প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫৯
প্রকাশক : অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী : নির্মলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯
অক্ষর বিন্যাস : মৃন্ময়
বি ২১২ বাঙ্গুর এভিনিউ
কলকাতা : ৭০০ ০৫৫

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০৭৩

রত্নাকে

।। পূর্বভাষ ।।

আমাদের লোকসংস্কৃতিচর্যার প্রধান অংশটি মূলত সংকলনমূলক এবং / কিংবা বিবরণকেন্দ্রিত। একটা পর্যায় পর্যন্ত ঐ বিবরণ ও সংকলনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশিই ছিল, সে কথা অবশ্য মানতে হয়। কিন্তু লোকজীবনের সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি কী, কতটা অবধি তার এলাকা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি তার ওপরে কতখানি অভিঘাত ফেলে—এইসব অনিবার্য কিছু প্রশ্ন সচরাচর এদেশে অনিরসিতই থেকে যায়। লোকসংস্কৃতিও যে সমাজবিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট বিদ্যাশৃঙ্খলা, সেকথা প্রায়শই থাকে অনুচ্চারিত।

এর ফলে, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বগত রূপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা স্বচ্ছভাবে অনুধাবন করতে পারিনা। তথ্যের বিশ্লেষণে আমাদের সাধারণত আগ্রহ কম; অন্তত সংকলনের ব্যাপারে যতটা উৎসাহ—তার অনুপাতে। আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসার আয়োজন যেখানে দেখি, সেখানেও আর এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বিদেশী—মূলত আমেরিকান—লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের তত্ত্বজ্ঞানমূলক বইপত্র থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঋণ নিয়ে এখানে যা-কিছু লেখা হয়ে থাকে তাদের সূত্রে আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক-পরম্পরার প্রেক্ষিতটি স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা যায়না। ফলে, প্রায় সময়েই ঐ তত্ত্বদর্শনের মাধ্যমে কোনও সুনিশ্চিত জমিতে পা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

লোকসংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠন এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞান-সন্ধান—উভয় ক্ষেত্রেই এই দো-রোখা সমস্যার সম্মুখীন হতে-হতে, এক সময়ে তার সমাধান করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া গিয়েছিল। .... এই বইটি সেই সিদ্ধান্তেরই লব্ধফল। লোকসংস্কৃতির বিশ্বজনীন ফ্রেমের মধ্যেই বাঙালীর লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপটিকে সাধ্যমতো ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন—এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্কটা যে কী, সেটাই এর মধ্যে দেখানোর জন্যে প্রয়াসী হয়েছি। প্রয়োজনে, গাণিতিক কিছু-সূত্রের সন্ধান করেও লোকসংস্কৃতির বহুমুখী অভিজ্ঞানকে সুসংহত করার নিরীক্ষাতেও দুঃসাহসী হয়েছি মাঝে-মাঝে!

এই কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করা। বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রশ্ন এবং সমস্যার মুখোমুখি হয়ে, এবং সে-সবের সম্ভাব্য সমাধান সন্ধান করতে গিয়ে এই বইয়ের বহু অধ্যায়-এবং উপ-অধ্যায় প্রাথমিক ভাবে নিবন্ধের আকারে লিখেছিলাম। এখন সামগ্রিক

একটি ভাবনার পরিমণ্ডলে সেগুলিকে এনে এবং নূতনভাবে পরিশীলিত, বিন্যস্ত ও তথ্যসম্মত করে এই বইয়ের মধ্যে সাজানো হয়েছে। আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই লিখতে হয়েছে অনেকগুলি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ও—এবং এই সব কিছু মিলিয়েই লোকসংস্কৃতির সীমারেখা কতদূর অবধি বিস্তৃত এবং তার যথার্থ রূপটা কী বা কেমন—সেটি দেখার ও দেখানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছি।

এখানে একটা কথা প্রাসঙ্গিক। যেহেতু মার্ক্সবাদকে একটি পরিপূর্ণ-বিশ্ববীক্ষণের প্রমা বলেই উপলব্ধি করি, তাই এই বইয়ের সর্বত্রই মার্ক্সীয় মতাদর্শের অভিক্ষেপ ঘটেছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে। জনজীবনের ঐতিহ্যকে স্মরণাতীত সময় থেকে একাল অবধি চিহ্নিত করতে গেলে তার আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি হয়ে ওঠে আলোচনার অনিবার্য একটি উপকরণ। কাজে-কাজেই এসব ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদকে পথদিশারী রূপে ধার্য না-করে তো উপায় থাকেনা!

আপাতভাবে, অলৌকিক-অবাস্তব-জাদু-কুহক-রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানা-ইত্যাদি নিয়ে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণগুলি যতই ব্যতিব্যস্ত থাকুক না-কেন, কিংবা সেখানে দেবতা-অপদেবতা থেকে শুরু করে রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যা-মন্ত্রীপুত্র-কোটালপুত্র—ইত্যাদি সব চরিত্রের ভীড় যতই জমুক না-কেন—বস্তুতপক্ষে, এর সবই যে বহিরঙ্গের বিষয়, অন্তরঙ্গে যে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের একান্ত-বাস্তব যত আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের পরিপূরণের জন্য ব্যক্ত বা অব্যক্ত অজস্র অভীপ্সাই—সেটিই এই আলোচনার প্রতীতি। আর তাই, মার্ক্সবাদই এর অপরিহার্য অবলম্বন।

এই বইটি গড়ে-তোলার জন্য আমার অত্যন্ত কাছের কয়েকজন মানুষের অবিরল উৎসাহ কাজ করেছে। অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্তের নাম এখানে সবার আগে উল্লেখ করতে হবে। তিনি এবং আরেক অগ্রজ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র গুপ্ত ছাড়া প্রিয় বন্ধু সনৎকুমার মিত্র, চন্দনকুমার চক্রবর্তী, প্রদীপ্ত সেন, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, দুলাল চৌধুরী এবং অনুজতুল্য চিদানন্দ ভট্টাচার্য, স্নেহভাজন রীতা ঘোষ ও রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই আমার দুহিতা চন্দ্রমল্লীর কথা তো এখানে বলতে হয়। 'মৃন্ময়' মুদ্রণালয়ের বন্ধুদের এবং প্রীতিভাজন অনুপকুমার মাহিন্দারের তুলনারহিত আগ্রহের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় **পল্লব সেনগুপ্ত**

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পদ্ধতি প্রসঙ্গে : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং সমাজ ও সংস্কৃতি

দরিদ্র এক খেয়ার মাঝি অপ্রত্যাশিতভাবে অন্নদায়িনী দেবীকে একদা তাঁর নাওয়ের সওয়ারী হিশেবে পেয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলেন:— "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" ঠিক ঐ একই আকাঙ্ক্ষা শুনতে পাওয়া যায় বাইবেলের একটি স্তোত্রেও : "ও লর্ড! গিভ আস দিস ডে আওয়ার ডেইলী ব্রেড্।" .... শুধু অন্নদামঙ্গল কাব্য এবং 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এই নয়, এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে চিরকালীন এবং বিশ্বজনীন। এর অন্তর্লীন সত্যটি স্মরণাতীত সময় থেকে আজ অবধি মানুষের প্রায় সমস্ত সৃষ্টি ও কর্মের অলক্ষ্য প্ররোচনারূপেই ক্রিয়াশীল রয়েছে। জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলির দাবী মেটাতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজেকে যেভাবে নিয়ে এসেছে এই সময় পর্যন্ত, তারই অনুষঙ্গ হিশেবে বিবর্তিত হয়েছে ঐ 'দুধ-ভাত' কিংবা 'ডেইলী ব্রেড' (দুটি কথাই এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত যে, সে কথা বলে রাখা উচিত) সংগ্রহের, তথা বাঁচবার রসদ জোগাড়ের উপায়গুলিও। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষণে সেগুলিই চিহ্নিত হয়েছে উৎপাদনের পদ্ধতি হিশেবে। সেই সব ক্রমবিবর্তিত অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই সমাজ-ইতিহাসেরও পরম্পরিত স্তরগুলিকে নির্দিষ্ট করেছে এবং পরোক্ষভাবে গড়ে তুলেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক এবং মানসিক সমস্ত ঋকৃথ। কোনও বিশেষ সমাজের বিকাশের ধারাটির স্বরূপ অন্বেষণ করতে হলে একজন মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী যেমন তার অন্তর্গত সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হন, ঠিক তেমনভাবেই কোনও সংস্কৃতিবিজ্ঞানের সন্ধিৎসু ছাত্র যদি সংস্কৃতির বিশেষ একটা পর্যায়ের সীমানা এবং স্বরূপকে বুঝতে চান, তাহলে তাঁকেও মূলত অভিনিবিষ্ট হতে হবে তার আর্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়াসমূহের লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম হবার কিছু কারণ নেই। সমাজ-বিশ্লেষণের মতো এই ক্ষেত্রেও তাঁকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচার-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল কোনও পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে-দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা : বস্তুবিশ্বের সামগ্রিক এবং অবিরাম বিবর্তনের অনুষঙ্গেই মানুষের সামাজিক উদ্বর্তনও ঘটে চলে; তার ব্যক্তিক অস্তিত্বও ওই

সামাজিক চলিষ্ণুতার সঙ্গেই সাপেক্ষ। ভাবাত্মিক যে-দ্বান্দ্বিকতা মার্ক্সের আগে হেগেল-প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে এই বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার মৌলিক প্রভেদ আছে। হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক-তত্ত্বের বক্তব্য ছিল— পূর্ণ বা শুদ্ধ চৈতন্য (ওঁর ভাষায় 'পিওর বীইং')-এর সঙ্গে তার বিপ্রতীপ অন্যতর অ-চৈতন্য ('নন্-বীইং') একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। এদের দুয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি, তৃতীয় তথা নতুন একটি ভাবচৈতন্য ('বিকামিং')-এর সৃষ্টি হওয়া। এইভাবে ক্রমান্বিত এবং অবিরত নূতন-নূতন 'চৈতন্য—অচৈতন্য—ভাবচৈতন্য' উদ্ভূত হয়ে চলে। জ্ঞানবিকাশের এই পর্যায়গুলিকে হেগেল যথাক্রমে, 'থিসিস'—'অ্যান্টিথিসিস'—'সিনথিসিস' আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন জাগতিক সমস্ত সৃষ্টিই এই চৈতন্যময়-দ্বান্দ্বিকতার লব্ধফল। আদি-চৈতন্য যা ছিল তা দেশকালাতীত— এই সেটিই হল পরমমহিম এক ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতীতি।

প্রমাবিহীন এই প্রতীতিকে ফয়েরবাখ মার্ক্সের আগেই অস্বীকার করেছিলেন। তিনি হেগেলীয় অধ্যাত্মবাদী-দ্বান্দ্বিকতার পরিবর্তে মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক অগ্রগমনকে গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্ববিচারে দেশ-কাল-সমাজের অতীত এক পরম-মানবতার তত্ত্বও বস্তুতপক্ষে প্রমাবিহিত নয়। মার্ক্স তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি নির্মাণ করতে গিয়ে হেগেল-প্রথিত থিসিস-অ্যান্টিথিসিস-সিনথিসিসের গাণিতিক কাঠামোটিকে যেমন গ্রাহ্য করেছিলেন ঐশ্বরিকতার প্রত্যয়কে বর্জন করে, ঠিক তেমনই আবার তিনি ফয়েরবাখের পরম-মানবতার তত্ত্বকেও গ্রহণ করেননি— সেটা ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত ছিল না যেহেতু; তবে ফয়েরবাখীয় সিদ্ধান্তের চিন্তা-পরম্পরায় যে-বস্তুমুখিন এবং মানব-নির্ভর প্রবণতা সুপরিব্যাপ্ত, সেটিকে মার্ক্স কিন্তু স্বাগত জানিয়েছেন।

আসল কথা, মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে অনুধাবন করাই যেহেতু মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকতার মুখ্যতম বিষয়, তাই সমাজের উত্তরোত্তর অগ্রগমনের পথে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলির অনুষঙ্গে যে-সব স্তরপর্যায় কিংবা শ্রেণী গড়ে উঠেছে এ-অবধি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণও সেই তত্ত্বের পক্ষে একান্তই জরুরী ব্যাপার। সমাজ-বিবর্তনের মূল পাঁচটি পর্বকে মার্ক্স চিহ্নিত করেছেন এই অর্থনীতি-নির্ভর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্রম-পরিণাম হিশেবে। এগুলি হল : আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস-শ্রম-নির্ভর সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ। জীবিকা নির্বাহ এবং উৎপাদন পদ্ধতির পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ফলে যে-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, তারই সূত্রে মার্ক্সীয় ইতিহাস বিচারে ঐ সমস্ত স্তরপর্যায়গুলি নামাঙ্কিত হয়েছে। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গ্যানের সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্ষেত্রসমীক্ষণের তথ্য ও তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে ফ্রীডরিশ এঙ্গেলস্ তাঁর 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট' (১৮৮৪) গ্রন্থে এই স্তরপর্যায়গুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

মর্গ্যানের 'এনসেন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭) বইতে সমাজবিবর্তনের যে-

স্তরপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোয় তাকেই পুনরবলোকন করেছিলেন এঙ্গেলস এবং সেই দেখারই পরিণত লব্ধফল হল মানুষের ইতিহাস-সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্তসমূহ। মর্গ্যান নিজে সমাজতন্ত্রী ছিলেন না; বুর্জোয়া আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধগুলির সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন বরং। ধর্মপ্রত্যয় এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাঁর ধ্যানধারণা মার্ক্সবাদের সঙ্গে সাযুজ্যময় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূলত তাঁরই সমীক্ষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে সোপান হিশেবে ব্যবহার করেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বশীর্ষে গিয়ে পৌঁছানো যায়। এজন্য সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকাশের পূর্ণ পরিচয় খুঁজতে গেলে কোনও মার্ক্সবাদী আলোচকের পক্ষেই মর্গ্যানকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতির সীমানা কতখানি অবধি বিস্তৃত, আর তার সামগ্রিক স্বরূপটি কেমনভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব — সেই সব কিছু অন্বেষণও তাই বহুলাংশেই মগ্যান-নির্দিষ্ট তথ্যনির্ভরতার মাধ্যমেই করতে হয়, তার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।

মর্গ্যান সমাজ-বিবর্তনের যতদূর অবধি চিত্রায়ণ করেছেন তার পরবর্তী পর্যায়গুলি নির্দিষ্ট হয়েছে ভি. গর্ডন-চাইল্ডের গবেষণায়। গর্ডন-চাইলড্ মানসিক-প্রবণতায় মার্ক্সবাদেই বিশ্বাসী বলে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলির কাঠানো স্পষ্টভাবেই কিন্তু মার্ক্স এবং এঙ্গেল্সের ভাবনার অনুসারী। মর্গ্যানের মতো তাঁর তত্ত্ববিশ্লেষণও এই বইয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সহায়ক হয়েছে, যদিও যান্ত্রিকভাবে মার্ক্সীয় আপ্তবাক্যের ফ্রেমে কোনও বক্তব্য বা সিদ্ধান্তকে এ-আলোচনার মধ্যে বেঁধে রাখা হয়নি : মার্ক্স নিজেই তাঁর তত্ত্বকে ও-রকম যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে অননুমোদন জ্ঞাপন করেছেন। মার্ক্স কী বলেছেন—এঙ্গেলস কী লিখেছেন—লেনিন কী সিদ্ধান্ত করেছেন—এইসব আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করাটাই যেমন প্রকৃত মার্ক্সবাদচর্যা নয়, ঠিক তেমনই আবার মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আর যাঁরা-সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের কথার যান্ত্রিক অনুসৃতি করাটাও প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সীয় অনুধ্যান-পদ্ধতি নয়। তাঁদের বক্তব্যগুলির অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক সত্যকে গ্রহণ করাটাই হল যথার্থ মার্ক্সবাদী পন্থা।

।। ২ ।।

মার্ক্সবাদ একটি বিশ্লেষণ-এবং-উপলব্ধিনির্ভর বিশ্ববীক্ষণ; পদ্ধতিগতভাবে, মুখ্যত আর্থসামাজিক বাস্তবতাকে কতকগুলি ক্রমান্বিত-তত্ত্বের মাধ্যমে বিচার করেই সেই বিশ্ববীক্ষা নিষ্পন্ন হয়। সেই বিচারের আনুষঙ্গিক হিশেবে মার্ক্সবাদের মৌলিক-ভাবনার সঙ্গে সুসমঞ্জস বলে গণ্য হতে পারবে এমন কিছু নূতন-তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্তও সর্বদাই স্বাগত। বিশেষত, কোনও ধরনের শৈল্পিক ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে তো এই ব্যাপারটি প্রায় অনিবার্যই বলা চলে।

মার্ক্সবাদ-বিরোধী পণ্ডিতেরা শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যায়ন কিংবা স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রায়শই মার্ক্সীয় বীক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে একটি নির্ভিত্তিক-অভিযোগ খাড়া করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুসারে মার্ক্সবাদী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিচারে নাকি বলা যে, সে-সবকিছুই আসলে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তার হুবহু প্রতিচ্ছবি। অথচ মূল কথা হল এই যে, বস্তুময় জীবন-প্রতিবেশের চাহিদা-অনুসারে মানুষ তার উৎপাদন

প্রণালী উদ্‌ভাবন করে এবং সেটাই তার সমকালীন সামাজিক, পারিবারিক, গোষ্ঠিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থানগুলিকে পরিচালিত করে। সেই চালনার সূত্রেই তার মানস এবং প্রজ্ঞারও উদ্‌ভাস ঘটে। সংস্কৃতির ব্যবহারিক ও মানসিক ঋকৃথগুলি তারই প্রেরণাগত বটে, কিন্তু কোনও সময়েই আক্ষরিক প্রতিবেদন অথবা চিত্রায়ণ নয়। ভাবনার রূপক, সঙ্কেত, প্রতীক, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই ঋকৃথসমূহের বহিরঙ্গের বিন্যাস ঘটে পরোক্ষভাবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ক্রমপরম্পরিত গতিপথটির একটা জটিল এবং বহুরৈখিক চেহারা রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদেরও একটা জ্যামিতিক অবয়ব নির্দেশ করা সম্ভব। থিসিস (অবস্থান), অ্যান্টিথিসিস (বিপ্রতীপ অবস্থান) এবং সিনথিসিস (সমন্বিত-অবস্থান)—এই তিনটি মাত্রাকে যদি যথাক্রমে, 'ক'-'খ'-'গ' রূপে সঙ্কেতবদ্ধ করা যায়, তাহলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের রৈখিক প্রতিবেদনটি হবে এই রকম :

এই রেখাসংকেতের সঙ্গে সাযুজ্যসম্পন্নভাবেই মানুষের ইতিহাস-বিবর্তনের অজস্র স্তর-উপস্তরগুলির উদ্ভব ও রূপান্তরের পথনির্দেশ পেতে পারি। এই সূত্রে, মার্ক্সীয় তত্ত্বে মূলত কী বলা হয়েছে প্রসঙ্গত সেটি একটু স্মরণ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় :

ক. "ভাব, বোধ এবং সচেতন তার উপকরণগুলি প্রত্যক্ষভাবেই মানুষের বস্তুকেন্দ্রিক কাজকর্ম ও বাস্তব কর্মসম্পর্কের সঙ্গে এবং বাস্তব জীবনচর্যার ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কোনও কিছু সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলা, ভেবে নেওয়া, ভাবনার বিনিময় করা, সব কিছুই বস্তুতপক্ষে মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে তার চলাবলা, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির লব্ধফল রূপেই প্রতীতি পায়। এই সবকিছুই হল উৎপাদক-উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের বিশেষ-বিশেষ পর্যায় আর তাদের সঙ্গে উদ্বর্তনের সর্বোচ্চ স্তরে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গতিই নিরূপণ করে তার বাস্তব অবস্থান।" ('দ্য জার্মান ইডিওলজি' · মার্ক্স ও এঙ্গেলস; ১৯৬৪-র মস্কো সংস্করণ; পৃ: ৩৭)

খ. "শেষ বিচারে, বাস্তব জীবনচর্যায় উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনই হল ইতিহাসের মুখ্য নিয়ন্ত্রী শক্তি। আমরা (আমি এবং মার্ক্স) শুধু এইটিই বলেছি, এর চেয়ে কিছু বেশি নয়। তাই যদি কেউ আমাদের বক্তব্যের বিকৃতি ঘটিয়ে এমন কথা বলেন, যে অর্থনৈতিকভাবে যা-যা কিছু উৎপাদিকা শক্তি বলে গণ্য কেবলমাত্র সেগুলিই শুধু নিয়ামক শক্তি হিশেবে ধার্য হবে, তাহলে তিনি আমাদের বক্তব্যকে কিন্তু বাস্তবতাবর্জিত একটি অবোধ প্রলাপেই পরিণত করবেন। একথা ঠিকই যে, অর্থনৈতিক অবস্থানই হল মূল বনিয়াদ, কিন্তু তার ওপরে গড়ে তোলা বহি:সৌধগুলির তাবৎ উপাদানসমূহও তাদের সর্বাবিধ বৈচিত্র্য নিয়ে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার বিবর্তনে নিজেদের প্রভাব ফেলে; প্রায়শই, তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাও পালন করে। এই সমস্ত উপকরণগুলির মধ্যে নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই এমন ব্যাপারটা হয়। এই কথাটাই মার্ক্স বারংবার বলেছেন।" ('মার্ক্স ও এঙ্গেলেসের পত্রাবলী'; জে. ব্লখকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি, ২১.৯.১৮৯০)

গ. "বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদনের চারিত্রিক অভিজ্ঞান যে ঠিক কী, সেটা তাকে তার পারিপার্শ্বিক ইতিহাসগত আয়তনে রেখে বিচার না-করলে বুঝতে পারা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার অনুষঙ্গে যে-সব মননসঞ্জাত উৎপাদন সংক্রিয়া দেখা যায়, তাদের বাস্তব স্বরূপগুলিও তা না-হলে চেনা অসম্ভব হয় এবং ঐ ঐতিহাসিক আধার এবং তার আধেয় স্বরূপ মননজাত ফলগুলির মিথস্ক্রিয়ার স্বরূপটিও বোঝা যায় না। " ('দ্য জার্মান ইডিওলজি,' পূর্ববৎ; পৃ: ৩৮)

এই তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজের বিকাশধারা এবং তারই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংস্কৃতির উদ্বর্তনের চরিত্রটিকে বুঝতে হবে। সংস্কৃতিবিজ্ঞানের সমস্ত অন্বিষ্ট ছাত্রকেই এই বিশিষ্ট পদ্ধতিটির সঙ্গে নিজের সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যাচাই করে নিতে হয় অতএব। সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশের প্রেক্ষাপটরূপে যে বিশেষ-বিশেষ আর্থ-সামাজিক স্তরগুলি মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিবিম্বন ঘটেছে লোকায়ত জীবনের প্রাত্যহিক চর্যার ক্ষেত্রে : এককথায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণে।

ফলকথা এই যে, আর্থনীতিক অন্তর্কাঠামোর ওপর সংস্কৃতির সমস্ত প্রকরণেরই বাহিরঙ্গিক রূপটি গড়ে উঠে। স্বভাবতই, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আবার উৎপাদন শক্তিগুলির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পটভূমিতেই বিবর্তিত হয়। শিল্প ও সাহিত্য লোকায়ত স্তরে সহজ, সরলভাবে এবং পরিশীলিত স্তরে সূক্ষ্ম-জটিল বুননে তাকে ব্যঞ্জিত করে। এক জন মার্ক্সবাদী-বিশ্লেষককে তাই সামাজিক স্তর বা শ্রেণীগুলির প্রতিভূস্বরূপ তাদেরই অন্তর্গত মানুষের জীবনচর্যা, মনন এবং কর্মের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচার ও মূল্যায়ন করতে হয়। আবার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডই সেই বিশ্লেষণের মাপকাঠি বলে গণ্য হতে পারে না : নীতিবোধ, ধর্মচেতনা, দর্শনবোধি ইত্যাদির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াও সেখানে বিচার্য, কারণ এগুলিই হল সমাজ-চৈতন্যের বিচিত্র প্রাকরণিক উপাদান। এই মিথস্ক্রিয়া একটি সুজটিল সংগঠন। সংস্কৃতির ব্যাবহারিক দিক এবং মানব-অভিব্যক্তির দিকগুলির পরস্পরসাপেক্ষ টানাপোড়েনের বুননে এটা ঘটে চলে অবিরামভাবে। এই ব্যাপারটিকেই প্লেখানভ সারসংকলিত করে বলেছেন— 'শিল্প আসলে একটি সামাজিক বিষয়।'

।। ৩।।

'ডায়ালেকটিক্স অব নেচার' (১৮৭৬; প্র. ১৯৪৫) বইয়ের ভূমিকায় এঙ্গেলস একটি উক্তি করেছেন, যার তাৎপর্য অপরিসীম। তিনি লিখছেন : "আর কেউ নয়, মানুষ— শুধু মানুষই পারে তার নিজের ইতিহাসকে গড়ে তুলতে। আর সে তা অতীতে পেরেছে এবং উত্তরকালেও পারবে।" এঙ্গেলসের এই কথায় অনুপ্রাণিত হয়েই সম্ভবত ভি. গর্ডন-চাইল্ড তাঁর একটি বইয়ের নাম দেন 'ম্যান মেকস হিমসেলফ' (১৯৪৮)। এই বইতে তিনি সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে, মানুষকেই ইতিহাসের মূল নিয়ামক শক্তিরূপে গণ্য করেছেন। একটি মাত্র বাক্যে এঙ্গেলস যে-তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন, তাকেই গর্ডন-চাইল্ড সুপ্রতিষ্ঠ করলেন তাঁর ঐ বইতে। প্রকৃতির ওপর যখন থেকে সে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে শিখল, তখন থেকেই সভ্যতারও সূচনা ঘটেছে। অর্থাৎ মানুষ এবং প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের লব্ধফলই হল তার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, তদানীন্তন উৎপাদন-ভিত্তিক সামাজিক-প্রেক্ষিতে যা গড়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে। উৎপাদন-পদ্ধতির ক্রম-উদ্বর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তার সভ্যতা-সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটেছে স্বতঃসিদ্ধ অনিবার্যতায়।

তাহলে, ইতিহাস এগিয়ে চলে তার নিজস্ব দ্বান্দ্বিক নিয়মেই। বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিচয়ের মধ্যে প্রতিনিয়তই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অবস্থান এবং প্রতি-অবস্থানের সংঘাতে একটি সমন্বিত অবস্থান উদ্ভূত হয় গুণ ও রূপ দ্বিবিধ পরিবর্তনকে সূচিত করেই। আবার, ঐ নূতন-অবস্থানটিরও একটি প্রতি-অবস্থান থাকে অবশ্যম্ভাবী হয়ে, তাদের দুজনের দ্বান্দ্বিকতার নূতনতর এক সমন্বয়ী-অবস্থানের সৃষ্টি হয়, এইভাবেই নিরন্তর গতিতে চলে সমস্ত প্রক্রিয়াটি। গুণগত এবং পরিমাণগত যে-রূপান্তরগুলো ঘটে তারাও কিন্তু আবার একান্তভাবে পরস্পরসাপেক্ষ, যদিও সে ক্ষেত্রে একটা দ্বান্দ্বিক-উদ্বর্তনের প্রক্রিয়া নিয়তই চলিষ্ণু থাকে।

ইতিহাস বলতে শুধু মাত্র কতকগুলি ঘটনার সনতারিখনামা এবং সামাজিক পর্যায়ে যাঁরা জনসাধারণকে শাসন (এবং শোষণও!) করে এসেছেন (সেটা সভ্যতার যে-কোনও কালে, যে-কোনও স্তরেই হোক না-কেন) তাঁদের কর্মকাণ্ডের সত্য-মিথ্যা বিবরণপঞ্জীকেই যে বোঝায় না, এই তত্ত্বকে এখন আমরা বিশ্বজনীনভাবেই বুঝতে শিখেছি। এমন কী, মার্ক্সবাদের যাঁরা বিরোধী, তাঁরাও কিন্তু এ-সম্পর্কে ভিন্নতর কোনও মত এখন আর মানতে পারেন না। জনজীবনের ক্রমান্বিত-বিবর্তনের পরিচয় সন্ধান করাই যে যথার্থ ইতিহাসচর্যা, একথা এখন সকলেই মেনে নেন। সেই পরিচয় অন্বেষণেরই একটি সফল হাতিয়ার হল সংস্কৃতির — বিশেষত, লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করা। সেই সন্ধান কেমন করে সফল হতে পারে, এঙ্গেল্‌স তাঁর ঐ 'ডায়ালেকটিক্স অব নেচার' বইতে সে-সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক প্রজন্মেই শ্রমের চেহারা বদলে যেতে লাগল, তার বৈচিত্র্য এবং ত্রুটিহীনতার পরিমাণ থাকল বাড়তে। শিকার এবং পশুপালনের সঙ্গে প্রথমে চাষবাস এবং তারপরে সুতো-কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুশিল্পকে গড়ে তোলা, মৃৎশিল্পের বিস্তৃতি ঘটানো, নৌকোচালানো-ইত্যাদি সব ব্যাপার ক্রমে-ক্রমে সামাজিক ক্ষেত্রে সংযুক্ত হতে থাকে। এইভাবেই ধীরে-ধীরে শিল্প-বাণিজ্যও গড়ে উঠল তার তারই অনুষঙ্গে আবির্ভূত হল চারুশিল্প ও বিজ্ঞান। গোষ্ঠী থেকে জাতি এবং তার থেকেই রাষ্ট্রেরও উদ্বর্তনও হল; প্রতিষ্ঠিত হল বিধি-বিধান, আইন আর রাজনৈতিক অনুশাসনসমূহ। আর, এই সব কিছুর সঙ্গে—মানুষের অন্তর্লোকে তার নিজেরই বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিবিম্বিত হয়ে পরিণতি পেল ধর্মচিন্তায়।" (১৯৪৫ সংস্করণ; পৃ. ২৮৮'-৮৯)

সংস্কৃতির এই ব্যাবহারিক এবং মানসিক ঋকৃথ্‌গুলির মধ্যে পরস্পর-সাপেক্ষতার ব্যাপারটি যেখানে একান্ত প্রাঞ্জলভাবে বোঝানো হয়েছে সেটি কিন্তু কোনও মার্কসীয় তত্ত্বের পুঁথি নয়। ঐ ব্যাপারটার খুব সুন্দর এবং স্বচ্ছ প্রতিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

"জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে — সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতোরের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে — তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে ; তার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।" ("গ্রাম্যসাহিত্য" / 'লোকসাহিত্য'; রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৭১৬)

শ্রমপদ্ধতির প্রত্যক্ষ-অনুষঙ্গে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ যে কেমনভাবে ঘটে, তার নিখুঁত চিত্রায়ন করেছেন এখানে রবীন্দ্রনাথ। মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতেও ঠিক এই কথাগুলিই বলতে হবে নির্দ্বিধায়।

এখানে একটা কথা অবশ্য বলে নেওয়া দরকার। এই শ্রম নির্ভরশীল সংস্কৃতির বিকাশের মূল রূপটি পরিশীলিত নাগরিক অথবা ধ্রুবপদী কলাকৃষ্টির মধ্যে থাকলেও, তা থাকে প্রচ্ছন্ন হয়েই। পক্ষান্তরে, লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটি অনেক স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ চেহারায় হাজির থাকে। সভ্যতার স্তরে-স্তরে ইতিহাসের যে-উদ্বর্তন ঘটে, তার সম্যক্ পরিচয়টি মেলে সেখানেই। তাই কোনও মার্ক্সবাদী আলোকে যখন

তাঁর অভীপ্সিত বিশ্ববীক্ষণের আলোয় লোকসংস্কৃতির স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে চান, তখন তাঁকে এই জন্যেই কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শরণ নিতে হয় ঃ এছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ঐ যেভাবে সভ্যতার প্রতিটি পর্যায়েই ইতিহাসের রথচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে, সেটি ঘটেছে বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক উৎপাদন-নির্ভর বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিণামেই। কোনও-না-কোনওভাবে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের যে-অবিরাম-সংঘটন মানুষের সমাজে হয়েই চলেছে, তারই সূত্রে সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও ইতিবৃত্ত রচিত হচ্ছে নিরন্তরভাবে। কখনও বা সেই দ্বন্দ্ব শিকারী এবং সংগ্রাহকের সঙ্গে পশুপালনজীবীর; কখনও তাদের একজনের, অথবা, দু-জনের সঙ্গেই কৃষিজীবীর; আবার কখনও কৃষিদীবীর সঙ্গে শিল্পজীবীর; চূড়ান্ত পরিণামে সামগ্রিকভাবে শোষিত নির্বিত্ত শ্রমজীবীদের সঙ্গে বিত্তবান পরশ্রমজীবীদের। পাপ-পুণ্য-ধর্ম-ঈশ্বর-নিয়তি-কর্মফল ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে, ভাগ্যলিপির দোহাই পেড়ে প্রত্যক্ষে সেই সংঘাতকে কোনও-কোনও সময়ে ঠেকাতে পেরেছে বটে ক্ষমতাসীন শ্রেণী, একথা ঠিক। কিন্তু তখনও লোকজীবনের সংস্কৃতির মধ্যে ঐ দ্বন্দ্বের অভিক্ষেপগুলি পড়েছে আর যখন ক্ষমতাসীন শ্রেণী ঐ দ্বন্দ্বকে এড়াতে পারেনি, তখন তো তার প্রগাঢ়-প্রভাব লোকায়ত কৃষ্টির ওপর পড়েছেই। প্রচলিত প্রথানুগত ইতিহাস-চর্চায় এর হদিশ মিলবে না। সেকথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

মার্ক্সীয় তত্ত্বের মৌলিক প্রমিতিগুলির স্বরূপ-নির্দেশক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থে ('ফাণ্ডামেন্টাস অব মার্ক্সিজম-লেনিনিজম্) এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মুখ্য কাঠামোটিকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, এখানে যা খুব প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধারযোগ্য ঃ

"উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা-শক্তিগুলির সংঘাতের পরিণামে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধটা ক্রমশই তীব্র হতে থাকে; বিশেষভাবে ঐ ক্রমবর্ধমান তীব্রতা দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে। এইসব শ্রেণীর কোনও-কোনওটি পূর্বতন অর্থনৈতিক পর্যায়ের সম্পদ-কেন্দ্রিত সম্পর্ককেই টিকিয়ে রাখতে চায়; পক্ষান্তরে, অন্যরা চায় নূতন অর্থনীতি-নির্ভর বিত্তসম্পর্কগুলিকে বিকশিত করতে। (সংঘাতটা এই জন্যেই হয় অনিবার্য।)

সমাজ কোনও সময়েই চলে-যাওয়া অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল উৎপাদন-শক্তিগুলিব সৃষ্ট বাতিল-হওয়া উৎপাদন-সম্পর্ককে ফিরিয়ে আনতে পারে না। অবশ্য, ক্ষমতাশালী শ্রেণী হামেশাই ভাবে যে, সেইটিই হল তার অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ। অচিরেই পুরানো উৎপাদন-পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেই শূন্যতা সামগ্রিকভাবে পূরণ করে নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক, নূতন উৎপাদন শক্তি।............ঠিক একইভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই দ্বান্দ্বিকতা চলতেই থাকে চক্রাবর্তনে, অবিরাম।" (ক্লিমেন্স ডাট-সম্পাদিত, ১৯৬০; পৃঃ ১৫০)

একই ভাবে সংস্কৃতির ক্রমাবিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটিই একান্তভাবে অনুসরণযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ক. সংস্কৃতির স্বরূপ

আগের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে 'সংস্কৃতি' বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার একটি সুনির্দিষ্ট আভাস মিলেছে। মার্ক্সীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে, 'সংস্কৃতি' হল মানুষের সচেতন অস্তিত্বময় অবস্থানের বহিঃসৌধ (অর্থাৎ, সুপার-স্ট্রাকচার)। উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক অবস্থান এবং প্রতি-অবস্থান সৃষ্টি করে সমাজের অন্তঃসৌধ (বা, ডীপ-স্ট্রাকচার); তার ওপর ব্যবহারিক প্রয়োজনের গুরুত্ব-অনুযায়ী তৈরি হয় শিল্পকলা, সাহিত্য, আচার-সংস্কার, রাষ্ট্রবিধান, দেবকল্পনা, ধর্মপ্রত্যয়, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মূল্যবোধ ইত্যাদি, আর এই সমস্তকিছুর সমন্বিত ফলশ্রুতিই হল সংস্কৃতি।

এই 'সংস্কৃতি' অর্জনের জন্য মানুষকে কয়েক লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে-করে অগ্রসর হতে হয়েছে। তার বাঁচার তাগিদেই সে শ্রম প্রক্রিয়াকে নিজের বিবর্তনশীল বুদ্ধিবৃত্তির জোরে জটিল এবং সূক্ষ্মতর করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ শ্রমপদ্ধতিগত-জটিলতাই তাকে করে তুলেছে পশুর থেকে পৃথক; শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তার মেধা, স্মৃতিক্ষমতা এবং বিচারশক্তি। এই সবের সুসংহত পরিণামে সে যুক্তিসিদ্ধভাবে ভাবতে শিখেছে, প্রকৃতির ওপরে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে এবং গড়ে তুলেছে শৃংখলাবদ্ধ সমাজ, ক্রমবিবর্তমান সভ্যতা আর তারই অনুষঙ্গে -- সংস্কৃতি।

মানুষের সংস্কৃতি তার স্রষ্টার জ্ঞান-ও-পরিশীলন নিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, আবার সেখান থেকে আর এক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতে-হতে বহমান থাকে। এইটিকেই বলা হয়, ঐতিহ্য। ঐ হস্তান্তরের সময়ে তার কিছু-কিছু রূপান্তর ঘটে বটে, কিন্তু মূলগত চরিত্রের অনেকখানিই আবার থাকে অক্ষুণ্ণ। অন্যদিকে একটি গোষ্ঠী এবং সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিও এসে হামেশাই মিশে যায়। এটা সম্ভব হয় এইজন্যেই যে, বিবিধ প্রকারের আর্থ-সামাজিক উপলক্ষে গোষ্ঠীগুলি একে অপরের সান্নিধ্যে আসে। মৈত্রী কিংবা বিবাদ, সহযোগিতা অথবা শত্রুতা, অর্থনৈতিক লেনদেন নয়ত কারিগরী প্রযুক্তির বিনিময় ইত্যাদির সূত্রে একের সঙ্গে অপরের যে- যোগাযোগ গড়ে ওঠে— তারই কারণে সাংস্কৃতিক উপাদানেরও বিনিময় ঘটে। হেনরী লুইস মর্গ্যানের প্রসঙ্গ আগের অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে; তিনি দেখিয়েছেন সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকাশের একটি অলঙ্ঘনীয় বিশ্বজনীন নিয়ম রয়েছে। প্রত্যেকটি সমাজের সংস্কৃতিতে বহিরঙ্গগতভাবে নিজস্বতা থাকলেও, তার অন্তর্লোকে ঐ বিশ্বজনীন-সমধর্মিতাও আছে। আর সেই কারণেই এক পক্ষের বাহিরঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে অন্যপক্ষের আত্মগত করে নেওয়াটা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতির মূল চরিত্রের মধ্যেই বিশ্বজনীনতা এবং অনন্যতার একটা বিচিত্র সহাবস্থান থাকে। এটাকে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতাও বলা চলে স্বচ্ছন্দে।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে 'সংস্কৃতি' বলতে যে- সামগ্রিক আয়তনকে বোঝায়, তা হল মূলত এইরকম ঃ

প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে গেলে মানুষ যা-কিছু উদ্‌ভাবন করেছে, করে এবং করবে—সেগুলি সম্পর্কে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে, এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে প্রতিবেদিত অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা হল সংস্কৃতির একটা দিক। অন্যতর একটি দিকে, মানুষের নান্দনিক সমস্ত সৃষ্টি—যা ঐসব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণী অভিজ্ঞানগুলির অনুষঙ্গে গড়ে ওঠে এবং ঠিক একইভাবে হস্তান্তরিত হয়— সংস্কৃতির আয়তনকে সমৃদ্ধ করে। এই দুটি দিককে একত্রে সুসংহত করে তোলে প্রথা, রীতি, আচার, সংস্কার, প্রত্যয় ইত্যাদি। পৃথক অথচ পরস্পর-সাপেক্ষ এই যে-তিনটি স্তরের অস্তিত্ব ঐতিহ্যাগতভাবে বিদ্যমান আছে মানুষের সমাজে — এরাই একত্রে অভিহিত হয় 'সংস্কৃতি' হিশেবে।

এই বক্তব্য অবশ্যই একটু ব্যাখ্যার দাবী করতে পারে। নিচের রেখাচিত্রটি সেই ব্যাখ্যার প্রারম্ভিক প্রয়োজন মেটাতে পারে সম্ভবত ঃ

	মানব সম্পদ	ললিতকলা সাহিত বিজ্ঞান দর্শন
সংস্কৃতি	ভাবসংযোগ প্রক্রিয়া	প্রথা প্রত্যয় রীতি বিধিবিধান আচার সংস্কার
	ব্যবহারিক সম্পদ	বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্ত করার জন্য উদ্‌ভাবনী প্রজ্ঞাসমূহ □ উৎপাদন-প্রক্রিয়া

এই ছকের পরিপ্রেক্ষিতে বলা সঙ্গত যে, 'সংস্কৃতি' আসলে একটি ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ এবং তার বিবর্তনের নিয়ামক হল আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উপলক্ষ। ভাববাদী বিশ্লেষণে সংস্কৃতিকে নিছক একটি অন্তর-প্রেরণাজাত অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা হলেও, মার্ক্সবাদী-বিশ্ববীক্ষা ঐ প্রেরণার উৎসে বাস্তব উৎপাদন-পদ্ধতিগুলির অস্তিত্বকেই অবশ্যম্ভাবী বলে ধার্য করে। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা একান্তই জরুরি : বাস্তব প্রেক্ষিতের দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও, সংস্কৃতির মানস-সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বদাই কিন্তু সরাসরিভাবে তার প্রত্যক্ষ অভিক্ষেপ ঘটেনা। কিন্তু একথাও ঠিক যে, প্রতিটি অর্থনৈতিক-প্রক্রিয়া-নির্ভর সামাজিক শ্রেণীই, তার নিজস্ব উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য-সম্পন্ন করেই তার 'নিজস্ব' সংস্কৃতির ঐ তিনটি স্তরকেই গড়ে তোলে। ইতিহাসের যে-পর্যায়ে শিকার-ও-সংগ্রহই ছিল তার অর্থাৎ, মূল আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর) মুখ্য জীবিকা-মাধ্যম (ওরফে, উৎপাদন-ক্রিয়া)— তখন তার হাতিয়ার, বাসস্থান, খাদ্য, তৈজসপত্র, আচার, বিশ্বাস, রীতিনীতি, বিধিবিধান,

দেবতা, ধর্মপ্রত্যয়, সংস্কার- নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সামাজিক-সম্পর্ক—সমস্ত কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকত পশু-পাখি-শিকার-অরণ্য এবং তার আনুষঙ্গিক বহুকিছুই। ঠিক তেমনই আবার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাত এবং তার অনুসূত্রে কখনও জয়, কখনও বা পরাভবও মানুষের সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষত দেবতা-কল্পনায় এবং মিথ-তথা লোকপুরাণ-বৃত্তান্তে। আবার যে-গোষ্ঠীর মানুষরা মূলত পশুচারণকেই প্রধান উপজীবিকা হিশেবে গ্রহণ করেছে, তাদের সাংস্কৃতিক উপকরণ এবং অভিব্যক্তিতেও সেটিই প্রধান। শিকারজীবীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত হয়েছে মিথ, সঙ্গীত, নৃত্য—ইত্যাদিতে। ঠিক এই ভাবেই, কৃষিনির্ভর-অর্থনীতি যে-সমাজে প্রধান উৎপাদন মাধ্যম, সেখানে সংস্কৃতির সর্বস্তরেই চাষবাস-কেন্দ্রিক ভাবধারার প্রভাব; আর পশুপালন যাদের উপজীবিকা ছিল, তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের বিবরণও এই গোষ্ঠীর মানুষদের তৈরি করা মিথ-ইত্যাদির মধ্যে মেলে।

কৃষির পত্তনীর পর ক্রমে-ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যখন গড়ে উঠেছে, তখনও সেই প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংস্কৃতি-সম্পদগুলির মধ্যে ঐ সমস্ত কিছুর ছায়াপাত ঘটেছে। সেই ছায়া কোথাও ফিকে, কোথাও বা গাঢ় হলেও, সর্বপর্যায়েই তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়, প্রত্যক্ষত যদি না-ও হয় পরোক্ষে তো বটেই। বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর প্রভেদের ফলে যে-দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সমাজে একটি অবশ্যম্ভাবী সংঘটন হিশেবে দানা বেঁধে ওঠে, তার প্রতিফলন দেখা যায় সাংস্কৃতিক প্রকরণগুলির মধ্যে — লোককাহিনী, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত এমন কী লৌকিক খেলাধূলার মধ্যেও।

শ্রেণীভিত্তিক সমাজকাঠামো পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করলে একই রাষ্ট্র-বা-সমাজকাঠামোর মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবার একাধিক পরস্পর-সম্পর্কিত অথচ পৃথক এলাকার সৃষ্টি হয়। ওপরতলার পরশ্রমজীবী শ্রেণীর সংস্কৃতি-প্রকরণগুলি অনেক বেশি পরিশীলিত, জটিল এবং সূক্ষ্ম হলেও, নিচের তলার শ্রমজীবী জনসমাজের সংস্কৃতির উপকরণগুলির গ্রাহ্যতা অনেক, অনেক বেশি ব্যাপক। তবে পরিশীলিত নাগরিক সংস্কৃতি, ধ্রুবপদী সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে এক অলক্ষ্য যোগসূত্র থাকে বলেই এরা পরস্পর-সাপেক্ষও বটে। এদের মধ্যে পারস্পরিক দান-প্রতিদানের ব্যাপারটিও থাকে সর্বদাই ক্রিয়াশীল । সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে প্রাথমিকভাবে মর্গ্যান এবং তাঁর পরে গর্ডন-চাইল্ড, প্লেখানভ প্রমুখ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অবশ্য মর্গ্যানের তত্ত্বকে অবলম্বন করেই এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিকাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন বলেই হয়ত মার্ক্সবাদে অপ্রত্যয়ী নৃতত্ত্ববিদ্‌রা হয় তাঁকে সম্পূর্ণই উপেক্ষা করেছেন, আর নয়ত নানান্ খুঁটিনাটি উপলক্ষকে মুখ্য করে দেখিয়ে সামগ্রিকভাবে তাঁর তত্ত্বটিকেই নস্যাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গগুলি পরে আলোচ্য; তার আগে, মর্গ্যান এবং গর্ডন-চাইল্ড সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদির বিবর্তনের যে-ধারাক্রমটি সন্ধান করেছেন, সে বিষয়ে অনুধাবন করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই ক্রমবিকাশের রূপরেখাটিই অতঃপর আলোচ্য।

খ. সংস্কৃতির সিঁড়ি ঃ মর্গ্যানীয় তত্ত্ব

মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষার প্রেক্ষিতে 'সংস্কৃতি' কথাটার যে ব্যাপক এবং গভীর তাৎপর্যই থাকুক না কেন, 'সংস্কৃতি' বলতে একটা ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, নাচ-গান-অভিনয়-আবৃত্তি—এই ধরনের ব্যবহারিক নানাবিধ কলাবিদ্যার মধ্যেই তার পরিচয় নিহিত। যাঁরা একটু বেশিদূর চিন্তা করতে ইচ্ছুক হন, তাঁদের বিচারে ঐ তালিকার সঙ্গে সাহিত্য-কলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-ইত্যাদিও সংযুক্ত হয়।

অথচ, 'সংস্কৃতি' কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে আরও অনেক বেশি তাৎপর্য। মানুষের সভ্যতার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গেই এই কথাটি বিজড়িত। তাই একালের সমাজবিজ্ঞানের উৎসুক ছাত্রেরা সংস্কৃতির যথার্থ রূপ এবং তার বিবর্তনের ধারাটিকেও তাঁদের বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের উপকরণ বলে গণ্য করেন।

সংস্কৃতি-বিকাশেরও যে একটা সুস্থিত বৈজ্ঞানিক ধারাক্রম আছে, অনিবার্য কতকগুলি ঐতিহাসিক সংঘটনের সূত্র ধরেই যে তার চরিত্র নির্ণয় করতে হয়— এ ব্যাপারটা এখনও বহু পণ্ডিতই মেনে নিতে পারেন না : বিশেষত পুরোপুরিভাবে বুর্জোয়া ভাবধারায় যাঁদের মানসিকতা পরিণত হয়ে উঠেছে-তাঁরা। সংস্কৃতিকে তাঁরা বহু সময়েই শুধুমাত্র অনির্বচনীয় এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু অনুভূতির লব্ধফলরূপেই দেখাতে চান এবং তার ফলে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটিই যায় আবৃত হয়ে।

স্বভাবতই, আলোচনার এই পর্যায়ে এসে 'সংস্কৃতি' ব্যাপারটি কী এবং কতখানি তার ব্যাপ্তি—সেই প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়। .....এর জবাবে হয়ত 'সংস্কৃতি' শব্দটির তাৎপর্য নিয়েই কথা শুরু করা যেতে পারে। 'সংস্কৃতি' শব্দের আড়ালে দুটি ব্যঞ্জনা : স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হওয়া কোনও প্রত্যয় বা ধারণা, যা অধিকাংশ সময়েই পরিবেশ, পরিবার, সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে গড়ে উঠে; এবং পরিশীলন, পরিমার্জনা, সুন্দরভাবে বিন্যাস করা ইত্যাদি। 'সংস্কৃতি'র পূর্ণায়ত তাৎপর্য এই দুই ধরনের ব্যঞ্জনার সমন্বয়েই মিলবে।

সভ্যতার আদিকাল থেকেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। বস্তুত, বাঁচবার প্রয়োজনে মানুষ যে-ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে, তারই অনিবার্য অনুষঙ্গে তার মানস-সম্পদ সঞ্জাত অভিব্যক্তিগুলিরও প্রকাশ হয়েছে।

এই পরস্পরসাপেক্ষ বিকাশটিরই একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্দেশ করেছেন লুইস হেনরি মর্গ্যান। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের সভ্যতার বিবর্তন সমস্ত দেশ-কাল-সমাজেই ঘটেছে একটি সুনির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা হয়ে। এই বিবর্তন ঘটেছে, এবং এখনও ঘটছে, পরম্পরিত কতকগুলি স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়ার মাধ্যমে। কোনও জাতি বা গোষ্ঠী বা পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা অন্য কোনও কিছু কারণের জন্য বিবর্তনের একটি স্তরে এসে হয়ত আটকে রয়েছে; অন্য কোনও জাতি বা কোম হয়ত সে-স্তর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগেই এবং হয়ত বা তৃতীয় কোনও গোষ্ঠী উপযুক্ত পারিবেশিক ও আর্থনীতিক সুযোগের অভাবে ঐ স্তরে তখনও উঠতেই

পারেনি।

অথচ, এই উদাহরণের তিনটি গোষ্ঠীই হয়ত বা ক্যালেণ্ডারের বিচারে সমসাময়িক। স্বচ্ছ করে বোঝার জন্য উদাহরণ-স্বরূপ ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি আদিবাসী জাতিকোমের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে হয়ত। আন্দামানের ওঙ্গেরা, নীলগিরির অরণ্যের চোলানাইক্কাররা, বিহার-বাংলার সাঁওতালরা, সিকিম-তিব্বত সীমান্তের অনামা একটি আদিম গোষ্ঠী এবং ত্রিপুরা-অঞ্চলের রিয়াংরা—এঁরা সকলেই এই ১৯৫৫ সালের ভারতবর্ষের অধিবাসী। সেন্সাস বিভাগের খাতায়, নৃবিজ্ঞানের বইতে এবং খবরের কাগজের পাতায় এঁদের একটি সাধারণ পরিচয় রয়েছে — 'আদিবাসী'! কিন্তু বাস্তব অবস্থার বিচারে এঁরা পরস্পরের সমসাময়িক হলেও সাংস্কৃতিক স্তর-পর্যায়ের বিচারে অনেক এগিয়ে-পেছিয়ে রয়েছেন।

।। ২।।

ওঙ্গেরা এখনো মধ্য-প্রস্তর যুগের মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করত, প্রায় সেভাবেই দিন কাটান। মাছ মেরে, কাঁকড়া-কচ্ছপ ধরে, নারকেল এবং অন্যান্য ফলমূল সংগ্রহ করে এবং ছোটখাট প্রাণী—যেমন শুওর, শিকার করে তাঁদের জীবিকার সংস্থান হয়। ওঙ্গেদের লজ্জানিবারণের জন্য ঘাসের ঘাঘরা জাতীয় আবরণ ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাধারণত এঁরা আগুন সংরক্ষণ করেন, কেননা জ্বালবার সমস্যাটুকু যেহেতু খুবই বেশি। এঁদের মধ্যে বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠানরূপেই অস্তিত্বশীল, লোকপুরাণ এবং ধর্মগত সংস্কার ওঙ্গেদের আছে—আদিম জাতিসুলভ দেহসজ্জা ইত্যাদিও এঁদের মধ্যে প্রচলিত। গণ্ডীবদ্ধ ও দ্বৈপায়ন একটি ক্ষুদ্র জাতি হবার ফলে যৌনবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই এঁরা ক্রমক্ষয়িষ্ণু।

এঁদের পাশাপাশি সাঁওতালেরা এবং রিয়াঙেরা যদি আলোচিত হন, তাহলে দেখা যাবে যে তাঁরা সংস্কৃতির সিঁড়ির অনেক, অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে এসে এখন অনেকেই একালীন সমুন্নত জীবনচর্যার সঙ্গে প্রায় অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এঁরা কৃষি এবং চাকুরীজীবী; মেধা এবং শ্রম, দুই মাধ্যমই এঁদের চাকুরীর খুঁটি। সামাজিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত ঐতিহ্য ইত্যাদি অনুসরণ করে চললেও, বহু সময়ে একালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়ান অনেকে। পুরুলিয়ায় এবং মালদহে এঁদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত ডাইনী-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচার এবং লড়াইয়ের কথা এখানে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। এঁরা এবং রিয়াঙেরা দেশের জনজীবনের মূল ধারার সঙ্গে মিলে-মিশে গেছেন মোটামুটিভাবে। বিদ্যালয়ে, প্রশাসনে, আইনসভায়-সর্বত্রই এঁরা যৎসামান্য হলেও নিজেদেরকে হাজির করেছেন। আধুনিক জীবনযাত্রার দ্বারপ্রান্তে এঁরা এসেছেন মোটামুটিভাবে—এঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রসর, তাঁরা সে জীবনের মধ্যে প্রবেশই করেছেন।

কিন্তু চোলানাইক্কাররা এখনও গুহাবাসীই। কৃষি এখনো তাঁদের অজ্ঞাত। কিন্তু ওঙ্গেরা যেমন তাঁদের প্রায় প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রার মধ্যেই নিশ্চিন্ত এবং

নিরুপদ্রতভাবে রয়েছেন, এঁদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি। 'সভ্য' মানুষদের নাগাল থেকে বেশিদূরে না-থাকার ফলে এঁদেরকে 'সভ্যতার উৎপাত' যে-সব সইতে হচ্ছে— তার থেকে ওঙ্গেরা রেহাই পেয়েছেন। কৃষির ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এঁদের মধ্যে বিকশিত হবার আগেই এঁদের পুরুষদের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যাঙ্গালোর-ম্যাঙ্গালোর-কোলারের খনিতে-কারখানায় নিয়ে যাচ্ছে আড়কাঠিরা। সহজাতভাবেই সুশ্রী চোলা-নাইক্কারদের মেয়েরা অন্য ধরনের আড়াকাঠিদের পাল্লায় পড়ে পাপের পথে পা বাড়াচ্ছেন নিজেদের অজান্তেই এবং সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন বলে এঁদের সংস্কৃতিও এখন প্রায় বিধ্বস্ত হবার মুখে।

সিকিম-তিব্বতের সীমান্তে বরফাচ্ছন্ন এক গহন পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি পাহারাদার দলের সদস্যরা বছর পনেরো আগে 'গুহাবাসী' একদল 'আদিম' মানুষের দেখা পেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর সরকারী সূত্রে পাওয়া ঐ ঘটনার যে-বিবরণ সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, সেই অনুযায়ী জানা গিয়েছিল যে, এই মানুষগুলির কাছে লজ্জানিবারণের ব্যাপারটাও নাকি অজ্ঞাত ছিল। ঐ প্রবল শীতের এলাকায় নগ্ন দেহে জীবন যাপন করার ব্যাপারটি বিশ্বাস করা খুব কঠিন ঠিকই, কিন্তু দায়িত্বশীল বলে গণ্য সরকারী একটি মহল থেকেই খবরটা প্রচারিত হয়েছিল, তাই এ ধরনের খবরে অবিশ্বাস করার হেতু নেই।

এ খবরের গুরুত্ব স্বীকার কবলে বলতে হয় যে, এঁদের মতো আদিম জীবনচর্যা এখন পৃথিবীর আর কোনও গোষ্ঠীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। শরীরের কোনও কোনও অংশ সম্বন্ধে লজ্জাবোধ সঞ্জাত হওয়াকে সুসংস্কৃত মানস-বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে একালের মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেই গণ্য করেন।

সুতরাং, এই পাঁচটি আদিবাসী গোষ্ঠী একই রাষ্ট্রভুক্ত এবং সমকালীন হলেও সংস্কৃতির পর্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে পরস্পরের থেকে অনেকটাই ফারাকে রয়েছেন। আদিমতম জীবনযাত্রার সূচক মান যদি '১' বলে ধার্য করি এবং আধুনিকতম জীবনচর্যা যদি '১০০' হয় তাহলে এখানে আলোচিত পাঁচটি গোষ্ঠীর আনুমানিক মানগুলি অনেকটা এরকম হতে পারে : (ক) অনামা হিমালয়বাসীরা =±৫, (খ) ওঙ্গেরা =± ২৫, (গ) চোলানাইক্কাররা =± ৩৫, (ঘ) রিয়াংরা =± ৭০/ ± ৮০ এবং (ঙ) সাঁওতালরা =± ৮০ / ± ৮৫।

বলাই বাহুল্য যে, এই মাননির্দেশ নেহাতই আপেক্ষিক, সুনির্দিষ্ট তথ্য-বিশ্লেষণের ভিত্তি এর পিছনে নেই ঃ সভ্যতা-সংস্কৃতির 'সু' (বা 'কু')-ফল আহরণের ক্ষেত্রে কারা কতটা এগিয়ে বা পেছিয়ে তারই একটি আনুমানিক কিন্তু সম্ভাব্য তুলনামূলক হিশেব এটি।

এই আপেক্ষকভাবে পরিকল্পিত মানসারণীতে, 'ক' গোষ্ঠী যেহেতু সবচেয়ে কম অগ্রসর, তাই তাঁদেরকে '১'-এর খুবই কাছাকাছি রাখা হয়েছে। মগ্যান যে-সব পারিবেশিক -আর্থনীতিক বিকাশগুলিকে সাংকেতিক অগ্রগমনের সূচক বলে নির্দেশ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্থান-বিন্যাস। 'খ'-রা এঁদের থেকে অনেকটা

অগ্রসর হলেও তাঁদের জীবনযাত্রার স্বরূপও মূলত প্রাগৈতিহাসিক যুগ-সুলভ; সুতরাং স্মরণাতীতকালের সূচক যদি '১' হয়—এঁরা কম-বেশি '২৫'-এ উঠেছেন; প্রস্তরযুগীয়তা অতিক্রম করতে পারেননি বলে, তার বেশি হয়ত এঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করা যায় না। 'গ'-রাও প্রস্তরযুগসুলভ জীবনেই অভ্যস্ত; মূলত এ জন্যে এঁদেরও সূচকমান কম-বেশি ঐ '২৫'-ই হওয়া সঙ্গত; কিন্তু 'সভ্য'-দের উৎসাহে (বা, উৎপাতে) এঁদের জীবনচর্যায় যে-সব 'সভ্যতা'র প্রভাব দেখা দিচ্ছে (মজুরগিরি, বেগার খাটা, গণিকাবৃত্তি, যৌনব্যাধি, চুরি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ইত্যাদি) তার ফলে ইচ্ছা না থাকলেও সূচকমানে আরও কিছুদূর এগোতে হয়; অর্থাৎ মোটামুটি '৩৫'। 'ঘ' এবং 'ঙ'-রা প্রায় সমপর্যায়েরই অন্তর্গত; এঁরা সংস্কৃতির বিকাশের ক্রমান্বিত স্তরগুলি ধীরে-ধীরে পার হয়ে হয়ে আধুনিক জীবনচর্যা-নির্ভব সংস্কৃতির অঙ্গনে এসে পৌঁছেছেন, (ধরলাম, তার সূচকমান ৮০; সাধারণভাবে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় মানে মধ্যবিত্তদের সূচক মান তাহলে ৯৫-এর বেশি হবে না।) তাই এঁদের দু-পক্ষের সূচক মোটামুটিভাবে প্রায় সমান স্তরেই স্থিত। তবে 'ঙ'-রা সুবৃহৎ একটি জাতি, 'ঘ'-দের তুলনায় তাই সমগ্র জনজীবনে তাঁদের অস্তিত্বের প্রভাবটা স্বভাবতই কিছু বেশি বলে তাঁরা আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আর একটু ভার দিতে পেরেছেন। সে জন্য 'ঘ'-দের ক্ষেত্রে যা সূচকমান, 'ঙ'-দের ক্ষেত্রে সেটা তার থেকে কিছুটা বেশিই হবে।

।। ৩।।

সংস্কৃতির এই সব ক্রমান্বিত স্তরপর্যায়গুলিতে এক-একটি গোষ্ঠী বা জাতিকোম কেমনভাবে এগিয়ে চলে বা দাঁড়িয়ে থাকে তার যে-উদাহরণগুলি ওপরে বিন্যস্ত করা হল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মর্গ্যানের তত্ত্বের মূল কাঠামোটিকে স্বচ্ছন্দে বুঝে নেওয়া সম্ভব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুবৃহৎ আদিবাসীগোষ্ঠী ইরোকোয়াদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সূত্রে মর্গ্যান রেড ইন্ডিয়ান জাতির বিভিন্ন ট্রাইব বা কোম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সূত্রেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের উদ্বর্তনের সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কার করেন।

মর্গ্যান ইতিহাসের যে-নিয়মকে আবিষ্কার করেছিলেন, তার মাধ্যমে সমকালের পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলির সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি প্রাচীনকালের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল তিনটি পর্যায় নির্দেশ করেছেন, যাদের মধ্যে আবার কতকগুলি উপ-পর্যায়ও রয়েছে। এই পর্যায়, উপ-পর্যায়গুলি হল এই রকম :

মর্গ্যান প্রথম স্তরটির নাম দিয়েছেন বন্য অবস্থা (স্যাভেজারি); একেবারে আদিমতম প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রার পর্যায় থেকে এর শুরু; মৃৎপাত্র গড়তে শেখার শেষ। এরও আবার তিনটি উপ-পর্যায় নির্দেশ করেছেন মর্গ্যান : (ক) নিম্ন-পর্যায়ের বন্যজীবন—যখন থেকে মানুষের মুখে পারস্পরিক ভাবনার আদান-প্রদানের উপযুক্ত ভাষা গড়ে উঠেছে এবং মূলত ফলমূল কুড়িয়ে, পেড়ে বা হাত দিয়ে খুঁড়ে খাবার

সংগ্রহ করছে সে; ছোট-ছোট মরা জন্তুর কাঁচা মাংসও তার জীবনযাত্রার নির্বাহের অন্যতম উপকরণরূপে গণ্য হচ্ছে।

এই স্তরে পৃথিবীর কোন আদিমকল্প মানব গোষ্ঠীকেই এখন আর আটকে থাকতে দেখা যায় না বলেই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে সিকিম সীমান্তের ঐ নগ্নদেহীদের সম্বন্ধে যদি আরও খবর মেলে ভবিষ্যতে, তাহলে হয়ত মানুষের ব্যবহারিক সংস্কৃতির এই গোড়ার স্তরটি সম্বন্ধে আরও কিছু বেশি তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

তবে এই পর্যায়ে কোনও ধরনের সামাজিক বিধি খুব সম্ভবত তৈরি হয়নি। যৌন সম্পর্কের নিষেধ কিংবা লজ্জা সম্বন্ধে কোনও ধারণা না- থাকা অথবা কোনও ক্ষেত্রেই প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করতে না-পারা এই পর্বের লক্ষণ।

এর পরের পর্বের উপ-পর্যায়টি হ'ল (খ) মধ্য-স্তরের বন্যজীবন—যখন মানুষ ছোট-খাট পাথুরে অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে (যেমন, ছুরি, কুড়ুল, খন্তা ইত্যাদি) এবং তাদের মাধ্যমে ছোট মাপের জীবজন্তু শিকার করা কিংবা মাছ ধরার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই সময়কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল আগুনের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। পাথর ঠোকাঠুকি করে, শুকনো কাঠ ঘষে-ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখে মানুষ এই পর্বে অন্ধকার, শীত এবং ভয় দূর করতে পারল। প্রকৃতির ওপরে আধিপত্য বিস্তারের এই হল শুরু। হয়ত আমরা বলতে পারি যে, এইখান থেকেই মানুষ প্রথম হাঁটতে শুরু করল সভ্যতার তীর্থপথে। এই অগ্নির অধিকার মানুষের লোকপুরাণবৃত্তে অন্যতম একটি প্রধান কাহিনী-উপকরণ। লজ্জা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তির এবং সে-সবের অনুষঙ্গেই কিছু যৌন নিষেধ-বিধির উন্মেষও এই আমলেই ঘটেছে।

এর পরবর্তী উপ-পর্যায় হ'ল : (গ) বন্য অবস্থার উন্নতস্তর। প্রথমে বল্লম এবং তারপরে তীর-ধনুকের আবিষ্কার এই পর্বের বৃহত্তম গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। গাছের লম্বা ডালের সঙ্গে ধারালো পাথরের টুকরো লতার ফাঁসে বেঁধে বর্শা তৈরির মাধ্যমে বহু দূর থেকে শিকার কিংবা শত্রুকে ঘায়েল করতে সক্ষম হওয়ায় মানুষের ক্ষমতা জটিল যন্ত্র এবং আত্মবিশ্বাস দুই-ই বেড়েছে এই আমলে। তীর-ধনুক কিংবা গুলতি জাতীয় (সে যুগের হিশেবে) নির্মাণ করতে পারা তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি এবং কারিগরি দক্ষতার সূচক। এই পর্বে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সামাজিক বিধি-বিধানের খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের একটি কাঠামোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে . ধর্ম, দেবতা, জাদু, আচার, সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা ধারণার বিকাশ ঘটেছে: আত্মা. পরলোক. প্রেত ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে মোটামুটিভাবে এই সময় থেকেই।

এর পরবর্তী স্তর হল. বর্বর অবস্থা (বার্বারিজম)। এরও তিনটি উপ-পর্যায় · (ক) নিম্ন, (খ) মধ্য এবং (গ) উচ্চ। বন্যস্তরের উচ্চ-পর্যায়ের শেষ আমল থেকেই বর্বরস্তরের নিম্ন পর্যায়ের আভাস দেখা দিয়েছে। এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হল পোড়ামাটির বাসন-কোসন তৈরি করতে পারা। তত্দিনে

মানুষ গুহার কিংবা ঝোপঝাড়ওয়ালা গাছের আবাস ছেড়ে মাটিতে নেমে গাছের ডালপালা ইত্যাদি দিয়ে ঝুপড়ি বানাতে শিখেছে; বড় মাপের জন্তুর চামড়া দিয়ে তাঁবু তৈরি করার প্রাযুক্তিক জ্ঞানও তখন তার আয়ত্তে। গাছের গুঁড়িতে বসে নদীর জলে ভেসে-ভেসে সে বহুদূর পাড়ি দিতেও শিখেছে তখন। সুনির্দিষ্ট ধর্মধারা-তথা-কাল্‌টও গড়ে উঠেছে এই পর্বে। নিজেদেব গোষ্ঠীর পরিচালনাব জন্য কিছু দৃঢ়বদ্ধ প্রশাসনিক কানুনও তৈরি হয়ে গেছে ধীরে-ধীরে। পশুচারণ এবং পশুপালনও শুরু হয়েছে বর্বর পর্যায়ের নিম্ন উপ-পর্যায়ের শেষ দিকে। ধাতু-গলানটাও আয়ত্ত হয়েছে ততদিনে।

বর্বর অবস্থার মধ্য পর্যায়ে পশুপালন এবং পশুচারণ মানুষের অন্যতর মুখ্য জীবিকা মাধ্যম হয়ে উঠল। এর আগের পর্যায়েই এই আমলে তার প্রসার হল ব্যাপকভাবে। এর ফলে মানুষের খাদ্যের যোগানটা অনেক নিশ্চিতও হল নিঃসন্দেহে। আর তারই অনুসূত্রে, এই প্রথম, বহু-সহস্র বছরের মধ্যে অবসর কাকে বলে, মানুষ তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করল। স্বাভাবিকভাবেই, এই অবসরের সদ্ব্যবহার করতে লাগল সে অনেক শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপকভাবে করে।

যাকে ধর্মনিরপেক্ষ শিল্প-সংস্কৃতি বলে, সেটি অবশ্য তখনও অনাগত; তবে এব আগের-আগের পর্যাযগুলির মতো প্রত্যক্ষভাবে জীবিকা সম্পৃক্ত-শিল্পচর্যাই একমাত্র উপজীব্য হয়ে বইল না মানুষের কাছে। ধর্ম-বিশ্বাস এবং জীবিকা পরোক্ষভাবে প্রতিভাসিত হতে লাগল মানুষের শিল্পে, সাহিত্যে—সেই প্রথম।

বর্বর পর্যায়ের উচ্চস্তরে মানুষের সামাজিক জীবনে যাযাবরত্ব স্থায়ীভাবে ঘুচল। পশুচাবণ-পালনের সূত্রে এক জায়গায় দীর্ঘদিন বাস করতে শিখেছিল সে; এরই সুবাদে আঙুর, খেজুর ইত্যাদি সুদীর্ঘকালীনভাবে ফলনশীল আবাদ করার ব্যাপারটা তার আয়ত্ত হল : তারই পরিণত ফলশ্রুতি — খাদ্যশস্যের আবাদ, কৃষির আবিষ্কার ও ব্যাপ্তি।

॥ ৪ ॥

সমাজবিজ্ঞানের অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে, ঘরে থাকা মানুষেরা (অর্থাৎ, যাঁরা শিকার করতে বা পশুচারণা করতে যেতেন না : মেয়েরা) তাঁদের অবসরের ফাঁকে-ফাঁকে শস্য উৎপন্ন হবার রহস্যটা আবিষ্কাব করে ফেলে কৃষির পত্তন ঘটিয়েছিলেন। বর্বর যুগের শেষ এখানেই বলা চলে।

কৃষির আবিষ্কার মানুষেব জীবন-চর্যাব একটি যুগক্রান্তি ঘটিয়েছে : নদীর নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ী জনপদের পত্তনী ঘটেছে কৃষির স্বার্থেই। অধিকাংশ মানুষেরই যাযাববত্ব পুরোপুরিভাবে ঘুচে গেল এর অনুষঙ্গ হিশেবে।

মানুষের জীবনচর্যায় এতে আমূল এক পবিবর্তন সাধিত হল : তাদের ধর্মবিশ্বাস, দেবতা-কল্পনা, সামাজিক বিধি, রীতি-সংস্কার— সব কিছুর ওপরেই এক পরিবর্তিত অভিক্ষেপ পড়ল। ব্যবহারিক-সংস্কৃতি এবং মানস-সংস্কৃতি, উভয় ক্ষেত্রেই এক সম্পূর্ণ নূতন যুগের উদ্ভাসন ঘটল ধীরে-ধীরে। মানুষের সভ্যতার অরুণোদয় হল ঐ কৃষির

আবিষ্কারের পরেই। তার মুখের ভাষাও চিহ্ন-সংকেতের মাধ্যমে রূপায়িত হতে শুরু করেছে এই সময়ে : জনপদ-সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এই লিপির আবিষ্কার।

বন্য এবং বর্বর এই শব্দ দুটি নিয়ে অবশ্য একালের সমাজবিজ্ঞানীরা সঙ্গতভাবেই আপত্তি করেন। তবে এটুকু মনে রাখতেই হবে, মর্গ্যানের আমলে পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় সমাজতাত্ত্বিকরা এসব শব্দের মধ্যে যে কোনও ধরনের ভাবগত অবমাননা থাকতে পারে— সে বিষয়ে অনবহিত ছিলেন। এই শব্দ দুটির পরিবর্তে, আদিম জীবনচর্যার স্তর এবং প্রত্ন-জীবনচর্যার পর্যায়—এই ধরনের শব্দগুচ্ছ হয়ত বা ব্যবহার করা অসঙ্গত হবে না। অবশ্য একালেও ম্যালিনৌস্কি-প্রমুখ অগ্রগণ্য নৃবিজ্ঞানী—এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন কোনও হীনতাসূচক ব্যঞ্জনা ছাড়াই।

এখানে অবশ্য একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, মুখ্য দুটি পর্যায়ের অন্তর্গত তিনটি করে উপ-পর্যায় হিশেবে যা নির্দিষ্ট করেছেন মর্গ্যান, সেগুলির প্রতিটির মধ্যেই আবার উদ্বর্তনের অনেকগুলি করে সিঁড়ির ধাপ রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই কিছু-কিছু নিজস্ব সময-লক্ষণ আছে। প্রতিটি ধাপেই, পূর্ববর্তী ধাপের কিছুটা অবশেষ থেকে যায় এবং পরবর্তী ধাপেরও আভাস একটু-একটু করে ফুটে ওঠে। তাই ঠিক কোন্ মুহূর্তে একটি উপ-পর্যায়ের একটি ধাপ অতিক্রান্ত হল, আর নতুন সিঁড়িতে ঘটল মানুষের পদক্ষেপ, তা কখনও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। মর্গ্যান সুদীর্ঘকাল উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীদের সেনেকা নামে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে-মিশে, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার বির্বতনের একটি 'প্রায়-গাণিতিক' নিয়ম আবিষ্কার করে ছিলেন। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁব বিহিত ঐ নিয়মের যাথার্থ্য যাচাই হয়ে গেছে।

ইরোকোয়াদের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক বন্ধনের সূত্রে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন আদিবাসী বেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর জীবনচর্যা সম্পর্কে মর্গ্যানের যে-অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার সঙ্গে, প্রাচীন গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে-সুগভীর প্রজ্ঞা ছিল- সেটির সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বিচার করে তিনি কতকগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। মানুষের জীবনচর্যায় অসমান অগ্রগমনের যে-প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করা হযেছে তারই ব্যাখ্যান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ উদ্বর্তনের সিঁড়িতে পৃথক পৃথক সোপানে আটকে গেছেন আর্থ-পারিবেশিক কারণে। যাঁরা সভ্যতার সৌধশীর্ষে পৌঁছেছেন, তাঁরা এক- এক করে ঐ সমস্ত কটি ধাপই কিন্তু পেরিয়ে এসেছেন। যাঁরা আটকে আছেন, তাঁদের তাহলে কোথায় কার অবস্থিতি?

মর্গ্যান দেখালেন যে, উত্তর-মধ্য আমেবিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে—যেখানে একদা মায়া, আজটেক, টোলটেক, ইনকা প্রভৃতি উন্নত নাগরিক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল—এখন যে আদিবাসীরা থাকেন (অর্থাৎ মর্গ্যানের সময়ে থাকতেন)-তাঁরা হলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। পশুপালন এবং প্রাথমিক ধরনের কৃষি এঁদের আয়ত্ত, কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে এঁরা পেছিয়ে। কিন্তু এঁদের চেয়েও বেশি পেছিয়ে মিসৌরীতটবাসীবা।

তাঁরা শুধু পোড়া মাটির বাসন তৈরি করতে শিখেছেন: আর জানেন তীর-ধনুকের ব্যবহার। এঁদের চেয়েও পিছিয়ে আছেন হাডসন উপসাগরীয়রা, তাঁরা শুধুমাত্র তীর-ধনুক অবধিই এগোতে পেরেছেন। এঁদের চেযেও পেছিয়ে কারা? . মর্গ্যান দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া বা পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের সেই বর্গে ফেলা চলে। তার চেযে পিছনে? মর্গ্যান দেখাননি। সেই সিকিম-সীমান্তবাসীদের ফের হদিশ মিললে হযত এ সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়।

ধ্রুপদী গ্রোকো-রোমক সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ বিচার করে মর্গ্যান দেখিযেছিলেন যে, নিউ মেক্সিকো থেকে পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর জীবনচর্যার সঙ্গে হোমার-পূর্ব গ্রীসের, রোমের পত্তন-পূর্ব ইতালির এবং জুলিয়াস সীজারের পূর্ববর্তী জামানির মানুষদের জীবনধারার সুগভীর সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ, এইসব রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী যদি আর্থ-পারিবেশিক কারণে উদ্বর্তনের সিঁড়ির বিশেষ কয়েকটি ধাপে আটকে না-যেতেন-তাহলে তাঁরাও প্রথম যুগের এথেন্স কিংবা রোমের মতোই উন্নত হয়ে উঠতে পারতেন। কিংবা সীজারের সাম্রাজ্যভুক্ত জার্মানির মতোই হতো তাঁদের সমাজ।

এথেন্স বা রোমের নাগরিক সভ্যতায় পৌছুতে গ্রীক এবং ইতালীয়দের সেই সবক'টি ধাপই অতিক্রম করতে হয়েছে, যেখানে-যেখানে আটকে আছেন অস্ট্রেলিয়ানরা, পলিনেশিয়ানরা, রেড ইন্ডিয়ান বিভিন্ন গোষ্ঠীরা, কিংবা সিকিম সীমান্তবাসীরা, ওঙ্গেরা, চোলানাইক্কাররা, রিয়াংরা, সাঁওতালরা এবং পৃথিবীর আর সব আদিবাসী কৌমজনেরা। শুধু গ্রেকো-রোমক সংস্কৃতির ধারকরাই নন, যাঁরা আমাদের বিচারে 'সভ্যস্তরের চূড়াশীর্ষে' পৌছেছেন তাঁদের সকলের সম্পর্কেই ঐ একই কথা প্রযোজ্য। নাগরিক পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেও কতকগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তর আছে, যাঁদের কথা অবশ্য মর্গ্যান তাঁর 'এনসেন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭) গ্রন্থে বলেননি; বলেছেন এঙ্গেলস তাঁর 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট', (১৮৮৪) বইতে এবং গর্ডন-চাইল্ড তাঁর 'ম্যান মেকস হিমসেলফ' (১৯৪৮), 'হোয়াট হ্যাপেনড ইন হিস্ট্রি, (১৯৪২) 'সোস্যাল এভোল্যুশন' (১৯৫০) প্রভৃতি বইয়ে, এবং ই. এইচ. কার তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' (১৯৬১) বইয়ের মধ্যে।

।। ৫ ।।

আদিম স্তর থেকে আদিবাসী স্তর; সেখান থেকে লোকায়ত ('ফোক' অর্থে) স্তর এবং তার পরে নাগরিক এবং ধ্রুপদী স্তর—সংস্কৃতির বিবর্তন এতগুলি মূল পর্যায়ে ঘটেছে সারা বিশ্বেই। এদের মধ্যে পরবর্তীকালীন যেগুলি (লোকায়ত, নাগরিক এবং ধ্রুবপদী)— তারা আবার বহুলাংশে পরস্পরের ওপর প্রভাব-প্রতিভাসও বিম্বিত করে।

সেই প্রভাবেরও একটি জ্যামিতিক প্রতিকল্প নির্দেশ করা অবশ্য কঠিন নয়। কিন্তু তার আগে, জনপদ-সংস্কৃতির উদ্ভাস থেকে নাগরিক এবং / বা ধ্রুবপদী কৃষ্টির

বিকাশ অবধি, যে-স্তরপর্যায়গুলি অবলম্বিত হয়েছে, তাদেরও কিছু প্রাসঙ্গিক পরিচয় নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

গর্ডন-চাইল্‌ডের কথা ওপরে কয়েকবারই উল্লেখ করেছি। কৃষির ব্যাপক প্রসারের সূত্রে সভ্যতার যে-অরুণোদয়ের কথা বলা হয়ে থাকে, গর্ডন-চাইল্‌ড তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'কৃষি বিপ্লব' (অ্যাগ্রিকালচারাল রেভোল্যুশন) বলে। আদিম কৌমস্তর থেকে আদিবাসী কৌমপর্যায়ে উত্তরণও তখনই ঘটে মানুষের। মানুষের জনপদ-জীবনের শুরু থেকে সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পালাবদল শুরু হয়েছিল; কৃষি-বিপ্লবের পর তার চরিত্রে বাহিরঙ্গিক পরিবর্তনটা হল সুপ্রবল। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে বিচিত্র ধরনের সূক্ষ্ম-জটিল সব টানা-পোড়েনেরও সৃষ্টি করল; কৃষির সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা কীভাবে উদ্ভব হল, সেটি এঙ্গেলস দেখিয়েছেন তাঁর বইতে। আদিম কোমগুলি বিবর্তিত হতে শুরু করেছিল বৃহত্তর সামাজিক-একক (ইউনিট) রূপে তার আগে থেকেই; পশুচারণের সঙ্গেও কৃষিও যখন থেকে জীবিকা রূপে গড়ে উঠেছে, তখন থেকে। ছোট-ছোট দ্বীপকল্প-গোষ্ঠীগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ল্যান, ফ্রাত্রি, ট্রাইব, নেশন ইত্যাদি বৃহত্তর সামাজিক এককে পরিণত হতে-হতে এক সময়ে নগর-সভ্যতার পত্তনও হয়ে গেল। শ্রেণীকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর অনুষঙ্গে একই সঙ্গে নেশন-বা-জাতি এবং নগর-রাষ্ট্র তৈরি হতে লাগল . মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু-উপত্যকায় (৫ থেকে ৫১/২ হাজার বছর আগে); কিছু পরে চীনে (৪ থেকে ৩১/২ হাজার বছর আগে), গ্রীসে, রোমে (৩ থেকে ২১/২ হাজার বছর আগে)। ছোট-ছোট জনপদ পরিণতি পেতে লাগল গ্রামে; নূতনতর অর্থনৈতিক সংগঠনের সূত্রে কোনও-কোনও গ্রাম বিবর্তিত হতে থাকল নগরে। প্রাথমিক পর্যায়ের রাষ্ট্র ব্যবস্থার হল উদ্ভব।

জনপদবাসীরা প্রাথমিক পর্বে আদিবাসী কোমে পরিণত হয়েছিলেন যখন এবং পরবর্তীকালে গ্রাম-শহরে পার্থক্য যখন ঘটল, তখন আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলিকে সহজে গ্রহণ করতে পারলেন-তাঁরাই শুরু করলেন লোকায়ত স্তর (অর্থাৎ, ফোক-লেভেল)-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা।

আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির এই পার্থক্যের স্বরূপটুকু বোঝা দরকার। আদিবাসী সংস্কৃতি মূলতই রক্ষণশীল বলে, ভিন্নতর সংস্কৃতির (বিশেষত, তা যদি আবার সচ্ছলতর অর্থনৈতিক শ্রেণীর উপজীব্য সংস্কৃতি হয়) ভাব এবং রূপগত উপাদানগুলিকে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হয়; এই শ্রেণীগত আদান-প্রদানটা লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। নাগরিক জীবন যে-নূতন পর্বের সূচনা করেছিল (গর্ডন-চাইল্‌ডের ভাষায় যা হল, 'নগর-বিপ্লব' বা আরব্যান রেভোল্যুশন) তার সংস্কৃতি, এবং একই সঙ্গে যা তার উৎস ও প্রতিবেশী—সেই লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়াটা কিন্তু অনিবার্য ব্যাপার। নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধ্রুবপদী একটি সংস্কৃতির ধারাও গড়ে উঠেছে প্রাচীন এবং মধ্যযুগে। মিথোলজি বা পুরাণবৃত্ত এবং শাস্ত্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল ঐ

ধ্রুবপদী সংস্কৃতির মুখ্য গঠন-উপকরণ। এর সঙ্গেও লোকায়ত সংস্কৃতি এবং নাগরিক সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্বন্ধটি তৈরি হল এবং তা বজায় থাকল স্বাভাবিকভাবেই।

সংস্কৃতির এই অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ —সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম 'কালচারাল কনটিন্যুয়াম', এর আপাত-চূড়ান্ত পর্বের পরিবেশ রূপে যন্ত্রবিজ্ঞান-নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোকে নির্দেশ করেছেন গর্ডন-চাইল্ড · ইনডাস্ট্রিয়ল রেভোল্যুশন। পরশ্রমভোগী শ্রেণী যখন সমাজে গড়ে উঠেছে, তখন থেকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজসোপানের ওপরের দিকের ধাপগুলি অধিকার করে ফেলল ঐ পরশ্রমজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণী। নানা পর্যায়ে নিচে পড়ে রইলেন ঐ রেড ইন্ডিয়ানরা, আদি-অস্ট্রেলীয়রা, আফ্রিকার অরণ্য-জনপদবাসী আদিজাতিরা, ওঙ্গেয়া, চোলানাইক্কাররা এবং আরও হাজার-হাজার আদিবাসী অধিজাতি; সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে আছেন তাঁরা।

উপরের সিঁড়ির মানুষেরা তাঁদের সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং অবসরের সুযোগে পরিশীলিত করে ফেলেন তাঁদের সংস্কৃতি ধারার বিভিন্ন প্রবাহকে : সেই পরিশীলন আবার কিছুটা প্রতিফলিত হয় লোকায়ত ধারার উপর, যেখান থেকে ঐ ওপরতলার সংস্কৃতির উৎসারণ ঘটেছে। অবিরাম এই আসা-যাওয়া, দেওয়া-নেওয়ার এই বহমানতাই সংস্কৃতির সজীব সত্তাটিকে অটুট রাখে : এটিই ইতিহাসের সত্য। মর্গ্যান এবং গর্ডন-চাইল্ড তাঁদের তত্ত্বের সাহায্যে সেটিকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

গ. মর্গ্যানীয়-তত্ত্বের পক্ষে-বিপক্ষে

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে অন্বিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যায় অনেক। এগুলির সামগ্রিক সংশ্লেষণেই গড়ে উঠেছে তাঁর তত্ত্বের পরিপূর্ণ আয়তনটি। মর্গ্যানের তত্ত্বের মোটামুটি চারটি পর্যায়, যা তাঁর 'এনসেন্ট সোসাইটি : রিসার্চেস ইন দ্য লাইনস অব হিউম্যান প্রগ্রেস ফ্রম স্যাভেজারি থ্রু বার্বারিজম টু সিভিলাইজেশন' (১৮৭৭) বইয়ের চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। সুবিশাল এই গ্রন্থের কিছু-কিছু তথ্য অবশ্য উত্তরকালে অগ্রহণীয় হয়েছে নূতন-নূতন ক্ষেত্রসমীক্ষার সূত্রে নূতনতর তথ্য গবেষকদের হাতে এসে পৌঁছুনোর ফলে। মর্গ্যানের বিবর্তনবাদী চিন্তাধারার বিরোধী পণ্ডিতরা (যাঁদের অধিকাংশই মার্ক্সবাদেরও ঘোরতর বিরোধী) এই সব আনুষঙ্গিক অনুপপত্তির উপলক্ষে সামগ্রিকভাবেই মর্গ্যানকে অস্বীকার করতে চান, যার প্রকৃত কারণ যতটা না জ্ঞানচর্যাজাত, তার চেয়ে অনেক বেশি আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থানগত।

মর্গ্যানের বইয়ের চারটি খণ্ডে বিষয়ের বিভাজনটা মূলত এই রকমের : ক. পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিবর্গের অবস্থানগত স্তর নির্ণয়; খ. রাষ্ট্র ও রাজনীতিকেন্দ্রিত সমাজ সৃষ্টি হবার পূর্ববর্তী ব্যক্তিগত সম্পর্কনির্ভর সমাজের কাঠামো নির্দেশ : গ. পরিবার-প্রথার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কিত রূপরেখাটি নির্ধারণ; এবং, ঘ. সম্পত্তির ধারণার ক্রমান্বিত বিকাশধারাটির রূপায়ণ।

এই চারটি পর্যায়ের মধ্যে চতুর্থটিই মার্ক্সবাদবিরোধী পণ্ডিতদের কাছে সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর বলে মনে হয়। এবং মূল বক্তব্যের অপরিহার্য অংশ হওয়ায় শুধুমাত্র এটিকেই যেহেতু তাঁরা নাকচ করতে পারেন না, ফলে সম্পূর্ণ তত্ত্বটিকেই অস্বীকার না-করে এঁদের উপায়ান্তর থাকে না।

মর্গ্যানের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটিই অবশ্য সংস্কৃতিতত্ত্বের ছাত্রদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গে এটি লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও একান্তই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। অন্য খণ্ডগুলির মূল বিচরণক্ষেত্র হল সামাজিক নৃতত্ত্ব; কিছু পরিমাণে আবয়বিক নৃবিজ্ঞানেব সিদ্ধান্তও তিনি সেই সূত্রে নির্দেশ করেছেন অবশ্য।

মর্গ্যান-সম্পর্কে পশ্চিমী-দুনিয়ার ভীতি (বা তাচ্ছিল্য) যে কী পরিমাণে রয়েছে, তার প্রমাণ ১৮৭৭ সালে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হবার পর, দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৯৪৭ সালে, এবং তার প্রকাশস্থল হল কলকাতা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মর্গ্যানের তত্ত্ব যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা হলেও মূল বইটি সেখানেও অনূদিত কিংবা পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এঙ্গেলসের 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট' (১৮৮৪) গ্রন্থে মর্গ্যানীয় তত্ত্বের যে- বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটিই সেখানে মূল অবলম্বন হিশেবে গৃহীত হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মর্গ্যানের তত্ত্বের সামগ্রিক পর্যালোচনা প্রায় ক্ষেত্রেই হয়নি।

সংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোচনায় মর্গ্যানের তত্ত্বের যতখানি বিচার্য, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

সেটি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মর্গ্যানীয় সংস্কৃতিতত্ত্বের মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই ঐ আলোচনার সারনির্যাস এখানে সংকলন করা দরকার। মর্গ্যান দেখিয়েছেন :

সংস্কৃতি বলতে যা সামগ্রিকভাবে বোঝায়, তা একটি ক্রমপরম্পরিত স্তর ধরে বিবর্তিত হয়, এবং সেই পরম্পরাগত স্তরগুলি বিশ্বজনীনভাবেই অনুরূপ। এরই অনুসূত্রে বুঝতে হবে যে, সমস্ত জাতি-প্রজাতিরই মানসিকতারও স্তর-পরম্পরা আছে এবং অনুরূপ পরিবেশে একই রকমভাবে সেগুলির ক্রমবিকাশ ঘটে। এর ফলে সংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন চরিত্রও গড়ে উঠেছে।

এই সমস্ত পরম্পরিত স্তরগুলির ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকমের

নিম্নপর্যায়ের বন্যতার স্তর	ভাষার উদ্ভব, ফলমূল সংগ্রহ ও মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়ার মাধ্যমে জীবনধারণ
মধ্যপর্যায়ের বন্যতার স্তর	মাছধরা এবং আগুনের ব্যবহার পাথরের অস্ত্র নির্মাণ
উচ্চপর্যায়ের বন্যতার স্তর	তীর-ধনুকের ব্যবহার
নিম্নপর্যায়ের বর্বরতার স্তর	পোড়ামাটির তৈজসপত্র নির্মাণ
মধ্যপর্যায়ের বর্বরতার স্তর	পশুপালন এবং যাযাবর জীবনের অবসান
উচ্চপর্যায়ের বর্বরতার স্তর	লোহার ব্যবহার, দীর্ঘস্থায়ী আবাদ শুরু
সভ্যতার স্তর	অক্ষর ও বর্ণমালার উৎপত্তি

অন্যান্য খণ্ডে এই স্তরগুলির সঙ্গে মানসহ করে পারিবারিক সংগঠন, জ্ঞাতিত্ববাচক সম্পর্কনামগুলির তাৎপর্য, বংশধারা নির্দেশ, উত্তরাধিকারের বিধিবিধান, রাষ্ট্রিক-সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা-ইত্যাদি বিষয়ে মর্গ্যান বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মর্গ্যানের বিরোধীরা যে-সমস্ত ত্রুটির উল্লেখ করে তাঁর তত্ত্বকে নাকচ করতে চান, তার মধ্যে যেগুলিকে ওঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেন, সেগুলি হল : ক. সমস্ত পৃথিবীর সবগুলি জাতি-প্রজাতির সামাজিক এবং মানসিক (অর্থাৎ, সাংস্কৃতিকও) উদ্বর্তনের একটি সার্বিক বিধি খুঁজতে চাওয়াটা ভুল; প্রত্যেকটি জাতি এবং সংস্কৃতিরই বিকাশ হয়েছে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভাবে, সাদৃশ্য যা দেখা যায়, তা হল পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলশ্রুতি (ফ্রানৎস বোয়াজ)। খ. সমস্ত জাতি-প্রজাতির ব্যবহারিক ও মানসিক বিকাশ অনুরূপভাবে বিবর্তিত হওয়ার তত্ত্বটা মানলে পরিবেশ এবং সহজাত গুণের নিজস্বতাকে অস্বীকার করতে হয় এবং যেহেতু একই সময়ে উন্নত ও অনুন্নত সমাজ পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকবে, তাই এই তত্ত্ব

মান্য নয় (বের্থোল্ড লাউফার)। গ. মর্গ্যান আসলে ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাই তিনি ডারউইন প্রমুখের মতো বিবর্তনবাদী বলে গণ্য হতে পারেন না (র‍্যাল্‌ফ লিনটন)। ঘ. মর্গ্যান বস্তুতপক্ষে সমাজ-বিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক-পরিবর্তনমূলক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত-বিবর্তনের কথা বলার জন্য তাঁকে প্রগতিবিরোধী বলে গণ্য করতে হয় (জে. র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন)। ঙ মর্গ্যান মূলত -ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাই মানুষের স্বকীয় উদ্যমে এগিয়ে যাবার বিষয়টি তাঁর মুখ্য নির্দেশ্য হতে পারে না (আর. এইচ. লাওঈ)।

স্পষ্টতই এইসব নিন্দাপ্রস্তাব মুখ্যত ভাবভিত্তিক; তত্ত্বনিষ্ঠ নয়। শুধুমাত্র বরেণ্য নৃবিজ্ঞানীরা এগুলি বলেছেন বলেই, এসব এখানে উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু এঁদের সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের কোনও প্রত্যাশা নেই, তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই এসব বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা যায়। কিন্তু সমস্যাটা হয় তখনই, যখন বিস্তৃতভাবে মার্ক্সবাদের আলোচনা করার দাবী করেন কোনও বিশেষ-বিদ্যাশৃঙ্খলার পণ্ডিত এবং সেই উপলক্ষে মার্ক্সবাদের মূল ভিত্তিনির্ধারক তত্ত্বগ্রন্থ (এক্ষেত্রে, মর্গ্যানের এই বই) সম্পর্কে শুরু থেকেই বিরূপ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে পেশ করতে থাকেন একপেশে ভঙ্গীতে। মরিস ব্লখের 'মার্ক্সিজ্‌ম অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপলজি' (১৯৮৩) বইতে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। মর্গ্যান সম্পর্কে তিনি যে আপত্তিগুলি জানিয়েছেন, তার মধ্যে সবগুলিই যে নির্ভিত্তিক, তা নয়; কিন্তু একটা কথা ব্লখ বিস্মৃত হয়েছেন যে, কোনও বৃহৎ গবেষণা নিজের সময়কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব। উত্তরকালে পাওয়া অন্যতর তথ্যের সূত্রে যদি কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ঐ গবেষণার কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তনীয় বলে ধার্য হয়ও, তাতে মূল অন্বেষার মূল্য একটুও কমে না। এমন কী যেখানে লাওঈ-র মতন কঠোর মর্গ্যান-সমালোচকও একথা মানতে বাধ্য হন যে, ''মর্গ্যানের গবেষণার গুরুত্ব গগনস্পর্শী। তাঁর আরব্ধ কর্মের বিস্তারণ এবং পরিশীলন পরবর্তীকালে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে তাঁর সামগ্রিক অবদানকে অস্বীকার করা অসম্ভব।''

প্রধানত, জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক নামগুলি (যেমন মামা-কাকা, জেঠা-খুড়ো, মাসি-পিসি, জা-ননদ, মেসো-পিসে, ভাইপো-ভাগ্নে ইত্যাদি) বিভিন্ন সমাজে নানাভাবে ব্যবহৃত হয় কি-না, গোষ্ঠীবিবাহ ব্যাপারটির ক্রমবিলয় ঘটা সমাজের অগ্রগতির সূচক কি-না, মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃপ্রাধান্যে বিবর্তন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল কি-না, এইসব সামাজিক নৃতত্ত্বকেন্দ্রিত প্রশ্নসংক্রান্ত যা-যা তথ্য পরবর্তীকালে সংগৃহীত হয়েছে, তাদের অনুসূত্রে মর্গ্যানের কোনও-কোনও বক্তব্যের কিছু-কিছু অংশ অবশ্যই পুনর্বিচার্য। কিন্তু এই বিষয়গুলি সংস্কৃতির ব্যবহারিক দিক অথবা মানস-উদ্বর্তনের সঙ্গে সেভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া এইসব কমবেশি পুনর্বিচারের ফলে মর্গ্যানের যা মুখ্য প্রতিপাদ্য—সভ্যতা-সংস্কৃতির স্তরান্বিত ক্রমবিবর্তন, সেটির ক্ষেত্রে কোনও ব্যত্যয়ই ঘটে না যে, একথাটুকু কিন্তু অনস্বীকার্য। বরং মর্গ্যানের ঐ স্তর-নির্দেশের

সূত্রেই উত্তরকালে আরও যেসব তথ্যকে হাজির করেছেন পণ্ডিতেরা, সেগুলিকে বিবেচনা করলে কিছু-কিছু প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যেমন, 'বন্যতা' (স্যাভেজারী) এবং 'বর্বরতা' (বার্বারিজ্‌ম) শব্দদুটি নিঃসন্দেহেই আপত্তিকর। তবে, এ বক্তব্য একালের; মর্গ্যানের এক শতাব্দী পরের। তাঁর সমকালে ওসব শব্দের মধ্যে কেউ কোনও গ্লানির সংকেত খুঁজে পেতেন না খুব সম্ভবত । একথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও মর্গ্যানের যুগবিভাগেও মাঝে-মাঝেই অস্বস্তিকর রকমের ফাঁক দেখা যায়। হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি পাথরের তৈরি কুঠার, ছুরি, বল্লম, চাঁছনী-প্রভৃতির কথা সেভাবে উল্লেখ করেননি, যদিও সংস্কৃতির অগ্রগতির বিচার করতে গেলে এগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবেই আলোচনা করা শ্রেয় এবং মর্গ্যানের সময়েই এসব নিয়ে কিছু-কিছু বিচার ও অন্বেষণও শুরু হয়েছিল।

মর্গ্যানের তত্ত্বের আরও একটি প্রশ্নসাপেক্ষতা ওঠে লোহার ব্যবহার, কৃষির পত্তন, বর্ণমালার উৎপত্তি-ইত্যাদি বিষয়ে একটি সর্বন্ধর বিশ্বজনীন সূত্র (ফরমূলা অর্থে) বিহিত করার ব্যাপারে। যেমন, হাওয়াই দ্বীপের বাসিন্দারা জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধভিত্তিক সমাজের (মর্গ্যান- কথিত) একটি বিশেষ-স্তরে পৌঁছনোর আগেই কৃষির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে (যা অন্যত্র ঘটেনি); কিংবা, হরাপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সংস্কৃতি-ধারকরা লোহা ঢালাই করতে শেখার আগেই রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করতে সক্ষম হয়েছেন, ইন্‌কারা সুসভ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পরও ধ্বনিনির্ভর অক্ষরমালা সৃষ্টি না-করে (বা, না করতে পেরে) রঙিন সুতোর 'কুইপু' সংকেতের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতেন। এসব ছাড়াও, মর্গ্যানের তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা হল, যে ছ-টি প্রাক্‌-সভ্য স্তরের বিভাজন তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই অনেক উপস্তর ছিল বা আছে; তাদের সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেননি সেভাবে।

কিন্তু একশ বছর পরেও—এতসব ত্রুটি নির্দেশ করেও আমরা কোনও সময়েই মর্গ্যানের তত্ত্বের প্রধান প্রতীতিটিকে অস্বীকার করতে পারছি না যে, অর্থনৈতিক-উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পর্কিত হয়েই মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ ঘটে। বস্তুমুখিন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের এই বিবর্তনকে চিহ্নিত করার মধ্যেই তাঁর তত্ত্বের মহত্তম মূল্য নিহিত রয়েছে। বার্নার্ড স্টার্ন, এল. এ. হোয়াইট ই. বি. লীকক, কার্ল র‍্যাসেক-প্রমুখ অনেক নৃবিজ্ঞানী-সমাজবিজ্ঞানীই মর্গ্যানের এই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, এবং অনেকেই কিন্তু এবং উল্লেখ্য এঁরা অনেকেই কিন্তু মার্ক্সবাদী হিশেবে পরিচিত নন! বর্তমানের প্রেক্ষিতে হারানো অতীতকে পুনর্নির্মাণ করা এবং অতীতের প্রতিভাসে বর্তমানের স্বরূপ সন্ধান করার মতো জটিল দো-রোখা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি যে-তত্ত্বকে গড়ে তুলেছেন, ছোট-বড় নানাবিধ অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও তার মৌলিক আয়তনটিকে সংস্কৃতিবিজ্ঞানের পর্যালোচনায় কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা মর্গ্যান সম্বন্ধে প্রতিকূল এবং অসহিষ্ণু, শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তুলনামূলক সমাজ-

বিশ্লেষণের ভিত্তির ওপরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুবিশাল তাত্ত্বিক সৌধটি নির্মিত হয়েছে। ফলত, নিজে সমাজতন্ত্রী না-হওয়া সত্ত্বেও (বরং, তাঁকে উদার মানবতাবাদী একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী বুর্জোয়া পণ্ডিত হিশেবেই গণ্য করা শ্রেয়োতর), বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্বগত ভিত্তিটা তৈরি করার উপকরণ জুগিয়ে দেবার কারণেই তাঁর ওপরে পশ্চিমী পণ্ডিতদের বৃহদংশই খড়্গহস্ত। কেউ তাঁকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছেন আলোচনা থেকে, আর কেউ-কেউ তাঁর তত্ত্বের ভুল দেখাতে উদ্যমী হয়েছেন গোষ্ঠীবিবাহ, সামূহিক যৌন-অধিকার, মাতৃপ্রাধান্য এবং উত্তরাধিকার প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে পরবর্তীকালে পাওয়া বিভিন্ন সব নতুন তথ্যের প্রেক্ষাপটে। মর্গ্যানের সমসাময়িক ই. বি. টাইলরও ছিলেন বিবর্তনবাদে প্রত্যয়ী নৃবিজ্ঞানী এবং তাঁরও কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত পরবর্তী গবেষকদের পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুর্বল বলে প্রতীত হয়েছে; কিন্তু তাঁকে এইভাবে মর্গ্যানের মতো উপেক্ষা অথবা বিদ্বেষ সহ্য করতে হয় না। এর একটাই কারণ · টাইলর বিবর্তনবাদী এবং কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক ভাবনার (যেমন, সর্বপ্রাণবাদ) উদ্গাতা হলেও, আর্থ-রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে এমন কোনও তত্ত্বের তিনি প্রবক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি। সুতরাং, তাঁকে মর্গ্যানের মতো 'শত্রুশিবিরের লোক' বলে মনে করা হয় না।

মর্গ্যানের বিরোধিতার আর একটি প্রচ্ছন্ন উপলক্ষও আছে এই সব পশ্চিমী-বিদ্বান্‌গোষ্ঠীর মধ্যে। মর্গ্যানীয় তত্ত্বের চূড়ান্ত প্রমা হচ্ছে এটাই যে, পৃথিবীতে উচ্চতর বা নিম্নতর জাতি- প্রজাতি বলে বস্তুত কিছু নেই; যাঁরা সামাজিক-বিবর্তনের আনুকূল্যে প্রযুক্তিগত, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পরিশীলিত বিভিন্ন-পর্যায়ে পৌঁছেছেন, আর যাঁরা সেখানে পৌঁছননি, তাঁদের উভয়পক্ষের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক / জাতিতাত্ত্বিক (অ্যানথ্রোপলজিকাল / এথ্‌নোলজিক্যাল) ভাবে কোনও মূলগত বা গুণগত ফারাকই নেই। এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই এক ধরনের উচ্চম্মন্যতার দ্বারা কবলিত। বহুক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের আদিবাসী অধিজাতিগুলি সম্পর্কে এঁদের একটা প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের ভাব আছে : 'ওরা সব পিছিয়ে-থাকা, সহজাত অনগ্রসরতায় গ্রস্ত-থাকা জাতি-প্রজাতি' —মনোভাবটা হল এই রকমের। পশ্চিমী এথ্‌নোলজিস্টদের অতি প্রিয় 'গ্রেট ট্র্যাডিশ্যান' (যা না-কি ওঁদের একচেটিয়া সম্পদ বলে ধার্য করেন ওঁরা!) এবং লিটল ট্র্যাডিশ্যান' (যা তাহলে অন্যদের, বিশেষত ঐ সমস্ত আদিবাসী অধিজাতিদের সম্বল!)-এর থিওরি, মর্গ্যানকে মেনে নিলে আর দাঁড় করানো যায় না। এর ফলে সর্বমানবের মৌলিক সাম্যের কথাটা অনিবার্যভাবেই এসে উপস্থিত হয়, যা অবশ্যই এঁদের স্বার্থবিরোধী। 'পিছিয়ে-পড়া' মানুষদের সম্পর্কে যে-পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাবটা এঁরা পোষণ করেন, সেটা একই সঙ্গে কিছুটা তাচ্ছিল্য, কিছুটা করুণার সহযোগে গড়ে উঠেছে। প্রকারান্তরে তাকে রুডইয়ার্ড কিপলিং কথিত 'হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন'- তত্ত্বের স্বগোত্রীয় বলেই গণ্য করা যায়। মর্গ্যানের তত্ত্বের স্বীকৃতি এই নৃতত্ত্ববেত্তাদের বহুজনের মনের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা সেই উন্নাসিক ভাবটাকে আঘাত করে যেহেতু, সেজন্যও তাঁর প্রতি এঁরা এতটাই বিরূপ।

কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের যে-তত্ত্ব মর্গ্যান সুস্থিত করেছেন, তার মূল্য অপরিসীম। সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব যে কী এবং কতটা, সে-সম্বন্ধে তিনিই সবপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর প্রবল বিরোধী যাঁরা, তাঁরাও মর্গ্যানের এই ভূমিকাটাকে অস্বীকার কবতে পারেন না। বিবাহপ্রথা, নারীর প্রাধান্য, যৌনবিধানের বিবর্তন, জ্ঞাতিত্ববাচক সম্পর্কের বিকাশ এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তির নিয়ম প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তাঁর প্রাথমিক পর্বের কাজগুলিই পরবর্তী গবেষকদের প্রণোদিত করেছে নূতনতর তথ্যের সন্ধান করতে। নতুন-পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি যেখানে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, সেখানেও তাঁর অগ্রপথিকত্বের সম্মানটি নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

সংস্কৃতিবিকাশের যে-ধারাক্রম মর্গ্যান নির্দেশ করেছেন কিছু-কিছু খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া (যেগুলি সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি) তার মূল পরিকাঠামোটিও কেউই অস্বীকার করতে পাবেননি — এমন কী ফ্রানৎস বোয়াস কিংবা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতো ভিন্নপন্থীরাও। সংস্কৃতির পরিভ্রমণ (অর্থাৎ, মাইগ্রেশ্যন) এবং সংমিশ্রণ (অর্থাৎ, ডিফিউশ্যন) ইত্যাদি তত্ত্ব উত্তরকালে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলেও, মর্গ্যান-নির্দেশিত বিবর্তনেব তত্ত্বটিকে কোনও পণ্ডিতই তাঁর পরবর্তীকালে নাকচ করতে পারেননি। সংমিশ্রণ যে-সব ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই সম্ভব হয়নি বলে প্রমাণিত হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে ভাব এবং রূপগত সাদৃশ্য সমধর্মিতা যখন প্রবলভাবেই দেখা যায়, তখন তাঁর তত্ত্বের মূল সত্যটিকে না মেনে উপায় কী?

ঘ. সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা : লোকায়ত ও নাগরিক

লোকজীবনের উপজীব্য কৃষ্টিকলার বিচিত্র প্রকরণগুলো নাগরিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনিবার্যভাবে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে—এমন একটা আক্ষেপ প্রায়ই আমরা শুনি। এই প্রতীতির আড়ালে কতকগুলি ভাবনা কাজ করে, যা নিঃসন্দেহে ব্যাপক এবং সুগভীর। কিন্তু আমাদের মতো দেশে — যেখানে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো প্রযুক্তিবিদ্যাকে এখনও তেমনভাবে আত্মস্থ করতে পারেনি, সেখানে এই খেদ একান্তই আপেক্ষিক। সমাজতত্ত্বের নিয়ম অন্তত তা-ই বলে। ইতিহাসের একটি মূল তত্ত্ব অনুসারেই সংস্কৃতির রীতি-প্রকরণ বহিরঙ্গে একটু-একটু করে পরিবর্তিত হতে থাকে; কিন্তু তার ভিতরের ভাবগত-কাঠামো মোটামুটি অবিকৃতই যে থেকে যায়, এমন কথাই সংস্কৃতিবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন নানাভাবে।

আসলে, লোকজীবনের কৃষ্টি — সাধারণ ভাবে যাকে আমরা 'লোকসংস্কৃতি' বলে বুঝিয়ে থাকি — শহুরে-সংস্কৃতির বহুধাব্যাপ্তির পরিণামে তার ঐ অবক্ষয় ঘটার ধারণাটা গড়ে উঠেছে প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত পশ্চিমী — বিশেষত আমেরিকান— সমাজতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের চিন্তার একটা গভীর প্রভাব আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতাকেও ঐ মর্মে ছায়াছন্ন করেছে। দ্বিতীযত, আমরা অনেকেই একটা ভ্রান্ত সংস্কারে গ্রস্ত যে, লোকসংস্কৃতি এবং নাগরিক সংস্কৃতি না-বি সম্পূর্ণরূপে পৃথক দুটি সামাজিক মাত্রার অন্তর্গত বিষয়!

দ্বিতীয় উপলক্ষটি নিয়েই প্রথমে বলা দরকার। এই ভাবনা-তথা-সংস্কারের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল : ক. লোকসংস্কৃতি এবং শহরের সংস্কৃতি একান্তভাবেই অসম্পৃক্ত দুটি মানসিক (কাজেকাজেই, সামাজিকও বটে!) স্তরে সৃজিত প্রকরণগুচ্ছ; খ. এই দুয়ের মধ্যে অতএব কোনও অনিবার্য পরস্পরসাপেক্ষতা নেই; গ. গ্রামের মানুষরা (না-কি) পরিশীলিত নাগরিক কৃষ্টির সৌন্দর্যকে আদৌ উপলব্ধি করতে পারেন না; এবং ঘ. শহরের মানুষের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যদি বা কিছু আগ্রহ দেখা যায়, বস্তুতপক্ষে তা হল এক ধরণের 'কিউরিও ইন্টারেস্ট' মাত্র।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অনুসিদ্ধান্তগুলির মুখ্য ভিত্তিটা নিতান্তই পলকা। ইতিহাসের একটি মৌলিক সত্যের উল্লেখ একটু আগেই করা হয়েছে; সে সত্যের মুখ্য কথাটি হল এই যে, যতই মানুষের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বদ্‌লে-বদ্‌লে যায়, ততই তার সামাজিক অভিব্যক্তিগুলিও পাল্টাতে থাকে। এটারই অভিক্ষেপ ঘটে মানুষের ব্যবহারিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে—ফলে সংস্কৃতির অনুষঙ্গেও একটা পালাবদল প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বক্তব্য এটাই যে, ঐ পালাবদল নেহাৎই পোশাকী। লোকজীবনের শিকড়ে বহুকালীন যে ঐতিহ্য-চেতনা প্রাণরস সঞ্চার করে যায় নিরন্তরভাবে, তার অলক্ষ্য কিন্তু অপ্রতিরোধ্য সঞ্জীবনী শক্তি নাগরিক /পরিশীলিত কলাকৃষ্টিকেও পুষ্ট করে। সেই ঐতিহ্যকে আমরা কোনও সময়েই মন থেকে নির্মঞ্জিত করতে পারি না, পারিনি। মর্গ্যান, ফ্রেজার, টাইলর

থেকে শুরু করে ম্যালিনৌস্কি, মীড, দুর্খহেইম অবধি কোনও সমাজবিজ্ঞানীই এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন নি। সাম্প্রতিককালের লেভি-স্ত্রোসও না। আমাদের দেশের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস যাঁরা আমাদের নিজস্ব মানস-পটভূমিতেই বিচার করেছেন— ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কিংবা দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী কি রামশরণ শর্মা বা রোমিলা থাপার — তাঁরাও না। পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, সেই এ. এল. ব্যাশমও এঁদের মূল সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।

ঐ পালাবদলটাকে 'পোশাকী' বলা হয়েছে নানা কারণেই। উৎপাদন-প্রক্রিয়া (বা জীবিকা নির্বাহের প্রকরণ) ধীরে-ধীরে বদলায়; তার সঙ্গে তাল রেখেই বদলায় সংস্কৃতির ব্যবহারিক, বাহিরঙ্গিক রূপটি, কিন্তু মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে তার অন্তর্নিহিত মানস-পরিকাঠামোটি। একটা উদাহরণই প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থিত করবে এই কথার সমর্থনে : পশুশিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে যেকালে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক-প্রপিতামহেরা জীবন নির্বাহ করতেন, সেই আমলে তাঁদের নৃত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-দেবতার কল্পনা-মন্ত্র-আচার-সংস্কার-কাহিনী-তৈজস-বাসস্থান— সব কিছুই ছিল ঐ বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠিতে হিশেব করা। আবার পশুপালন ও পশুচারণ যখন ধীরে-ধীরে নূতনতর এক অর্থনৈতিক পর্যায়ের সূচনা করেছিল, তখন ঐ সমস্ত কিছুতেই আবার সেই নূতন স্তরটির ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে প্রত্যয়ের মৌল পরিকাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখেই। আবার কৃষির উদ্ভবের পরিণামে আরও নতুন এক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন গড়ে উঠেছে, তখনও পূর্বতন প্রতীতির অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোই বজায় থেকেছে, বদলেছে বাইরের রূপটুকু। নতুন থেকে আরও নতুন স্তরের অর্থনীতির বিবর্তনের লব্ধফলে সমাজ-কাঠামো কীভাবে বাইরের দিকে পাল্টে যায়, দীর্ঘকাল আগেই মর্গ্যান এবং তাঁর পরে এঙ্গেলস দেখিয়ে গেছেন। সেই আলোচনা আগেই করা হয়েছে; মার্কিন সমাজবিজ্ঞান-শাস্ত্রের পণ্ডিতদের বৃহদংশ রাজনৈতিক কারণে সেই তত্ত্ব সম্পর্কে আপত্তি জানালেও, তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তি কিন্তু খুব দৃঢ় নয়। সে কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিস্তৃতভাবে বোঝানো হয়েছে। অর্থনীতিই যে সমাজের মৌল পরিচালিকা শক্তি এটা ভাববাদী দার্শনিকরা এককালে মানতেন না; এখনও মানেন না। সমাজবিজ্ঞানীরা যদিও এটা এখন মোটামুটি মানেন, কিন্তু সংস্কৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে সেটা আবার ঐ পশ্চিমী পণ্ডিতরা অনেকেই মান্য বলে মনে করেন না।

এইখানেই মার্ক্সবাদী সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের সঙ্গে অন্যদের তত্ত্বগত বিরোধ। অন্যরা অর্থনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির মানস-সম্পদের দিকটির নিবিড় সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন; মার্ক্সবাদীরা করেন না। আবার মার্ক্সবাদীদের মধ্যেও অন্যতর একটি মত পার্থক্য আছে : এক তরফের বক্তব্য, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে-পরিবর্তনের সূত্রে আর সব কিছুর মতো সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে — এবং সেই বদলটা সামগ্রিক। অন্যরা মনে করেন ঐ পরিবর্তনটা দ্বিমাত্রিক — বহিরঙ্গে বদলালেও অন্তর্কাঠামো মোটামুটি একই থাকে। সঠিক অবস্থানটা তাহলে কোথায়?

সেটি খুঁজে পাব, যদি এই ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত উদাহরণটিকে এবার প্রত্যক্ষত

নিয়ে আসা হয় : একটা সময় ছিল যখন আদিম পিতামহরা পশুশিকার করে, নিহত প্রাণীর কিছুটা অংশ নিবেদন করতেন তাঁদের কল্পিত দেবতাদের তুষ্টির জন্য অর্ঘ্য হিশেবে। শিকারভিত্তিক অর্থনীতি যখন কৃষিভিত্তিক হয়ে উঠেছে, তখন বন্য প্রাণী শিকার করাটা অপ্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের ব্যাপারটা প্রচলিতই থেকেছে। শিকারের পরিবর্তে, বলি হয়েছে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যম। মুরগীর মুণ্ডু ছিঁড়ে, নরবলি দিয়ে, পশুবলি দিয়ে.— যেভাবেই হোক না কেন, মূল প্রথাটা অপরিবর্তিত থেকেই গেল। আর এরই আধুনিক রূপান্তরণ, একটা জাহাজ ভাসানোর আগে, কিংবা কারখানায় একটা নতুন প্ল্যান্ট বসানোর প্রাক্কালে মদের বোতল বা নারকেল আছড়ে ভাঙা। বোতল বা নারকেল এখানে নরমুণ্ডের প্রতীক। সেতু বা বাঁধ বাঁধবার সময়ে নরবলি দিয়ে 'শুভ' সূচনা করার ঘটনা মধ্যযুগোত্তর পর্বেও অবিরল ছিল!

।। ২ ।।

বস্তুতপক্ষে, সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অন্বেষণ করলে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পর্যায়ের কৃষ্টিস্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যে ঠিক কী, সে ব্যাপারে ধারণা করাটা সহজসাধ্য হবে। এই সূত্রে, ঐ বিবর্তনের একটি ছক তৈরি করা যেতে পারে :
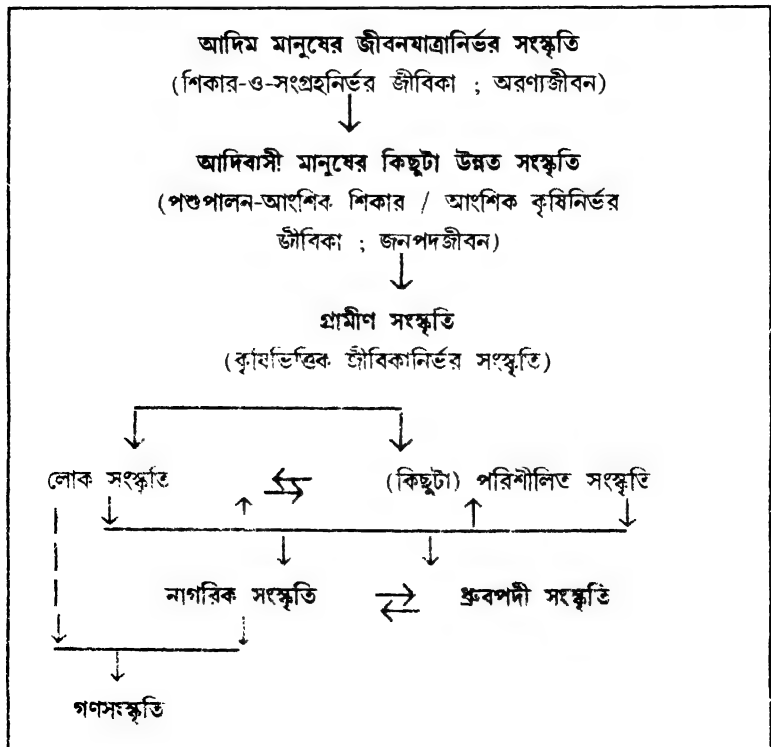
স্পষ্টতই, গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির আগের স্তরগুলি থেকে বিবর্তিত হতে হতেই শেষ অবধি নাগরিক ধ্রুবপদী (ক্লাসিক্যাল) কৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে এবং তারও পরবর্তী বিবর্তনের অনুষঙ্গে গড়ে উঠেছে গণসংস্কৃতি। অতএব, এটা মানতে হবেই যে, লোকসংস্কৃতি কৃষ্টি-বিবর্তনের পথে কোনও টার্মিনাস নয়, ববং তাকে জংশন-স্টেশন বলেই গণ্য করা শ্রেয়। পূর্ববর্তী স্তর এবং পরবর্তী স্তরগুলির সঙ্গে সে-ই হল সম্পর্কের গ্রন্থিস্বরূপ। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, তাহলে প্রথমেই এক্ষেত্রে বলতে হবে যে, কলকারখানা-কেন্দ্রিক অর্থনীতির মূল শিকড়টা এখনও গ্রামেই, কেন-না শতকরা ৮৫ জন এখনও সেখানে থেকে মুখ্যত কৃষিকে অবলম্বন করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে কলকারখানা-ভিত্তিক বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রভাব তার ওপরে যে গভীর এবং ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করেছে, সে কথাও অনস্বীকার্য। সুতরাং লোকসংস্কৃতিও নাগরিক সংস্কৃতির দ্বারা বেশ কিছুটা প্রভাবিত হচ্ছে যে, তাতে সন্দেহ কী?

এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নাগরিক জীবনের সামাজিক চরিত্র গ্রামীণ সমাজের চরিত্র থেকে অনেক কম রক্ষণশীল। তাছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ সেখানে একত্র হন বলে. শহরের সংস্কৃতির মধ্যে একটা সর্বজনীনতা থাকে। পক্ষান্তরে গ্রামীণ সংস্কৃতি তুলনায় অনেক বেশি একমাত্রিক এবং সীমায়ত।

তাছাড়াও, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের থেকে শহবেব খেটে-খাওয়া মানুষেরও নিঃসন্দেহে কিছুটা বেশি বলে, স্বভাবতই নাগরিক জীবনের চমক. চটক আর মোহও প্রবলতর। গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপবে তাই চলচ্চিত্র, রেডিও, দূরদর্শন, সংবাদপত্রেব খবর-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি থেকে নির্যাস-করা নূতন এক মোহময়ী 'নাগবিক' সংস্কৃতির অভিক্ষেপ অপ্রতিরোধ্য ভাবেই পড়ে। যে-জীবন গ্রামের (এবং শহরেরও) বিবাট সংখ্যক মানুষের অনায়ত্ত, তারই মোহ গ্রামের জীবন ও লোকসংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু তাতে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রবাহ রুদ্ধ হয়নি। গ্রামের মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা অন্তঃশীলা হয়ে থাকছেই। প্রকৃতপক্ষে শহরের সংস্কৃতির মধ্যেও লোকসংস্কৃতির ভাবনাবেণু অনির্মঞ্ছনীয় হয়ে থাকে। ধ্রুবপদী সংস্কৃতিব সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্বন্ধ যে কতটা নিবিড়, সেটি বোঝা আদৌ দুরূহ নয়, যদি উদাহরণ হিশেবে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগ-রাগিণীর নামগুলি একবার স্মরণ করি: ভূপালী-মালবকৌশিক-গুর্জরী-গৌড়মল্লার-বৃন্দাবনীসারং আহিরী ভৈরোঁ-লাচাড়ী টোড়ী-দেশ-পাহাড়ী.....এবং আরও বহু নাম স্পষ্টতই সঙ্কেত করে একটা দিকে : এগুলি মূলত, কোনও বিশেষ অঞ্চল বা গোষ্ঠীর লৌকিক সুররীতির পরিকাঠামোর ওপরই গড়ে উঠেছে ক্রমে- ক্রমে।

শহরেব মানুষরা যখন কথা বলেন, তখনও ইডিয়ম, প্রবাদ, প্রবচন-ইত্যাদিকে তো বাদ দিয়ে চলতে পারেন না কোনও সময়েই। লোকসংস্কৃতির ভাবনাবেণুগুলি শহরের মানুষের মানসকে যে রঙিয়ে রাখেই, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে তো যে-কোনও বিয়েবাড়ির আচার-অনুষ্ঠানগুলি তলিয়ে বিচার করলে। বিবাহ-সম্পৃক্ত

কিংবা অন্যবিধ সংস্কার যে নাগরিক জীবনে কতখানি ব্যাপক হয়ে আছে এখনও, পরের একটি অধ্যায়ে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

আসলে, গ্রামের কৃষ্টি এবং শহরের কৃষ্টি মোটেই পরস্পর অসম্পৃক্ত নয়— একে অন্যের পরিপূরক হয়েই অস্তিত্ব রেখে চলেছে। সামাজিক-বুননের অনুসূত্রে উভয় তরফের সাংস্কৃতিক-বুননটাও গড়ে উঠেছে এবং তার নক্‌সাটি সুস্পষ্ট। শুধু শহরের বর্ণালী কখনো উজ্জ্বলতর, কখনো গ্রামের। কিন্তু তাতে দুয়ের মধ্যে অনাত্মীয়তা ঘটে না। ফারাক যা, তা নেহাৎই বহিরঙ্গে; কালচারাল কনটিন্যুয়াম অনিবার্যভাবেই বজায় থাকে অন্তর্কাঠামোয়।

তৃতীয় অধ্যায়
লোকসংস্কৃতির সীমানা

ধরা যাক, বাংলার কোনও গ্রামের জনৈক অমুকচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর পরিবারের কথা ঃ কার্তিক মাসের ভোরবেলা ভট্চাযের প্রৌঢ়া গৃহিণী ঘুম ভেঙে হাই তুলে বললেন, 'দুগ্গা, দুগ্গা— শুভেলাভে রেখ মা দিনটুকু।' চোখে মুখে জল দিয়ে এসে বড় মেয়েকে ডাকাডাকি করতেই সে চোখ কচ্লাতে-কচ্লাতে উঠে বসল— মা বলে উঠলেন অম্নি, 'সক্কালবেলায় আর এক চোখ দেখাসনি বাছা, দুচোখে হাত দে।' ততক্ষণে কর্তা উঠেছেন, হাই তুলতে-তুলতে মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে 'মা-মা' রবে তিনি শয্যা ছাড়লেন। গিন্নী বললেন, 'এই যে ইয়ে শুনচ, আজকে তো হাটবার, এদিকে চাল বাড়ন্ত— মনে করে কেজি দুই ভাল চাল এনো, ওবলার 'টেনে' ভাস্ঠাকুররা সব আসবেন। আর হ্যাঁ আজ আবার মঙ্গলবার, মোচা এনো না, নেবু নংকা আনবে.... ও খুকি তোর বাবার তামাকটা সেজে দিয়ে বাসি কাপড়টা ছেড়ে ঠাকুরের ফুল-জলটা একটু দিয়ে আয়ত মা।'

খুকি সুর টেনে জবাব দিল, 'ও—মা, আজকে ত আমি ফুল-জল দিতে পারব না, তোমাকেই দিতে হবে, মা শুনছ?' মা গজ্গজ্ করতে-করতে তুলসীতলায় গেলেন গোবর লেপতে, পায়ের কাছে দিয়ে বাস্তু সাপটা হেলতে-দুলতে চলে গেল। গিন্নী দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়েই দেখলেন পাড়াতুতো ভাসুর চাটুজ্যেমশায় এসেছেন। অতএব ঘোমটা একটু নামিয়ে তিনি ছোট মেয়েকে ডাকলেন, 'ওলো ও বুড়ি, তোর জ্যেঠামণিকে দাবায় একটা আসন পেতে দিয়ে হুঁকোটা দিয়ে যা—বল্ তোর বাবা হাটে গেছে, এক্ষুনি আসবে অখন'—বুড়ি একাই উঠোনেতে এক্কা-দোক্কা খেলছিল, দৌড়ে এসে আসন আর হুঁকো চাটুজ্যে-জ্যেঠার হাতে দিয়েই ছুট দিল প্রাণের সই 'বকুলফুল' পুঁটুরাণীর বাড়ি — যার মেয়ে-পুতুলের সঙ্গে ওর ছেলে- পুতুলের 'সম্বন্ধ' চলছে। মুশকিল শুধু একটাই; দু-পক্ষের গোত্র নাকি একই। দু-তরফই আসলে মুখুজ্যে অর্থাৎ ভরদ্বাজ। তাই...! পুজো সেরে ভট্চায-গিন্নী রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন মহা-অশান্তি! খুকি লাউ-উচ্ছের শুকতোয় মেথি-সরষের বদলে ভুল করে পাঁচ ফোড়ন দিয়েছে আর মালা জপতে-জপতে ভটচাযের বৃদ্ধা মা তা দেখে ফেলেছেন এবং একালের মেয়েদের কাজে অপটুতা যে আসলে মায়ের দোষেই, এমন একটি মন্তব্য করেছেন। ফলে তুলকালাম! মেয়ে এবং শাশুড়ী উভয়ের ওপরই রেগে ভট্চাযনী ঠক্ করে কড়াটা উনুন থেকে নামাতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘটালেন, আচমকা ঠুকে ফেলে বাঁহাতের শাঁখাটা দু-খানা করে ফেললেন; শাশুড়ী কপালে কুঁড়োজালি ছুঁইয়ে বিরস কণ্ঠে বলে উঠলেন 'এই বচ্ছরকার দিন, তার ওপরে মঙ্গলবারের ভরা

একাদশীতে শাঁখাটা বাড়িয়ে ফেললে মেজ বউমা?' বাঁহাতে বাঁধা ইষ্টনামের মাদুলিটা মাথার সিঁথিটায় একবার ছুঁইয়ে ব্যাজার মুখে মেজবউমা বসে রইলেন।

।। ২।।

কর্তা অফিস বেরোবার মুখে বুড়ি হেঁচে ফেলায় তাঁকে বসতে হয়েছিল। ফলে তাঁর ট্রেন ফস্‌কেছে। সে জন্যে কর্তা-গিন্নীতে নিমখোস্ একটু কলহ এবং তার ফলে একজন জামা-জুতো খুলে ধুতির খুঁট্ গায়ে জড়িয়ে পাড়ার ভাঙাচণ্ডীমাতলায় পোড়ামাটির ছলনগুলো সরিয়ে বারোয়ারী মজলিসে গিয়ে বসেছেন এবং অন্যজন প্রতিশোধ নিতে শুধু একটা মাছের আঁশ এবং গুণে একটি ভাত নিয়ে দাঁতে কেটে, বসলেন একখানা নক্‌সী কাঁথা নিয়ে — ভাইপোর অন্নপ্রাশনের আগেই যাতে শেষ হয়; ওর ষষ্ঠী পুজোর দিনই 'সাহিত্' করে কাঁথাটা 'পেড়েছেন' তিনি! শাশুড়ী গজগজ করতে-করতে সারা দুপুর বড়ি দিয়েছেন ছাদে বসে। কে নাকি তাঁকে 'বক' দেখিয়ে গেছে বলে তাঁর বিশ্বাস!

বিকেলে পুঁটি এল কোলের ভাইকে নিয়ে : সে ওর খুব 'ন্যাওটা'। বাচ্ছাটাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে ফোক্‌লা মাড়ির কষের নিচে ঝিনুকের ডগাটা চলে গিয়ে বিষম খেয়ে সে তো প্রায় 'যায়-যায়' হয়েছিল! কোনওমতে মাথায় ফুঁ দিয়ে, অনেক 'ষাট্-ষাট্' বলে তাকে ঠাণ্ডা করে চোখে কাজল পরিয়ে, বাঁদিকে সিঁথি কেটে একটা কাজলের টিপ লাগিয়ে, বাঁহাতের কড়ে আঙুলে একটা আল্‌তো কামড় দিয়ে—তবেই তাকে দিদির সঙ্গে পাড়ায় বেড়াতে পাঠিয়েছেন তার মা।

ভট্‌চাযগিন্নীর ছেলে নেই; তাই মেয়ের বকুলফুলের ভাইটাকে একটু ভালবাসেন। ওকে দেখেই কাঁথাটা নামিয়ে কোলে নিয়ে ছড়া কেটে, গান করে-করে 'ভোলাতে' লাগলেন উনি। 'তিরপুন্নির ঘাট' থেকে 'বর্গীর হাঙ্গামা' অবধি যখন অনেক কিছুর বর্ণনা শেষ, দেখা গেল শ্রীমান গভীর ঘুমে 'বম্মা'-র কোলে 'নেতিয়ে' শুয়ে রয়েছে। একখানা কাঁথা পেতে ছোট একটা সর্ষের বালিশে মাথা রেখে বাচ্চাটাকে শুইয়ে গিন্নী উঠলেন সাঁজপিদিম জ্বেলে ঠাকুরদের শয়ন করিয়ে শাঁখে ফুঁ দিতে। অন্যদিন খুকি করে এসব; আজ পারবে না।

পুঁটির মা এলেন ছেলেকে নিতে। দুই গিন্নী চুল বেঁধে পরস্পরের 'সিঁতে'-'নোয়া'-য় সিঁদুর ছোঁয়ালেন। ওদিকে পুঁটি আর বুড়ি বসে গেছে ঠাকুরমার কাছে 'ডালিমকুমারের' গপ্পো শুনতে। কত্তাও ফিরেছেন। রাগ পড়েছে ক-দান 'কচ্চে বারো' জিতে। বাটি ভর্তি মুড়ি-নারকেলনাড়ু নিয়ে বসলেন তিনি। আকাশপিদিমের লম্পটাতেও আলো জ্বালিয়ে দিলেন। সন্ধ্যের পর গাঁয়েব হাটতলায় কৃষ্ণযাত্রা হবে। পুঁটি, বুড়ি সঙ্গে যাবে। মায়েরা যাবেন না; এতো শহর নয়, গাঁ-ঘরে বউ-মানুষের ওসব চলে না, গেলে শাশুড়ীরাই 'চিপ্‌টেন' কেটে বললেন : 'কালে কালে কতই হল, পুলিপিঠের ন্যাজ গজাল!' অতএব..!

ওঁরা ফিরলেন অনেক রাতে। গিন্নী জেগেই ছিলেন। তিনবার খুকির নাম ধরে

কর্তাকে ডাকতে শুনে, উঠে দোর খুললেন ঠাকরুণ; লণ্ঠন জ্বেলে দাবায় 'ঠাঁই' করে ভাত বেড়ে পাখা হাতে বসলেন। বিকেলের ট্রেনে ভাসুর আর তাঁর ছেলেরা এসেছেন। ক্লান্ত থাকায় তাঁরা আগেই শুয়ে পড়েছেন খাওয়া-দাওয়া সেরে। বাকি শুধু এঁরা দুই কর্তা-গিন্নী। বড় মেয়ে ঘরে ঘুমোচ্ছে; ছোট মেয়ে ঢুলতে-ঢুলতেই ফিরেছিল। এতক্ষণে দুজনে একটু একলা হলেন... সকাল হলেই তো আবার 'পব্ব' শুরু।

।। ৩।।

শুধুমাত্র কিছু ছড়া, উপকথা, কাঁথা, গান, দোতারা, সাবিন্দা আর ধাঁধা প্রবচন নিয়েই লোকসংস্কৃতির সবকিছু — এই ধরনের একটা অসম্পূর্ণ ধারণা আছে। ধারণাটা যে ভুল, যথা-অর্থে লোকসংস্কৃতি বলতে যে আর অনেক-অনেক বেশি-কিছু বোঝায়, সেইটি প্রমাণের জন্যেই ভট্টাচার্যদের পরিবারের এই গল্প তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু 'গল্প'ই বা বলছি কেন? জনজীবনের নানাবিধ বাস্তব বিশ্বাস, আচার সংস্কার, ধারণা এবং সেই মানস-উপলব্ধির ব্যবহারিক প্রকাশগুলি কীভাবে ঘটে, লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলির অন্বেষণের সূত্রেই তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মের পরিণতিতে সুদীর্ঘ — হয়ত বা স্মরণাতীত— কাল আগে থেকেই যা প্রবহমান, তারই মোহনা হল সংস্কৃতি; এ-এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি।

১ ঘুম ভাঙার পর দুর্গানাম করা, জগন্মাতাকে সম্ভাষণ করা, 'শুভে লাভে' থাকার প্রার্থনা করা; ২. সকালবেলায় একচোখে হাত না দেওয়া; ৩. হাই তোলার সময়ে মুখের সামনে তুড়ি বাজানো; ৪. 'এই যে ইয়ে' বলে নাম না-ধরে স্বামীকে সম্বোধন করা; ৫ চাল 'বাড়ন্ত' হওয়া; ৬ 'ওব্লার' 'টেনে' 'ভাস্ঠাকুরদের' আসার কথা বলা; ৭. মঙ্গলবারে মোচা আনতে মানা করা; ৮ 'নেবু, নংকা' ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া; ৯. 'বাসি' কাপড় ছাড়া; ১০. ঠাকুরকে ফুল-জল দেওযা; ১১ খুকির পক্ষে ফুল-জল দিতে পারার অসুঁবিধে থাকা; ১২. তুলসীতলায় গোবরলেপা; ১৩ বাস্তুসাপের উদ্দেশে প্রণাম জানানো; ১৪. ভাসুরস্থানীয়ের প্রতি সম্ভ্রম দেখানোর জন্য ঘোমটা টানা; ১৫ 'ওলো' বলে বুড়িকে সম্বোধন করা; ১৬. বুড়ির মাধ্যমে ভাসুর স্থানীয়ের সঙ্গে কথা বলা; ১৭. তামাক সাজা; ১৮ এক্কা-দোক্কা খেলা; ১৯. 'বকুলফুল' পাতানো; ২০. পুতুলের বিয়ে দেওয়া; ২১ স্বগোত্রে 'সম্বন্ধ' হবার বাধা থাকা; ২২ বিশেষ তরকারিতে বিশেষ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা; ২৩ কুঁড়োজালি নিয়ে মালা জপ্পা; ২৪ শাশুড়ী-বউয়ের অপ্রীতির সম্পর্কজনিত কারণে বিশেষ ধরনের মন্তব্য করা; ২৫. কড়ায় রান্না করা; ২৬. শাঁখা পরা ও শাঁখা 'বেড়ে' যাওয়া; ২৭. 'বচ্ছরকার'দিনে, মঙ্গলবারে এবং একাদশীর কালে শাঁখা 'বেড়ে' যাওয়া; ২৮. মাদুলি বাঁহাতে বাঁধা এবং সেটি কপালে ছোঁয়ানো, ২৯ হাঁচিতে 'যাত্রা ভঙ্গ' হওয়া; ৩০. ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো; ৩১. ভাঙা চণ্ডীমাতলায় 'ছলন' দেওয়া; ৩২ 'ছলন' সরানো, ৩৩ দাঁতে মাছের আঁশ আর একদানা ভাতকাটা; ৩৪ নক্সী কাঁথা

'সাহিত্' করে 'পাতা'; ৩৫. ষষ্ঠী পুজো ও অন্নপ্রাশন; ৩৬. বড়ি দেওয়া; ৩৭. 'বক' দেখানো; ৩৮ 'কোলের ভাই-এর 'ন্যাওটা' বলে গণ্য হওয়া; ৩৯. ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানো; ৪০. 'বিষম' খাওয়া, 'যায়-যায' হওয়া; ৪১. মাথায় ফুঁ দেওয়া এবং 'ষাট্' 'ষাট্' বলা; ৪২. কাজল-পরানো ও বাঁদিকে সিঁথি কাটা; ৪৩. কাজলের টিপ্ পবানো এবং কড়ে আঙুল কামড়ানো; ৪৪. ছড়া-কাটা এবং ঘুমপাড়ানি গান করা; ৪৫. 'তিবপুর্ণির ঘাট ও বর্গীর হাঙ্গামা'-র ছড়া বলা, গান করা; ৪৬. 'বম্মা'-র কোলে গভীর ঘুমে 'নেতানো; ৪৭. সর্ষের বালিশে শোয়ানো; ৪৮. সাঁঝের পিদিম জ্বালা, ঠাকুরদের 'শয়ন' করানো, শাঁখে ফুঁ দেওয়া; ৪৯. বিকেলবেলা চুল বাঁধা, সিঁথি-নোয়ায সিঁদুর ছোঁয়ানো; ৫০ 'ডালিমকুমারের' গপ্পো শোনা; ৫১ 'কচে-বারো'র দান জেতা; ৫২ মুড়ি-নারকেলনাড়ু খাওয়া; ৫৩. আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো; ৫৪. কৃষ্ণযাত্রাব পালা শোনা; ৫৫. গাঁ-ঘরের ভদ্দরনোকের বউ-মানুষের পালা না দেখতে যাওয়া; ৫৬. প্রবাদ-প্রবচন আওড়ানো; ৫৭. 'পুলি পিঠে'-র উল্লেখ; ৫৮. 'ন্যাজ' গজানো ও 'চিপটেন' কাটা; ৫৯. তিনবার গলার আওযাজ শুনে দোর খোলা; ৬০. 'দাবা'য় 'ঠাঁই' করে ভাত 'বাড়া'।

মোট এতগুলি প্রকরণ খুঁজে পাচ্ছি আমরা এখানে যাদেব সঙ্গে, লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ অনুভাবনা জড়িয়ে আছে। বাঙালীর লোকাযত জীবনচর্যায় এই প্রকরণগুলি বা এরকম হাজাব হাজাব প্রকবণের ভূমিকা কি, তার বর্গীকরণ করলেই স্পষ্ট হবে।

।। ৪।।

'শুভলাভে' থাকার যে প্রার্থনা দিয়ে কাহিনীর শুরু, লৌকিক জীবনের সারাৎসার, তাতেই নিহিত। এই ঐহিক চরিতার্থতাব আকাঙ্ক্ষাই লোকজীবনের দর্শন-চেতনার ভিত্তি বাঙালীব লৌকিক বার-ব্রতগুলিবও মূল কথা এটাই। পাবত্রিক চিন্তা, কর্মফলবাদ, নিয়তি, মোক্ষ, এসব হল লোকজীবনেব পরিপন্থী ভাবনা।

লৌকিক-সংস্কার এবং সহজাত অথবা ঐতিহ্যাগত বিশ্বাস (যা-নাকি অনেকসময়েই জাদুশক্তি এবং অলৌকিক কায-কাবণ-সম্পৃক্ত ঘটনা হিশেবে পুরুষানুক্রমে গণ্য হয়ে আসছে)-সমূহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এগুলি গড়ে ওঠার পিছনে। তাবপবে পরিবেশ, আর্থনীতিক পরিমণ্ডল, নৃতাত্ত্বিক-জাতিতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন উপকবণ এবং আরও কিছু-কিছু বিষয়ও এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। কিন্তু তার আগে প্রযোজন লোকসংস্কৃতিব উপকরণ বলে যেসব বিষয়গুলিকে এখানে বাছা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির স্বরূপ, উৎস এবং বিবর্তনের ধাবা নির্ণয় করে দেখানো

১ সম্পর্কে এই অধ্যায়েব শুরুতেই বলে নেওয়া হয়েছে। ২ একটি আদিম সংস্কার; দুটি চোখ থাকাই স্বাভাবিক, যেখানে একটি চোখ হাতে ঢাকা, সেখানে ঐ 'অস্বাভাবিকত্ব' কোনও অপশক্তিব আবির্ভাবের পথ করে দিতে পারে, তাই সংস্কার গড়ে উঠেছে একচোখে হাত না-দেওয়াব, দিলে ঝগড়া হতে পাবে ঐ অপশক্তির ভয়ে। ৩ এটিও আদিম ভাবনা; 'হাই'-এব সঙ্গে আত্মার কিছুটা যাতে বেরিয়ে না

যায়, সেজন্যে তুড়ির জাদু-প্রক্রিয়া একটি প্রতিরোধক ব্যবস্থা বলে গণ্য। (জাদু সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে); হেঁচে ফেল্লে ঐ জন্যেই 'জীব' (বাঁচো) বলা হয়। ৪. লৌকিক শব্দ প্রয়োগ; আবার, স্বামীর নাম না-ধরা হল প্রতিরোধক সংস্কার; আদিবাসী বহু জাতির মধ্যেই প্রকৃত নামে সম্বোধন নিষিদ্ধ, পাছে ঐ নাম শুনে ফেলে কোনও অপশক্তিসম্পন্ন সত্তা বা মানুষ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মাকে গ্রাস করে। ৫. 'বাড়ন্ত' বলে 'নেই' বোঝানোও একটা সংস্কার; শব্দকেন্দ্রিক স্পর্শজাদু — 'কমন্ত' বল্লে সত্যি পাছে কম হয়ে থাকে, তাই 'নেই'-এর ঠিক বিপরীত শব্দ ব্যবহৃত। ৬. ওব্‌লা<ওবেলা, টেন্<ট্রেন, ভাস্‌ঠাকুর<ভাসুরঠাকুর < ভ্রাতৃশ্বশুর ঠাকুর; লৌকিক বাক্‌রীতি। ৭. শনি ও মঙ্গল এই দুই বার উগ্র এবং ক্রুদ্ধাবস্থায় অহিতকারী গ্রহের প্রভাবাধীন বলে সংস্কার আছে; আবার মোচা উর্বরতা তথা-সন্তানের প্রতীকরূপে আদিমকাল থেকেই গণ্য (যে কারণে জোড়া-কলা মেয়েরা খান না, পাছে জোড়া ছেলে হয়); তাই ঐ দুদিনে মোচা কাটলে সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলে সংস্কার। ৮. লৌকিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য : ল→←-ন; যেমন র→←অ। ৯. রাতে-শোয়া কাপড় 'অশুদ্ধ' বলে গণ্য, তাই 'বাসি' কাপড় ছাড়ার বিধান; আদিম সংস্কারও হতে পারে, স্মার্ত সংস্কার হওয়াও সম্ভব। ১০. এ ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা; দেবতাকে প্রীত করার জন্য ফুল দেওয়া আত্মনিবেদনের প্রতীক; আদিম মনে ফুল ছিল যৌন চিহ্নের সমতুল্য, পরে এর নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য কল্পিত হয়েছে সভ্যতার বিবর্তনের ফলে । ১১. যে-কারণে 'বাসি' কাপড়ে দেবতাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, সেই একই ধরনের ভাবনার জন্য প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ঋতুমতী-অবস্থাতেও তা নিষিদ্ধ; আদিম মনে রক্ত সম্পর্কে ভয় থেকে এই সংস্কারের সৃষ্টি। ১২. তুলসীতলা হল বৃক্ষপূজার উত্তরসরণ, গোবর-লেপা কৃষিভিত্তিক জীবনের দ্যোতক। ১৩. একই সঙ্গে পূর্বপুরুষের আত্মার এবং-পশু-পূজার অনুবর্তন। ১৪. ভাসুর স্বামীর বড়, প্রায় শ্বশুরের তুল্য, কিন্তু দেবর তা নয়; তাই ভাসুরকে নিয়ে নিষেধ-সংস্কার গড়ে উঠেছে—যৌনসম্পর্ক প্রতিরোধ করার জন্য; দেবর← দ্বিতীয় বর, তাই সেক্ষেত্রে বিধান শিথিল। ১৫. লৌকিক বাক্‌রীতি : ওলো ←হলা (প্রাকৃত)←হে রে (তৎসম)। ১৬. এটিও (১৪)-র আনুষঙ্গিক। ১৭. হুঁকোয় তামাক খাবার প্রথাটুকু বাঙালীর লৌকিক ঐতিহ্য; তামাক 'সাজা' লৌকিক ক্রিয়াপদ । ১৮. লোকক্রীড়াও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; হা-ডু-ডু-ডু, কুমীর-কুমীর, ডাংগুলি, নামপাতানো ইত্যাদি কিছু-কিছু খেলা বঙ্গসংস্কৃতির নিজস্ব। ১৯. এটিও নামপাতানোর সমধর্মী; কোনও একটি জিনিসকে (গঙ্গাজল, বকুলফুল, চোখের মণি ইত্যাদি) পবিত্র, শুচি, শুভদ্যোতক, মঙ্গলদায়ী, প্রীতিদাতা ইত্যাদি মর্মে গণ্য করে সেই নামে পরস্পরকে ডাকার রেওয়াজে 'ফেটিশ' (শুভদায়ী ও অশুভরোধী বস্তু) অর্চনার ধারা বহমান; মাদুলি, কবচ, আংটির বিশেষ-বিশেষ পাথর ইত্যাদি ঐ রকমের 'ফেটিশ' বলে গণ্য। ২০. এও বাঙালী মেয়েদেব নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জিনিস। ২১. একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একই বংশের সন্তান নারী-পুরুষের মধ্যে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার বিরুদ্ধে আদিম-নিষেধ

সংস্কার। গোত্র অর্থে 'গো-ত্র'—একই ভূমিতে পশুচারণ করে যারা। আদি গোত্রপুরুষ মুনি হিশেবে কথিত হলেও প্রায়শই দেখা যায় কোনও-না-কোনও পশুর নাম সেটি : ভরদ্বাজ = ঈগল বা বাজপাখি, কাশ্যপ< কশ্যপ = কচ্ছপ, কৌশিক <কুশিক = পেঁচা, ধন্বন্তরী = ধনু + অন্তরী = রাজগোখরো; এও আদিম সংস্কার; পশুই হল বংশের আদিপিতা তাই সে কুলপ্রতীক বা টোটেম : (১৩ দ্রষ্টব্য; এই সব কিছু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরের 'ট্যাবু ও টোটেম' অধ্যায়ে আছে)। ২২. রন্ধনরীতি এবং আহার্যের বৈশিষ্ট্য জাতি, গোষ্ঠী, এলাকা-ইত্যাদিগতভাবে সাংস্কৃতিক নিজস্বতা সূচিত করে; রান্নার ব্যাপারটা মুলত মেয়েদেরই সীমানাভুক্ত বলে ফোড়ন, উপচার প্রভৃতি বংশানুক্রমে এক-একভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ২৩. মালা জপা বহু ধর্মেই প্রচলিত— তাই লোকসংস্কৃতির এই উপকরণটি সর্বজনীন। ২৪. শাশুড়ী-বউয়ের সম্পর্ক বিশ্বজনীনভাবেই ভাল নয়। কিন্তু এই বিশেষ ভঙ্গীর টিপ্পনীকেন্দ্রিত বিদ্রুপ চিরকালই বঙ্গীয় শাশুড়ীকুল করেন, তাই এও লোকসংস্কৃতিরই একটি উপকরণ। ২৫. গার্হস্থ্য তৈজসপত্র লোকজীবনের ব্যবহারিক পরিচয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সূচক। ২৬. শাঁখার ব্যবহার বাঙালী মহিলাদের নিজস্ব; নৃবিজ্ঞানীরা কড়ি ও শাঁখার সঙ্গে আদিমকালীন সমুদ্রতীরবর্তী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কারগত যোগাযোগের কথা বলেছেন। শাঁখ এবং কড়ি মেয়েলি বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপতাসম্পন্ন বলে এয়োস্ত্রী নারীর পতিসোহাগের দ্যোতক হিশেবে গণ্য হতে পারে; বিয়ের কনের হাতে শাঁখাপরানোর মতো, কোমরে কড়ি-পরানোর রেওয়াজের কথাও স্মরণযোগ্য। 'বেড়ে' যাওয়া অর্থে যা উচ্চারণ করা 'ট্যাবু' (পরে আলোচিত) হয়েছে শব্দানুসারী জাদু ক্রিয়াশক্তির ভয়ে ('৫নং' পুনর্দ্রষ্টব্য) ২৭। বিশেষ সময়, দিন, বার, তিথি-ইত্যাদি শুভ-বা-অশুভ বলে গণ্য হয় সমস্ত জাতির মধ্যেই। ২৮. মাদুলি হল দৈব বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু তথা ফেটিশ; আদিম সর্বপ্রাণবাদের পরে আলোচনা করা হয়েছে) ধারণার বিবর্তিত চিন্তাপরিণতি; বাঁ হাতে বাঁধা, মেয়েদের পক্ষে বাঁ দিক শুভ বলে কল্পিত হবার সংস্কারজাত রীতি; কপালে ছোঁয়ানো ঐ মাদুলি তথা, ফেটিশের মাধ্যমে শাঁখা-ভাঙারূপ 'অশুভ' ঘটনার প্রতিষেধক। ২৯. হাঁচি-বিষয়ে এই সংস্কারের তাৎপর্য, (৩নং দ্রষ্টব্য); হাঁচি-নির্গত-আত্মার 'অংশ', অশুভকারী বলে গণ্য হওয়ায়, তার ভয়ে যাত্রা না-করা ট্যাবু। ৩০. পোশাক পরার বিশিষ্ট ভঙ্গী যে-কোনও লোকসংস্কৃতিরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক, খাদপ্রস্তুতি ও বিশেষ কিছু আহার্যের মতনই, (২২ দ্রষ্টব্য)। ৩১. 'ভাঙা মাচণ্ডী' জাতীয় নাম লৌকিক দেবদেবীরই হয়; হয়ত কোনও সময় ঐ দেবীর 'থান' (স্থান) বা মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার থেকে এই নাম; উত্তরবঙ্গে কাটিদুর্গা (যাঁর পেট কাটা) নামে অনুরূপ এক দেবী আছেন; গ্রামদেবী মাত্রেই বাঙালীর সংস্কৃতিতে চণ্ডী বা শক্তিদেবীর রূপান্তর বলে স্বীকৃত এবং গ্রামদেবতারা সচরাচর শিবেরই রকমফের; আদিম মাতৃকা-উপাসনা এবং পিতৃদেবতার পূজার বিবর্তনে এটি ঘটে; স্মরণযোগ্য, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে লৌকিক দেবদেবীরা সর্বদাই শিবশক্তির রূপভেদ নন, রাম, সীতা,

বিষ্ণু, নারায়ণ, লক্ষ্মী, গণেশ, হনুমান-প্রমুখও সেখানে লৌকিক দেবতার রূপান্তরণে আবির্ভূত; হরাপ্পা ঐতিহ্যানুসৃতিতেই সম্ভবত এই শিব ও শক্তির লোকায়তিক পুনরার্বিভাব। ৩২. ছলন হল অপরিশীলিতভাবে তৈরি হাতী, ঘোড়া-ইত্যাদির পোড়া মাটির মূর্তি, যা খেলনা হিশেবেও ব্যবহৃত হয় আবার দেবতার কাছে মানৎ-রূপেও দেওয়া হয়; দেবতার কাছে শিকার করা পশু এবং প্রদত্ত বলির পরবর্তীকালীন প্রতিকল্প। ৩৩. একাদশীর দিনে না-খেয়ে থাকলে 'অনুরূপ-কারণে-অনুরূপ-ফল-ফলতে পারে' এমন একটি অশুভদ্যোতক জাদুর সংস্কার-অনুযায়ী পাছে বৈধব্য ঘটে, সেইজন্য একদানা ভাত দাঁতে কেটে, অনাহার উপবাস ঘটেনি অতএব বৈধব্যও ঘটবে না এমনই একটি জাদুকেন্দ্রিক সংস্কারের অভিব্যক্তি এটি; মাছের আঁশ দাঁতে কাটাও অনুরূপভাবেই বৈধব্যের প্রতিরোধকরূপে গণ্য হয়েছে ('দেবী চৌধুরাণী' স্মরণযোগ্য)। ৩৪. নকৃসী কাঁথা বাংলার লোকশিল্পের বিশেষ ঐতিহ্যবাহী প্রকরণ; 'সাহিত' লৌকিক শব্দ; এর অর্থ-শুভকামনা করে শুভক্ষণে শুরু করা; 'কাঁথা-পাতা' লৌকিক বাক্‌রীতির ক্রিয়া ব্যবহার। ৩৫. সমস্ত ঐতিহ্যানুসারী জাতির মধ্যেই অনুরূপ লৌকিক ধর্মাচার প্রচলিত : ষষ্ঠীপুজো, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, ক্রাইশ্চেনিং, ছুন্নত্, ঋতুদর্শন, ছেদন ইত্যাদি রীতিগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের বয়োপ্রাপ্তির এবং সামাজিক-তথা-ধর্মীয় অধিকার অর্জনের স্বীকৃতিমূলক অনুষ্ঠান, যা ধর্মাচাররূপেই পরিণতি লাভ করেছে; ষষ্ঠীপূজার সঙ্গে জন্মপরবর্তী কিছুদিনের অসহায়তা (ভূতপ্রেত, ডাইনী, অশুভশক্তি ইত্যাদির জন্য) থেকে মুক্তির এবং অন্নপ্রাশনের সঙ্গে কৃষিভিত্তিক সমাজের যৌথ মানসিকতার সম্পর্ক আছে। ৩৬. লৌকিক আহার্য নির্মাণ; এর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক সুনিবিড় (২২নং পুনর্দ্রষ্টব্য)। ৩৭. লোকভঙ্গিমা; সাংকেতিক অঙ্গভঙ্গীর গুরুত্ব লোকসংস্কৃতিতে অপরিসীম; খাদ্য, পরিধেয়ের মতো ভঙ্গিমাও সব জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। ৩৮/৪০. লৌকিক বাক্‌রীতি। ৩৯. এ প্রসঙ্গে ২৫-এর বিশ্লেষণ আবার দ্রষ্টব্য। ৪১. বিপদের স্রষ্টা কোনও অশুভ শক্তির পাল্লায়-পড়ার সংকেতবাহী: 'ফুঁ' দেওয়ার সংস্কার হাইতে তুড়ি বাজানোর অনুরূপ (৩নং দ্রষ্টব্য)। ৪২. অঙ্গসজ্জার অংশীভূত। ৪৩. অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য 'খুঁতো' করে দেওয়া আদিম আচার। ৪৪. ছড়া, গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির অনিবার্য অংশ। ৪৫. প্রচলিত দুটি ঘুম-পাড়ানি-পর্যায়ের ছড়ার অংশ। ৪৬ লৌকিক বাগ্‌রীতি। ৪৭. বাঙালী মহিলাদের সন্তান-পরিচর্যার নিজস্ব রীতি। ৪৮. অন্ধকারে আলো-জ্বালার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সন্ধ্যার মুখে ধর্মাচার-স্বরূপ আলো-জ্বালানোর পিছনে ভূত-প্রেত ইত্যাদিকে দূর করার সংস্কারই সক্রিয়; আদিম-কালে এভাবেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র প্রাণীদেরও তাড়ানো হত; শাঁখ বাজিয়ে বিচিত্র ধরনের শব্দসৃষ্টি করার পিছনেও ঐ একই মনস্তত্ত্ব; 'শয়ন' করানো, 'ফুলজল' দেওয়া (১নং দ্রষ্টব্য) দেবতাদের মানব কল্প বলে মনে করার ফল। ৪৯. যথাক্রমে অঙ্গসজ্জা এবং সধবাবস্থা বজায় রাখার প্রয়াস। ৫০. লোককথা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ৫১. এও লৌকিক বিনোদন-পদ্ধতি। ৫২ বিশেষ ধরনের খাদ্য এক-একটি সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা। ৫৩. ফসলী

মরশুমে (হেমন্তকাল) 'উর্ধ্ব-লোকের বাসিন্দা' পিতৃপুরুষের আত্মাদের জন্যই এই প্রথা, ঐ আলো অনুসরণ করে তাঁরা যেন গৃহের পথ খুঁজে পাবেন, এমনই বিশ্বাস; পূর্ব পুরুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করার এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, 'এমনটি করলে তাঁরা শুভ ফল দান করবেন'— এই বিশ্বাস থেকে; এই পূর্বপুরুষের আত্মা পূজার নামান্তরই হল তর্পণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ৫৪. লোকনাট্য-সঙ্গীত-নৃত্য প্রভৃতির উদাহরণ। ৫৫. লোকবিধি; নারী-প্রাধান্য-অবসানে পুরুষপ্রাধান্য শুরু হয়েছিল সমাজে যখন থেকে, তখনকার ধারাবাহী প্রথা বহু শতাব্দী পেরিয়ে এই সব বিধানে পরিণতি পেয়েছে। ৫৬. এগুলি শুধু লোকসাহিত্যেরই অঙ্গ নয়, সমাজ-মানসেরও নির্দেশক বটে। ৫৭. লৌকিক খাদ্য (১২, ৩৬ ও ৫২ দ্রষ্টব্য)। ৫৮. লৌকিক শব্দ প্রয়োগ। ৫৯. সংস্কার আছে যে-অপকারী অলৌকিক শক্তি এসে গভীর রাতে চেনা লোকের গলার স্বর নকল করে ডাকে এবং সেই ডাকে সাড়া দিলেই উত্তরদাতার আত্মাকে অধিকার করে সেই অপশক্তি; দু-বারের বেশি এরকম বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা নাকি থাকে না ঐসব অশুভ শক্তির —'তিন' সংখ্যার বিচিত্র জাদুশক্তি সম্বন্ধে এই ধারণা প্রায় বিশ্বজনীন; ঐ অপশক্তির ডাককে 'নিশির ডাক' বলে। ৬০. লৌকিক শব্দ প্রয়োগ ও বাক্‌রীতির নিদর্শন।

।। ৫।।

ওপরের ষাটটি (প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি, কেননা অনেক সময়েই একটির মধ্যেই লোকসংস্কৃতির একাধিক দিক সমাহৃত হয়েছে) প্রকরণ বিশ্লেষণ করলে তাদেরকে এভাবে বর্গীকৃত করা যায় :

ক. জাদু ও অলৌকিকতার সংস্কার-সঞ্জাত বিশ্বাস এবং আচার; খ. আত্মা, প্রেত, অপশক্তি, বিভিন্ন ধরনের দেবতা ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কার এবং এই সম্পর্কিত শুভসংঘটক ও অশুভরোধক বিশ্বাস-আচার-অভ্যাস; গ. বিভিন্ন বস্তুর ভালমন্দ ঘটানোর ক্ষমতা সম্বন্ধে সংস্কার; ঘ. বার, তিথি, সময়-ইত্যাদি-বিষয়ে সংস্কার; ঙ. যৌন-এবং-নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক নিষেধবিধি; চ. শব্দ, উচ্চারণ ও বাক্‌রীতি; ছ. বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা; জ. জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি-সম্পর্কিত সংস্কার; ঝ. রন্ধনরীতি, খাদ্যবৈশিষ্ট্য, পোশাকেব পরিধানরীতি ইত্যাদি; ঞ. বৃক্ষ, প্রাণী ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস; ট. দেবার্চনার পদ্ধতি; ঠ. বিশেষ ধরনের ভঙ্গিমা; ড. হাঁচি, হাই, ফুঁ, ঋতুরজঃ ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়ার বিষয়ে সংস্কার; ঢ. কাঁথা, পুতুল-ইত্যাদি শিল্পরীতি; ণ. ছড়া, কাহিনী, প্রবাদ-প্রবচন; ত. গান, নাচ, নাটক ইত্যাদি শিল্পরীতি; থ. বয়স-এগোনোর সঙ্গে সম্পৃক্ত আচার; দ. অঙ্গসজ্জা; ধ সংখ্যা সম্বন্ধে সংস্কার; ন. স্বামী, সন্তান-প্রমুখের পরিচর্যার পদ্ধতি ইত্যাদি।

লোকসংস্কৃতি কেবল এটুকুর মধ্যেই সীমায়ত নয়! আসলে যে 'ফোকলোর' শব্দের সমতুল্য করে বাঙলাভাষায় এই 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি তৈরি করা হয়েছে, তার ব্যাপ্তি বিশাল। অবশ্য 'সংস্কৃতি' শব্দেরও সীমানা যে সুদূরবিস্তৃত সেও তো আগেই বলা হয়েছে। সাধাবণভাবে যা মনে করা হয়—সংস্কৃতি মানেই হল নাচ,

গান, অভিনয়, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি— প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটির তাৎপর্য তার থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্ত।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, সংস্কৃতির দুটি দিক . ব্যবহারিক বস্তুসম্পদ এবং তার থেকে বিবর্তিত ভাবসম্পদ। বস্তুসম্পদের ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে ভাবসম্পদ। এই দুটি দিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন, ওপরে বিন্যস্ত দ্বিতীয় তালিকাটিকে যদি আলোচনার জন্য আবার হাজির করি, তাহলে সংস্কৃতির ঐ দুই প্রকরণেরই কিছু-কিছু আচরণবিধি ও পরিচর্যা পদ্ধতি ইত্যাদিকে সরাসরিই বস্তুসম্পদের বিষয় বলে নির্দিষ্ট করা চলে। অন্যপক্ষে, ভাবসম্পদের উপজীব্য হল : শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, নাটক ইত্যাদি। সংস্কার, বিশ্বাস, অলৌকিকতার প্রত্যয়-প্রভৃতি বিষয়কে সংস্কৃতির দুই প্রকরণের মধ্যে সাধারণ (বা 'কমন্') উপকরণ হিশেবেই ধরতে হয়। 'শুভেলাভে' থাকার আকাঙক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য আদিম কাল থেকেই আমাদের মধ্যে ঐগুলি সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে একদিকে বস্তু-সম্পদের, অন্যদিকে ভাবসম্পদের সমস্ত প্রকরণগুলি।

ঠিক এইখান থেকেই সংস্কৃতির মূল তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে 'সংস্কার' শব্দের রূপ-বিবর্তনে 'সংস্কৃতি' শব্দ গড়ে উঠেছে, তার মৌল অর্থ হল দুটি : যা মন ও উপলব্ধিকে সংস্কার বা পরিমার্জনা করে এবং যা ঐতিহ্যগতভাবে এক-একটা ভাবনা ও অভ্যাসকে বিবর্তিত করে। সুতরাং জীবনের সর্ব-পর্যায়েই তার অভিক্ষেপ দেখা যায়, যেতে বাধ্য। সংস্কারকে ঐতিহ্য বা 'ট্র্যাডিশ্যন' অর্থেই ধরি, কিংবা পরিশীলন, পরিমার্জন অর্থেই ধরি, এ-সূত্রের ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং যে-সমস্ত উদাহরণ গোড়াতেই ভট্টচাযবাড়ির একটি দিনের জীবনচর্যার বিবরণী দেবার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে ঐ ঐতিহ্যানুসরণ এবং ভাব-পরিশীলন, দুটিই অবলীন হয়ে রয়েছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। যে-নমুনাগুলি এখানে বিন্যস্ত হয়েছে এবং আরও অজস্র যা উল্লেখিত হয়নি, তাদের সবগুলিকে তালিকাবন্দী করতে চাইলেও পারা যাবে না, কারণ মূল কথা যা, সেই 'শুভেলাভে' থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং আকাঙক্ষা সমাজ-বিবর্তনের গাণিতিক ছকটি সারা পৃথিবীতেই এক বলে —(সংস্কার যেহেতু একটি 'ট্র্যাডিশ্যনাল বিলীফ') তার থেকে গড়ে ওঠা বহু অভ্যাসও তাই-ই নিঃসন্দেহে, কিন্তু আরও অনেক বেশি ক্ষেত্রেই বাহিরঙ্গিক প্রকাশগুলি ভিন্ন। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, এই পার্থক্য স্বাভাবিক— প্রাকৃতিক, পারিবেশিক-অর্থনীতিক ('ইকোলজিক্যাল') ইত্যাদি কারণেই, এমন কী একই জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ঐ বাহিরঙ্গিক প্রকরণগুলি সর্বদা একই রকমের যে হবে তার নিশ্চয়তা নেই; হামেশাই তা হয় না। জেলায় জেলায়, গ্রামে-গ্রামে এমন কী পরিবারে-পরিবারে পর্যন্ত ঐ ধরনের প্রকরণ পৃথক হতে দেখা গেছে।

এই সমস্ত কিছু তৈরি হতে-হতে এসেছে স্মরণাতীতকাল থেকে, এক অনবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে আদিম মানুষ ধীরে-ধীরে নানা ধরনের

বিশ্বাস ও কর্মে অভ্যস্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্থানের মাধ্যমের রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গেই সেগুলির বাইরের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন আর্থনীতিক ভিত্তিতে নতুন সংস্কার ও অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরোনো অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের যতটা রূপান্তরিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আচার-সংস্কারও কিছুটা মার্জিত হয়েছে , কিছুটা বর্জিতও। এদের সবকিছুর ওপর এসে পড়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজ-অর্থনীতির নিজস্ব সব অভিক্ষেপ। তাদেরই রূপায়ণ দেখি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র আঙ্গিকে। মৌখিকভাবে এদের বৃহদংশ সংরক্ষিত, কিছুটা মৌখিক কিছুটা ব্যবহারিক ভাবে, এবং তাদের বিকাশের অন্তর্কাঠামোর (ইনফ্রাস্ট্রাকচার) ওপর তৈরি হয়েছে ধ্রুপদী এবং অতিপরিশীলিত (যথাক্রমে 'ক্লাসিক্যাল' এবং 'সফিস্টকেটেড') সংস্কৃতির বহির্কাঠামো (সুপারস্ট্রাকচার)। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের লব্ধফল হিশেবে জীবনচর্যার যে-দ্বান্দ্বিক বিকাশ অনিবার্য, তারই সঙ্গে মানানসই হয়ে লোকায়ত সংস্কৃতি এবং ওপর তলার সংস্কৃতি একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সূত্রে আবদ্ধ। লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমির ওপরই গড়ে ওঠে পরিশীলিত বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির সৌধ। আবার উত্তরপর্বে ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রভাবও কিছুটা নতুন উপাদানসহ প্রত্যাবৃত্ত হয় লোকসংস্কৃতির জমিনে। এই দেওয়া-নেওয়ার অবিরাম চলমানতা নির্দিষ্ট হয় জীবনচর্যার ব্যবহারিক প্রয়োজনে; যার নাম দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সূত্র। লোকপুরাণ, লোককথা, কিংবদন্তী, গান, গীতিকা, চারু-ও-কারুশিল্প, নৃত্য, নাট্য, ক্রীড়া, ভঙ্গিমা ইত্যাদি যেমন একদিকে, অন্যদিকে সংস্কার, বিশ্বাস, আচার, নিয়ম, প্রথা, বিধি, নিষেধ, ধর্ম, দেবতা, খাদ্য, পোশাক, উৎসব-ইত্যাদি বিষয় সভ্যতার আদিকাল থেকে ঐ সূত্র ধরেই বিবর্তিত হয়ে আসছে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে; আর তা আসছে ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই। কালচারাল কনটিন্যুয়ামের যে-কথা কিছু আগে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল, সেটারই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যান মেলে এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়েব সূত্রের অনুষঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসংস্কৃতির উপকরণ

ক. মান্যা এবং অলৌকিকের কল্পনা ও বিবর্তন

এর আগে লোকসংস্কৃতির সমগ্র এলাকাটিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে, যত ধরনের বিষয় এবং উপকরণের কথা বলা হয়েছে, মোটামুটিভাবে তাদের অধিকাংশকেই বিশেষ একটি ধারণাক্রমের সূত্রে স্বচ্ছন্দেই বাঁধা যায়। আদিম কাল থেকে এ-অবধি সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন যে-ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে মানস-সম্পদ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই—তার মধ্যে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে গতিশীল হয়ে আছে নিজেদের পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কে অজস্র জিজ্ঞাসার অসংখ্য কল্পিত সমাধান। বহু সময়েই সেই সমস্ত কল্পনার অন্তর্কাঠামোয় ক্রিয়াশীল থাকে নানান্ সব অলৌকিক প্রতীতি। বস্তু-জগতের প্রত্যক্ষ-প্রেক্ষিতে জন্ম -নেওয়া ওই সমস্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে-ধারণাগুলি মানুষের সমাজে প্রায় সর্বজনীনই হয়ে উঠেছিল বলা চলে— সমাজবিজ্ঞানীরা তাদেরকে মূলত চারটি বর্গে বিন্যস্ত করেন : মান্যা, ম্যাজিক, টোটেম এবং ট্যাবু ; অলক্ষ্য-সত্ত্বা, জাদু, কুলপ্রতীক এবং নিষেধ-সংস্কার। এগুলি আবার একে অন্যের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই সংশ্লেষের ভিত্তিভূমি অবশ্যই মানুষের সমাজ। বরং, আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, সমাজবদ্ধ মানুষের মানস-প্রতীতি। এবং তারই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে দেবতা, ধর্ম ইত্যাদির ভাবনা।

এই ধারণাগুলির মধ্যে 'মান্যা'-র প্রসঙ্গই সবার আগে আলোচ্য। 'মান্যা' শব্দটি নৃবিজ্ঞানের সূত্রে এখন বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মেলানেশীয় শব্দ; দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বৈপায়ন আদিবাসী জাতিগুলির মধ্যে এই শব্দটি প্রচলিত। তবে 'মান্যা' বলতে যা বোঝায়, সেই ধারণাটি সর্বজনীনভাবে সমস্ত পৃথিবীতেই বিদ্যমান। এমন কী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই সমুন্নত আমলেও যে মানুষ এই সংস্কারের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গ্রস্ত নেই, সে কথা বলা চলে না।

আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, আলো, হাওয়া, গাছ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড়, বন, মাঠ প্রভৃতি যাবতীয় নিসর্গবস্তু এবং নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে একটা-না-একটা অলক্ষ্য শক্তি, যা মাঝে-মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠে তার অস্তিত্বের জানান দেয়: মান্যা সংস্কারের প্রাথমিক কথা হল এটাই। সেই অলক্ষ্য শক্তি নিরাকার, অনির্দেশ্য—কিন্তু ভাবা হয় যে, সে ভাল বা মন্দ অনেক কিছুই সংঘটনের ক্ষমতা রাখে। ঝড় ওঠে, বৃষ্টি ঝরে, ভূমিকম্প হয়, বন্যা আসে, বরফ পড়ে, অরণ্যের মধ্যে

পথ হারিয়ে যায়, নদীর স্রোতে মানুষ ডুবে মরে, দাবানল জ্বলে ওঠে এবং আরও অজস্র নৈসর্গিক ঘটনা যে ঘটে, তার প্রত্যেকটির পিছনেই রয়েছে সেই অলৌকিক শক্তিগুলির 'মর্জি', এমনই একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল আদিম প্রপিতামহদের মনে, স্মরণাতীত কাল আগেই।

এই ব্যাপারটিকেই ই.বি টাইলর অভিহিত করেছেন 'অ্যানিমিজ্‌ম' তথা সর্বপ্রাণবাদ হিশেবে। জড়বস্তু এবং নৈসর্গিক ব্যাপারগুলির অন্তরালে এই সব অলক্ষ্যশক্তিগুলির কল্পনাকে পরবর্তীকালে আর আর. ম্যারেট নাম দিয়েছেন 'অ্যানিমেটিজম' ওরফে জড়সত্তাবাদ। তাঁর বিচারে এটা হল সর্বপ্রাণবাদের আদিস্তর। তার পরবর্তী স্তরে মানুষ কল্পনা করেছে তার নিজের (এবং অন্যান্য প্রাণীদেরও) আরও একটি করে সত্তার কথা। এরই সূত্রে ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তার পরিণামে, পূর্বপুরুষের (তথা, প্রেতের) পূজা। আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে যে-ধারণা বিশ্বের বেশ কয়েকটি সুসংগঠিত ধর্ম মতের মধ্যেই দেখা যায়, তারও উৎস এখানেই রয়েছে। স্পষ্টতই, প্রকৃতির উপাসনা, দেবতার কল্পনা, জাদুশক্তিতে আস্থা, প্রেতের অস্তিত্বে প্রত্যয় ইত্যাদি বহুবিধ অলৌকিক চিন্তারই মুখপাত হয়েছে ঐ মান্যার ধারণা গড়ে ওঠবার অনুষঙ্গে। সুতরাং, জাদু এবং ধর্ম এই দুটি সংস্কারেরই আদি রূপ মান্যার মধ্যে নিহিত, এমন কথাই মানতে হয়। অর্থাৎ, মান্যা হল ঐ দুটি সুপ্রবল বিশ্বজনীন সংস্কারের প্রাথমিক উৎস।

সম্ভবত কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মান্যা-কেন্দ্রিত অ্যানিমেটিজ্‌ম/অ্যানিমিজ্‌মের মোটামুটি তিনটি প্রকরণ :

১. জড়বস্তু এবং নিসর্গ ব্যাপারগুলির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সব শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস।

২. মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় একটি / একাধিক সত্তা কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।

৩. অনির্দেশ্য-কিছুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস।

এই ত্রিবিধ-প্রত্যয়ের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে সর্বপ্রাণবাদ। জড়বস্তু এবং নিসর্গ-ব্যাপারগুলির অন্তর্বাসী শক্তিগুলির বিষয়ে আদিম মানুষের ধারণার স্বরূপকে অনুধাবন করতে পারলে এর প্রারম্ভিক পর্যায়টিকে চেনা যায় : জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় যখন, তখন বুঝতে হবে ঐ আগুনের ভিতরের 'মান্যা' 'কামড়ে' দিল; ঝড়ের দাপটে বিরাট গাছটা এক সময়ে মড়্‌মড়্‌ করে ভেঙে পড়ার মানে হচ্ছে, ঝড়টার 'মান্যা' ঐ গাছটার 'মান্যার চেয়ে বেশি জোরালো, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে —এর কারণ আর কিছুই না, কোনও একটা অজানা 'মান্যা' এসে আক্রমণ করেছে; কিন্তু একটা কিছু চিবিয়ে গিলে ফেললে পেটের ভিতরে (খিদের) কষ্ট দেয় যে 'মান্যা', সেটা শান্ত হয়; নদীর জলে নাইতে গিয়ে একজন যে স্রোতের জলে ভেসে হারিয়ে গেল, তার পিছনে ঐ জলের 'মান্যা'-রই নষ্টামি রয়েছে; এই জঙ্গলে এসে যে এত-এত সব শিকার করার মতো জীবজন্তু মিলল, এর পিছনে

আছে এইখানকার 'মান্যা'-র কৃপা; আগের দিন হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে এসে দলের একজনকে একেবারে থেঁৎলে মেরে ফেলল, সে তো ঐ পাহাড়ের 'মান্যা' কোনও কারণে ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল বলেই না!

অর্থাৎ প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনার প্রকৃত কারণটা কী, তাই বুঝতে চেষ্টা করার সূত্রেই 'মান্যা'-'ওরেণ্ডা'-'ওয়াকান্দা'-'মানিটু' 'বারাকা'-ইত্যাদি অলক্ষ্য সমস্ত নির্দেশ্য-অনির্দেশ্য সত্তাময়-শক্তির কথা কল্পনা করেছে মানুষ। প্রকৃতির বিচিত্র সব রহস্যগুলির উদঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর সৃষ্টি : এরই বিবর্তনে মিথেরও উদ্ভব। সে-কথা যথাস্থানে আলোচ্য। সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক আমলে এ ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

সর্বপ্রাণবাদের অন্যতর দিকটির প্রসঙ্গে এবারে বলি · মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে নিজেই দেখছে যে, সে এটা-ওটা করছে, এখানে-ওখানে যাচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে আসলে 'সে' একজন নয়, দুজন; কারণ, একজন 'সে' তো দ্বিতীয় 'সে'- কে প্রত্যক্ষ করছে। এই অনুষঙ্গেই মৃত মানুষের এবং পশুপাখির সত্তার বিষয়েও একটা কল্পনাসঞ্জাত বোধের উদ্ভব হয়েছে। যে মানুষটা — ধরা যাক, ডুবে গেছে হ্রদের জলে কিংবা মরে গেছে সাপের কামড়ে, তাকে আবার কী করে স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায়, যেখানে যে চলছে-ফিরছে কথা বলছে কাজ করছে? তবে তো তার আরও একটা অস্তিত্ব আছে!.... ঠিক এইভাবেই মরে-যাওয়া পোষা কুকুরটা কিংবা শিকার করে- আনা এবং ঝলসে খেয়ে-ফেলা জন্তুটাও যখন স্বপ্নের মধ্যে ফের দেখা দিল, তাহলে তো তখন মেনে নিতেই হবে যে, তারও একটা আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে।

জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা এবং মৃতেরও আত্মা থাকার বিশ্বাস— এই দুইয়ে মিলে আদিম মানুষের মনকে ধীরে-ধীরে দেবতা, জাদু, ধর্মধারণা প্রভৃতির দিকে ঠেলে দিতে লাগল। এই সূত্রে প্রাথমিকভাবের একটা অধ্যাত্মবোধও সম্ভবত সূচিত হয়ে ছিল। বস্তুর নিহিত অন্তর্লীন শক্তিকে আয়ত্তে আনার সম্ভাব্য প্রয়াস থেকেই উৎপন্ন হল জাদুবিশ্বাস এবং তারই সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিভিন্ন 'মান্যা'-রা বিবর্তিত হল ধীরে-ধীরে : সেই বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণাম, দেবতার কল্পনা। দেবতাদের সম্ভাব্য সেই বিবর্তনের চূড়ান্ত তুষ্টি-এবং-রুষ্টির যথাক্রমে সাধন-ও-প্রতিরোধ করার প্রয়াসই সমন্বিত হয়ে পরিণতি পেয়েছে ধর্মাচার এবং ধর্মসংস্কারে। এই সমস্ত কিছু সংশ্লেষণের ফলশ্রুতিই হল 'ধর্মধারা', ওরফে 'কাল্ট'; এক একটি -বস্তু / বিষয়ের দেবতাকে অবলম্বন করে যা গড়ে উঠেছে সর্বত্র। প্রেতের কল্পনা সৃষ্টি করেছে পূর্বপুরুষের পূজা এবং নানা বিচিত্র কারণে পশু-পাখি-সরীসৃপ-ফল-শস্য প্রভৃতি হরেক প্রাণী / বস্তু থেকেই এক-একটি কোম-এর উদ্ভব হবার মতো বিচিত্র ধারণাও তখন গড়ে উঠেছে। (এই ব্যাপারটা 'টোটেম'-সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তৃতভাবে পরে বিচার করা হয়েছে।)

ধর্মাচার-ও-ধর্মসংস্কারের অনুসূত্রে "এই - এই করতে বাধা নেই" এবং "এই -

এই করতে বাধা আছে''—এমন সব ভাবনাও তৈরি হয়েছে নানান্ সব সামাজিক ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমস্ত 'বাধা-থাকা' বিষয় / কাজই 'ট্যাবু', যা বহুসময়েই আবার 'টোটেম' বা কুলকেতুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রহস্যময় সম্বন্ধের যে-ধারণা বিদ্যমান, তার অনুষঙ্গবাহী।

আসলে মান্যা - জাদু - দেবতা - প্রেত - টোটেম - ট্যাবু ইত্যাদি, এত বিভিন্ন টানাপোড়েনের বুননে একে-অন্যের সঙ্গে এমনভাবেই সম্পর্কিত যে, সব কিছু মিলিয়েই মানুষের চৈতন্যের নানান্ মাত্রায় তারা বিবিধ চেহারায় সজ্জিত হয়ে থাকে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধারণা কিংবা বোধ সক্রিয় থাকলেও মূলত এই সবকটি ব্যাপারই যে গোষ্ঠীমনের উপলব্ধি সেটাও কিন্তু বুঝতে হবে।

সম্ভবত বিষয়টা আরও একটু তলিয়ে বিচার করা উচিত। মান্যা-ভাবনার থেকে মোটামুটি সমান্তরাল ভাবেই উৎসারিত হয়েছে জাদু এবং দেবতার ধারণা। কিন্তু প্রকৃতির ওপরে জাদুর কল্পিত-শক্তির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যখন তা যায়, তার অবশ্যই কিছু-না-কিছু কার্যকারণ থাকে), এটা যখন থেকে মানুষ বুঝতে শিখল, তখন থেকেই দেবতার বিষয়ে এমনএকটা ভাবনারও সৃষ্টি হল তার মনে যে দেবতা তার ভাল-মন্দ বিহিত করতে পারবেন। যে-মান্যাকে ''সংযোগসাধ্য মৌলশক্তি'' (আর. আর. ম্যারেট), কিংবা ''সামাজিক জীবনের আদি অধিশাস্তা'' (এমিল দুর্খহেইম) বলে ধার্য করা হয়, তারপক্ষে দেবতায় বিবর্তিত হয়ে গাছপালা-প্রাণী-নদী-অরণ্য পর্বতের রূপে প্রতিভাত হওয়াটা কী এমন অস্বাভাবিক।
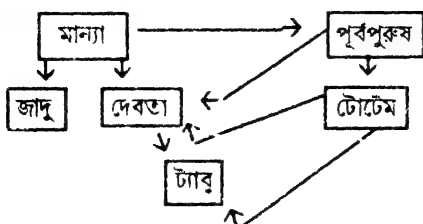
এই কথারই সূত্রে প্রাসঙ্গিক এই রেখাচিত্রটি অনুধাবন করলে মান্যা, দেবতা, পূর্বপুরুষ, জাদু, টোটেম, ট্যাবু-ইত্যাদির পারস্পরিক সমীকরণ সম্বন্ধে টাইলরের তত্ত্বের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটির তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করা যায় স্বচ্ছন্দেই : ধর্ম হল প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন যে-সমস্ত বিদেহী শক্তির (বা সত্তার) দ্বারা সে অধিকৃত, আকীর্ণ এবং পরিচালিত বলে নিজেকে মনে করে, তার নিজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস; বরং বলা ভাল, প্রতীতি।

এই 'প্রতীতি'-র উৎস কী?....আদিম প্রপিতামহরা যখন শুধু বাঁচবার তাগিদেই বিশ্বপ্রকৃতির অপরিচিত গহন-প্রত্যন্তগুলিতে হঠাৎ-তঠাৎ গিয়ে পড়তেন (খাবার

খুঁজতে কিংবা আর কোনও ব্যবহারিক উপকরণ সংগ্রহের তাড়নায়, তখন বারবারই তাঁরা অনির্দেশ্য বিশালতা, অপরিচিত পরিবেষ্টনী এবং সুগম্ভীর নৈঃশব্দ্যের মুখোমুখি হতেন অনিবার্যভাবে। যখনই কোনও গহন বনের আলো-আঁধারিতে দুর্জ্ঞেয় এবং অপার এক ভয়ালতা তাঁদের ঘিরে ধরত, অথবা দুর্গম পাহাড়ের অন্ধকার অপরিচিত গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা অব্যক্ত এক আতঙ্কে অস্বস্তি বোধ করতেন, কিংবা নির্জন কোনও হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে তার গাঢ় কালো জলটা দেখে থমকে দাঁড়াতেন অনির্বাচ্য একটা মূক অসহায়তায়—ঠিক সেই সমস্ত মুহূর্তগুলিতে তাঁদের সীমায়ত প্রজ্ঞার বাইরেও যে 'একটা কিছু' আছে, এমনই কল্পনা করতেন তাঁরা। অতিলৌকিক বলতে এখন যা বোঝায়, তাঁদের কল্পনায় সেটাই দেখা দিত আর এই জন্যই হয়ত টাইলর তাঁদেরকে "স্যাভেজ ফিলজফার" আখ্যা দিয়েছিলেন। ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, মৃত্যু. ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, হিংস্র আরণ্যকপ্রাণী— এইসব থেকে যে 'বস্তু'-নিষ্ঠ ভয়, তার সঙ্গে ঐ দুর্জ্ঞেয় (অথবা, অজ্ঞেয়) সব ভীতির মূলগত পার্থক্য যে একটা আছেই, সেটাও তাঁরা অনুভব করতে পারতেন অবশ্যই। সেই ভয়ের উৎসে যা আছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন না-করতে পারলেও, তাঁদের চেতনায় তার অভিঘাত সুগভীর হয়ে থাকত — সমস্ত ভয়টুকু কল্পনা-সঞ্জাত হলেও।

স্পষ্টতই, প্রকৃতির সুবিশাল রহস্যময়তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অমিত অসহায়ত্বটুকু উপলব্ধি করারই পরিণতি ছিল সেই অনির্দেশ্য ভয়। সেই ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারত না বলে অজ্ঞেয় কোনও কিছু একটার কল্পনা করত সে—তার ধারণায় যে ছিল ('অলক্ষিত' হলেও) মহাশক্তিধর। সেই কল্পিত শক্তি যে 'কে' (অথবা, 'কারা'), তা সে বুঝত না· কিন্তু যেহেতু সেটির কারণে' সে ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে, অর্থাৎ সেই 'কারণ'-টা ব্যাখ্যাতীত; তাই সে ঐ 'শক্তি'-কে তার নিজের (বা নিজেদের) থেকে পৃথক কিছু একটা বলেই ভাবত। সেই-পৃথকত্ব কিন্তু তার পরিচিত অন্যান্য সব ভয়ের উপলক্ষ যা-যা, তাদের সঙ্গেও আবার এক রকমের নয়। সাপ, বাঘ, আগুন, বাজ, ভূমিকম্প, খিদে, অসুখ, শীত ইত্যাদির সঙ্গে 'ভয়' জড়িয়ে থাকলেও, সে-সব ছিল তার পরিচিত এবং সাধ্যমতো তাদের এড়িয়ে যেতে কিংবা ঠেকিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু এই 'ভয়' যেহেতু অনির্দেশ্য, তাই এর হাত থেকে তার কোনও রেহাই মিলত না। ফলত, এই 'ভয়' তার মনে অমোঘ এবং অনিরোধ্য হয়ে উঠেছিল আর ঠিক এইখানেই অন্যান্য সমস্ত ভয়ের সঙ্গে এর ফারাক। এ ভয় বিপুল, সর্বগ্রাসী, অনিবারণীয় এবং ব্যাপক। আদিম মানুষের মগ্নচৈতন্যের অতলে এর শিকড় বহু সহস্র বছর ধরে গেঁথে বসেছে। মগ্নচেতনার সেই অনির্দেশ্য ভয়ের উত্তরাধিকার পরবর্তী বহু সহস্র বছর ধরে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছে, এমন কী আজও। অবশ্য প্রকৃতির ওপরে এই সময়কালে মানুষের আধিপত্যের যতই বিস্তার ঘটেছে, ততই অবশ্য আবার ঐ ভয়াল অলৌকিকতা (কোনও-কোনও সংস্কৃতিবিজ্ঞানী, যাকে ' প্রি-মিথিক অ্যা' বা প্রাক্‌পৌরাণিক বিভীষা বলতে চান) বিপরীত অনুপাতে কমেছে। যদি গাণিতিক সঙ্কেতে এই ব্যাপারটা বুঝতে চাই তাহলে

প্রকৃতির অন্তর্লীন অমোঘ ভয়ালতাকে 'অ' এবং প্রকৃতির ওপরে মানুষের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে 'আ' ধরে নিলে :

$$\text{'আ'} \propto \frac{1}{\text{'অ'}}$$

একটি এমনই সূত্রকে অন্বিত করা যায় হয়ত বা।... কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঐ অলৌকিক শক্তির প্রতীতি মানুষের মন থেকে একেবারে নির্মঞ্জিত হয়ে যায় না কখনও। আর সেই জন্যেই জাদু-দেবতা-ধর্ম-ইত্যাদি যেমন, ঠিক তেমনই আবার মান্যা-টোটেম-ট্যাবু-ইত্যাদিও বা-বেশি পরিমাণে 'সুসভ্য' মানুষের মনেও টিঁকে থাকে। লোকসংস্কার তাই নানাভাবেই আজও মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অনির্দেশ্য ভয়ের উৎস হিশেবে আদিম মানুষ যা কল্পনা করেছিল, সেটার সঙ্গে মান্যার কোনও সমধর্মিতা আছে কি-না? এরই অনুসূত্রে আর একটা কথাও বিচার্য ঐ অনির্দেশ্য শক্তি এক, না অজস্র?... দুটি জিজ্ঞাসারই উত্তর পরস্পর-সম্পর্কিত। নৈসর্গিক ঘটনাবলীর পিছনে তাদের সংঘটক 'মান্যা', অসংখ্য, অজস্র। এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের অধিষ্ঠাতৃ মান্যাও সুপ্রচুর। কিন্তু সামাজিক পরিকাঠামোয় সেই অতি-আদিম যুগের সমাজে যেহেতু কোনও একক ব্যক্তির আধিপত্য সঞ্জাত হবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই অনির্দেশ্য ভয়গুলিরও উৎসে একটিই মাত্র 'মহাশক্তি'-র অস্তিত্ব কল্পনা করাটাও ছিল অসম্ভাব্য। মানুষ ঠিক ততটাই কল্পনা করতে পারে, যতটা তার অভিজ্ঞতার ফ্রেমে ধরানো যায়। সুতরাং, নির্দেশ্য-উৎসজ মান্যাদের মতোই অনির্দেশ্য-উৎসজাত মান্যার সংখ্যাও স্বভাবতই অঢেল। আর এই দ্বিবিধ অতিলৌকিক শক্তির কল্পনাই জন্ম দিয়েছে বহুদেবতার ধারণাকে (পলিথীইজ্‌ম)।

এই বহুদৈবিক ধারণার সঙ্গে এসে মিলেছে সর্বপ্রাণবাদের অন্যতর ধারাটি, যেখানে আদিম মানুষ নিজেদের দ্বৈত সত্তার কথা ভেবেছে। দ্বিতীয় যে, সত্তা আছে (মৃত্যুর পরে যা প্রেত সত্তায় পরিণত হয়) পূর্বপুরুষের উদ্দেশে উপচার নিবেদন করে তার তুষ্টিসাধন করা এবং ক্রমে-ক্রমে সেই সূত্রে পূর্বপুরুষের সঙ্গে পশু-পাখি-শস্য-গুল্মকে সমীকৃত বলে ভাবা (টোটেমবাদ)- ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আবির্ভূত হয়েছে। খাদ্য, নিরাপত্তা, ভয়বিমুক্তি - ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনই যে ছিল এর পিছনে, সেকথা বলা বাহুল্য। মান্যাদের (নির্দেশ্য বা অনির্দেশ্য যাই হোক-না কেন) তুষ্ট রেখে প্রাকৃতিক কারণে বিপন্নতার হাত থেকে বাঁচার প্রয়াস কিংবা তাদের অনুগ্রহে খাদ্যলাভ, রোগমুক্তি, ভয়মুক্তি, যৌনতৃপ্তি, সন্তানপ্রাপ্তি-ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সম্ভব করার আকাঙ্ক্ষার থেকেই সৃষ্টি হয় পূজা-পার্বণ আচার-বিধি প্রভৃতি। মান্যা বিবর্তিত হয় দেবতায়। প্রথমে নৈসর্গিক প্রত্যক্ষ কিছুর রূপেই (যেমন—আগুন, বাতাস, জল) তারপর একটু-একটু করে পশু, পশু ও মানুষের মিশ্ররূপ এবং অবশেষে মানবীয় অবয়বে তাদেরকে ভাবা হতে লাগল। এক-একটি দেবতা/ দেবতা গোষ্ঠীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে লাগল ধর্মধারা (কাল্‌ট) এবং অলৌকিকের ধারণার একাংশের সঙ্গে ধর্ম-দেবতা মিশে গেল। আর অন্য একটি

অংশের সঙ্গে কোনও ধর্মসম্পর্ক রইল না : সেটাই হল জাদু, ওরফে ম্যাজিক। তবে ধর্মাচার এবং জাদুবিদ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বহুসময়েই নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। দেবতা -কল্পনার সূত্রে গড়ে উঠেছে স্বর্গ বা দেবলোকেব ধারণা; প্রেতসত্তার চিন্তা সৃষ্টি করেছে পরলোকের ভাবনা, ধর্মসংস্কার-নিবদ্ধ নিষেধবিধি মানা না-মানার পরিণতি পাপ পুণ্যের সংজ্ঞানির্ণয়ের প্রয়াস; আর এই সমস্ত কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি সামাজিকভাবে চিন্তাগত জটিলতার ক্রমোন্মেষ। জাদুর সূত্রে 'শামান্ইজম' (ওঝাতন্ত্র), টোটেমের সূত্রে 'ক্ল্যান' (গোত্র' বলা যেতে পারে) ও বহির্বিবাহ এবং ট্যাবুর সূত্রে কৃত্য-অকৃত্যের ক্রমবর্ধন মানুষের সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে ফেলল। এই পরিবর্তন সুদীর্ঘকাল ধরে ঘটেছে; সমস্ত সমাজেই এটা অবশ্য একসঙ্গে ঘটেনি এবং সেই অ-সম বিবর্তনের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ ছিল আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন। শামান বা ওঝার আয়ত্তগত জাদুবিদ্যা তাকে অন্যদের চেয়ে সুবিধাভোগী করেছে। টোটেম-ট্যাবু-ঘটিত বহির্বিবাহ (এক্সোগ্যামী) কৌমসমাজকে ক্রমবর্ধিত করে 'জাতি' হবার পথে নিয়ে গেছে। কৃত্যাকৃত্যের ধারণাগত পাপ-পুণ্য ইত্যাদির বোধ ধর্মীয় সংহিতার (রিলিজিয়াস কোড) পত্তন করেছে তারই পাশাপাশি। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেয়-অশ্রেয়ের সঙ্গে ধর্মীয় অনুভাবনারও সংমিশ্রণ ঘটেছে। ধর্ম এবং তার 'ধারক'-রাই ফলত প্রবল হতে শুরু করেছে সর্বত্র।

এরই অনিবার্য লব্ধফল : পুরোহিত-প্রধান সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। সেই সমাজের ধর্মপ্রাধান্য আর সব কিছুর মতো তার সংস্কৃতিকেও আচ্ছন্ন করেছে। ঠিক এমন ব্যাপারটা মান্যা-কল্পনার আমলে কিন্তু হয়নি। ধর্মীয় অনুশাসনের সংহিতাবদ্ধ নাগপাশ মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বকে সেই সময়ে বেঁধে ফেলেনি : সেই কালের সংস্কৃতির মুখ্য রূপকার ছিল বিভিন্ন প্রকরণের ব্যবহাবিক প্রয়োজন। তাদের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য হয়ত প্রাথমিকবর্গের সাহিত্যও অবশ্যই মৌখিক— সমস্ত কিছুই ব্যবহারিক জীবনেব প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট হত। ধর্মীয় ভাবনার প্রারম্ভিক উৎসারণ তাদেব মধ্যে ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু জাদুর ভাবনাধারাও ছিল সমান্তরালভাবে বহমান। দুই ধারা একত্রে মান্যা-কল্পনার থেকে নির্গত হয়ে সংস্কৃতির প্রকরণগুলিকে রূপায়িত করত। পুরোহিত -প্রাধান্যের যুগে যে-শ্রেণীবিভাজন সমাজে ঘটেছে, উত্তরকালে সেটা তখন কিন্তু নিরস্তিত্ব ছিল।

এই পূর্বতন স্তর থেকে সুবদ্ধ ধর্মসংস্থিতির পর্বে আসার আনুপূর্বিক প্রেক্ষাপটটি এঙ্গেলস ঘনবদ্ধ অথচ খুবই সুষ্ঠুভাবে তাঁর 'ডায়ালেকটিকস অব নেচার' বইতে দেখিয়েছেন :

"সমস্ত ধর্মই হল প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের ওপর বাইরের সেই শক্তিগুলির এক আশ্চর্য প্রতিবিম্বন, যেসব শক্তি অতিলৌকিক হিশেবে তার ভাবনায় প্রতীতি লাভ করলেও, পার্থিব কোনও কিছুর রূপেই তার প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে।" (১৯৭৫ সং.; পৃঃ ৩৬১)... 'পার্থিব' অর্থে এখানে এঙ্গেলস অবশ্যই 'প্রত্যক্ষ'কে বুঝিয়েছেন, যার অন্তরালে মানুষ 'অপ্রত্যক্ষ' তথা 'অপার্থিব / অলৌকিক'-এর অস্তিত্বকে কল্পনা করে। ধর্মের মুখ্য পরিচালিকা শক্তিই হল ঐ অলৌকিকের কল্পনা। তার সামাজিক তাৎপর্য পরে আলোচ্য।

খ. ম্যাজিক ও ধর্মবিশ্বাস

মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে এককভাবে যদি এমন কোনও সর্বজনীন প্রত্যয়ের কথা সন্ধান করি, যার প্রভাব স্মরণাতীত আদিমতম কাল থেকে আজ অবধি বহমান, তা হল ম্যাজিক তথা জাদুশক্তিতে বিশ্বাস। বস্তু এবং ঘটনার অন্তর্লীন জাদুশক্তি সম্বন্ধে এই অবিরাম বিশ্বজনীন বিশ্বাসের নানা ধরণের অভিব্যক্তিই ধর্মবিশ্বাস আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি নানান্ কিছু গড়ে তোলার পিছনে সক্রিয় থাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। জাদুতে, এই বিশ্বাস মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস থেকে শুরু করে, হাতের আংটিতে বিশেষ-বিশেষ পাথর বসিয়ে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিফলিত। বস্তুতপক্ষে যে-কোনও ধরণের অলৌকিকতার প্রতি আস্থা রাখার অন্তরালেই ঐ বিশেষ [illegible]ের বিশ্বাসের ঘনীভূত উপাদান লুকিয়ে থাকে।

'ম্যাজিক' শব্দের উৎসে আছে প্রাচীন পারসিক ভাষার 'ম্যাজাই' যেটা গ্রীক ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় মোটামুটি একই রকম উচ্চারণে স্থান পেয়েছে বহুকাল অবধি। তো এই 'জাদু' বা 'ম্যাজিক' ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে কী?...... এর উত্তর এক কথায় দেওয়া বেশ অসুবিধাজনক! কেননা বস্তু এবং ঘটনার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ না জানলে, যে-কোনও কিছুই জাদু বলে প্রতিপন্ন হতে পারে অজ্ঞ মানুষের কাছে। কেমিস্টের ল্যাবরেটরীতে যদি আফ্রিকা কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোনও অরণ্যচর আদিবাসীকে নিয়ে এসে দেখানো হয় যে দুটো লাল জল (অবশ্যই দুটি বিশেষ কিছু রাসায়নিক পদার্থ) মিশিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্রণের রংটা হয়ে গেল শাদা, তাহলে তাঁর কাছে ঐ ঘটনাটা 'জাদু' বলেই প্রতীত হবে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাদুসংস্কার যার আছে, সে নিজে সেটাকে সেভাবে দেখতে চায় না তার মতে সেটি হল দৈব ব্যাপার। এটা ঠিকই যে, মনের মধ্যে আদিমতার শিকড় যত বেশি গভীর ভাবে প্রোথিত থাকে, জাদুর ওপর আস্থার পরিমাণটাও ততই বেশি হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিক্ষা, সংস্কৃতির পরিশীলন—এমন কী, বিজ্ঞানের পরিশীলনও ঐ জাদুপ্রত্যয়কে উৎপাটিত করতে পারে না মন থেকে। দ্রব্যগুণ-টুন বলে এসব ক্ষেত্রে একটা পাশ কাটানোর চেষ্টা দেখা যায় অবশ্য অনেক সময়েই!

এমন-যে ব্যাপক প্রভাববিস্তারকারী জাদুশক্তিতে বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে এর প্রাচীনত্ব কত দিনের? সম্ভবত, মানুষ নিজের চিন্তাশক্তিকে ধীরে-ধীরে প্রয়োগ করতে শিখছে যখন থেকে এই বিশ্বাস ততদিনেরই। যে-ঘটনার পারম্পর্য সে নিজের প্রাথমিক স্তরের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারত না, তার পিছনেই সে কল্পনা করত অতিলৌকিক কোনও শক্তির, যা থাকতে পারে যে-কোনও কিছুর সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে— হোক তা ঝড়, হোক বৃষ্টি, হোক রৌদ্র, হোক নদী, পাহাড়, গাছ, পাথর, পশু। এই অতিলৌকিক যে-শক্তিকে সর্বত্রই সে কল্পনা করত, কিছুটা আগেই সেই মান্যার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব মান্যাদের তুষ্টি সাধন

এবং রুষ্টিরোধন করার জন্যেই তারা ব্যস্ত থাকত সদাসর্বদা; তাদের ধারণা ছিল এতেই তাদের আহার্য জুটবে, বিপদ নিবৃত্তি ঘটবে, কামতৃপ্তি, শত্রুনিসূদন এবং কষ্টনিবারণ হবে। বিশেষ-বিশেষ কাজ করলে তার ফলশ্রুতি হিশেবে এই সব ঘটনা সহজসাধ্য হবে, এই হল জাদুবিশ্বাসের আদি কথা। এই অবধি মান্যা, ম্যাজিক এবং আদিমতম ধর্মভাবনা মিলে-মিশে একাকার হয়েই থেকেছে।

মোটামুটিভাবে জাদু-তথা জাদুকরের অস্তিত্বের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক হদিশ যা মেলে তা প্রায় হাজার পঁচিশেক বছরের পুরোনো। ফ্রান্সের পীবেনিজ পর্বতমালাব আরিয়েজ অঞ্চলে 'তিনভাই' (ত্রোয়া ফ্রেরে') নামের একটি গুহায় এক নৃত্যরত মূর্তির ছবি আঁকা আছে দেয়ালের গায়ে। মূর্তিটির মাথায় বল্‌গা হরিণের শিং, দাড়িওয়ালা মুখে পেঁচার মুখোশ, পিছনে নেকড়েজাতীয় কোনও প্রাণীর লেজ, হাতের দুটি মুঠো ভালুকের থাবার ভঙ্গীতে জড়ো করে রাখা এবং দুই পা স্বাভাবিক মানুষের মতনই। গুহাচিত্রকলার প্রবীণতম পণ্ডিত বলে যিনি বিদ্বান্-মহলে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত, সেই অ্যাবে ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরীজ অব কেভ আর্ট' বইতে এই মূর্তিকে জাদুকর-এর বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ ঐ সব উপকরণ এবং ভঙ্গিমার মাধ্যমে আদিমকালের লোকপৌরাণিক (মিথিক) কোনও দেবতার মূর্তিতে সেজে অলৌকিকতার সংস্কার-সঞ্জাত একটা-কিছু জাদু-অভিচার সাধন করা হচ্ছিল যে, তারই প্রমাণ ঐ ছবির মাধ্যমে মেলে। আজও কোনও-কোনও রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী বা আরণ্যক-আফ্রিকার আদিবাসী কৌম গোষ্ঠীতে অথ বা বেশ কিছুটা অগ্রসর সমাজেও এই রকম 'পশুর ছদ্মবেশ ধারণ' এবং বিশেষ-বিশেষ 'ভঙ্গিমা করণ'-সহ নাচ, গান - ইত্যাদি বহু সময়েই জাদুর প্রক্রিয়া বলে গণ্য হয়। বেশিদূর যেতে হবে কেন? আমাদের নিজেদের সমাজের কথাই ধরুন না : দিনাজপুরের পোল্যে সম্প্রদায়ের মুখ্য গুণিনবা 'মুখাখেল' (মুখোশ-পরা এক ধরণের বিশিষ্ট প্রকরণের লোকনৃত্যের নাম; অনেকেই হয়ত দেখেছেন) করার জন্য পশুর-বাঘ, ভালুক, নরসিংহ ইত্যাদির মুখোশগুলি মন্ত্র পূত:করে দেন। এমনও তাঁরা বলেন যে, এই 'মন্ত্রসিদ্ধ' মুখোশগুলি যথাযোগ্য রীতি-অভিচারসহ ধারণ না-করলে মুখোশের প্রাণীটি বাস্তবমূর্তি ধারণ করে 'দোষী' নর্তককে হত্যা করবে! বস্তুত এই ধরণের ভাবনার উৎস থেকেই ধর্মবিশ্বাসও বিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে (প্রয়োগকলা ও সামাজিক প্রয়োজন প্রসঙ্গে লোকশিল্পের আলোচনাসূত্রে) মুখোশের এই জাদু-তাৎপর্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং মানবসমাজে জাদুর অস্তিত্ব আছে ± ২৫,০০০ বছর ধরে তো বটেই। বল্‌গা হরিণ ফ্রান্সের ঐ অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ঐ সময়ের কিছু পরেই, অর্থাৎ শেষ তুষার যুগ সাঙ্গ হল যখন। বল্‌গা হরিণের শিং মাথায়-পরা তারপরে নিশ্চয় ঐ অঞ্চলের ক্রোম্যার্ন্য মানুষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; অতএব ছবিতে সেটার রূপায়ণও তার পরে অকল্পনীয়।

।। ২।।

স্যার জেমস ফ্রেজার তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'গোল্ডেন' বাও' গ্রন্থমালায় জাদুকে প্রকরণগতভাবে দু ভাগে ভাগ করেছেন :

ক. অনুকৃতিমূলক (সিমপ্যাথেটিক / হোমিওপ্যাথিক)

খ. সংস্পর্শমূলক (কন্টাজিয়াস)

আবার, ভাবগত দিক থেকেও সমাজবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ম্যাজিব তথা জাদুকে দুই ধবণের বলেছেন .

এক. শুভকারী (হোয়াইট ম্যাজিক)

দুই. অশুভকারী (ব্ল্যাক আর্ট)

এরা উভয়েই আবার,

১. প্রবর্তক (পজিটিভ / ইনসপিরেটিভ)

২. নিবর্তক (নেগেটিভ / প্রিভেনটিভ)

এই দুই পরস্পর-বিপ্রতীপ বর্গে বিভাজিত হয়ে থাকে।
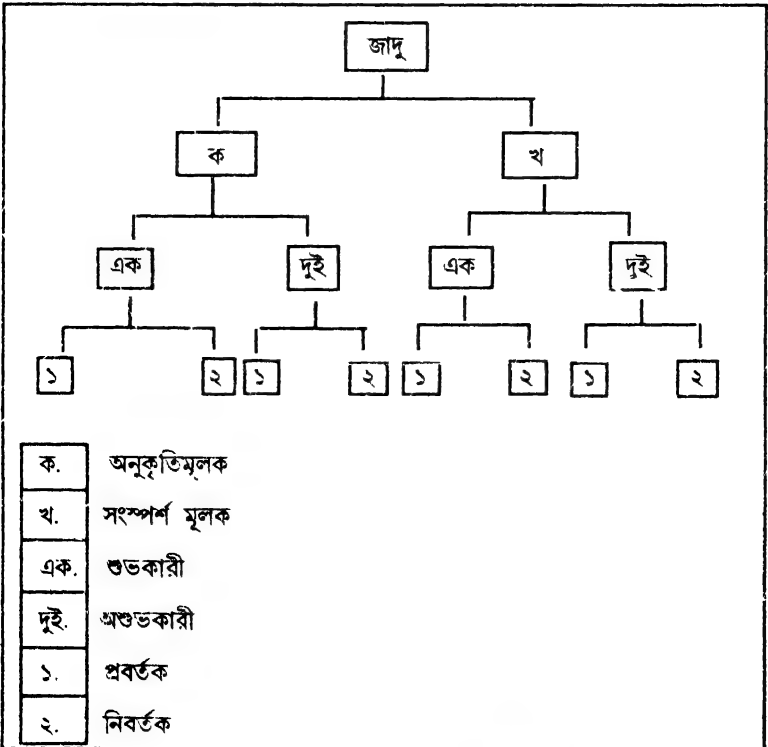
জাদু ◻ রেখচিত্র · ১ ◻ বিভিন্ন ধরণের জাদুব বর্গীকৃত অবস্থান
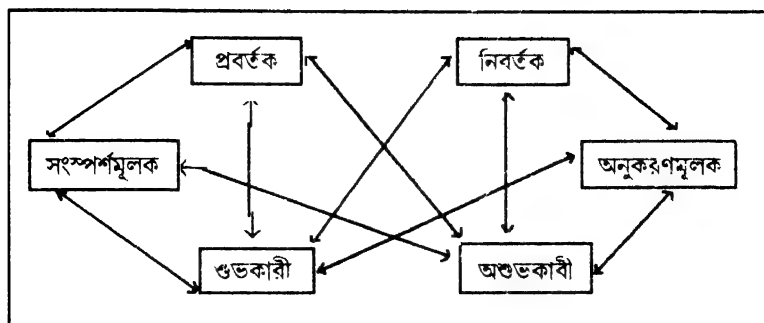
জাদু □রেখচিত্র: ২ □বিভিন্ন চরিত্রের জাদুর পারস্পরিক সম্বন্ধ

অনুকৃতিমূলক জাদুর বিশ্বাসগত কাঠামোটি হল এই রকম বাস্তবে যা ঘটে বা ঘটা-প্রত্যাশিত, একটা এমন কিছু ঘটনার অভিনয় বা অনুকরণ করলে সত্যি-সত্যিই সেটা ঘটে যাবে—এই ধারণা পোষণ করা। বৃষ্টি হচ্ছে না, অতএব জল আঁজলা করে তুলে-তুলে ছিটিয়ে দাও, তাহলেই ঐ 'নকল'-বৃষ্টিই 'আসল' বৃষ্টি সূচিত করবে! অবশ্য ঐ জল ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে নানা ধরনের মন্ত্র, অভিচার-ওরফে-নাচ গান-তুক্‌তাক্ -ইত্যাদিও প্রয়োজন, যেগুলি বৃষ্টির জাদুকে সক্রিয় করবে!

আদিম গুহাচিত্রে মধ্যে এই অনুকৃতিমূলক জাদুতে বিশ্বাসের খুব ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। গুহাচিত্রশিল্পের অভিনিবিষ্ট ছাত্র মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্রই গুহাচিত্রকলার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উপজীব্য হল পশুর এবং পশুশিকারের ছবি। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা এর পিছনে যে-প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তা হল পশুর ছবি আঁকলে বাস্তবে হয়ত বা একটা সত্যিই ঐ বিশেষ পশু এসে হাজির হবে; কিংবা পশু শিকারের ছবি-আঁকার অবলীন জাদুশক্তির বশে, কিছু পরে, বাস্তবে ঐ রকম একটা শিকারের ঘটনা ঘটে য়াবার সম্ভাবনা হবে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই, ছবিটা নিজেই একটা জাদুর সামগ্রিক ক্রিয়া বা উপকরণ-নিচয়েরও একটা খণ্ডাংশ। আচার-অভিচার (রিচুয়াল অর্থে) সেখানে বৃহত্তম ব্যাপার। তাদের মাধ্যমে পশুর বা শিকারের মান্যাকে সন্তুষ্ট করলে তবেই ছবির উপজীব্যগত আকাঙ্ক্ষাটা বাস্তব হবে। অতএব আবার মন্ত্র-তথা-গান, ভঙ্গিমা-ওরফে-নাচ এবং সব মিলিয়ে অনুকৃতি-মূলক রিচুয়াল; এবং তারই লব্ধফল হল জাদু।

অনুকৃতিমূলক রিচুয়ালের মাধ্যমে জাদুশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তার ওপর নির্ভর করার খুব ভাল উদাহরণ হল বাঙালীর ঘরের মেয়েলি ব্রতগুলি। ধানের ছড়া আঁকা হল; আকাঙ্ক্ষা—বাস্তবে ঐ রকম ধানছড়া উপ্‌চে পড়বে; পুকুর আঁকা হল, ধানের গোলা আঁকা হল, মাছ আঁকা হল, ঘর আঁকা হল—কেন? না, এই অনুকৃতি-বস্তুচিত্রগুলি ব্রতের সিদ্ধি হলে বাস্তবে রূপায়িত হবে। এর সঙ্গে আছে

ব্রতের জন্যে বিভিন্ন উপচার : ঘট, সিঁদুর, হলুদ, পান, সুপারি, চাল, কলা, বাতাসা, ফুল এবং আরও অনেক কিছু; এবং আছে মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা জানিয়ে মন্ত্র এবং আরও কিছু পালনীয় বিধি —যথা স্নান, উপবাস -ইত্যাদি। এই সব মিলিয়ে যে জাদুশক্তির সঞ্চার, উদ্দিষ্ট দেবতা (মান্যার বিবর্তিত ও সুসংস্কৃত রূপ) তার উপলক্ষে সেই সব বস্তু মিলিয়ে / জুটিয়ে দেবেন, যাদের ছবি পিটুলিগোলার আল্‌পনায় আঁকা হয়েছে।

সংস্পর্শমূলক জাদুর ব্যাপারটা হল এই রকম; আদিম সংস্কার-অনুযায়ী একই বস্তু যদি একাধিক খণ্ড বা অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলেও তাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সংযোগ থেকে যায়, ফলে একটি খণ্ড বা অংশকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় তো অপর অংশটিরও ক্ষতি হবে। আবার একটি বস্তুর মধ্যে যদি কোনও বিশেষ অতিলৌকিক গুণ থেকে থাকে, তো সেটিকে যদি অন্য কিছুর সঙ্গে সংস্পৃষ্ট করা যায় তাহলে দ্বিতীয়টিও প্রথমটির সেই বিশেষ গুণের অংশভাগী হবে।

প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের যে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ওপরে, এখানেও সেই উপকরণকেই আবারও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেখানে দেখছি মানুষ হরিণের শিং-ছাল ইত্যাদি গায়ে-মাথায় চাপিয়ে তার অঙ্গভঙ্গী এবং স্বর নকল করে বনের মধ্যে নাচছে এমন ছবি আঁকা হয়েছে, সেখানে বাস্তবে ঐ রকম ঘটনা অবশ্যই ঘটত ধবে নিতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে যে জাদুবিশ্বাস, তা খানিকটা অনুকরণমূলক হলেও বাকিটা সংশ্রবমূলক। ঐ হরিণের শিং এবং ছাল ইত্যাদির সংস্পর্শে থাকার ফলে নতুন একটা হরিণও ঐ বস্তুগুলির অন্তর্লীন অতিলৌকিক ক্ষমতার বলে শিকারী নর্তকের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে—মানসিকতাটুকু ছিল এই ।

আবাব ধরা যাক, শত্রুর পোষাকের একটা টুকরো কিংবা তার দেহের অংশ—নখ, চুল-ইত্যাদি যদি সংগ্রহ করে সেটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ঐ সংস্পর্শমূলক জাদুর উপজীব্য বিশ্বাসে এইটাই মনে কবা হবে যে, যাব গায়ে ঐ পোষাক আছে কিংবা যার নখ বা চুল, সেও দগ্ধ হবে সেই জাদুর বলে।...দেবতার 'প্রসাদ' খাওয়া বা অঞ্জলি দেওয়া ফুলের অংশ কাছে-রাখা ইত্যাদি যে-সব সংস্কার ধর্মাচার বলে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদের অন্তরালেও ঐ সংস্পর্শমূলক জাদু-সম্পর্কিত ধারণাটিই প্রবাহিত আছে।

।। ৩ ।।

দ্বিতীয় যে-ভাবনা-অনুযায়ী জাদুর শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ শুভকারী এবং অশুভকারী, তাবও কিছুটা হদিশ ওপরের আলোচনায় মিলছে। এই বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্ ব্রনিস্লাউ ম্যালিনৌস্কি তাঁর 'ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যাণ্ড রিলিজান' বইতে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। তাঁব গবেষণা মূলত প্রশান্ত মহাসাগবের ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হলেও পববর্তী সময়ে অন্যান্য

সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধানে সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়ের মানুষের ক্ষেত্রেই যে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগযোগ্য, সে কথা প্রমাণিত হয়েছে।

এক দিক থেকে বিচার করলে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ-ইত্যাদির পিছনে যে-মানসিকতা কাজ করছে, সেটি ঐ শুভকারী জাদুবিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছে। বৃষ্টি নামাতে চাওয়ার জন্য, ফসল ফলানোর জন্য, সন্তান লাভের জন্য, যুদ্ধ জয়ের জন্য, বিত্ত অর্জনের জন্য, আহার্য সন্ধানের জন্য —এই জাদুর ওপর আস্থার মানসিকতাটিই সক্রিয় থাকে। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা-অর্চনা, বিশেষ-বিশেষ আচারবিধির পালন -ইত্যাদি ব্যাপার এই জাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত।

এই ধরনের জাদুর প্রয়োগ সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা এখানে জরুরী হয়ে উঠছে, কারণ এর সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা জড়িয়ে থাকে। ধরুন, ফসল ফলানোর জন্যে শস্যদেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় গোষ্ঠীবদ্ধ নাচ-গান - ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করবার পর, কোনও-কোনও সমাজে এমন রীতিও আছে যেখানে শস্যক্ষেত্রের ওপর নারী-পুরুষের অবাধ ও যথেচ্ছ মিলন ঘটে ঐ আচারবিধিরই অবশ্য-পালনীয় অঙ্গ হিশেবে। এ ক্ষেত্রে এই অবাধ ছাড়পত্র কিন্তু ঐ জাদুর সাফল্য ঘটানোর সুবাদেই, কেন-না পৃথিবীর সর্বত্রই আদিবাসী সমাজ কিন্তু যৌন বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল। ‘বহুচারিতা তথা ‘প্রমিসকুইটি’ মূলত তথাকথিত ‘সভ্য’ সমাজেরই অনুষঙ্গবাহী।

অর্থাৎ জাদুর সাফল্যের জন্য কঠিন সামাজিক-সংস্কারাবদ্ধ সমাজেও নৈতিক বন্ধন অনেকখানি ঢিলে করে দেওয়া হয়। সুতরাং, সমাজ-পরিচালনার ক্ষেত্রেও জাদুবিশ্বাসের প্রভাব যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে পড়ে, সেটা এর থেকে সহজেই বুঝতে পারি। অনেক সময়ে ঐ নৈতিক মূল্যবোধের শিথিলতাটি প্রতীকী হয়েও আসে; মনে রাখতে হবে যে, জাদুবিশ্বাসের মধ্যে প্রতীকের একটা ভূমিকা আছেই, বিশেষত সাদৃশ্যমূলক জাদুর ক্ষেত্রে। উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলেই বৃষ্টি নামানোর জন্যে ‘হুদুমদেও’-এর পুজো প্রচলিত আছে। এর নিয়ম হল গ্রামশুদ্ধ মেয়েরা অন্ধকার রাত্রে মাঠে গিয়ে বসনমুক্ত অবস্থায় নাচ-গান-ইত্যাদি করবেন। ঐ সময়ে কোনও পুরুষের ঘর থেকে বেরোনো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মেয়েরা দল বেঁধে ঐ ভাবেই গোটা গ্রাম ঘুরবেন এবং গান-টান করবেন; আবার ভোর হবার আগেই মাঠে এসে নিজের-নিজের পোশাক-আশাক পরার পরে ঘরে ফিরলে, তবেই পুরুষরা ঘরের বাইরে আসতে পারবেন। এই আচারের অবলীন বিশ্বাসের শিকড় এমনই সুগভীর যে, ঐ সব অঞ্চলে কোনও দিনই ‘হুদুমদেও’ পুজোর রাত্রে চুরি-টুরিও হয় না এবং ঐভাবে থাকা-সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত একটি মেয়েকেও বিপন্ন হতে শোনা যায়নি। এখানে স্বয়ং হুদুমদেবতার সঙ্গেই যেন এই মেয়েদের একটা প্রতীকী সংরাগের ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং তারই পরিণতিতে বৃষ্টি দান করেন তিনি, অন্তর্নিহিত জাদুবিশ্বাস এটাই , যদিও এই প্রথাটি আপাতভাবে ধর্মধারা বা কাল্ট-জাত বলে সহসা মনে হয়। এর মূলে আছে উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস, তাই প্রতীকী দেহমিলন ঘটার

কল্পনা করা হয়েছে।

শুভকারী জাদু এবং অশুভকারী জাদু বোধ হয় সমবয়স্ক। কারণ শত্রুর অমঙ্গল হোক এবং নিজের মঙ্গল হোক এমন অভীপ্সা একে অন্যের পরিপূরক অতি-অবশ্যই। মারণ-উচাটন অভিচার-ইত্যাদি বিষয় এই অশুভকারী ইন্দ্রজাল-পদ্ধতি বৈদিক সাহিত্যে যথাক্রমে 'কৃত্যা' এবং 'যাতু'রূপে পরিচিত। 'যাতু' যারা ব্যবহার করে তারা যাতুধান-তথা-রাক্ষস-বা-পিশাচ-বা-ডাক / ডাকিনী বলে কথিত। এই রকম একটি যাতু (জাদু শব্দ কি এরই বিবর্তন, না-কি তার ঠিক বিপরীতটাই সত্যি?) দেখি অথর্ব সংহিতার ৫।২২।৫-৭ সূক্তে যেখানে বলা হচ্ছে 'তক্মন' (জ্বরবিকার) যেন এই মন্ত্রের উচ্চারণকারীর যারা শত্রু সেই মহাবৃষ বা মূজবৎ বা বাহ্লীক দেশে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের গ্রাস করে।

এই ব্ল্যাক-আর্ট ওরফে ডাকিনী-বিদ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন শেকসপীয়র 'ম্যাকবেথ' নাটকে, যেখানে আলেপ্পোযাত্রী নাবিকের বউ চেস্টনাট খেতে দেয়নি বলে তিন ডাইনীর ক্রোধ জ্বলে উঠেছে (১/৩)। সেই উপলক্ষে তাদের কাছে আভিচারিক মারণ-উচাটনের প্রয়োজনীয় বস্তু কী-কী-হতে পারে তারও উদাহরণ শেকসপীয়র দিয়েছেন : পাথরের নীচে ঠাণ্ডায় জমে-থাকা কোলাব্যাঙ, জলার সাপের মাংস, সোনাব্যাঙের নখ, বাদুড়ের রোঁয়া, কুকুরের জিভ, টিকটিকির ঠ্যাং, জলার গিরগিটির চোখ—ইত্যাদি, ইত্যাদি (৪।১)। এই সব বিদ্‌কুটে বস্তুর সাহায্যে যে শুধু অশুভই করা যায় এমন নয়, শুভদ্যোতক জাদুপ্রক্রিয়াতেও নানান আল্‌টপ্‌কা উদ্ভুটে জিনিষ লাগে। যেমন, পূর্ববাংলার কোনও-কোনও এলাকায় কনের দেহক্লেদসিক্ত কাপড়ের টুকরো নিয়ে বাসরঘরে প্রদীপের সল্‌তে পাকানোর রীতি আছে; এতে নাকি তার বিবাহিত জীবন সুখের হবে, এই হল জাদুবিশ্বাস। বিবাহাচারে যে কত ধরণের জাদুসংস্কার প্রচলিত আছে সারা দুনিয়া জুড়ে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই; প্রবর্তক-এবং- নিবর্তক জাদুসংস্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা পরে বলছি।

অশুভকারী জাদুতে ভয়-এবং-বিশ্বাস থেকেই মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে ডাইনী-ইত্যাদি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সেই আদিম যুগেই। ইউরোপের ইতিহাসের সমস্ত মধ্যযুগই তো ডাইনীতন্ত্রের ভয়ে শিহরিত ছিল। কোথাও মড়ক বা অপঘাত বা শস্যহানি -ইত্যাদি ঘটলে আজও তো অশিক্ষিত (শিক্ষিতরাও) মানুষেরা তার কারণ হিশেবে বহু সময়েই তুক-তাক, নজর-লাগা-ইত্যাদির কথা বলেন।'ডাইনী' সন্দেহে উৎপীড়নের খবর তো এখনও মেলে পুরুলিয়া, মালদহ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ থেকে।

।। ৪ ।।

তৃতীয় বর্গ, অর্থাৎ প্রবর্তক-ও-নিবর্তক জাদুর কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আসে এবার। আদিম গুহার দেওয়ালে হাতের পাঞ্জার ছাপ যেমন দেখি, তেমনই আজও দেখি গ্রামে-ঘরে মেটে বাড়ির দরজায়। এর মর্মার্থ গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি-ও নৃতত্ত্ব বিদ্যার ছাত্র মাত্রেই জানেন : অপকারী অলৌকিক-তথা-জাদুশক্তি যাতে ঐ

হাতের ছাপে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, সেই জন্য এই প্রয়াস। ঠিক একই মানসিকতা সক্রিয় থাকে ছোট্ট বাচ্চাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবার সময় তার কপালে বা বাঁ-গালে কাজলের টিপ পরিয়ে 'খুঁতো' এবং বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুল কামড়ে 'এঁটো' করে দেওয়ার মধ্যে, যাতে ডাইনীর নজর না-লাগে!

ওপরের 'যাতু'র কথা বলেছি; অথর্ববেদে ঐ যাতুর প্রতিরোধক পাল্টা-কুহকের প্রসঙ্গও আছে : ঐ 'অপামার্গ' প্রয়োগের উপকরণ হিশেবে এক জায়গায় 'সীস' ব্যবহার করার কথা রয়েছে; সায়নাচার্যের ভাষ্যে এই 'সীস' হল 'সীসা', নদীর ফেনা, লোহার উখোঘষা 'গুঁড়ো, টিকটিকির থেঁতলানো-মাথা-ইত্যাদি-মিশ্রিত পদার্থ' -ইত্যাদি 'ম্যাকবেথ'-এর ডাইনীদের ব্যবহৃত উপকরণের সঙ্গে এর সমধর্মিতা উল্লেখযোগ্য অবশ্যই।

প্রবর্তক-নিবর্তক জাদুর সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় তাবিজ, কবচ, মাদুলি এবং রত্নধারণের মধ্যে। বিপদ, দুর্ভাগ্য, সম্ভাব্য ক্ষতি-ইত্যাদিকে ঠেকানোর জন্যে এই সবের ব্যবহার প্রায় চিরকালীন এবং বিশ্বজনীন। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের সেই কাহিনী তো সবারই জানা, যেখানে কর্ণের অক্ষয়-কবচ-কুন্ডল ভিক্ষা করে চেয়ে এনেই তবে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণ-অর্জুনের পক্ষে! এই রকম প্রবর্তক-নিবর্তক জাদুশক্তি ছিল মহাবীর স্যামসনের চুলে; বাইবেলীয় মিথোলজির বিবরণ অনুসারে ফিলিস্তাইনের শাসকদের প্রেরিত সুন্দরী গণিকা ডেলাইলা ছলাকলায় ভুলিয়ে সেই রহস্যটি জেনে নিয়ে, ঘুমের মধ্যে তাঁর চুল কেটে নিয়ে তাঁকে হীনবল করে বন্দী করেছিলেন।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিচিত্র আচারের মধ্যে ঐ রকম প্রবর্তনকারী এবং প্রতিরোধকারী জাদুর প্রসঙ্গ ওপরে উল্লেখ করেছি। উদাহরণ হিশেবে এখানে দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে আলোচনার পূর্ণতাসাধনের জন্যে (পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে):

বিয়ের কনেকে যে বহন করে নিয়ে আসা হয় আসরে, এক দিক থেকে সেটা নিবর্তনমূলক সংস্কার। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন মাটি স্পর্শ করে আসরে এলে মাটির সঙ্গে বিলীন মৃত মানুষদের দেহাবশেষ সংস্পৃষ্ট হয়ে ক্ষতি করতে পারে কনের, তাই এই প্রথা। বিয়ের বর-কনে জাঁতি, কাজললতা-ইত্যাদি যে সঙ্গে রাখে—তার কারণও ঐ; লোহার স্পর্শে নাকি ভূত-প্রেত পালায়! (মৃতদেহ সৎকার করে এসে ঐ জন্যেই আগুন এবং লোহা ছোঁওয়ার সংস্কার বিহিত) আছে।

এই রকম প্রবর্তক জাদুর বিশ্বাস কনের কোমরে কড়ি-পরানো ইত্যাদি প্রথার মধ্যেও আছে। কড়ি তার বিশেষ ধরনের আকৃতির জন্য উর্বরতাবৃদ্ধির সহায়ক বলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই গণ্য হয়। সুতরাং, কড়ির সংশ্রবে নারীদেহের অনুরূপ দেখতে অংশটিও অধিকতর ফলবতী হয়ে উঠবে, উর্বরতার (অবশ্যই সন্তান জন্মের প্রসঙ্গে) পরিপোষণ ঘটবে কনের মধ্যে, এই হল সংস্কার। এটি একই সঙ্গে অনুকৃতি মূলক ও সংস্পর্শমূলক জাদুর বিচিত্র উদাহরণ। প্রবর্তক-নিবর্তক জাদুর একটি বড় উপকরণ

হল মুখোশ। ঐ ত্রোয়া ফ্রেরের ছবির আমল থেকেই মুখোশের সঙ্গে জাদুর সম্পর্ক যে সুনিবিড়, সে-কথা তো কিছু আগেই বলা হয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ান বিভিন্ন গোষ্ঠী বা মধ্য-আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী জাতির মধ্যে মুখোশের এখনো বহুল প্রচলন আছে অলৌকিক বিভিন্ন শক্তিকে প্রতিরোধ বা আমন্ত্রণ করার সূত্রে। ডেলাওয়ার অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে বিকট-দর্শন সব 'কাচিনা' মুখোস তৈরী করে তারপর সেগুলি দিয়ে মুখ আবৃত করে আচার-ভিত্তিক গোষ্ঠী নৃত্যের মাধ্যমে অশুভ আকৃতিক শক্তিগুলিকে ভয় দেখানোর যে-রীতি প্রচলিত আছে, সেটির মধ্যে ঐ মুখোশকেন্দ্রিক নিবর্তক জাদুবিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য নমুনা মেলে।

আমাদের রাঢ়-অঞ্চলের মড়ার-কঙ্কাল-সেজে বোলান্-নৃত্যের পিছনেও সেই একই মানসিকতার অস্তিত্ব রয়েছে। একটু আগে উল্লেখিত মুখা (বা মোখা) খেল, যেসব মুখোশ পরে নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় (কালী, বেনাকী, নারসিংহী ইত্যাদি)— সেগুলি দৈবশক্তির অনুগ্রহলাভের উপকরণ বলেই গণ্য। আবার (আগেই বলেছি অবশ্য) মোখা-খেলুড়েদের মধ্যে এ-সংস্কারও আছে যে, সেই মুখোশের উপজীব্য দেবতার রোষে তার মৃত্যু ঘটবে! এগুলি তাই একই সঙ্গে 'প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' বহন করছে, বললে খুব অত্যুক্তি হয় না।

।। ৫ ।।

ধর্মে, লোকাচারে, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে জাদুর এই যে সর্বপ্লাবী ভূমিকা, এর সার্থকতম নজীর মেলে লোককাহিনীর ক্ষেত্রে। রূপকথা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তী— প্রায় সমস্ত পর্যায়ের লোককথাতেই অলৌকিকতার যে বিপুল গুরুত্ব, তার বৃহত্তম উপকরণ হল সর্ববিধ পর্যায়েরই জাদু। সোনার কাঠি রূপার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যা ঘুমোয় কিংবা জাগে; রাক্ষসীর প্রাণভোমরা অন্যত্র লুকানো থাকে, ডাইনীর জাদুতে মানুষ পাথরে পরিণত হয়; পশু এবং মানুষ পরস্পরের চেহারা ধারণ করতে পারে; জাদু-তরবারির আঘাতে রাক্ষসের লোহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়—এই সব অজস্র অভিপ্রায় বা মোটিফ (লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানী স্টিথ টমসনের ভাষায়) সব দেশের রূপকথাতেই অঢেল। পরীর মায়ায় চিম্‌নী-ঝাড়ুদারনী সিণ্ডেরেলা রূপসী রাজকন্যায় পরিণত হয়, কুমড়ো হয় তার জুড়িগাড়ি, গিরগিটিরা বনে যায় কোচোয়ান, অবার রাত বারোটা বাজতে-না-বাজতেই যে সিণ্ডেরেলা, সেই সিণ্ডেরেলা! সুখ-দুখুর রূপকথায় দেখি দয়ালু বুড়ীর জাদুর জোরে বিনম্র দুঃখী মেয়ে হাসলে হীরে-মানিক ঝরে আর তার সঙ্গে রাজপুত্তুরের বিয়ে হয়; কিন্তু উদ্ধত সুখী মেয়ের ক্ষেত্রে সেই জাদুশক্তিই তার মুখ থেকে ব্যাঙ ব্যাঙাচি সাপের ছানা উগ্‌রে আনে, আর তার বর অজগর সাপ হয়ে গিয়ে তাকে গিলে খায়। এ রকম নজির ভুরি-ভুরি মেলে প্রায় সমস্ত ধরনের লোককথাতেই।

বস্তুতপক্ষে জাদুর এই যে আবহমান কাল ধরে চলে-আসা সর্বব্যাপকতা এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি অন্তঃসারশূন্য হলেও, ইতিহাসে—বিশেষত সাংস্কৃতিক ইতিহাসে—

এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদিম সংস্কৃতিতে ওঝা বা শামানরা কিছু পরিমাণে প্রাকৃতিক বিধিবিধান অনুধাবন করে বুদ্ধির জোরে জাদুশক্তির ভাণ করে নিজেদের অধিকারকে জানান্ দিতেন গোষ্ঠীসমাজে। কিন্তু তাই বলে জাদুর সঙ্গে আদিম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এক করে দেখা সঙ্গত নয়। উপাদান, আচার এবং বিশ্বাস একত্রে সমন্বিত হয়ে জাদুর সংস্কার গড়ে তুলেছে সুদূর অতীতকালেই। আমরা যথার্থ বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেও সেই জাদুর বাঁধনকে কাটাতে পারছি না মন থেকে যে, এটা খুব গৌরবজনক না হলেও, অত্যন্ত বেশি পরিমাণেই কিন্তু সত্য।

সংস্কৃতির (হয়ত সমাজেরও) বিকাশে জাদুর কি বৃহৎ ভূমিকা ছিল, সে কথা সংস্কৃতিতত্ত্বের পড়ুয়ারা জানেন। কিন্তু সভ্যতার একটা স্তরের শেষে (মধ্যযুগ) এই জাদুশক্তিতে আস্থার ব্যাপারটা স্তিমিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। কেন ঘটেনি, সেটা এখানে একটু ভেবে নেওয়া হয়ত উচিত ·

আসলে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বস্তু এবং ক্রিয়ার পারম্পর্য সম্বন্ধে আমরা যতই অভিজ্ঞ হয়ে উঠি না কেন, অলৌকিক সংঘটনে হাজার-হাজার বছরের বিশ্বাসটুকু আমাদের মনে গভীরভাবে থেকেই গেছে সমাজব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকাটি অক্ষয় হয়ে থাকার ফলশ্রুতি হিশেবে। শ্রেণী-সমাজ গড়ে ওঠার পর, সমাজের নিয়ন্ত্রণ যে ওপরতলার মানুষের হাতে মজুত হয়েছিল প্রাচীনকালেই, বহু শতাব্দীর পরেও সেই পুঁজি তাদের ফুরোয়নি; এবং ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে দাবিয়ে রাখাটা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই অনিবার্য হয়েছে। সুতরাং ধর্মের প্রাধান্য যখন সমাজ-পরিচালকদের স্বার্থে বজায় থাকছেই, তখন তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিশেবে জাদু এবং অলৌকিকতায় প্রত্যয়ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকছে সব সময়েই। সামাজিক শ্রেণীস্বার্থেই তাই বিজ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাদুর প্রতি আস্থাকেও টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

গ. টোটেম এবং ট্যাবু

অধ্যাপক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের এই শিরোনামে একটি সুপরিচিত বই আছে, যা সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক তিনটি শাখা— নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির ছাত্রদের পক্ষে অনিবার্যভাবে-পাঠ্য এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। বলে রাখা দরকার ঐতিহাসিকভাবে আচার্য ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির যত গুরুত্বই থাকুক না কেন, মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষণের নিরিখে তার যৌক্তিকতা যাচাই করতে বসলে অনেকখানিই মানা চলে না। সুতরাং এই নিবন্ধের শিরোনাম ফ্রয়েডের বই থেকে ধার করলেও, বক্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বের অনুবর্তন করা হয়নি।

টোটেম এবং ট্যাবু শব্দদুটির মূল এবং ভাবগত রূপান্তরিত অর্থগুলির পরিচয় আগে নেওয়া প্রয়োজন প্রথম শব্দটি আদিতে রেড ইণ্ডিয়ান বিভিন্ন জাতিকৌমের সৃষ্টি, আর দ্বিতীয়টির উৎস পলিনেশিয়া। মূলত 'টোটেম' যে শব্দ-উৎস থেকে উদ্ভূত তার অর্থ হল 'জ্ঞাতি'; এই প্রধান-অর্থেই ওজিবওয়া রেড ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'ওটোটেমান' বা 'রক্ত-সম্পর্কের নিকট আত্মীয়' রূপে; অ্যালোনকুইয়ানদের জবানীতে এর চেহারা হয় 'ন্টোটেম' অর্থাৎ 'আমার আত্মীয়' এবং ক্রী-ইণ্ডিয়ানদের উচ্চারণে 'ওটোটেমা', যারও মানে ঐ 'আমার আত্মীয়'!

'ট্যাবু শব্দের মূল তাৎপর্য 'নিষিদ্ধ'; যদিও আদিতে পলিনেশিয়ান সমাজে এর অর্থ ছিল 'নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন'! দুটি শব্দকেই নৃতাত্ত্বিকরা গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে থাকেন, কারণ বিশ্বের সমস্ত জাতি এবং কৌমগোষ্ঠীর মধ্যেই এদের সমান তাৎপর্যবাহী সংস্কার প্রচলিত দেখা যায়। সুতরাং শব্দদুটির ধ্বনিগত উৎস যা-ই হোক না-কেন, এদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যবাহী সংস্কারটি বিশ্বজনীন।

টোটেম সম্বন্ধে প্রথম ক্ষেত্র-গবেষণা-ভিত্তিক তত্ত্ব সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন মর্গ্যান, তাঁর সেই সুবিখ্যাত 'এনসেন্ট সোসাইটি' গ্রন্থের মধ্যেই। মর্গ্যান দীর্ঘদিন ইরোকোয়া গোষ্ঠীর রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁদের প্রায় একজন আত্মীয়ের মতো হয়েই কাটিয়েছেন। তাঁর পরে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-গবেষণা-নির্ভর সিদ্ধান্ত করেছেন বৃটিশ সামাজিক/সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক স্যার জেমস ফ্রেজার তাঁর 'টোটেমিজম অ্যাণ্ড এক্সোগ্যামী' গ্রন্থে। আরেক ইংরেজ পণ্ডিত—'মান্যা' প্রসঙ্গে আলোচিত ই বি টাইলর প্রায় কাছাকাছি সময়েই (এগুলি সবই গত শতকের শেষ দিকের এবং এই শতকের গোড়ার আমলের কথা) তাঁর 'দ্য প্রিমিটিভ কালচার'-এও এই নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ফ্রেজার তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাবলী 'গোল্ডেন বাও'-তে এবং উত্তরকালে ব্রনিশ্লাউ ম্যালিনৌস্কি 'সায়েন্টিফিক থিওরী অব কালচার' বইতে, আর ক্লোদ লেভী-স্ট্রোস তাঁর 'স্যাভেজ মাইণ্ড' এবং 'টোটেমিজম' বইতে এ নিয়ে আরও বেশী তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নানান সিদ্ধান্ত করেছেন। রুথ বেনেডিক্ট, ফ্রানৎস বোয়াজ-প্রমুখ একালীন মার্কিন বিদ্বানও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে অনেক কথা বলেছেন; অবশ্য তাঁরা সমাজের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের তত্ত্ব মানতে চান না

বলে মার্ক্সবাদী আলোচকদের কাছে তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বজনীন ভাবে গ্রাহ্য বলে মনে করার কারণ নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিকোমের মধ্যে টোটেম-সম্পৃক্ত ধারণার স্বরূপ সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে জন ফেরেইরার 'টোটেমিজম ইন ইণ্ডিয়া' বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

|| ২ ||

টোটেম-সংস্কারের প্রেক্ষাপটে একটি কোনও পশুকে গোষ্ঠীর আদি-প্রবর্তক বলে গণ্য করা হয় সর্বত্রই। কোথাও-কোথাও একটি ফুল, বা গাছ, কিংবা ফলও টোটেম রূপে গণ্য হয়। মনে করা হয় যে, ঐ বিশেষ পশুর উত্তরপুরুষ হিশেবে যে-গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদেরকে মনে করেন, তাঁরা পরম্পরের 'ওটোটেমান' বা 'নটোটেম' বা 'ওটোটেমা।' এঁদের কাছে ঐ পশু পরম পবিত্র, তার ক্ষতি করা মহাপাতক, অন্য গোষ্ঠীরও কেউ যদি তা করতে উদ্যত হয়, তাকে প্রতিনিবৃত্ত করা টোটেম বংশজদের পবিত্র কর্তব্য, এবং তার জন্য যদি হত্যাও করতে হয় টোটেমের নিরাপত্তার কারণে তা করতে হবে।

কিন্তু পশু (বা ফুল-ফল) এভাবে পরম পবিত্র বলে বিশ্বজনীনভাবে গণ্য হয়ে উঠল কেমন করে? মনে রাখতে হবে যে, কোনও সামাজিক ধারণা এবং আচারই গড়ে-ওঠা সম্ভব হয় না, যদি না তার নিচে একটা অর্থনৈতিক কারণের সুপ্ত ভিত্তি থাকে। আদিম মানুষের জীবনে পশুই ছিল তার জীবন নির্বাহের মাধ্যম। প্রথমে পশুশিকার, তার পরে পশুপালন-ও-চারণা এবং অবশেষে কৃষি--- সর্বক্ষেত্রেই তার অর্থনৈতিক জীবন তথা অস্তিত্বের প্রধানতম নির্ভর ছিল ঐ পশুই। ঠিক এই জন্যেই তার মানসিক বিকাশের সঙ্গে পশুর সম্পর্কটি ছিল খুবই নিবিড়। আমরা জানি যে, আদিম মানুষ প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও সংঘটনের পিছনেই একটি করে অলৌকিক সত্তা বা শক্তির কল্পনা করছে, এবং এই বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে যে-সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সর্বপ্রাণবাদ' (টাইলর কথিত 'অ্যানিমিজম'), যা কিনা 'মান্যা' অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনার অন্তর্লীন অলৌকিক সেই কল্পিত সত্তার উপর নির্ভরশীল। এই সত্তা বা শক্তিই ধীরে-ধীরে দেবতায় পরিণতি পেয়েছে যে, তা আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। ঃ আগুন, বজ্র, বাতাস জল, সূর্য, চন্দ্র--- এরাই হল আদিমতম দেবতা। এদেরকে তুষ্ট করার জন্য মানুষ খাবার-দাবার উৎসর্গ করেছে, হাঁক-ডাক, লাফ-ঝাঁপ করেছে, যা পরিণতি পেয়েছে পূজা, গান, নাচ - ইত্যাদিতে---যাতে করে শিকারের দেবতা / মান্যা পশু জুগিয়ে দেন, সেজন্য তাঁকেও এভাবে খুশি করার চেষ্টা করা হতো যাতে শিকার করে প্রাণটুকু রক্ষার উপায় মেলে! একইভাবে তুষ্ট করা হতো পশু পালনের মান্যা / দেবতা, পশুচারণের জমিতে ঘাস-টাস ভালভাবে তিনি যাতে গজিয়ে দেন--- পশুগুলো পেট পুরে খেতে পায়, সঙ্গে-সঙ্গে মানুষেরও অন্ন সংস্থান হয় (স্মরণযোগ্য একইভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে 'গোত্র' কথাটা গড়ে উঠেছে 'গো-ত্র' বা 'পশুচারণস্থল' থেকেই)।

এই সবের মান্যা যা-যা, তারাও স্বাভাবিক ভাবেই পশুমূর্তিতে কল্পিত হল আদিম মানুষেব মনে। ইতিমধ্যে মৃত্যু-সম্বন্ধেও তারা ভীত ও সচেতন হয়েছে; যে-লোকটি কিছুক্ষণ আগেও নড়ছিল, হয়ত বা কথাও বলছিল— সে হঠাৎ নড়েও না, কথাও বলে না— এর পিছনে যে 'মান্যা', সে-ই কল্পিত হল জীবিতকালে লোকটির মধ্যে যে-সত্তা ছিল তাব সংরক্ষক রূপে; এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল আত্মার ভাবনা। তাকেও তুষ্ট কবা দরকাব, অতএব তাকেও দেবতারূপে কল্পিত করা হল, যাতে সে ক্ষতি না-করে মঙ্গলই করে। পশুব 'মান্যা' এবং আত্মার 'মান্যা' একই রকম কাজ করেছে যেহেতু, তাই ধীবে-ধীরে পশু এবং পূর্বপুরুষের আত্মা-বিষয়ক ধারণা সমীকৃত হযে গিয়ে পশুই পূর্বপুরুষ— এমন চেতনার উন্মেষ হল। মৃত পিতা বা পিতামহের বংশধর যেহেতু সবাই, তাই তার সঙ্গে সমীভূত খাদ্যপ্রদাতা-এবং-ভয়ত্রাতা ঐ পশুদেবতাও পিতা বা পিতামহের তুল্য হয়ে উঠল। এই পর্বে পশু ও মানুষেব মিশ্রিত মূর্তিতে দেবতাব কল্পনা করা হয়েছে, যেমন নৃসিংহ কিংবা গণেশ; প্রাচীন মিশরের প্রায় সব দেব-দেবীই এই রকম অর্ধপশু-অর্ধমানব— বাজপাখির মুখওয়ালা হোরাস, শেয়ালের মুখওয়ালা আনুবিস ইত্যাদির কথা উদাহরণত বলতে পারি; অন্যান্য সংস্কৃতিতেও এ জিনিষ দেখা যায়।

পরবর্তী স্তবে দেবতা পুরোপুরি মানবদেহী; পশু আছে তাঁর বাহন হয়ে। এই পর্যায়েই প্রাচীন ভারতে বংশ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে পশুর নাম ব্যবহৃত হলেও, তাদেরকে মুনি-ঋষি-ইত্যাদি বানিয়ে দেওয়া হল— গোত্রনামও তার থেকে হল বিবর্তিত। যেমন ঃ ভরদ্বাজ (মূল অর্থ 'ঈগল' বা 'বাজ') কাশ্যপ < কশ্যপ (অর্থাৎ 'কচ্ছপ') , কৌশিক < কুশিক (পেঁচা), ধন্বন্তরী (রাজগোখরো), গৌতম (গরু) ইত্যাদি। নাগ, বাঘ, হাতী, সিংহ - প্রভৃতি বংশ-পরিচায়ক পদবী হল এর পরবর্তী বিবর্তন। উল্‌ফ, ক্রো, ফক্স -প্রভৃতি বিলিতি পদবীরও উৎস অনুরূপক্ষেত্রেই নিহিত।

।। ৩।।

সমটোটেমভুক্তদের মধ্যে দুটি বস্তু নিষিদ্ধ ঃ ক পারস্পরিক রক্তপাত এবং খ. পারস্পরিক যৌনসম্পর্ক স্থাপন। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজবোধ্য। রক্ত সম্বন্ধে আদিম মানুষের একটা ভয়জাত অলৌকিকতার সংস্কার সহজাতভাবেই ছিল। জ্ঞাতিরক্তপাত আসলে আদিপুরুষ সেই পশুর বক্তপাতেরই প্রকারান্তর; অতএব জ্ঞাতির রক্তপাত ঘটলে টোটেম পিতার ক্রোধ সঞ্জাত হবে, যা-নাকি সমূহ ক্ষতিরই কারণ হবে। কিন্তু যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়েছিল কেন আদিমকালে সমটোটেমীদের মধ্যে?

প্রথমত, যৌন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকালে নারীদেহ থেকে প্রাথমিকভাবে একটা রক্তপাত অনিবার্য হয়ই ; সুতরাং সেই নারী --- যে-নাকি স্বটোটেমীয়া— তার রক্তপাত ঘটছে পুরুষেব সাহচর্যে। এব ফলে জ্ঞাতি-রক্তপাতের পাপ অর্শাবে, এমন ধারণা

সমটোটেমীয় নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল স্মরণাতীত কালেই। দ্বিতীয়ত, ঐ সম্পর্কের পরিণতিতে পুরুষের ক্ষেত্রেও যা ক্ষরিত হয়, আদিম (আদিম শুধু কেন, একালীনও) মানুষের মনে তাও রক্তেরই রকমফের মাত্র। সুতরাং এদিক থেকেও সমটোটেমীয়দের মধ্যে যৌনসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। আবির্ভাব হতে শুরু করল ট্যাবুর। (এই ব্যাপারটি পরে বিশ্লেষিত হয়েছে।)

এইভাবে টোটেমকে উৎস করে ট্যাবু গড়ে-ওঠার পরিণতিতে মানুষের সামাজিক ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী পালাবদল ঘটল, যার পরিণতি হল সুদূরপ্রসারী। স্ব-টোটেমে যৌনসম্পর্ক ঘটা ট্যাবু-রূপে গণ্য হওয়ায় স্বভাবতই ভিন্ন টোটেমে বিবাহ প্রচলিত হতে থাকল। এই বহির্বিবাহ ধীরে-ধীরে বিভিন্ন টোটেমগোষ্ঠীকে আত্মীয়তার সূত্রে লাগল আবদ্ধ করতে। ফলে একদা যারা ছিল ছোট-ছোট স্বকেন্দ্রিত দ্বীপের মতো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী, তারা ক্রমে-ক্রমে পরিণত হতে থাকল বৃহত্তর সমাজে : গোষ্ঠী থেকে কোম বা ট্রাইব এবং তার থেকে আস্তে-আস্তে জাতি বা নেশানেও বিবর্তন ঘটেছে এই পথ বেয়েই।

পারস্পরিকভাবে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান যতই বেড়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, সে-সবের অনিবার্য শর্তে ততই আবার নূতনতর সামাজিক কাঠামোরও বিন্যাস ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে যে-সমাজ গড়ে উঠতে লাগল অবিরামভাবে, তার সবটাই যে টোটেম এবং তার থেকে সঞ্জাত ট্যাবুর কারণেই শুধু সম্ভব হয়েছে, এমন ভাবলে ভুল হবে কিন্তু, একথা এখানে বলে রাখা ভাল। তবে সভ্যতার বিবর্তনে ও-দুয়ের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অবশ্যই ছিল, সে কথাও স্মরণযোগ্য। টোটেমকে উপলক্ষ করে যে-যৌনট্যাবু তৈরি হয়েছে, তার মাধ্যমে মানুষের কতকগুলো রুচিগত শুচিতারও সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে, এর ফলে অতি আদিম পর্যায়ে যেসব জান্তব অজাচারে মানুষ অভ্যস্ত ছিল, সেটা ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে গেল। জীবন যাপনের কতকগুলো নৈতিক মাপকাঠিও এর থেকে তৈরি হল, যা সমাজের শ্লথবদ্ধ মূল্যবোধকে সংহতও করেছিল।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দুয়েকটি প্রবল ব্যতিক্রমের কথাও আবার না বললে নয়। টোটেমের নিরাপত্তা রক্ষার যে-প্রথা প্রায় সর্বজনীন, তারও কখনও-কখনও ব্যতিক্রম আছে। কোনও বিশেষ সময়ে টোটেম প্রাণীটি যদি খাদ্য হিশেবে অচল না হয় (কিন্তু মানুষ খায় না, এমন কী প্রাণী আছে!) তাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলার রেওয়াজও বহু সমাজে দেখা যায়। নৃতাত্ত্বিকেরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে — কোনও বিশেষ ঋতুতে বা দিনে, ঐ পশুর পবিত্রতা তুরীভূত বলে ধরে নেয় সেই সমাজ। ঐ সময়ে ঐ বিশেষ পশুর মাংস ইত্যাদি খাওয়ার তাৎপর্য হল, আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তার দৈব শক্তিকে নিজের সত্তার সঙ্গে আত্মস্থ করে ফেলা। এটা ফুল-লতা-গাছ ইত্যাদি টোটেমের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

টোটেমের যথার্থ স্বরূপটিকে বুঝতে আফ্রিকার সেনেগাল রাষ্ট্রের কবি-রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেংঘরের লেখা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যময় কবিতা বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। কবিতাটির নামই হল 'টোটেম'। সেংঘর লিখছেন (যথাসম্ভব মূলানুগত অনুবাদ করে দেওয়া গেল এখানে) :

"তাকে আমার লুকিয়ে রাখতে হবে সঙ্গোপনে, ধমনীর একান্ত গভীরে—
আমার সেই আদিম প্রপিতামহকে, যার ঝোড়ো-চামড়াটা ঝলসে গেছে
বাজ-বিজুলির হানায়।
তাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে আমায়, আমার সেই অলক্ষ্য রক্ষককে—
সেই পশুমূর্তি আরণ্য-পিতৃপুরুষকে, যাতে
আমি কোনও কলঙ্কের অঘটন না ঘটিয়ে ফেলি!

....

সে আমার ধমনীতে বহমান বিশ্বস্ত শোণিত;
জানি তার দাবী আছে বিনিময়ে আনুগত্য পেতে—
আমাকে বাঁচাতে চেয়ে
লজ্জাহীন অহমিকা,
আর ভাগ্যবান জাতিদের লাঞ্ছনার অনুদান থেকে।"

সেংঘরের এই কবিতার মধ্যে টোটেম-ভাবনার অন্তর্নিহিত অনুভবটি যেমন অভিব্যক্ত হয়েছে, ঠিক তেমনই আবার তার সামাজিকভাবে ব্যবহারিক অবস্থান যেখানে, তাও সূচিত হতে দেখা যাচ্ছে। টোটেম-ভাবনার মধ্যে যে পূর্ণায়ত জাতিসত্তা স্পন্দিত থাকে (অবশ্যই 'জাতি' অর্থে এখানে 'নেশ্যন'-কে বোঝাতে চাইছি না), সেটাও এই কবিতায় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এমন কী, পরাধীন আফ্রিকার লোকমানসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সম্পর্কে যে বিরূপতা ঐতিহাসিক সত্য-- টোটেমভাবনাকে তার সঙ্গেও মিশে যেতে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে। আধুনিক কালের এই টোটেম ভাবনায় এও একটি নূতন মাত্রা নিঃসন্দেহে, যা অভিনব হলেও অপ্রত্যাশিত নয় একটুও!

।। ৪ ।।

টোটেমের মাধ্যমে মানুষ যে নিজেকে পশুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদিম গুহাচিত্রগুলিতে। মানুষ পশু সেজে রয়েছে মাথায় হরিণের শিং লাগিয়ে কিংবা ভালুকের ছাল চাপিয়ে —এরকম দৃশ্য তো নানান্ দেশের পর্বতগুহার দেওয়ালেই আঁকা আছে, আর তার পাশেই আছে শিকারের দৃশ্য, যাকে বিশেষজ্ঞরা সাদৃশ্যমূলক জাদুবিশ্বাসের নিদর্শন বলে গণ্য করেন . শিকারের ছবি আঁকলে বাস্তবে শিকার জুটিয়েও দেবে শিকারের মান্যা; অতএব মান্যা > টোটেম-পশু। এক পশুর সঙ্গে নিজেদেরকে অভিন্ন করে ফেলতে পারলে, তার পরিচালিকা শক্তি (টোটেম) অন্যান্য পশুকেও শিকারের আওতায় এনে দেবে।

পশুর সঙ্গে এই অভিন্নতার কল্পনা পরবর্তী সময়ে কেবলমাত্র গোত্রভাবনা বা

বংশসূচক পদবীর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে এমন নয়। মানুষ সভ্যতার সোপানে বহুদূরে উঠেও নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক করে দেখেনি, দেখে না। যে দ্বাদশ রাশির এবং লগ্নের কোনও-না-কোনও একটির অধীনে সব মানুষেরই জন্ম—এই মর্মে প্রচলিত প্রাচীন গ্রীকো-রোমক এবং হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র-নির্ভর সংস্কার আজও স্বস্থানে সটান খাড়া—তাদের মধ্যে সাতটিই বিশেষ কোনও একটি প্রাণী: মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক, মীন এবং মকর (কল্পিত হলেও, প্রাণী তো বটেই) —অন্যগুলিও মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরকেই ব্যঞ্জিত করে ঃ ধনু (শিকার-নির্ভর যুগ), কুম্ভ (মৃৎপাত্র নির্মাণের স্তর), কন্যা (মাতৃকা-উপাসনার পর্যায়), মিথুন (সুনির্দিষ্ট বিবাহ প্রথার পত্তনীকাল) এবং তুলা (দাঁড়িপাল্লা হল ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর অর্থনীতির প্রতীক)। পরে পাঁচটি যেখানে মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়কে অবলম্বন করে তার ব্যবহারিক পরিচয়কেই সূচিত করছে, সেখানে পশুবাচক রাশি-ও-লগ্নের সূত্রে মানুষের পরিচয়ও তার সংস্কৃতির পূর্বতন স্তবেবই স্মৃতি বহন করছেনা যে, এমন ভাববার কারণ কিছু আছে কী?

বাৎস্যায়নেব 'কামসূত্র'-এ নারী এবং পুরুষের যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভাগ করা হয়েছে, তার পিছনেও সম্ভবত টোটেম-ভাবনার সূত্রই লুকিয়ে আছে। নারী হল : পদ্মিনী (< পদ্ম), শঙ্খিনী (< শঙ্খ কিংবা শঙ্খচূড়), চিত্রিণী, (< চিত্রী .. চিতাবাঘ) এবং হস্তিনী (টীকা নিষ্প্রয়োজন)—এই চার প্রাণীব শরীর ও চরিত্র-লক্ষণের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বিচার্য। আর পুরুষের ক্ষেত্রে : শশ (= শশক), গজ (হাতী), বৃষ (= ষাঁড়) এবং হয় (= ঘোড়া) এই চারবর্গীয়। পদ্ম এবং সাতটি প্রাণী—এরা সবাই টোটেম।

পশুকে এইভাবে নিজের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার সূত্রেই লোককাহিনীতে পশুব সঙ্গে মানব-মানবীর বিবাহের ঘটনা সারা পৃথিবী জুড়েই কল্পিত হয়েছে। ইউরোপীয় রূপকথা 'ফ্রগ প্রিন্স' থেকে আরম্ভ করে বাংলার 'পরস্তাব' 'ডালিমকুমার' অবধি শত-শত লোককাহিনী উল্লেখ্য। গ্রীক ধ্রুবপদী-পুরাণবৃত্তের বৃষরূপী জিউসের সঙ্গে ইউরোপার মিলন, রাজহংসের কলেবরধারী ঐ জিউসের সঙ্গেই লেডার সঙ্গত হওয়া যেমন অনুরূপ অজস্র কাহিনীর মধ্যে মাত্র দুটি, ঠিক তেমনই নাগিনী উলূপীর সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে এবং ভল্লুকী জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়েও, হিন্দু পুরাণবৃত্তের অন্তর্গত সদৃশ অসংখ্য প্রাচীন কাহিনীর মাত্র একজোড়া নমুনা। এগুলো সবই ভিন্ন টোটেমভুক্ত নারীর সঙ্গে বিবাহের সূচক মাত্র। অনুরূপ ভাবেই 'ফ্রগ প্রিন্স'-এ ব্যাঙকে এবং 'ডালিমকুমার'-এ অজগরকে বিয়ে করার কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ঐ দুই টোটেমেব পুরুষকে বিয়ে করার প্রতীকী-কাহিনী বলেই ধার্য। বৌদ্ধ মিথোলজিতে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর দেহে স্বপ্নের মধ্যে শ্বেতহস্তী বিলীন হবার যে-বিবরণ মেলে, তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে হস্তী টোটেম-সম্পন্ন লিচ্ছবিরাজ শুদ্ধোদনের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হবারই রূপক। শ্বেত বর্ণটি দৈবী মহিমাসূচক। লোককাহিনীতে প্রায় সব সময়েই দেখা যায় যে, পশুচরিত্রগুলি মোটামুটিভাবে সমস্ত দিকেই মানবিক গুণসম্পন্ন। পশু থেকে

মানুষে রূপান্তরণও বহুল-প্রচলিত। এক-একটি জাতি / দেশও প্রায়শই এক-একটি পশুর চিহ্নে সূচিত হয় ঃ সিংহ (ইংলণ্ড), ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়া), ভালুক (রাশিয়া) ইত্যাদি।

পশু-টোটেমের সূত্রে মানুষ চিত্রকলা এবং সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তেমনই তার নৃত্য এবং সঙ্গীতও পশুর সঙ্গে অভিন্নতার সূত্রেই বহুলাংশে বিবর্তিত। পশু সেজে নাচবার হদিশ তো গুহাচিত্রেই মেলে; এখনও ছৌ লোকনৃত্যে পশুচালের খুব বড় ভূমিকাই আছে। 'মুখা খেল' ইত্যাদিতে পশু সেজেই নাচতে হয়, যেমন ত্রোয়া ফ্রেরে (ফ্রান্স) গুহার দেওয়ালের গায়ের পূর্বোল্লিখিত সেই ছবিতে দেখা যায় +২৫ হাজার বছর আগেও মানুষ ঠিক একই ভাবে নাচত। সংগীতের সাতটি স্বরই মানুষ মনে করেছে পশুপাখির নকলে তৈরী ঃ সা (ময়ূর), রে (বৃষ), গা (ছাগ), মা (সারস), পা (কোকিল), ধা (অশ্ব), নি (হস্তী)।

এই সমস্ত ধরনের টোটেম-ভাবনাই মানুষের সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। যেমেন, চীনা পঞ্জিকার অনুসারে বর্ষ-নির্ণয় ঃ ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোস, ড্রাগন, (ঐ মকরের মতোই, কল্পিত হলেও প্রাণী তো বটে!) সাপ, ঘোড়া, ছাগল, বাঁদর, মোরগ, কুকুর এবং শুওর। ম্যাসকট বা শুভ প্রতীক হিশেবে কোনও পশুকে গ্রহণ করা (যেমন, 'আপ্পু' হাতী কিংবা 'বাবু'-বাঘ খুব পরিচিত ম্যাসকট), জাতীয়-পাখি (যথা, 'ময়ূর'), রাষ্ট্রীয় চিহ্ন (প্রাচীন কালে এই উপলক্ষে পশু-বিশেষের চিত্র ব্যবহার করা হতো) ইত্যাদিও পশুর পরিত্রাতা চরিত্রদ্যোতক। সংস্কৃতির সমস্ত স্তরেই এইভাবে টোটেমের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অস্তিত্ব মানুষের বিবিধ ধরনের ধ্যান-ধারণাকে স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রভাবিত করে আসছে যে, সেটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এরই ফলিত ফলশ্রুতি 'ব্যাঘ্রবিক্রম', 'সিংহভাগ,' 'বৃষস্কন্ধ', 'মরালগমনা', 'হরিণনয়না', 'কোকিলকণ্ঠী' এবং 'গজেন্দ্রগামিনী' জাতীয় উপমা, তুলনা।

পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত ভাষাতেই গালিগালাজের ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে অভিন্নতার একটা কল্পনা করা হয়। যেমন : 'শুওরের বাচ্চা', 'হারামজাদা', 'সন অব আ বিচ্', 'গোরুর মতো বুদ্ধি', 'চিকেন-হার্টেড', 'পিগ-হেডেড', 'বুল-শিট', 'সাপের মতো খল', 'টিকটিকি' (গোয়েন্দা অর্থে) 'ভোঁদড়' (বোকা অর্থে), 'ঢ্যামনা' (নপুংসক অর্থে) ইত্যাদি। প্রবাদ-প্রবচনেও ঐ সমীভবনের নমুনা মেলে। 'মাছের মায়ের কান্না', 'কুম্ভীরাশ্রু', 'ব্যাঙের সর্দি', 'ঘোড়ার কামড়', 'বেড়ালের মাছে অরুচি', -ইত্যাদি তির্যক-বিদ্রূপবাচন তারই প্রমাণ দেয়। অবচেতনভাবে মানুষ যে নিজেকে পশুর সঙ্গে এক করেই দেখে, এগুলি তারই প্রমাণ। চেতনে এসে, সেটি বিপ্রতীপ-মুখী হয়েছে এই মাত্র

।। ৫।।

টোটেমের আলোচনা শেষ করার আগে তার মূল বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়। পশুর উৎস থেকে সঞ্জাত এই ভাবনা প্রকৃতপক্ষে আদিম মানুষকে এক ধরণের সমান ঐতিহ্য-তথ্য-উপলব্ধির বাঁধনে জড়িয়েছে। এটাকে

মানুষের পরস্পরের মধ্যে প্রথম ঐক্যবোধসূচক ব্যাপার হিশেবে গণ্য করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে তার বাঁচবার, আত্মরক্ষা করবার এবং জীবিকা অর্জনের মাধ্যম সব সময়েই যেহেতু পশু-পাখি, ফল-মূলই হয়েছে, তাই একটা স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতার বোধও এর থেকে হয়েছে উৎসারিত। এই সমস্ত কার্যকরণ মিলিয়ে টোটেমকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা চলে ঃ ক. গোষ্ঠীগত; খ. গোষ্ঠীর বিশেষ অংশ (যেমন, নারী, পুরুষ)-গত এবং গ. ব্যক্তিগত।

এদের মধ্যে ক-শ্রেণীর টোটেম নিয়ে বিস্তৃত ভাবে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। খ-বর্গীয় টোটেম থেকে গড়ে উঠেছে আদিম মানুষের মনে নারীর গর্ভসঞ্চার সম্পৃক্ত ভাবনা। গ-প্রকরণের টোটেম বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব কিছু-কিছু সংস্কার বা ধারণা। গোষ্ঠীর কোনও পুরুষেব টোটেম-শক্তিই নারীর গর্ভবতী হবার মূলে আছে, এইটেই তাবা ভাবত। এর থেকে ব্যক্তিগত টোটেমের চিন্তাটুকুও খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তবে যৌন-প্রভেদ-নির্ভব টোটেম-বিশ্বাসই কালক্রমে গোষ্ঠীবিশেষের টোটেমে পরিণতি পেয়েছে।

উত্তরকালে টোটেমের ঐ যৌন-বিভাজনটাই আবার ট্যাবুরও একটা প্রকরণে রূপান্তরিত হয়েছে : অমুক-অমুক টোটেম একান্তভাবেই মেয়েদেব, অতএব পুরুষেরা তার সংশ্রবেও আসতে পাবে না; এবং অমুক-অমুক টোটেম যেহেতু পুরুষসম্পৃক্ত, সুতরাং নারীর সংশ্রব যেখানে নিষিদ্ধ; অতএব ট্যাবু গড়ে উঠল এর থেকেও এক সময়ে।

প্রকৃতপক্ষে যৌনবিষয়ক ট্যাবু থেকেই সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা পালাবদল হতে লাগল যে, সেই কথা তো আগেই আলোচনা করেছি। তবে ট্যাবুর উদ্ভবও অনেক আদিম কালেই। আদিম মানুষের সীমাবদ্ধ বিচারশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অজ্ঞতাজনিত যে-সব সংস্কার গড়ে উঠেছিল প্রায় সহজাতভাবে, ট্যাবুব উৎস মূলত ছিল তারাই।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা একটু বলা দরকার। যে-কোনও নিষেধরীতিই কিন্তু ট্যাবুর অন্তর্গত বলে গণ্য হয় না। যে-কাজ বা যে-ব্যক্তি অথবা যে-বস্তু কোনও-না-কোনওভাবে কিছু-একটা অলৌকিক শক্তির দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তার বাবদে কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকলে তবেই সেটা ট্যাবু বলে গণ্য হবে। বস্তুতপক্ষে কোনও জিনিষের অতি-পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণা থেকেই ট্যাবুর বিকাশ। টোটেমের মতো ট্যাবুও বহুক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিগতও বটে; পুরো সমাজের সবাই মানে, এমন ট্যাবুর সংখ্যা কিছু কম নয়; বরং সেটাই বেশি।

আসলে মানুষ যবে থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে, খুব সম্ভবত তখন থেকেই নানান্ ধরণের 'অকরণীয় কাজ' সম্পর্কেও তার একটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করেছে। এই নিষেধমূলক ব্যাপারগুলি প্রাথমিকভাবে এক-একটা সংস্কার হিশেবে সঞ্জাত অথবা গোষ্ঠীগত কতকগুলি বিধানে পরিণত হয়েছে; এদের মধ্যে কিছু-কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে কোনও ধর্মানুষঙ্গ অথবা পাপপুণ্যের ধারণা

সম্পৃক্ত নয়। সেগুলি সাধারণ নিষেধাত্মক বিধি বলেই গণ্য। 'পাপ' হওয়া অথবা বিপদ-আপদ ঘটার কোনও কল্পনা তাদের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে নেই। কিন্তু যেখানে তা আছে, সেখানেই এই সব বিধি-সংস্কারগুলি বিশেষ ধরনের গুরুত্ব এবং সামাজিক কিছু তাৎপর্যও অর্জন করেছে।

একটু আগেই 'ট্যাবু'-র সঙ্গে পবিত্রতা-অশুচিতার বোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই এও বলেছি যে, এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ—'অপরিচ্ছন্ন'। অর্থাৎ যা কিনা অপবিত্র, নোংরা, অশুচি ইত্যাদি। অতএব সেই কারণেই নিষিদ্ধ। তবে উত্তরোত্তর এই শব্দটির ভাবগত পরিব্যাপ্তি ঘটেছে—অতি-পবিত্র, অতি-শুচি ইত্যাদি বিষয়, বস্তু এবং ব্যক্তিও ট্যাবুর এলাকাভুক্ত হয়ে থাকে; উপলক্ষ বলে গণ্য প্রাণী বা ঘটনাও এর অন্তর্গত বলে ধরা হয়। সভ্যতার সমস্ত স্তরেই, দেশ-কালনির্বিশেষে এই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যময় নিষেধবিধির সংস্কারগুলি প্রবহমান ছিল এবং আছে। সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়ের লোকপুরাণ বা মিথ, লোককথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যেও বহু বিচিত্র ট্যাবুর হদিশ মেলে। বাংলা লোককাহিনীতেও ট্যাবুর প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্নদেশের লোককথায় ট্যাবু ভাঙার অপরাধে নিদারুণ বিপন্ন হবার বেশ কিছুসংখ্যক মোটিফ-তথা -কাহিনীরেণুকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন স্টিথ টমসন তাঁর 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটেরেচার' গ্রন্থমালার মধ্যে। সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ই ('সি') তিনি এর জন্যে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই থেকেই বোঝা যায় লোককথায় ট্যাবু-সংস্কারের বিশ্বজনীন অভিঘাতটি কতটা গভীর এবং ব্যাপক। এবং এটা লোকমানসে ট্যাবুর গুরুত্ব যে কতখানি, সেটিই সূচিত করে নিঃসন্দেহে।

ট্যাবুর একটি বড় উপলক্ষ হল যৌনসম্পর্কঘটিত বিধি-বিধানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিক্ষেপ। আর একটি উপলক্ষ হল, বিচিত্র বিষয়-সম্পর্কে আদিম কালাগত একটা ভয়ের ভাবনা। অর্থাৎ, ক্ষুধা-ভয়-যৌনবোধ এই তিন মৌল জৈব-প্রবণতার মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির উৎস থেকেই সমস্ত ট্যাবুর উৎসারণ ঘটেছে।

আগেই বলেছি যে ট্যাবুর যৌনাচরণভিত্তিক উৎস থেকে সভ্যতার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে : বহির্বিবাহ। এই একটি বিশেষ ট্যাবুর উৎসটি খুঁজে দেখলেই মানুষের মনে নিষেধ চেতনার উৎপত্তি কেমন করে হয়েছিল, সে-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। রক্ত সম্বন্ধে মানুষের একটা সহজাত ভয় আছে; রক্তের নানান অতিলৌকিক শক্তি সম্পর্কে আদিম কাল থেকেই সে বিচিত্র সব কল্পনা করে এসেছে। সুতরাং, রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারেও তার অবচেতন মনে বিবিধ রকমের সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল স্মরণাতীত কালেই। রক্তকে জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ বা আত্মা বা সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা সেই রকমের একটি সংস্কার। শত্রুর রক্তপাত করা মানে, তার আত্মার ক্ষতিসাধন করা, শিকার্য পশুর রক্তপাত ঘটানো মানে তাকে কাহিল করে দেওয়া এই রকম কল্পনার পাশাপাশি নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর কারুর রক্তপাত হওয়ার অর্থ নিজেরই প্রাণসত্তার কিছু

অংশ অপচিত হল— এমনও ভাবা হয়। এক টোটেমের অন্তর্গত যারা, তারা একই পূর্বপুরুষাগত রক্তের উত্তরাধিকার বহন করছে; সুতরাং স্ব-টোটেমের কারুর রক্তপাত ঘটানোর অর্থ আদি পূর্বপুরুষরূপে কল্পিত ঐ টোটেমের প্রাণ বা সত্তার কিয়দংশের ক্ষতি করা। সেটা করলে অনির্দেশ্য অলৌকিক শক্তিরা রুষ্ট হবে এবং ক্ষতি করবে রক্তপাতকারী-রূপী ঐ 'অপরাধী'-র। সুতরাং, টোটেম-বলে-ভাবিত প্রাণীটির কোনও হানি করা যেমন বিপজ্জনক (কারণ সেই অপরাধ 'পাপ' রূপেই গণ্য করবে অলক্ষ্য অলৌকিক শক্তিরা) তেমনই গর্হিত স্ব-টোটেমীয় নরনারীর রক্তপাত করা। ঠিক এই কারণেই জ্ঞাতিহত্যা কিংবা স্ব-টোটেমীয় কারুরও অন্যভাবে 'রক্তপাতন' নিষিদ্ধ কাজ বলে গণ্য হল। টোটেম-প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে এই ব্যাপারটা তো বিশদ করে বলা হয়েছে কিছুটা আগেই।

।। ৬।।

ট্যাবুর কাঠামোকে তৈরি করে থাকে সর্বক্ষেত্রেই কোনও-না-কোনও একটা ভয়। আদিম গোষ্ঠীজীবন এমনভাবেই মানসিক দিক দিয়ে মানুষকে বন্দী করে রাখত (ঐতিহ্যানুসরণে গ্রস্ততা এবং অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতার কারণে) যে, মুক্ত চিন্তা এবং যুক্তিবুদ্ধির বিকাশ সেখানে ঘটত না বিশেষ। অতএব ট্যাবুর অলঙ্ঘ্যতা সম্পর্কেও মানুষের সংস্কার বলতে গেলে অনড় হয়েই থাকত।

ট্যাবু কত রকমের হতে পারে? সূক্ষ্ম বিচার করলে, সংখ্যাতীত। মোটামুটিভাবে বর্গীকরণ করলে অন্তত এতগুলি হতে পারে :

১. খাদ্য-পানীয়-বেশভূষা ও ব্যবহার্য-বস্তু সংক্রান্ত।
২. কথা বলা, শব্দবিশেষ উচ্চারণ করা, কিছু দেখা, মেলামেশা -ইত্যাদি সংক্রান্ত।
৩. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-ইত্যাদি সংক্রান্ত।
৪. কোনও বিশেষ কাজ করা-না-করা সংক্রান্ত;
৫ কিছু ছুঁয়ে ফেলা-ইত্যাদি সংক্রান্ত।
৬. দিনক্ষণ-তিথি-ইত্যাদি সংক্রান্ত।
৭ কোনও-কোনও কাজে বিশেষ-বিশেষ কারুর হাজিরা-গরহাজিরা সংক্রান্ত।
৮. বিশেষ কিছু ভঙ্গী বা মুদ্রা করা-না-করা সংক্রান্ত।
৯. বিশেষ কিছু ভাবা কিংবা না-ভাবা সংক্রান্ত।
১০ বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত।

এই দশটি বর্গের প্রত্যেকটিই অজস্র উপবর্গ এবং অনুবর্গে বিভাজিত হতে পারে। সেই জটিল বিন্যাসের মধ্যে জড়িয়ে না-পড়েও বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্যে মূল বর্গগুলির পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর। মূলত বাঙালীর সাংস্কৃতিক বলয় থেকেই সেগুলি সংকলন করা গেল এখানে।

১ম বর্গের ট্যাবুর অতি-পরিচিত উদাহরণ হল বাঙালী হিন্দু বিধবার অনেকগুলি

পালনীয় বিধি। মাছ-মাংস না-খাওয়া, লালপাড় শাড়ি, টিপ, শাঁখা, সিঁদুর না-পরা ইত্যাদি যেসব সংস্কার প্রচলিত আছে, সেইগুলিই ট্যাবু। নতুন কনে-বৌকে কালোরঙের শাড়ি ইত্যাদি না-পরতে দেওয়াও ট্যাবু।

২য় বর্গের ট্যাবুর সুপরিজ্ঞাত নমুনা ভাসুর-ভাদ্দর বৌতে কথা বলাব বাধা থাকা। কিংবা শ্বশুর ভাসুর স্বামী প্রমুখের নাম মুখে না-আনা। সেই গল্পটি তো বোধ হয় সকলেরই জানা: বউ তার বরকে বলছে, "কবিরাজ মশাই বললেন তোমাকে থেঁতো করে বট্‌ঠাকুরকে দিয়ে মেড়ে খোকাকে খাওয়াতে।" বলা বাহুল্য, মেয়েটির বর এবং ভাসুরের নাম যথাক্রমে তুলসী এবং মধু! কিংবা, "ফালিঘাটে ফেষ্টমামার বাড়িতে ফরিরামকে নিয়ে কাল একবার যাব।" কালী, কেষ্ট এবং হরি ইত্যাদি নামগুলি অবশ্যই মেয়েটির কাছে কোনও কারণে অনুচ্চার্য বলে ট্যাবু। এই বর্গেরই অন্তর্গত হল রাত্রে 'সাপ' না-বলে 'লতা' বলা, 'বাঘ' না-বলে 'বড় শিয়াল' বলা, 'ভূত' না-বলে 'ওঁয়ারা' বলা, চাল ফুরোলে সে কথা বলতে নেই ট্যাবু বলে : 'বাড়ন্ত' বলাই প্রথা। দেওরের সঙ্গে মেলামেশা ট্যাবু নয়, ভাসুরের সঙ্গে হলে অবশ্য তাই। শাশুড়ী-জামাই পরস্পরের দিকে তাকানো এবং কথা বলাও একদা নিষিদ্ধ ছিল। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু জাতিকোমের মধ্যে এই প্রথা এখনও আছে।

৩য় বর্গের উদাহরণ অঢেল। শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপুজো না-হওয়া পর্যন্ত সে এবং তার মা এক ধরনের 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য। তাদের ছুঁয়ে ফেলাটা ট্যাবু-ভঙ্গ বলে ধার্য। বিয়ের শুভদৃষ্টির আগে বরের মুখ কনেকে দেখতে নেই বলে যে-প্রথা আছে, তাও ট্যাবু। মড়া পুড়িয়ে ফিরে আসবার সময়ে পিছনে তাকাতে নেই, এই সংস্কারটিও ট্যাবু।

৪র্থ বর্গের অনেকগুলিই অবশ্য অবশ্য অন্যান্য বর্গেও বিচার্য হতে পারে। সন্তানের মায়ের লাউ-কুমড়ো দু-ফালা না-করা কিংবা নারকেল গাছ না-কাটা ইত্যাদিকে এই বর্গের ট্যাবু বলা চলে।

৫ম বর্গের ট্যাবুর নমুনা : নারীর নারায়ণ শিলা ছুঁয়ে ফেলা, কিংবা বাসি কাপড়ে টাকার বাক্স ছোঁয়া কিংবা চালের কৌটো ধরা-ইত্যাদির নিষেধ থাকা।

৬ষ্ঠ বর্গে, মাসপয়লায় কোথাও যাত্রা করা, গ্রহণের সময়ে কিছু খাওয়া, চৈত্র-ভাদ্র-ইত্যাদি মাসে বিয়ে হওয়া প্রভৃতিকে উল্লেখযোগ্য নিষিদ্ধ কাজ বলা চলে।

৭ম বর্গে, বিয়ে হবার সময়ে বিধবা নারীর ছাঁদনাতলায় থাকার বাধা, খুব পরিচিত একটি ট্যাবু।

৮ম বর্গের নমুনা, এক চোখ ঢেকে অন্য চোখ দেখানো, দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়া-ইত্যাদির নিষেধবিধি।

৯ম বর্গে, তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যাক ট্যাবু আছে। যেমন, ওষুধ খাবার সময়ে মৃত্যুর কথা মনে এলে, সে ওষুধ না-খাওয়া; কিংবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রাক্কালে অনুচিত চিন্তা এলে কাজটি এলে কাজটি সম্ভবপক্ষে না-করা।

১০ম বা শেষ বর্গের মধ্যে পড়ে ঋতুকালে মিলন বা পূজার দ্রব্য ব্যবহার

ইত্যাদি।

এই দশটি বর্গের অন্তর্গত ট্যাবুই সারা পৃথিবীতে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। পলিনেশিয়ায় এরা 'ট্যাবু', পশ্চিমবাংলার রাঢ় এলাকায় 'খ্যানোত', মরোক্কোয় 'বারাকা', নাগাল্যাণ্ডে 'গেন্না' জুলুদের সমাজে 'হলোনিপা', বেচুয়ানাল্যাণ্ডে 'ইলা' এবং অন্য সমস্ত সংস্কৃতিতেই এই ধরনের কোনও-না কোনও বিশেষ নামে এগুলি উল্লেখিত হয়।

।। ৭ ।।

ট্যাবুর অন্তর্কাঠামোয় ভয় এবং যৌনাভিকামনার অস্তিত্বের কথা ওপরে বলেছি। এই দশটি বর্গের ক্ষেত্রে ঐ দুই জৈব প্রবণতা কেমনভাবে ক্রিয়াশীল, তা একটু বুঝে নেওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ধর্মানুশাসন এবং জাদুর প্রত্যয় অনেক সময়েই এদের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে এই নিষেধ-সংস্কারগুলির পত্তন করছে। বস্তুর অন্তর্নিহিত কল্পিত অলৌকিক শক্তির (অর্থাৎ 'মান্যা') অসন্তোষ বা ক্রোধ ঘটবে এই-এই হলে, এর থেকেই যখন ট্যাবুর উদ্ভব, তখন স্পর্শ বা অনুকৃতির মাধ্যমে যে-জাদুশক্তির ক্রিয়াশীলতা ঘটে যায় বলে মানুষ ভেবে আসছে প্রাগিতিহাসের কাল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সেই জাদুই ঐ অলক্ষ্য শক্তিদের সক্রিয় করে তোলে : ট্যাবু ভঙ্গ হয়ে গেলে তারা শাস্তি দেয়। ওপরে উল্লেখিত উদাহরণগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশ্লেষণ করে দিলেই এটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যেমন ধরুন, ভাসুর-ভাদ্দরবৌতে কথা বলা। রক্তসম্পর্কীয় নয় এমন নারী-পুরুষে বাক্যালাপ তাদের যৌনসম্পর্কের সূচনা করে, এমন একটি আদিম সংস্কার এর মধ্যে আছে। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেহেতু স্বামীর চেয়ে সম্মানে বড়, তাই তার পক্ষে ছোট ভাইয়ের দ্বারা আগেই পরিগৃহীত-হওয়া নারীর সঙ্গে এবংবিধ আলাপনের সম্বন্ধে সম্পৃক্ত-হওয়া কৌমসমাজের বিধানকে খর্ব করে, সুতরাং এই বাক্যালাপ, ট্যাবু। দেওর, স্বামীর অনুজ বলে কথা বলায় দোষ নেই। (বস্তুত, দেবর = দ্বিতীয় বর!) সাপ, বাঘ, ভূত ইত্যাদির নাম উচ্চারণ করলেই সেই ধ্বনিপুঞ্জ যেসব ভয়ঙ্কর প্রাণীসত্তা-প্রভৃতির দ্যোতক, তারা মূর্তিমন্ত হবে, এমন আদিম সংস্কার অবশ্যই জাদুঘটিত। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য সেই বিলিতি প্রবাদ : 'টক অব দ্য ডেভিল, অ্যাণ্ড হি উইল অ্যাপিয়ার'। তেমনিই স্বামী, শ্বশুরের নাম মুখে আনলে তাঁদের আত্মার কিয়দংশ দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে এসে হাজির হবে, ফলে তাঁদের জীবন-সত্তার কিছুটা হানি হবে— এটাই হল জাদুবিশ্বাস। মন্ত্র-ইত্যাদিরও এই প্রত্যয় থেকেই উদ্ভব ঘটেছে।

কালো রং অশুভদ্যোতক, সুতরাং কালো শাড়ি নতুন বৌয়ের ক্ষতি করবে; স্পর্শ জাদু। কুমড়ো, গর্ভিণী নারীর মধ্যদেশের অনুরূপ, সুতরাং সন্তানবতীর কুমড়ো কাটা তার নিজের গর্ভের (বা গর্ভজাত / গর্ভস্থ সন্তানের) ক্ষতি করা; অনুকৃতিমূলক জাদু। মড়া পুড়িয়ে-ফেরার সময়ে পিছনে তাকালে মৃতের আত্মা দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছু নিতে পারে, স্পর্শ-জাদু। বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে যেহেতু মানুষ অশুভ শক্তির দ্বারা

গ্রস্ত থাকে বলে মনে করা হয়, সুতরাং সেইসব সময়ে কিছু করলে ঐসব শক্তির দ্বারা অভিভূত হতে হয়, অতএব সে-সব কাজ ট্যাবু। বিধবা নারীর উপস্থিতি কনের বৈধব্য আনতে পারে সংক্রমণমূলক জাদু। বাসি কাপড় বা ঋতুকালীন অবস্থা অশুচি বলে বিবেচ্য নানা কারণে, সুতরাং সেই অবস্থায় টাকা, চাল বা স্বামীকে স্পর্শ করে ফেললে হানি ঘটবে; স্পর্শ-জাদু।

ট্যাবুর অন্তর্লীন এই জাদু ও মান্যা-সম্পৃক্ত ধারণাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই, সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। যে-সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষের সামাজিক গুরুত্ব বেশি বলে স্বীকৃত, শ্বশুর-ভাসুর-কেন্দ্রিক ট্যাবুগুলি সেখানেই প্রবল। অর্থাৎ সামাজিক এবং পারিবারিক বিত্তাধিকারটা সেখানে পুরুষেরই আয়ত্তগত। পক্ষান্তরে, স্ব-গোত্রে / টোটেমে বিয়ে হওয়ার ব্যতিক্রমিক যে প্রসঙ্গটির কথা উল্লেখ করেছি, সেটি অতপর এখানে আলোচ্য। ভাই-বোন বলেই স্ব-টোটেমীয়রা গণ্য হয়; তাই তাদের বিবাহ / যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এই সংস্কারের পত্তন হয়েছে অজাচার ব্যাপারটা মানবসমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরে। কিন্তু সুসভ্য মিশর, লিচ্ছবিরাজ্য এবং আরও কোথাও-কোথাও ভাই-বোনের বিবাহও সিদ্ধ বলেই গণ্য হত। ঋগ্বেদের শ্লোকে আছে, যমী যমকে বিয়ে করতে চাইলে, যম ভগ্নীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইছেন এই বলে যে, এরকম বিবাহ আগে হতো, এখন এটি ঘটলে দেবতারা রুষ্ট হবেন। এই 'দেবতারা রুষ্ট হবেন' কথাটিই হল ট্যাবুর মূল সত্য। যে-পলিনেশিয়ার 'ট্যাবু' শব্দ আজকে বিশ্বজনীন, খোদ সেই এলাকাই কোনও-কোনও কৌমগোষ্ঠীতে ভাই-বোনে বিয়ে হওয়া আর সবার পক্ষেই ট্যাবু হলেও গোষ্ঠীর সর্দারের পুত্র-কন্যাদের পক্ষে কিন্তু বিয়ের একমাত্র পাত্রী বা পাত্র হিশেবে সামাজিক ভাবে স্বীকৃত যারা, তারা হল তাদের নিজেদের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা বোন। সর্দারের বংশের 'কৌলীন্য' যাতে 'হীনতর' বংশের রক্তমিশ্রণে 'ক্ষুণ্ণ' না হয় ট্যাবুর ব্যতিক্রমটা সেই জন্যেই।

যৌনট্যাবুর ব্যাপারটার এই যে ব্যতিক্রম, এর মূলে প্রকৃতপক্ষে আর সংস্কার নয়, আভিজাত্যের বোধ-তথা-শ্রেণীচেতনার ব্যাপারটিই সক্রিয়। 'অজাচার' বলে পরবর্তীকালে যে-ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা কখনও-কখনও আভিজাত্যেরই দ্যোতক বলে গণ্য হয়। দক্ষিণ ভারতীয় কোনও-কোনও ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীতে মামা-ভাগ্নীর বিয়ে হওয়াটাও ঐ সামাজিক আভিজাত্য বলেই স্বীকৃত।

তাহলে সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ই ট্যাবুর ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরাল থেকে। প্রাচীন মিশর, লিচ্ছবিরাজ্য-প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা থিয়োরি ঐতিহাসিকরা দাঁড় করিয়েছেন যে, ঐ-ঐ জায়গায় সম্পত্তির অধিকার ছিল কন্যাপরম্পরিত, পুত্র পরম্পরিত নয়; সুতরাং বোনের যদি ভিন্ন পরিবারে বিয়ে হয়, তাহলে সম্পত্তি তাদের হাতে চলে যাবে। এইটি ঠেকাবার জন্যই ভাই-বোনে বিবাহ প্রবর্তিত হয় ঐ সব দেশে। ট্যাবুর ক্রিয়াশীল চরিত্র এই আর্থনীতিক প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করতে পারেনি।

তবে, কোনও-কোনও ট্যাবু বহু সময়েই সাময়িক বলে ধার্য হয় সর্বত্রই। যেমন, আদিম সংস্কারানুযায়ী একটি নারী শুধু ততদিনই ট্যাবুর দ্বারা গ্রস্ত, যতদিন সে রজঃস্বলা হয়ে থাকবে। ঋতুস্নানান্তেই তার ট্যাবুত্ব শেষ হবে।

ট্যাবুকে যেমন অলঙ্ঘ্য বলে মনে করা হয়, তেমনই ফের তার প্রতিবিধান করারও বিধি খুঁজে পাওয়া যায় অনেক সময়। ট্যাবুকে 'নঞর্থক মানা' হিশেবে যে অনেক সময়েই মনে করা যায়, আর আর ম্যারেট সে-কথা বলেছেন। প্রতিবিধান করার ব্যবস্থাপত্র থাকলে ট্যাবুর সেই নেতিবাচক বা ক্ষতিকারক অতিলৌকিক অলক্ষ্য শক্তির কোপ থেকে ট্যাবুভঙ্গকারীকে অবশ্যই রক্ষা করা যায়, এই বিশ্বাসও কিন্তু দুর্লভ নয়। যেমন, কেনিয়ার কিকিউদের মধ্যে ট্যাবু ভেঙে ফেলার একটি বিচিত্র প্রতিবিধানের ব্যবস্থা চালু আছে। তাঁদের সমাজে, অজান্তে যদি সমটোটেমীয় দুটি নারী-পুরুষের বিয়ে ঘটে যাবার পর ব্যাপারটা জানা যায়, তাহলে সেই দোষও খণ্ডানোর পথ রয়েছে। সামাজিক একটি সমাবেশে বর-বউকে উপস্থিত করে, মেয়েটির কাঁধে একটা জ্যান্ত ভেড়াকে চাপিয়ে ঐ অবস্থায় সেটার গলায় কোপ দিয়ে হত্যা করা হয় এবং তারপরে সমাজপতিবর্গ মিলে তার নাড়িভুঁড়ি সব কেটেকুটে বার করে ফেলে দেন। ওঁদের বিশ্বাস, এর ফলে না-কি, মেয়েটির টোটেমের বন্ধনমুক্তি ঘটে, অনেকটা যেন আমাদের সমাজে স্বগোত্রে বিয়ের সম্বন্ধ এলে কনেকে তার মামার কাছে 'দত্তক' দিয়ে গোত্রান্তারিত করে স্বগোত্রে বিবাহের 'ট্যাবু' থেকে রেহাই দেবার মতন ব্যাপারটা।

ট্যাবুর আদিম চরিত্র যে পরবর্তীকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ স্বার্থ রক্ষণের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল হয়েছে, তার একটা চমৎকার প্রমাণ মেলে গ্রামবাংলার একটি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক লোককথার মধ্যে, যেটিকে এই অধ্যায়ের খুব মানানসই উপসংহার হিশেবে পেশ করা গেল .

গাঁয়ের নরসুন্দর মানিকের ছেলে রতন ছুটতে-ছুটতে ঠাকুর-মশাইকে শুধোল: "ঠা'ম্‌শাই, ঠা'ম্‌শাই, মাকড় মাল্লে কী পাপ হয় গো?" নিকুঞ্জ সার্বভৌম তো আঁৎকে উঠলেন একেবারে ঃ "অ্যাঁ! শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! নরসুন্দর-পুত্র হয়ে তুই মাকড় (মাকড়সা) নিধন করেছিস! ঘোর কলি: পাপে ডুবে গেল পৃথিবী—প্রাচিত্তির করতে হবে রে! প্রাচিত্তির করতে হবে।" . এই বলে নরসুন্দর-পুত্রের ট্যাবু 'ভাঙার' প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বেশ মোটা খরচের ফর্দ হাজির করলেন সার্বভৌম ঠাকুর। রতন ঠোঁটকাটা ছেলে। টটরে জবাব দিল ঃ "আমি নই গো, তোমার ন'ছেলে প্যাংলা মাকড় মেরেছে।" সার্বভৌম দাঁও ফসকানো জনিত দীর্ঘশ্বাসটা চেপে বললেন ঃ "আরে ব্যাটা বাউনের ছেলে মাকড় মাল্লে ধোকড় হয়।" . 'ধোকড়' অর্থে 'কিছুই না'। ট্যাবু মাত্রেই আসলে ঐ ধোকড়। . অন্ধ জাদুসংস্কারের সূত্রে আদিমকালে উদ্ভূত ধর্মীয় সংস্কারের আবরণে তার বেঁচে-থাকা এবং বহু ক্ষেত্রেই সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের চেতনার মধ্যে তার পরিণাম সূচিত।

ঘ. লোকাচার ও লোকসংস্কার : জাদুবিশ্বাসের বিবর্তন

লোকসংস্কার কাকে বলে এমন একটি প্রশ্নের জবাব চাইলে প্রায় প্রতিটি সময়েই পরস্পর-বিপ্রতীপ দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মুখোমুখি হতে হয়। বস্তুতপক্ষে একজনের চোখে যা প্রায় তার ধর্মপ্রত্যয়ের তুল্য বলে মান্য, ভিন্ন সংস্কৃতিবলয়ের মানুষ অথবা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীর কাছে সেটাই গণ্য হয় অন্ধ-কুসংস্কারের সামিল বলে। এ-ব্যাপারে, ভোলতেয়ারের একটি তীক্ষ্ণ পরিহাস বিশেষভাবেই হয়ত অনুধাবনের যোগ্য, যা গুস্তাভ জাহোদা তাঁর 'সাইকোলজি অব সুপারস্টিশ্যান' বইতে (হার্মণ্ডসওয়ার্থ, ১৯৭০), উদ্ধৃত করেছেন আলোচনার সূত্রে .

"যদি কোনও ফরাসি ভদ্রলোক ইতালিতে বেড়াতে যান, তাহলে তাঁর কাছে সেদেশের সবকিছুই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলে মনে হবে এবং, সম্ভবত তাঁর সেই ধারণা ভুল নয়। আবার ক্যান্টারবারির আর্চবিশপের কাছে প্যারির আর্চবিশপ নেহাৎই অন্ধ-সংস্কারে গ্রস্ত মানুষ বলে ধার্য হন। পক্ষান্তরে, প্রেস্‌বিটেরিয়ানরা কিন্তু ক্যান্টারবারির সুমহান যাজকশ্রেষ্ঠকে ঠিক একই রকম অভিধায় ভূষিত করেন। আবার কোয়েকারদের মতে প্রেস্‌বিটেরিয়ানরাই হচ্ছেন পাঁড় কুসংস্কারগ্রস্ত এবং অন্য সমস্ত শ্রেণীর ক্রিশ্চানদের কাছেই কোয়েকারদের চেয়ে বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন আর কেউই নয়!" (পৃঃ ১) ... ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮শ শতাব্দীর শেষদিকে ভোলতেয়ারের করা এই তির্যক্‌-মন্তব্যটি কিন্তু একটি বিশ্বজনীন সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। লোকসংস্কারের (নিন্দার্থে থাকে অধিকাংশ সময়েই 'কুসংস্কার' বলেও অভিহিত করা হয়) ক্ষেত্রে ফরাসি-ইতালীয়, কোয়েকার-প্রেসবিটেরিয়ান, প্যারি-ক্যান্টারবারি -
ইত্যাদি বলে কোনও বিশেষ পার্থক্য করা যায় না : গ্রীনল্যাণ্ড থেকে থাইল্যাণ্ড এবং আলাস্কা থেকে মাদাগাস্কার অবধি সমস্ত বিশ্ব জুড়েই সংস্কৃতির যে-অজস্রসংখ্যক বলয় আছে, তাদের প্রত্যেকটিই অসংখ্য লোকসংস্কার- তথা- কুসংস্কারের আশ্রয়স্থল হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সংস্কারগুলির অন্তরালে আছে জাদু এবং অলৌকিকে প্রত্যয় এবং হামেশাই এদের সঙ্গে সম্পর্কিত আচার-বিচারগুলি 'ধর্মাচরণ' হিশেবেই ধার্য হয়। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোকাচারগুলি ধর্মসংস্কার বলে গণ্য হলেও মূলত তারাও ঐ জাদুসঞ্জাত লোকসংস্কারেরই রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। কথাটার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য 'কেস স্টাডি' হিশেবে বিবাহাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সংস্কারকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মানুষের সভ্যতায় বিবাহ নামে প্রতিষ্ঠানটির যখন থেকে পত্তন হয়েছে, বলতে গেলে প্রায় তখন থেকেই এর সঙ্গে-সঙ্গে বহু-বিচিত্র আচার, সংস্কারেরও আবির্ভাব ঘটেছে। বিয়ের রীতিনীতির মধ্যে প্রথা-এবং-বিশ্বাসগতভাবে একটি প্রগাঢ় রক্ষণশীলতার ভাব সব দেশে, সমস্ত সমাজে, সর্বকালেই বজায় থাকে, ব্যবহারিকভাবে যদি সম্ভব না-ও হয়, মানসিকভাবে তো বটেই। জন্ম, মৃত্যু এবং বিয়ে---জীবনের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেজন্যেই অসংখ্য

ছোট-বড় সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত সমাজেরই লোকমনে এবং সেগুলিকে উৎসে রেখে গড়ে উঠেছে অজস্র লৌকিক আচার। একজন মানুষের সংস্কারাবদ্ধতার ব্যাপকতম নিদর্শন এদের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই তিনটির মধ্যে আবার বিয়ের ক্ষেত্রেই বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-ইত্যাদির পরিমাণ আনুপাতিকভাবে অন্যদুটির চেয়ে অনেক বেশি। মৃত্যুকেন্দ্রিক আচার-বিধান অন্তত আমাদের দেশে শাস্ত্রীয়ই বিধানের দ্বারাই তুলনায় অনেক বেশি শৃঙ্খলিত। তাই বিয়ের আচার-বিশ্বাসগুলির পর্যালোচনার সূত্রেই লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের যথার্থ রূপটির খোঁজ মেলে।

প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আচার দ্বিবিধ : ধর্মীয়-তথা-শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক। যে-সমস্ত সমাজ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশি পরিণত হয়ে উঠেছে, তাদের বিবাহে ধর্মীয় আচারের অনেকগুলি দিক শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেয়েছে; পক্ষান্তরে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তো ও দুটিকে প্রায় সমার্থকই বলা চলে। শাস্ত্রাচার বলে স্বীকৃত বিবাহ-পদ্ধতি-ও-রীতিগুলিরও এক সময়ে যে লোকাচার রূপেই সৃষ্টি হয়েছিল, প্রসঙ্গক্রমে সে-কথাটিও এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন মশলা বা শস্য পেষার শিল/পাথরের ওপর দাঁড়ানো, ঐ বস্তুটির সম্পর্কে আদতে এক ধরনের শুভদ্যোতকতার বোধ থেকে সঞ্জাত। আদিম অন্ন কেন্দ্রিত সংস্কারই কালক্রমে বৈদিক বিয়ের রীতির সঙ্গে একীভূত হয়েছে (অথর্ববেদের '১/৪৭' এবং '১/১৩/৪' সূত্র দুটি এখানে মনে করা যেতে পারে)। বস্তুতপক্ষে বিবাহের লৌকিক রীতি ও তাদের আনুষঙ্গিক উপচারগুলিকে অবলম্বন করে যে-কোনও জাতিরই আদিম ও প্রাচীন সংস্কার এবং ঐতিহ্যের ধারাটির সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তোলা কঠিন নয়। বহুক্ষেত্রেই এগুলি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে বিশেষ মূল্যবান্ বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের দুই বাংলার মানুষের মধ্যেও প্রাগিতিহাসের কাল থেকে প্রচলমান বহুবিধ বিশ্বাস এবং ধারণারও যে সন্ধান মেলে নানা অঞ্চল, ধর্ম এবং জাতিগোষ্ঠীর বিবাহ-সম্পৃক্ত আচার-ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। মানব-সভ্যতায় বিবাহের ভূমিকার ইতিহাস যিনি রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন, সেই এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্কের ভাষায় এগুলি হল "ফসিলাইজড় এক্সপ্রেশ্যন্স" ('হিস্ট্রি অব হিউম্যান ম্যারেজ', লণ্ডন, ১৯২৫; ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯২)। আদিম মানুষের সুখ-শোক, লজ্জা-দ্বিধা, আকাঙ্ক্ষা- প্রত্যাশা, ভয়-আনন্দ প্রভৃতি সর্ববিধ মানসিক আবেগ, যা আজও বিবাহের সঙ্গে সুনিবিড় হয়ে জড়িয়ে রয়েছে, সেই আবেগ বা ইমোশ্যনই এদের মধ্যে "ফসিলাইজড্" হয়ে রয়েছে, এটাই তাঁর বক্তব্য। কথাটা সর্বতোভাবেই মান্য। ব্যবহারিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষ যত উন্নতই হয়ে উঠুক না কেন, মানস সংস্কৃতির স্তরে এখনও যে তার ভিতরে বহুবিধ আদিম অনুভূতি এবং বিশ্বাস সযত্নেই লালিত হয়েছে, সে-কথা তো বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা ভাল কি মন্দ, সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এর বাস্তব সত্যতা নিয়ে কোনও সন্দেহের যে অবকাশ নেই, সেটা প্রশ্নাতীত।

এই আদিম-সংস্কারগুলির অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তিগুলির মধ্যে প্রধানতম

হল জাদু ও দৈবশক্তির সম্বন্ধে আস্থাশীলতা। বিবাহের লোকাচারের দুটো দিক . একটি হল সামাজিক স্বীকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত; সেটি গৌণ। অন্যটি হল ঐ জাদু এবং দৈবসংস্কারের অনুষঙ্গবাহী। মুখ্য সেটিই। জাদু-সংস্কার-নির্ভর বিবাহের লৌকিক আচারগুলিও আবার মূলত তিনটি পর্যায়ের বলে বিবেচিত হয়

ক. পবিত্রীকরণ- বা শুদ্ধিকরণ-কেন্দ্রিক;

খ. প্রতিষেধনকারী;

গ. উর্বরতাসাধনের গুণসমৃদ্ধ।

বর এবং কনেকে সব রকমের শারীরিক গ্লানি, অপরিচ্ছন্নতা এবং অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত করে তোলার পিছনে যে-জাদুসংস্কার সক্রিয় তা হল এই যে, এর কারণে তাদের দাম্পত্য জীবনে শুভকারী দৈবশক্তি সমূহ না-কি শুভ প্রভাব ফেলবে। এরই পিঠ-পিঠ অশুভ শক্তি বা অপদেবতা বা অনুরূপ আর কিছু যাতে তাদের যৌথ জীবনের কোনও ক্ষতি ঘটাতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করার মানসিকতাও সমান ভাবেই সক্রিয়। আর বিবাহের যা প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ, সন্তান-সন্ততি পাওয়া, সে-আকাঙ্ক্ষা যাতে ফলবতী হয় নির্বাধে, তার আয়োজন করা হল তৃতীয় ধরণের সংস্কারের পশ্চাৎপট। এই তিনটি মানসিকতার উৎসেই আছে আদিম জাদুবিশ্বাস, আর তার থেকেই গড়ে উঠেছে ঐ তিন ধরণের লোকাচার, যা আজও সর্বদেশে, সমস্ত সমাজে কোনও-না-কোনও ভাবে- প্রচলিত। তৃতীয় ধরণের অর্থাৎ উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে গড়ে ওঠা বিবাহের লোকাচারগুলিকেও আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে হবে :

১. কৌমার্যভঙ্গের প্রতীকসূচক

২ দাম্পত্যমিলনের ইঙ্গিতব্যঞ্জক

৩ সন্তান-সম্ভাবনার ব্যঞ্জনাবহ

৪ নিরাপদে সন্তানলাভের প্রত্যাশাদ্যোতক

আগে উল্লিখিত তিনটি বর্গের মধ্যে মূলত তৃতীয়টির অন্তর্গত এই চারটি অভিপ্রায়ই বিবাহের যাবতীয় লোকাচারের সিংহভাগ অধিকার করে আছে; অন্তত, আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়ে যাবার পরবর্তী আচারগুলির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই এ কথা স্বীকার্য।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের লোকাচার নিয়ে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব উপকরণ ও রীতি অবলম্বন করে লোকাচারগুলি পালিত হয়ে থাকে, তারা ধর্মগত, এলাকাগত বা জাতিগত ভেদ রেখাগুলিকে অতিক্রম করে যায়। হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সাঁওতালী কিংবা পূবী পশ্চিম উত্তরী দক্ষিণী ইত্যাদি আচার বা 'আইসা' - গত বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত একটি প্রধান রীতিধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। নিচের সারণী দুটি

থেকেই একথার সমর্থনে অনিবার্য সাক্ষ্য মিলবে (নিচে সারণীর সংকেত নির্দিষ্ট হল)।

ক. হিন্দু (পশ্চিমবঙ্গীয়); খ. ঐ (পূর্ববঙ্গীয়), গ. ঐ (উত্তরবঙ্গীয়); ঘ. মুসলিম (পশ্চিমবঙ্গীয়), ঙ. ঐ (উত্তরবঙ্গীয়); চ. খ্রিস্টান; ছ. বৌদ্ধ, জ. সাঁওতালী।

এখানে একটি কথা বলবার আছে। ধর্মগত পার্থক্য যা-ই থাকুক না-কেন, বাঙালী মাত্রেই যে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক-উৎসজাত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা মানসিকভাবে মূল একটিই সাংস্কৃতিক পরম্পরার উত্তরসূরী হিসেবে গণ্য। সেই পরম্পরার সঙ্গে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীজ জাতিগুলিরও সম্পর্ক খুবই নিবিড়। বস্তুতপক্ষে, সাঁওতালরা বাঙালীদের সঙ্গে নৃ-সাংস্কৃতিক একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায়ও আবদ্ধ যে, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। লোকাচারের উপকরণ প্রয়োগের এই নিদর্শনগুলি তারই প্রমাণ।

বাংলাদেশের এই সব বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিবাহের প্রাসঙ্গিক লোকাচারে নানা সময়ে যেসব উপকরণগুলি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে কোনটি কাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় সেটি নিচের সারণীতে বিন্যস্ত হল

১. হলুদ (ক থেকে জ); ২. সিঁদুর (ক থেকে ঘ, চ, জ);
৩. পান (ক থেকে চ); ৪. সুপারি (ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ),
৫. কড়ি (ক থেকে ঙ, জ) ৬. ঘট (ক, খ, গ, ঙ থেকে জ)
৭. কলা (ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ) ৮. ধান চাল-শস্য ফল-ইত্যাদি (ক, খ, গ, ঙ থেকে জ),
৯. দূর্বা (ক, খ, গ, ঙ থেকে জ) ১০. আম্রপল্লব (খ, গ, ছ, জ),
১১. মাছ (ক থেকে ঘ), ১২. আংটি (ক থেকে চ),
১৩. শিল-নোড়া (ক, খ, গ, ঙ, ছ, জ); ১৪. তেল (ক থেকে ঘ, ছ, জ),
১৫. ক্ষীর দুধ-দই -ইত্যাদি (ক থেকে ছ) ১৬. আলতা (ক থেকে ঘ),
১৭. খই (ক, খ, গ, ঙ) ১৮. কুলো (ক, খ, গ, ঙ থেকে জ)
১৯. লোহা (ক থেকে ঘ, ছ, জ), ২০. শোলা (ক, খ, গ, ছ)

এই পর্যায়ে আলোচিত মোট আটটি গোষ্ঠীর মধ্যে কমপক্ষে ৫০% যে-উপকরণগুলি ব্যবহার করেন, ওপরের সারণীতে তার বিন্যাস করা হয়েছে। এ ছাড়াও কমপক্ষে অন্তত তিনটি গোষ্ঠীর বিবাহ লোকাচারে ব্যবহৃত হয় এমন উপচারও খুব কম নয়, যেমন

১. কুনকে ; পোয়া (ক, খ, গ); ২. শাঁখ (ক, খ, গ);
৩. চন্দন (ক, খ, গ), ৪. সুতো (ক, খ, জ);
৫. গোবর (ক, খ, গ); ৬. সোনা-রুপো (খ, চ, ছ),
৭. ফুল (ক, খ, গ); ৮. ডিম (ক, খ, জ)।

৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
হলুদ	কুলো, ঘট, শস্য/ফল/দূর্বা, জাঁতি-দর্পণ, দুগ্ধজাত খাবার	সিঁদুর, তেল, লোহা, আংটি, শিল-নোড়া, পান, সুপুরি, কলা, কড়ি		মাছ, আম্রপল্লব, খই, আলতা, শোলা	কুনকে / পোয়া, শাঁখ, চন্দন, সুতো, গোবর, সোনা-রূপো, ডিম, ফুল		

শুধু উপকরণ নয়, আচারের ক্ষেত্রেও এ রকমের ব্যাপক সমধর্মিতা দেখা যায়। এদেশে বিবাহের প্রধান লোকাচার যেগুলি, তাদের মধ্যে মিলের পরিমাণ হল এইরকম :

১. গায়ে-হলুদ (ক থেকে চ, জ);
২. আইবুড়োভাত / থুবড়োভাত / হলদি মুখধোয়া/ তেললোয়াই (ক, গ থেকে জ)
৩. উলু দেওয়া (ক, খ, গ, ছ);
৪. জল ভরে আনা (ক, খ, গ চ, ছ জ);
৫. লোহা দিয়ে জল-কাটা (ক, খ, গ, জ);
৬. আলপনা দেওয়া (ক, খ, গ, জ);
৭. ছড়া/গান (ক থেকে ছ),
৮. বরণ (ক, খ, গ, চ, ছ, জ);
৯. পঞ্চপ্রদীপ জ্বালা (ক, খ, গ, ছ, জ)
১০. সাত /তিন পাক ঘোরা (ক থেকে ঙ, ছ, জ);
১১. পাশা-কড়ি খেলা (ক থেকে ঙ),
১২. গিঁট বাঁধা (ক থেকে ঘ, জ);
১৩. ভাঁড় বা কড়ি মাড়ানো (ক, গ, ঘ, চ),
১৪. পুকুর খোঁজা (খ, গ, ঙ, ছ);
১৫. উর্বরতাসূচক চিহ্ন অর্থাৎ ষষ্ঠীর পুতুল, বসুধারা, স্বস্তিকা-ইত্যাদি আঁকা (ক থেকে ঘ, ছ জ);
১৬. সিঁদুর দেওয়া (ক, খ, গ, চ, জ);
১৭. মালাবদল (ক, খ গ, চ, ছ),
১৮. (বাপের বাড়ি থেকে কনের যাবার সময়) শস্য/ফল ফেলে দিয়ে যাওয়া (ক খ চ ছ জ);

১৯ (শ্বশুর বাড়িতে কনের) ঝাঁট দিয়ে ২০ অষ্টমঙ্গলা/ ফিরানি /লাউঠি /
শস্য/ফল তোলা (ক থেকে চ), নবদিন (ক থেকে ছ);

৮	গান গাওয়া, ছড়াকাটা
৭	গায়ে-হলুদ, আইবুড়োভাত, পাকঘোর, অষ্টমঙ্গলা
৬	জলভরা, বরণ, উর্বরতার চিহ্ন আঁকা
৫	ফল/শস্য ছোঁড়া, প্রদীপ জ্বালা, পাশা-কড়ি-খেলা, গিঁট বাঁধা, সিঁদুর দেওয়া, মালাবদল করা
৪	উলু দেওয়া, জলকাটা, ভাঁড়-মাড়ানো, পুকুর খোঁজা, আলপনা দেওয়া
৩	শস্য কুড়োনো
২	
১	

।।৩।।

সমাজবিজ্ঞান এবং লোকসংস্কৃতির সন্ধিৎসু ছাত্র মাত্রেই জানেন যে উল্লিখিত সমস্ত ক-টি উপকরণ এবং আচারই কোনও-না-কোনওভাবে সুদূর অতীতের কোনও বিস্মৃত ভাবনার ঐতিহ্য বহন করছে। সেই অতীত শুধু মাত্র দু-চার শতাব্দীর নয়, প্রচলিতভাবে যাকে প্রাক্-ঐতিহাসিক বলা হয়, সেই আদিম যুগেরও ঐতিহ্যবহন করছে বহু ক্ষেত্রে। স্মরণযোগ্য, সেই ঐতিহ্য শুধু এইখানে উল্লেখিত ধর্মীয় বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিরই একান্ত নয়, বলতে গেলে বিশ্বজনীন। জাদু-ও-দৈবশক্তি- সম্পৃক্ত আদিম ধারণাগুলি এখন তাদের মূল তাৎপর্য হারিয়েছে, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে নূতন অর্থও আরোপ করা হয়েছে. কিন্তু উপকরণ ও আচারের রীতিগুলি কোনও-না-কোনওভাবে সারা বিশ্ব জুড়েই এখনও প্রচলিত। এই সূত্রে উল্লেখিত কয়েকটি উপচার এবং আচারের আদি-তাৎপর্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে এখনও তাদের প্রচলন কতখানি, তার আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা গেল এখানে · হলুদ, সিঁদুর, কড়ি, কলা, পাথর (শিল নোড়া), লোহা (জাঁতি, কাটারি. দর্পণ), ঘট, আলতা. ফল, ফুল, শস্য-ইত্যাদি বস্তুগুলি প্রায় সর্বজনীনভাবে বিয়েতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হলুদ রঙকে বহুলভাবেই অশুভ শক্তির প্রতিষেধক ক্ষমতা-সম্পন্ন বলে গণ্য করা হয় বিভিন্ন দেশের লোক-সমাজে, বিশেষত নিরক্ষীয় এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলির বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে। সিঁদুর. আলতার তাৎপর্য

ভিন্নতর। এরা বস্তু বা বস্তুপ্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত, যেমন ব্যবহৃত কড়ি ও কলা তাদের আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য যথাক্রমে স্ত্রী-চিহ্ন এবং পুরুষ-চিহ্নের সংকেত রূপে। কলার ভিন্নতর তাৎপর্যও আছে; কলাগাছ হল বহু উৎপাদনের দ্যোতক। অর্থাৎ, উর্বরতা-কেন্দ্রিক রীতিধারার ঐতিহ্য বহন করছে এই ফল। ঠিক একই তাৎপর্য রয়েছে, জলপূর্ণ ঘট, ডাব, নারকেল প্রভৃতির; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সংকেত বহন করে এগুলি। এখানে একটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বিচার্য : আদিম মানুষের বোধ ও ভাবনার বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আদিম মনে বস্তুর আকার-প্রকারগত সাদৃশ্যের কারণেও অনুকৃতিমূলক জাদুর সংস্কার গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিশেবে কড়ির কথা বলা যায় অবশ্যই। সমুদ্রতীরবর্তী আদিম জাতিগুলির অনেকেই কড়ির সঙ্গে স্ত্রী-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য থাকার কারণে সেটিকে উর্বরতাসূচক বলে মনে করত। উত্তরকালে এই ভাবনার উপর পবিত্রতার বোধ আরোপিত হয়ে কড়ি বিত্তসূচক বলে গণ্য হয়েছে। শাঁখ, কড়ি, সিঁদুর, হলুদ, পান, সুপুরি, কলা, ডাব, নারকেল, মাছ-প্রভৃতি যেসব জিনিষ প্রায় সর্বজনীনভাবে বাংলার বিবাহাচারে এবং পুণ্যিপুকুর, দশপুতুলি, সেঁজুতি, রূপহলুদ, কলাছড়া-প্রভৃতি বিবাহ-এবং-সন্তানাকাঙ্ক্ষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন ব্রতাচারে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আমাদের প্রাগার্যভাব অস্ট্রিক দ্রাবিড় পিতামহদের যৌনপ্রতীকী চিন্তার ঐতিহ্যকেই সূচিত করছে।

লোহা এবং বিশেষ ধরণের কাজে ব্যবহৃত প্রস্তর (যেমন শিল নোড়া) সুপ্রাচীন কাল থেকেই অশুভ শক্তির প্রতিরোধক বলে গণ্য হয়; লোহার কিছু-একটা দিয়ে ঘটের বা পুকুরের জলকাটা, দর্পণ, জাঁতি-ইত্যাদি কিছু-একটা বিয়ের সময়ে সঙ্গে রাখা, বধূর হাতে 'নোয়া' রাখা প্রভৃতি ঐ থেকেই প্রচলিত হয়েছে। ঘটে ভরবার আগে লোহা দিয়ে জল কেটে দেওয়াকে কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রতীক রূপেও ব্যাখ্যা করেছেন। ঠিক এভাবে ফল, ফুল, শস্য -ইত্যাদির ব্যবহার ঐ দু-ধরণের মানসিক ধারণা থেকেই সঞ্জাত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উপলব্ধিতে ফুল, এক ধরণের অশুভরোধকরূপেই গণ্য ছিল; আর একদিকে তা নারীর বয়োপ্রাপ্তির ব্যঞ্জনা-চিহ্ন হিশেবেও কল্পিত হতো। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ এই আদিম-ধারণার ওপর সৌন্দর্যরুচির রঙ-তুলি বুলোতে শুরু করেছিল, আদিম-ব্যঞ্জনা এখন নন্দনতাত্ত্বিক উপলব্ধির অন্তরালে সমাহিত। বহু সংস্কৃতিতেই নারীর স্ত্রী-প্রত্যঙ্গ ফুলের, বিশেষত জবা ও পদ্মের প্রতীকে বাঞ্জিত হয়। তান্ত্রিকদের অষ্টদল বা শতদল পদ্ম, কি মহাযানী বৌদ্ধদের 'মণিপদ্ম'ও ঐ বিশেষ তাৎপর্যবাহী। তন্ত্রসাধনায় ঋতুরজঃ 'পুষ্প' বলেই প্রথিত। ঋতু-উদ্‌গমকে 'ফুল ফোটানো'-ও বলে। 'বিয়ের ফুল ফোটা', 'পুষ্পশর এবং 'ডিফ্লোরেশান' প্রভৃতি কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে অনুধাবনযোগ্য অবশ্যই। ঠিক এভাবেই জাদু-চিহ্ন আল্পনা শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে পরবর্তীকালে। ফল, শস্য মাছ, দুধ বা তার দ্বারা তৈরি খাদ্য—এরা সবই সভ্যতার বিশেষ-বিশেষ স্তরের ইঙ্গিতবাহী বিভিন্ন উর্বরতা-সূচক-চিহ্ন, যেমন, ষষ্ঠীপুতুল, স্বস্তিকা, বসুধারা ইত্যাদিও

ঐ ধারায় পরিগণিত। উর্বরতা-এবং-জন্মকেন্দ্রিক চিন্তারীতির উৎসও তাদের মধ্যে ঐ একইভাবে নিহিত আছে। এখানে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ . শস্য হল কৃষ্টিনির্ভর সংস্কারাগত উপকরণ। প্রাগার্যভাষী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। শস্য, পুরুষের বীজদ্যোতক; মাছ স্ত্রী-চিহ্নবাচক। নববধূর ঝাঁট দিয়ে শস্যকণা আহরণ করার তাৎপর্যটি অতঃপর সুবোধ্য। মাছ আবার বহুসন্তানধারণের প্রতীকও। অন্যপক্ষে, মাগুর বা লেটা-জাতীয় জ্যান্ত মাছ বধূর হাতে ধরানোর মর্মার্থ অন্যবিধ; সেখানে ঐ সব মাছ পুরুষত্বসূচক প্রত্যঙ্গ-প্রতীক। কিন্তু পোনা, ইলিশ-ইত্যাদি মাছের টুকরো তাদের আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রী-চিহ্নদ্যোতক হওয়ায়, এইসব মাছকে 'এয়ো'-হিশেবে গণ্য করেই তত্ত্বে পাঠানো হয়।

কতকগুলি আচারের মধ্যেও ঐ ধরণের আদিম জাদু-কল্পনার দ্বিধারা (সংস্পর্শ মূলক এবং অনুকরণমূলক) বহমান। যেমন ধরুন, বিয়ের সময়ে বা তার একটু আগে কোনও-কিছু একটা ভেঙে দেওয়া; আমাদের দেশে যেমন মাড়িয়ে ভাঁড় ভাঙা হয় (ক, গ, ঘ, চ) তেমনি ডিম ভাঙা (মরক্কো, সুদান, ফ্রান্স), নুন ভর্তি পাত্র ছুঁড়ে ভাঙা (ইংলণ্ডের কোনও-কোনও অঞ্চল)-প্রভৃতি প্রথা বহুল-প্রচলিত। মনোবিজ্ঞানীরা নুন ছুঁড়ে দেওয়ার মানসিকতাকে পুরুষত্ববাহী বীজ বপনের সঙ্গে সমার্থবোধক বলেন। লোককথার 'নুনের মতো ভালবাসা'-র তাৎপর্যও আসলে এইটিই। নুনের বদলে শস্য বা জল ছিটোনোর রেওয়াজ আছে অনেক সমাজেই। 'গায়ে বিয়ের জল পড়া'র গূঢ়ার্থটুকু এর আড়ালে নিহিত। এদেশের মতোই ভাঁড় বা কলসী ভাঙার প্রথা প্রচলিত আছে মরক্কো, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং জিপ্সীদের মধ্যে। এই ভাঙার প্রথাটি কৌমার্যভঙ্গের অনুকরণসূচক জাদুপ্রতীক হিশেবেই গ্রাহ্য। প্রাচীন রোমে কনের কোমরবন্ধনীর 'জটিল গ্রন্থি' (হারকিউলিয়ান নট্)-মোচনও ঐ একই ইঙ্গিতবাহী ছিল; এরই অনুরূপ রীতি হল স্বামী-স্ত্রী-রূপে বসবাস করার ক-দিন পরে হাতের লাল-হলুদ (রঙের তাৎপর্য স্মর্তব্য) সূতো খুলে ফেলা, যা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। বিয়ের কনের কোমরে লাল সুতো বাঁধার প্রথা বিক্রমপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মূল কারণ ঐটিই। নিউগিনীতে মাওরিদের মধ্যে পান পাতা চিরে বরকে কনের চিবোতে দেবার তাৎপর্যও তাই-ই। পানের আকারগত বৈশিষ্ট্য এখানে অবধানযোগ্য।

সিঁদুর দেওয়ার তাৎপর্য ওপরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রক্তের প্রতীক হিশেবে এখানে সিঁদুর-আলতা ব্যবহৃত হলেও, কিছু একটা ধারালো জিনিষ ফুটিয়ে আসল রক্ত বার করে দেবার প্রথাও বিরল নয় পৃথিবীতে; ব্রিটানী অঞ্চলে কোনও-কোনও গোষ্ঠীর এবং বিহারের ক্যাওটদের কথা উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করা যায়। সাতপাক, পাঁচপাক, তিনপাক-প্রভৃতি প্রথা অজস্র দেশে প্রচলিত; উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করতে পারি জার্মানী, স্কটল্যাণ্ড, মরক্কো, মাদাগাস্কার, সুইডেন, আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্যালেস্তাইন-প্রভৃতি দেশের। নিগ্রোয়েড মাদাগাস্কারীয়, অস্ট্রিক মুণ্ডারী, সেমিটিক সিনাই-বেদুইন এবং আলপাইন রেলো-রুশীয়—সর্বগোষ্ঠীর সমাজেই এই

বিচিত্র রীতির প্রচলন আছে, যা অশুভ শক্তির রোধক প্রক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হয়েছিল কোন্ এক আদিম যুগে, পরে তার ওপর আমরা হৃদয়-বন্ধনের কাব্যিক তাৎপর্য আরোপ করেছি। আসলে এ হল বিশেষ-বিশেষ সংখ্যার বিষয়ে বিশ্বজনীন জাদুসংস্কারের অভিব্যক্তি। আংটি বদল, মালাবদল ইত্যাদি যাবতীয় 'শাস্ত্রীয়' বিধি এবং বরকনের পরস্পরকে মিষ্টদ্রব্য খাওয়ানোর লৌকিক বিধি, দুই-ই আসলে ঐ একই উৎস থেকে উৎসারিত। আংটির যৌনব্যঞ্জনা বহুকালীন এবং সর্বদেশীয়। ফুলের তাৎপর্য থেকেই মালার উপলক্ষ বোঝা যায়। সর্বজনসমক্ষে এই প্রতীকী কাজগুলির মাধ্যমে তার সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এই যা! গাঁটছড়া বাঁধা, হাতে-হাতে সুতো দিয়ে বাঁধা, বাটির জলে মোনামুনি-মেলানো, মায় চুলে-চুলে বাঁধা (প্রাচীন চৈনিক প্রথা) -ইত্যাদি যাবতীয় অনুরূপ ব্যাপারই ঐ এক মূলসঞ্জাত। নিউগিনীতে সেই একই কারণে বরকনে পরস্পরকে সুপুরি খাওয়ায় সর্বসমক্ষে। জাতি বা ধর্মগত কারণে কিন্তু এই সব আদিম সংস্কারের বিলয় ঘটেনি, তার রূপান্তর ঘটেছে, এইমাত্র।

।। ৪।।

স্বামী-স্ত্রীর প্রথম রাত্রি জনসমাবেশে কাটানোব প্রথা, যা পশ্চিমবাংলায় 'বাসরজাগা' রূপে পরিচিত, কমপক্ষেও অন্তত এতগুলি অঞ্চলে প্রচলিত : বান্টু উপজাতির অধ্যুষিত বিভিন্ন নিরক্ষীয় এলাকা, কঙ্গো নদীর নিম্ন অববাহিকাভূমি, সমগ্র টিউটোনীয় ইউরোপ, শ্লাভ-সংস্কৃতির সমগ্র বিচরণক্ষেত্র, রেড ইণ্ডিয়ানদের এলাকার অন্তর্গত স্যালিনান-উপজাতীয় অঞ্চলগুলি, নিউগিনীর প্রায় সর্বত্র এবং প্রাচীন রোম। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা বজায় থাকার হদিশ মেলে। এর মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও অশুভকারী প্রেত বা অন্যান্য জাদু-শক্তিকে প্রতিরোধ করার কল্পনাও ছিল আদিতে, যার ভিন্নতর অভিব্যক্তি মন্ত্র-ছড়া, নাচ-গান এবং বিচিত্র-ধ্বনি 'হুলু' বা উলুর মধ্যে মেলে। হৈ-চৈ-বিজলী-রোশনাই-পট্‌কা ইত্যাদির ধূমধামও মূলত সম্ভাব্য অশুভ-শক্তিকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই। আমাদের নাপিতের ছড়াগুলি অনুধাবন করলে এর সমর্থনে সাক্ষ্য মিলবে। স্ত্রী-আচারে হাতে 'মাকু' দেবার মাধ্যমে কে-কার বশ, এইটে যেমন এদেশে দেখা হয়, প্রায় অনুরূপ মানসিকতা নিয়েই বিভিন্ন আচার পালন করা হয় শ্লাভ দেশগুলিতে এবং জার্মানীর অনেক জায়গায়।

নিতবর / মিতবর / বেস্টম্যান এবং নিতকনে/ ব্রাইডস মেইড রাখার লৌকিক প্রথাও ঐ একই হেতুজাত; অশুভশক্তিকে প্রতারিত করার জন্য একাধিক বর ও কনের কল্পনা এই প্রথার মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে। হিন্দু বিয়েতে রজঃস্বলা অবস্থায় কিংবা চালের বাতা ধরে না-দাঁড়ানোর বিধান থাকা, শ্লাভীয় সমাজের বিয়েতে ঘরের সমস্ত প্রবেশ-পথ, মায় চিমনী অবধি বন্ধ করা, বাসরের চারদিকে বন্দুকের শব্দ করা এবং তীর ছোড়া ইত্যাদির অভিনয় (যথাক্রমে সাইবেরিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য ভারত, বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও মরক্কোতে) ঐ চিন্তারই আর একটি

রূপ। বরকনে বহুদেশে ছদ্মবেশ ধরার ভাণ কবে (যেমন ভারতের কোনও-কোনও অঞ্চলে, এস্তোনিয়াতে এবং ব্যাভেরিয়াতে) খড়-টড় কিছু দিয়ে নকল বর-কনের মূর্তি গড়ে রাখা হয় (জাভায়), বিবাহের একটা ভাণ করা কবা হয় আসল বিবাহের আগে (পাঞ্জাবে)—এ সবের উপলক্ষও ঐ প্রতিরোধক জাদু।

কনেকে বয়ে নিয়ে-আসা, বা নিয়ে-আসার ভঙ্গী করার যে-রীতি বঙ্গদেশ, চীন, প্যালেস্তাইন, মিশর, ইতালি, গ্রীস, তুরস্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের লোকায়ত সমাজে বিদ্যমান, সেটাও না-কি মাটির তলায় যে মৃত আত্মারা শুয়ে আছে, তাদের ছোঁয়া থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যই! যাঁকে এই অধ্যায়ের গোড়াতে 'মানব জাতির বিবাহের ইতিহাসকাব' বলেছি, সেই এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এমন কথাই বলেছেন। এ হল নাকি, আদিকালের অপহরণমূলক বিবাহের রীতিরই চিহ্ন। সংস্কৃত 'বধূ' শব্দটিই তো 'বহ্' ধাতুর উৎসজাত! 'বিবাহ' শব্দটির মূলে 'বিশেষরূপে বহন' করাই ব্যঞ্জিত হয়ে আছে। বহু আদিবাসী জাতির মধ্যেই বিয়ের সময় বধূকে নকল-অপহরণের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাচীন কালের হিন্দু বিবাহের রাক্ষস-রীতিও অবশ্যই এরই উৎসজাত। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের মধ্যে ধাঁধার লড়াই করা কিংবা গানের মাধ্যমে গালাগালি দেওয়ার প্রথাটা ঐ আদিম কন্যাহরণ কালের সংঘর্ষের রূপান্তবিত মূর্তি বলেই বুঝতে হবে। মূল উপলক্ষটা বিলুপ্ত হলেও এইসব লৌকিক আচারের মধ্যে তার স্মৃতি শিলীভূত হয়ে আছে।

বিবাহের লোকাচারের মধ্যে অনুকরণমূলক জাদু-বিশ্বাস-জাত কিছু-কিছু রীতির উল্লেখ ওপরে করেছি। নিবর্তনমূলক ও সংশ্রবমূলক জাদু-বিশ্বাসের কয়েকটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করব এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে। কনের কোলে শিশুকে বসানো, বিয়ের সমস্ত 'শুভকর্ম' শুধুমাত্র বিবাহিতা মহিলাদের দিয়েই করানো—যাতে তাঁদের সৌভাগ্যের ছোঁয়া মেয়েও পায়—ইত্যাদি রীতিও বহুদেশীয় এবং বহুজাতিক, এ সব শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'কালরাত্রি'-মানা, উপবাস করা -ইত্যাদি নিবর্তনমূলক জাদু-সংস্কারও বহুদেশিক। বিয়ের বরকনের উপবাসের বিধান আফ্রিকার মাসাইদের মধ্যে, পেরুতে, উগাণ্ডায়, সাইবেরিয়ায় এবং কালরাত্রিপালন সুমাত্রা, বোর্নিও, নিউগিনী, পলিনেশিয়া- প্রভৃতি অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আদিম পিতামহীরা যখন কনেরূপে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতেন, তখন থেকেই এসব জাদু-কেন্দ্রিক রীতি চলন হয়েছে—আজও তা চালু রয়েছে। একই গোত্রে/টোটেমে/খুটে বিবাহের নিষিদ্ধতা, মৃতদার ব্যক্তির পুনর্বিবাহের আগে গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রায় বিশ্বজনীন লোকসংস্কার আজও বহুপ্রসারী হয়ে টিকে রয়েছে পরিবর্তিত ব্যাখ্যায়; কখনও বিস্মৃতহেতু লোকাচাবে, কখনও এরা রূপান্তরিত হয়েছে 'শাস্ত্রীয়' ধারায়।

অর্থাৎ আমরা যত এগিয়েই থাকি না-কেন হাজার-হাজার বছবের বিবর্তনে, আমাদের মনে অন্তর্লীন হয়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের অজস্র অব্যক্ত সংস্কার—মহাকালের স্রোতের ফেলে-যাওয়া বহু-বহু শতাব্দীর পলিতে তারা চাপা পড়ে আছে, এই মাত্র। সে অতীত, কেবলমাত্র আমাদেরই নয়; তা বিশ্বজগতের

সমস্ত কৃষ্টিবলয়েরই। সেই অতীতকে চেনবারই একটি শ্রেয় ও সুনিশ্চিত পথ হল বিবাহের এবং অন্য অজস্র ধরণের সামাজিক আয়োজনের অন্তর্বিলীন লোকাচারগুলির চর্যা, যা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় অলক্ষ্যসঞ্চারী আদিম বিশ্বাসজাত সংস্কারমগ্নতার অনুষঙ্গে। সে কথা আমরা, আধুনিক মানুষেরা প্রায়শই অস্বীকার করি অবশ্য!

।। ৫।।

ঠিক ঐ কারণেই যদি কোনও বয়স্ক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি খনার বচন মেনে চলেন, কি-না, অথবা পাঁজির বিধান অনুযায়ী লাউ বা বেগুন খাবার সময় দিন-অদিনের কথা ভাবেন না-কি, তাহলে প্রশ্নকর্তার মস্তিস্কের সুস্থতা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে সন্দিহান হয়ে উঠবেন হয়ত সকলেই! কিংবা বিয়ের সম্বন্ধের সময় পাত্র-পাত্রীর একজন যদি 'দেবগণ' অন্যজন 'রাক্ষসগণ'-ভুক্ত হয়, তাহলে ঠাকুমা-দিদিমাবা কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁত করলেও সাধারণভাবে মামা-কাকারা ব্যাপারটাকে উড়িয়েই দেন সব সময়ে। অর্থাৎ, যাকে আমরা কুসংস্কার বলে থাকি আজকালকার বিজ্ঞান-নির্ভর নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণে তার যে কোনও ভূমিকা থাকতে পারে, একথা কেউই প্রায় মানতে চাই না।

অথচ, এমন মানুষ খুবই কম মিলবে, যিনি এ-ধরনেব ব্যাপারে কম বা বেশি, কিছু-না-কিছু বিশ্বাসী। প্রচলিত দশটা সংস্কার-প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে হয়ত একটাও মানেন না এমন কথা বলতে পারেন কেউ; কিন্তু একাদশতম কোনও একটি সংস্কারেব কথা বললে তিনিই হয়ত চুপ করে যান, অথবা ইতস্তত করেন উত্তর দিতে। আবার দশটিই মানেন (এবং আরও অনেকগুলিও) এমন লোকের সংখ্যাই সম্ভবত অনেক বেশি হবে।

সাধারণভাবে একটা কথা মনে করা হয় যে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এইসব কুসংস্কাবের প্রাবল্য। কিছুদূর পর্যন্ত কথাটা ঠিক; কিন্তু সমাজের শিক্ষিত ও অগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে একদিকে যেমন কিছু-কিছু সংস্কার কেটে যায়, তেমনই আবার নতুনতর কিছু সংস্কারেব প্রাদুর্ভাবও ঘটে সেখানে। আর কতক ধরনের সংস্কার থাকেই সমাজে যাদের নির্মোচন বলতে গেলে অসাধ্যই।

তাহলে, এই ধরনের সংস্কারগুলির মধ্যে কতকগুলি হল স্থায়ী এবং অন্যগুলি পরিবর্তনশীল। যেগুলি পরিবর্তনশীল, সেগুলির বদল অবশ্য বিশ্বাসের বহিরঙ্গে; তার অন্তর্লীন কাঠামোর মূল চরিত্রটা অক্ষুণ্ণই আছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই উন্নত যান্ত্রিক-বৈজ্ঞানিক সময় পর্যন্ত নানারূপেই ঐ বিশ্বাসগুলি প্রবহমান। আদিম প্রপিতামহরা, ধরা যাক, কোনও পাথরের মধ্যে শুভাশুভ নির্ণায়ক কোনও শক্তিকে (অর্থাৎ, মান্যা) যেভাবে কল্পনা করতেন, তার সঙ্গে আজকের মানুষের অমুক-কাবণে তমুক-পাথর আংটিতে বসিয়ে নেওয়ার মধ্যে মৌলিক তফাৎটা কি?

আদিমকাল থেকেই মানুষের অজস্র রকমের বিচিত্র সংস্কার এবং বিশ্বাস গড়ে উঠেছে কার্য এবং তার অন্তর্লীন কারণগুলির যথার্থ সম্পর্ক যে কী, সেটি বিশ্লেষণ

না করতে পারারই ফলে। মূলত কোনও ব্যক্তি বা প্রাণী, কিংবা স্থানকাল বস্তু অথবা ঘটনাকে শুভ কিংবা অশুভের হেতু বলে গণ্য করার ফলেই এই সব বিশ্বাস এবং সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে একালের নগর-জীবনেও যে-সমস্ত আদিম বিশ্বাস- সংস্কারের ধারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বহমান আছে আর তাদের মধ্যেই সঙ্গে নতুন যেসব সংস্কার ও প্রত্যয় তৈরি হচ্ছে, সেইগুলিরও ভিত্তিতে ঐ শুভাশুভ গণ্য করার প্রবণতাই নিহিত থাকে।

জীবিকা-নির্বাহ, যৌন-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ, নিরাপত্তা লাভ এবং ভয় ও শত্রুর হানি—মোটের ওপর এই প্রয়োজনগুলি থেকেই শুভ-অশুভ-কেন্দ্রিত সংস্কার সমূহের উদ্ভব ঘটেছিল অতি-আদিমকালে। কিন্তু পিতৃপুরুষদের বিশ্বাস ও সংস্কারের মূল প্রত্যয়গুলিকে সুগোপনভাবে অটুট রেখে বহু সহস্রাব্দের পথ পরিক্রমা করে এসেছে যে-আধুনিক মানুষ, আজকের নাগরিক জীবনেও সেসবের আত্মপ্রকাশ ঘটতে আমরা হর-হামেশাই দেখি। ....বছর পনের আগে আমার ছাত্রী শ্রীমতী গোপা সরকার তাঁর একটি গবেষণা নিবন্ধের প্রয়োজনে এক নমুনা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, আজও বহু বিচিত্র এবং ভিত্তিহীন সংস্কার কেমনভাবে কলকাতার সামাজিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের মহিলাদের গ্রস্ত করে রেখেছে। মোট পঁচিশটি নিষেধাত্মক সংস্কার-তথা-ট্যাবুকে তিনি তাঁর সমীক্ষার সীমানাভুক্ত করেছিলেন এবং যতজন মহিলাকে তিনি সমীক্ষার সূত্রে যোগাযোগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কমসংখ্যক ট্যাবু যিনি মানেন, তিনিও বাইশটি সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত; অর্থাৎ ৮৮%। অধিকাংশই অবশ্য এগুলির মধ্যে ১০০ % সংস্কারেই বিশ্বাসী। এই মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগত মান ছিল এই রকম : নিরক্ষর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্তা; অর্থনৈতিক মান : মাসিক ৩৫০.০০ টাকা থেকে ৩০০০.০০ টাকা, এবং সামাজিক মান : পরিচারিকা থেকে অধ্যাপিকা এবং রাজ্য সরকারের উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মচারীর গৃহিণী। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাচ্ছল্য এবং সামাজিক মর্যাদা—কোনও কিছুই এইসব সংস্কার থেকে মুক্তির সহায়ক হয়নি।

মূলত, এই মহিলারা যে-সব সংস্কার মানেন তা অবশ্য একান্তভাবে নাগরিক জীবনেরই লক্ষণাক্রান্ত ছিল, এমন নয়। ছেলের জন্মবারে নখ কাটতে আছে কি-না, ঋতুকালে দেবতার বিগ্রহ স্পর্শ করা চলে কি-না এইসব, যা স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী মহিলারা মেনে আসছেন। তবে গোপা যে-সমীক্ষা করেছিলেন তার মূল তাৎপর্য হল এই যে, নাগরিক জীবনের আধুনিক চৌহদ্দীর মধ্যে এসেও এই মহিলারা চিরাচরিত সংস্কারের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে অনুশাসিতা।

ঠিক একই কথা পুরুষদের সম্পর্কেও বলা চলে। তবে গোপার সমীক্ষায় একান্তভাবে মেয়েলি সংস্কারগুলিকেই অবলম্বন করা হয়েছিল, যেহেতু তাঁর গবেষণার উপজীব্য ছিল মহিলাদের মানসিক গঠনের স্বরূপ নির্ধারণ। কিন্তু নাগরিক জীবনেরই পরিপ্রেক্ষায় ছেলেদের— অথবা ছেলে-মেয়ে উভয়েরই ক্ষেত্রে বিচার্য কয়েকটি কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে-থাকা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে

এখানে :

১. প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের একজন সুপরিচিত খেলোয়াড়, একটি খেলার প্রাক্কালে বুট পরতে গিয়ে ফিতে ছিঁড়ে ফেলেন। ঐ দিন খেলায় তিনি কিন্তু গোল দেবার হ্যাটট্রিক করেন। এরপর থেকে তিনি ঐ ঘটনাটিকে 'পয়া' বলে গণ্য করে প্রতিটি খেলার আগেই ইচ্ছে করে ফিতেটা ছিঁড়তেন। সবদিনই কিছু তিনি গোল পেতেন না; কিন্তু সংস্কারবশত এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

২. একটি বিখ্যাত ক্লাবের জনৈক প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা প্রতিদিনই ক্লাবের খেলা থাকলে একটি বিশেষ শার্ট পরে মাঠে যেতেন, যেহেতু প্রথম দিন ওটি পরার পরে তাঁদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী দলটি পর্যুদস্ত হয়। একবার জামাটা-পরা সত্ত্বেও তাঁর সংস্কার দলের ভরাডুবি বোধ করতে পারেনি। 'পয়া' জামাটি এভাবে 'অপয়া' হয়ে যাওয়াতে, সেই দিন থেকে বাতিল বলে গণ্য হল।

৩. একটি প্রখ্যাত কলেজের এক ছাত্রী তাঁর ফিলজফি অনার্স পরীক্ষার প্রথম দিন রওনা হবার মুখে পাড়ার ছাদে-ছাদে এবং বাগানে-বাগানে ঘুরে-বেড়ানো কোনও একটি বাঁদরকে দেখেছিলেন। ঐদিনের পরীক্ষা যেভাবেই হোক খুব ভাল হওয়ার পর থেকেই প্রতিটি পরীক্ষায় বাড়ির বাইরে পা-দেওয়া মাত্র তিনি খুঁজতেন সম্ভাব্য প্রশ্নের সমাধান নয়, ঐ বাঁদরটিকেই।

৪. বছর পঁচিশ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন এমন এক প্রবীণ পণ্ডিতকে সূর্যগ্রহণ চলাকালে চা খেতে অনুরোধ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল তাঁর প্রতিবেশীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই একথা বলেছেন।

৫. নামকরা এক শল্যবিদ্ যখনই গুরুতর ধরনের কোনও অপারেশন করতে যান, তখনই হাসপাতালের প্রাঙ্গণের একটি বিশেষ গাছের তিনটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রাখেন এবং সন্দেহাতীত সাক্ষ্য থেকে শোনা গেছে যে, যতক্ষণ অপারেশন চলে তিনি বিড়বিড় করে অনুচ্চার্য সব শব্দ ব্যবহার করে কোনও অনির্দেশ্য ব্যক্তিকে কুৎসিতভাবে গালাগালি করেন। অথচ এমনিতে তিনি অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এবং বিনয়ী। ওঁর বিশ্বাস খুব সম্ভবত, এই পাতা আর গালাগালি তাঁর রোগীর নিরাপত্তা বিধান করবে।

৬. একজন প্রযুক্তিবিদ্ যখনই তাঁর কারখানার কোনও একটি যন্ত্র বিগড়োয়, তখনই আগে ক্যান্টিনে গিয়ে পর-পর তিন কাপ চা খান এবং পয়সা বাকি রাখেন। ওঁর ধারণা এর ফলেই নাকি মেশিনের তাড়াতাড়ি 'রোগমুক্তি ঘটবে। ....সহজবোধ্য কারণেই এঁদের কারুরই পরিচয় জানানো সম্ভব নয়।

তাহলে, এই নমুনা-বিবরণীর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খেলোয়াড়, ছাত্রী, অধ্যাপক, সংগঠন-প্রশাসক, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার —নাগরিক জীবনের এই কজন প্রতীকী প্রতিনিধির প্রত্যেকেই বিচিত্র-সব সংস্কারের দ্বারা মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। এঁদের বিশ্বাসগুলির অন্তর্নিহিত কল্পনাগুলি যে কী তাৎপর্য বহন করে, তার বিশ্লেষণ

করলেই নাগরিক জীবনে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের মূল চরিত্রটি অনুধাবন করতে পারা যাবে। এঁদের নিজস্ব এই যে বিশ্বাসগুলি কার্যকারণহীন হয়ে এভাবে গড়ে উঠেছে, এগুলি কিন্তু সংস্কারের সর্বজনীনতার ধারাকেই বহন করে।

'১'-এর ক্ষেত্রে একটি ঘটনা ঘটা (ফিতে ছেঁড়া), '২'-এর ক্ষেত্রে একটি বস্তু (জামা), '৩'-এর ক্ষেত্রে একটি প্রাণী (বাঁদর), '৪'-এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় (গ্রহণকাল), '৫'-এর ক্ষেত্রে এক ধরনের আচরণ (গালাগালি করা), আর '৬'-এর এক বিশেষ সংখ্যক (৩) পৌনঃপুনিকতার মাধ্যমে কোনও এক বিশেষ ধরনের অভ্যাস (ধারে চা খাওয়া) --এর সবগুলিই গণ্য হচ্ছে শুভ বা অশুভের নিয়ন্ত্রক হিসেবে. যদিও বাস্তবে এর যাথার্থ্য বা যৌক্তিকতা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন এঁরা সবাই।

নাগরিক জীবনে এইসব লৌকিক সংস্কারের অন্তর্লীন পরিচালিকা শক্তিটি-আদিম মানুষের ক্ষেত্রে যা ছিল, তার থেকে ভিন্নতর কিছু নয়; তা' হল অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা, যার নামান্তর জাদুশক্তিতে প্রত্যয়। আদিম প্রপিতামহরা তাঁদের প্রাগৈতিহাসিক মন দিয়ে অনেক কিছুই বিশ্লেষণ করতে চাইতেন, কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কগুলি নির্ণয় করতে পারতেন না। এগুলোই নানান্ মনগড়া-ব্যাখ্যায় বৈচিত্র্য মণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হতো মিথ বা লোকপুরাণের। আজকে কালের বিবর্তনে অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেছে বলে আর মিথ তৈরি হওয়া সম্ভবপর নয় কিন্তু মিথ গড়ার পিছনে যে সব বিশ্বাস ছিল, তাদের উত্তরসরণ এখনো মানুষেরা মনে অব্যাহত।

উপরে প্রদত্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন-উদাহরণ দেখার পর একটি গোষ্ঠীনির্ভর সমীক্ষার ফলাফলের প্রতিবেদন রাখলে বোঝা যাবে ঐ আদিমধর্মিতা আমাদের সমকালের যন্ত্রপ্রধান, বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ নাগরিক জীবনেও কতখানি প্রবল :

সারণী : 'এক'

(ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জ্যোতিষ ইত্যাদি)

ক. খবরের কাগজে প্রকাশিত রাশিফল :

নিয়মিতভাবে পড়েন ও মানেন = ৮১%

পড়েন ও মানেন না = ৬.৫%

পড়েন না = ১২%

উত্তর দেন নি =০.৫%

(নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন এমন ২০০ জনকে নিয়ে এই পরীক্ষা; ম্যাট্রিক থেকে এম-এ; ২০ থেকে ৪০ বছর; ৪৫০.০০ থেকে ২০০০.০০ টাকা)

খ. হাত দেখানো, কোষ্ঠী বিচার

নিয়মিতভাবে করেন =৪৭%

অনিয়মিতভাবে করেন =২৯%

আদৌ করেন না =২০%

জবাব দেন নি = ৪%

(পূর্ববৎ; নিরক্ষর—এম এ; ১৬—৪০ বছর; ৪২৫.০০-২১০০.০০ টাকা)

সারণী : দুই

(অলৌকিক ও অতিলৌকিক)

ক. ভূত, অলৌকিক শক্তি -ইত্যাদি :

ভূত মানেন = ৩৯.২%

মানেন না =৪৮.৫%

জবাব দেননি =১২.৩%

(এক/ খ-এর অনুরূপ)

খ. বিশেষ-বিশেষ বস্তুর জাদু/অতিলৌকিক ক্ষমতা -ইত্যাদি

মানেন =৮৭.৪%

মানেন না = ১০%

জবাব দেননি =২.৬%

(এক/ ক-এর অনুরূপ)

সারণী : তিন

(সংস্কারের পাত্রভেদ)

ক ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় কোনও সংস্কার :

আছে = ৮৫.৫%

নেই = ৭.৫%

নিরুত্তর = ৭%

(এক/ ক-এর অনুরূপ)

খ. অন্যের কোনো সংস্কারের প্রভাব :

মনের ওপর পড়ে = ৪৬%

পড়ে না =৫২%

নিরুত্তর = ২%

(এক/খ-এর অনুরূপ)

নিজের সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি সংস্কারের ধারা ছাড়াও আধুনিক কালে নাগরিক জীবনে শিক্ষিত মানুষের মনে 'তিন/খ'-এর অনুসরণে যেসব সংস্কারের সৃষ্টি হয়, তার উৎস বিভিন্ন সময়েই শিক্ষা এবং ভিন্ন কোনও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটা। যেমন, 'এক শালিখ দেখলে খারাপ, কিন্তু দুটো দেখলে ভাল,' 'এক কাঠিতে তিনটে সিগারেট জ্বালাতে নেই', 'কারুর প্যাকেটের শেষ সিগারেট চাইতে নেই,' '১৩ সংখ্যাটি অপয়া', 'মইয়ের তলা দিয়ে গেলে খারাপ হয়', 'কালো বেড়াল অশুভ' -ইত্যাদি ইউরোপীয়-সমাজে প্রচলিত-সংস্কার-শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই শুধু প্রচলিত; এবং সে প্রচলন ঘটেছে শিক্ষার মাধ্যমেই, অর্থাৎ ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলেই। সুতরাং একদিক থেকে দেখলে শিক্ষিত নাগরিকদের

মধ্যে সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের আনুপাতিক ব্যাপ্তি স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নগরবাসীদের চেয়ে বেশিই . এই রকম বহিরাগত সংস্কারের প্রভাব কতটা, সেটিও সমীক্ষায় দেখা গেছে :

সারণী . চার

(ভিন্ সংস্কৃতির প্রভাব)

ক. ১৩ সংখ্যাটি অপয়া

মানেন = ৮০%

মানেন না = ১৫.৭%

নিরুত্তর = ৪.৩%

খ. এক শালিখ দেখা খারাপ :

মানেন ২৫

মানেন ৭০

নিরুত্তর ৫

এই দুটি সংস্কার শিক্ষিতা তরুণীদের মধ্যে প্রবল; '১৩'-র ব্যাপারটা ছেলেদের মধ্যে দেখা গেলেও, শালিখ নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান না। পক্ষান্তরে একান্তভাবেই ছেলেদের সংস্কারে দেখি :

গ. এক কাঠিতে তিন সিগারেট জ্বালানো খারাপ .

মানেন ২৫

মানেন না ৭০

নিরুত্তর ৫

ঘ অন্যের প্যাকেটের শেষ সিগারেট চাইতে নেই ·

মানেন ৩২

মানেন না ১০

নিরুত্তর ৫৮

(এই ছেলে-মেয়েরা ১৪-২৬ বছরের; ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের —অল্প কিছু বাংলা মাধ্যমের, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত)।

নাগরিক জীবনের সামাজিক-আর্থনীতিক চরিত্রের সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমজীবী গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁদেরও কতকগুলো নিজস্ব লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। যেমন · অধিকাংশ ট্রাক, লরী, বাস -ইত্যাদির বনেটের সামনে একটা ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে রাখা হয় কারণ তাদের ড্রাইভারেরা বিশ্বাস করেন এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যাবে। জাহাজ তৈরির কারখানা থেকে নতুন একটি জাহাজকে বার করে যখন প্রথম জলে ভাসানো হয়, তখন তার গায়ে একটি মদের বোতল (পাশ্চাত্যে) কিংবা আস্ত নারকেল (এই দেশে) আছড়ে ভাঙা হয়। ঠিক যে মানসিকতা থেকে শিশুর কপালের বাঁদিকে একটা কাজলের টিপ পরিয়ে এবং তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কামড়ে তবেই তাকে বাড়ির বাইরে পাঠান হয়, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে সেই একই মানসিকতা ঐ জুতো ঝোলানোর পিছনেও : এতে গাড়ীটা 'খুঁতো' হয়ে গেল বলে অশুভ-শক্তি এর ওপর লোভের দৃষ্টি ফেলবে না। অত্যন্ত আদিম সংস্কার সন্দেহ নেই। বোতল বা নারকেল ভাঙাও আদিম সংস্কারের রূপ-বিবর্তন . এই জাহাজের ওপর ভর করে আছে যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন-সত্তা তার মনস্তুষ্টির জন্য তাকে নরমুণ্ডের প্রতীকস্বরূপ নারকেল/বোতল উৎসর্গ করা হল। সমস্ত বস্তুর মধ্যেই অন্তর্লীন অলৌকিক শক্তির এই কল্পনাকেই যে মান্যা বলা হয়, তা আমরা আগেই দেখেছি।

অর্থাৎ ভূত-প্রেত-তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-তন্ত্র-জলপড়া-জ্যোতিষ-রাশিফল-কাকচরিত্র হাঁচি-টিকটিকি-মঘা-অশ্লেষা-ইত্যাদি সর্ববিধ-আদিম, প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় লোক-বিশ্বাস আমাদের নাগরিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অ্যাপ্লায়েড এম. এসসি-র ছাত্রও পরীক্ষা দিতে যান পকেটে ঠাকুরের ফুল গুঁজে; কঠিন অসুখে ইঞ্জেকশন এবং বংশের গুরুদেবের চরণোদক একই সঙ্গে চলে; গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে। অমুক মাজী, অমুক বাবাজীরা বহাল-তবিয়তে হুজুর থেকে মজুর অবধি সকলকে 'বিভূতি' দেখিয়ে পদানত করে ফেলেন, গ্রহণের জন্য সরকারী অফিসে বেসরকারীভাবে ছুটি হয়ে যায়, আর বারোয়ারী দুর্গা, সরস্বতী, কালী -ইত্যাদি খানদানী দেবীদের পূজোর পাশাপাশি— শিবরাত্রি, ঘেঁটু পূজো, শনিপূজো ইত্যাদিও বেশ জমে ওঠে। ঐ বাবাজী, মাজীরা এবং এই বারোয়ারীর কাজীরা একযোগে নাগরিক মানুষের মনের অন্তর্লীন আদিম সহজাত-সংস্কারগুলিকে ভাঙিয়ে দিব্যি ধর্মবণিক রূপে জমিয়ে নিচ্ছেন। নাগরিক জীবনের স্বধর্ম যে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান, তাকে এঁরা যথার্থভাবেই আত্মস্থ করেছেন কিন্তু। আদিম কালাগত লোকবিশ্বাসকে পুঁজি করে নাগরিক জীবনের প্রতিটি স্তরেই সেই বাণিজ্য চলেছে, শুধু এদেশেই নয়—সমস্ত ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক দেশেই। ভূমিকম্প হলে কিংবা বাজ পড়লে কলকাতার 'পশ্' এলাকার গৃহিণীরাই শুধু ঠাকুমা-দিদিমার আমলে ফিরে গিয়ে অপদেবতাকে শান্ত করতে শাঁখে ফুঁ দেন না; উন্নত যন্ত্রবিজ্ঞান এবং সমুন্নততর মানসিকতা-সম্পন্ন বলে গণ্য আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য হাওয়াইতে প্রবল অগ্ন্যুৎপাত হলে আগ্নেয়গিরির অধি দেবীর মনস্তুষ্টির জন্য যাঁরা পুজো দিতে গিয়েছিলেন সেই নিষ্ঠাবান্ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও ছিলেন। তারা ঐ ১৯৫৫ সালের সুসভ্য আমেরিকান রাষ্ট্রের নগর-সভ্যতার ধারক হলেও অন্তর্লীন মানসিকতায় ১৫০০ বছর কি তারও বেশী আগের পূর্বপিতামহদের থেকে অন্তত বিশ্বাস ও সংস্কারের ক্ষেত্রে খুব কিছু একটা পৃথক ছিলেন না।

নাগরিক সভ্যতায় এই আদিমতাধর্মী লোকবিশ্বাস বহু সময়েই কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতির ছদ্মবেশে হাজির হয়। "জলপড়া তেলপড়া, তুক্‌তাক, মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, রত্নধারণ, মারণ-উচাটন-বশীকরণ— এই সব আমি মানি মশাই, কেন-না এ সবের পিছনে যে-জাদুশক্তি অথবা অলৌকিকতা কাজ করে বলে মনে করা হয়ে

আসছে চিরাচরিতভাবে, তাতে আমার প্রত্যয় আছে''— খোলাখুলি এ-কথা যদি কেউ বলেন, তো তাঁর চরিত্রের সততাটুকু অন্তত প্রশংসনীয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এসবের এমন সব বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যান করার দুষ্প্রয়াস করা হয়, যাকে নাগরিক-জীবনসুলভ ভণ্ডতাও বলতে পারেন হয়ত বা। গ্রহণের সময়ে কেউ যদি রাহু-কেতু-ইত্যাদিকে মেনে না-খান কিছু, সেটা তো হল তাঁর নিজের ব্যাপার। কিন্তু না-খাবার কারণ হিশেবে যদি কেউ গ্রহণকালে চন্দ্র/সূর্য স্তিমিতালোক হবার কারণে খাদ্যবস্তুর মধ্যে অপকারী বীজাণু সৃষ্টি হয় (!) এমনতর ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দেবার উদাম দেখান, তাহলে তাঁর সংস্কারপ্রবণতাকে চাপা দেবার জন্যে যা-তা মনগড়া ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানরূপে চালানোর ঐ অপচেষ্টাকে ভণ্ডামি ছাড়া আর কী বলা যায়? অলৌকিক আদিম বিশ্বাসকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করতে-করতে একদা মানুষের সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল মিথ বা লোকপুরাণ। সমাজের অর্থনীতি বদলে গেছে বলে এখন আর মিথ্ গড়ে ওঠে না। কিন্তু একালে বহুবিতর্কিত এরিখ ফন দানিকেন—যিনি বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠায় 'নাগরিক' তো বটেই, ঠিক ঐ ভাবেই মানুষের চিত্তের অবলীন বিশ্বাসের ওপর বিজ্ঞান ধাঁচের রং-পালিশ চাপিয়েছেন। নাগরিক জীবনের লোকবিশ্বাসের স্বরূপ বুঝতে গেলে কিন্তু ঐ ছদ্মবিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আসলে, স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে অলৌকিক-অতিলৌকিক সম্পর্কে একটা অনির্বচনীয় ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-ইত্যাদি-মিশ্রিত ভাব মানুষের মানসিক উত্তরাধিকার হিশেবে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেটাই কখনও ধর্মপ্রতীতি, কখনও জাদুবিশ্বাস, কোনও সময়ে লোকসংস্কার, কখনও আবার আচার (রিচ্যুয়াল) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মূল বোধটা জাদুতে প্রত্যয়কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে; আর তারই পরিশীলিত অভিব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসে এবং অপরিশীলিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সংস্কারের মধ্যে। এই দুয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টি হয়েছে লোকাচারের। অবশ্যই সেটা আর্থ-সামাজিক স্বার্থের কারণে যে একথাটুকু বুঝতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

একথা ঠিকই যে, একালে ইতিহাসের চিরাভ্যস্ত সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সভ্যতার ইতিহাস যে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস, একথা কায়েমী স্বার্থের পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতরা ছাড়া আর সকলেই নির্দ্বিধায় মানেন। ইতিহাস মানে যে কেবল রাজরাজড়াদের সিংহাসন-প্রাপ্তি-চ্যুতির তারিখনামা নয়, সন্ধি-বিগ্রহের ধারাবাহিক দলিল নয় এবং বিশেষ- বিশেষ দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ-বিশেষ সমাজের শ্রেণীচরিত্রনির্ভর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেহারার বিবরণী মাত্র নয়, একথা আজকে মুক্তবুদ্ধি এবং অগ্রসর চিন্তার শরিকদের কাছে বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে, ইতিহাসের যথার্থ পরিচয় যে নিহিত হয়ে আছে লোকজীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞানের মধ্যেই, তাও আজ আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই যে, লোকজীবনের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে স্বীকার করেও সেই জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ যার মধ্যে ঘটেছে, তার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ কতখানি ঘনিষ্ঠ, সেই ব্যাপারে আমরা প্রায়শই অনুৎসাহী এবং অনবহিত থাকি।... লোকজীবনের পরিচিতির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে কিসে? অবশ্যই সে- প্রকাশ দীপ্যমান লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধ্যে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির যথা-অর্থে বিশ্লেষণ এবং অনুধ্যান করলেই যে ইতিহাসের বহু দুর্জ্ঞেয় সমস্যাকে অতিক্রম করা সম্ভব, বক্তব্য সেইটিই। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় মূল উপকরণগুলির অন্যতম যে লোকসংস্কৃতিও, সমাজবিজ্ঞানীরা এখন তা মানেন প্রায় সকলেই।

লোকায়ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা কী? পণ্ডিত নানাভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন, তবু সর্বজ্ঞ্বর কোনও সংজ্ঞা আজও তৈরি হয়নি। ইতিপূর্বে 'লোকসংস্কৃতির সীমানা' অধ্যায়ে এ নিয়ে ব্যাপক অন্বেষণ করে দেখানো হয়েছে। এখানে সংহত একটা সূত্রের মাধ্যমে সেটিকেই আরও একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। সাধারণভাবে এইটাই বলা চলে যে, কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা-ইত্যাদি, অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' বলে গ্রহণ করতে পারি।

স্বভাবতই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশমাধ্যমের সাহায্যে কোনও জাতি, প্রজাতি

বা গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের পরিচয়টুকু খুঁজে বার করা যায় যে, সেকথা বলাই বাহুল্য। আর ঐ সামাজিক-বিবর্তনের অন্বেষাই যথার্থ-ইতিহাসকে মূর্তিমন্ত করে। লোকায়ত তথা সর্ববিধ সংস্কৃতিই সেই ইতিহাসের অবিভাজ্য অংশ।

মানুষের ইতিহাসের বিবর্তন হয়েছে উৎপাদনের লক্ষ্য ও পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে- সঙ্গে : শ্রম হল সেই উৎপাদনের হাতিয়ার। ঐ হাতিয়ার দিয়ে মানুষ নিজের ইতিহাস লিখতে নিজেই গড়েছে। হয়ত সেই জন্যই অধ্যাপক ভি. গর্ডন-চাইলড মানবসভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'ম্যান মেক্‌স হিমসেল্‌ফ'।

মানুষের এই আত্মসৃজন-তথা-আত্মপ্রতিষ্ঠা যে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার খুব আকর্ষণীয় উদাহরণ হিশেবে বিভিন্ন দেশের পুরাণকথা কিংবা লোককথার কিছু নিদর্শনের উল্লেখ এখানে করতে পারি। যেমন : তাজিক লোককাহিনী 'শিরি-ফরহাদ'। দুস্তর পর্বতের ওপার থেকে যদি নদীর স্রোতকে এপারে নিয়ে আসতে পারে ফরহাদ, তাহলেই সে পাবে তার প্রেমিকা শিরিকে, এই ছিল শর্ত। এই শর্ত পূরণ করার পরই হল তাদের মিলন। প্রচলিত ভাবনা-অনুযায়ী এ হল এক দুর্জয় প্রেমের আবেগমন্থিত কাহিনী। কিন্তু আসলে এ তো প্রকৃতির ওপরে মানুষের বিজয়বার্তা; প্রেমগাথার রূপ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐ ঊষর তাজিকিস্তানের মানুষের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করে আসছে। এই বিশ্লেষণটাই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের লব্ধফল। দুঃসাধ্য কোনও কাজ— রাক্ষস কিংবা ড্রাগনকে হত্যা করা অথবা ঐ রকম আর কিছু— করেই তবে রূপকথার রাজপুত্ররা অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যাকে যেভাবে লাভ করে তার সঙ্গে এই প্রেমকাহিনীর রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য কোথায়: ঠিক এই একইভাবে হারকিউলেশের কিংবা ভগীরথের নিয়ে আসা নদীর স্রোতে সব জঞ্জাল ভাসিয়ে দেওয়ার কাহিনীরও মূল্যায়ন করতে হয়। ভগীরথের শ্রমসাধনায় ষাট হাজার সগর-সন্তানের মুক্তি তো প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমের পরিণতিতে মানবকল্যাণেরই রূপক ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নয়।

এই শ্রমনির্ভরশীল সংস্কৃতি-বিকাশের মূল রূপটি পরিশীলিত নাগরিক অথবা ধ্রুবপদী কলাকৃষ্টির ভিতরে থাকলেও, তা থাকে প্রচ্ছন্ন হয়েই। পক্ষান্তরে লোকায়ত সংস্কৃতির পর্যায়ে সেটি অনেক সুস্পষ্ট চেহারায় হাজির থাকে। সভ্যতার স্তরে স্তরে ইতিহাসের যে-উদ্বর্তন তার সম্যক্ পরিচয় সেখানেই মেলে। কোনও মার্ক্সবাদী যখন তাঁর আয়ত্তগত বিশ্ববীক্ষণের নিজস্ব মনোভঙ্গীটির মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশকে অন্বেষণ করেন, তখন তাঁকে অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হতে হয়, এইজন্যই।

সভ্যতার প্রতিটি স্তরে যে ইতিহাসের বিবর্তন ঘটেছে, সেটা ঘটেছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের লব্ধফল হিশেবেই। এখানে পুরোনো কথাটাই আবার বলি : বস্তুতপক্ষে, সভ্যতার ইতিহাসই হল শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিকথা; কখনও সে সংঘর্ষ পশুপালনজীবীর সঙ্গে কৃষিজীবীর, কখনও কৃষিজীবীর সঙ্গে শিল্পজীবীর, কখনও

সামগ্রিকভাবে শোষিত নির্বিত্ত শ্রমজীবীদের সঙ্গে বিত্তবান্ অবসরজীবীদের। পাপপুণ্য, ধর্ম, নিয়তি, কর্মফল ইত্যাদির ভয় এবং দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সেই সংঘর্ষকে কখনও-কখনও এড়াতে পেরেছে ক্ষমতাসীন শ্রেণী। যখন তা পেরেছে তখনও লোকজীবনের সংস্কৃতির মধ্যে ঐ দ্বন্দ্বের অভিক্ষেপটুকু মুছে যায়নি। প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস-চর্যায় তার হদিশ অবশ্য মিলবে না; সে কথা আগেই বলেছি।

।। ২।।

প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব যে-পুরাবৃত্ত স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে উঠেছে, মূলত তাও লোকজীবনেরই অভিজ্ঞতানির্ভর। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমাদেরকে একটি প্রজ্ঞায় সুপ্রতিষ্ঠ করেছে : মানুষের বস্তুগত অস্তিত্ব এবং তার মানস-প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতেই একই সঙ্গে উৎপাদন এবং শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম ও নীতিসংস্কারেরও উৎসারণ ঘটেছে। ঠিক এই কারণেই পুরাবৃত্ত বা মিথকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে তার অন্তঃস্থলে লুকোনো ইতিহাসকে খুঁজে বার করা অসম্ভব নয়। পুরাণকথাকে ধর্মের ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে ঢেকে সেই ইতিহাসের সত্যকে কবর দিতে চেয়ে এসেছে কায়েমী-স্বার্থ। তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস এবং অলৌকিকতার বাহিরঙ্গিক আস্তরণটুকু (সুপার স্ট্রাকচাব) খসিয়ে মিথ ওরফে পুরাবৃত্তের ভেতরেব কাঠামো (ইনফ্রা-স্ট্রাকচার)-টিকে বার করতে পারলেই লোকায়ত জীবনের ইতিহাস প্রকাশমান হবে। প্রচলিত নানা ধরণের ছড়া, প্রবাদ, কিংবদন্তী এবং লোককথা, এমন কী লোকসঙ্গীতের ও লোকচিত্রকলার মধ্যেও ঐ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে অন্তর্লীন ইতিহাসকে খুঁজে পেতে পারি আমরা। বাংলার ব্রতগুলি এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন : লোকশিল্প সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে পরে এই প্রসঙ্গ বিশদভাবে বলা হবে। স্বভাবতই আলোচনার সুসংহতির জন্য এখানে সেই বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে ঐ বিশ্লেষণের কয়েকটি ব্যবহারিক পদ্ধতি নির্দেশ করা গেল, এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেই নির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই উদাহরণ-সাপেক্ষ!

প্রসঙ্গক্রমে এখানেও বাংলার ব্রতকথাগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্রতের কথা বা গল্প এবং আচারগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে আমাদের বিস্মৃত ইতিহাসের নানান্ টুকরো টুকরো ছবি অবশ্যই চোখের সামনে ফুটে উঠে।

ধরা যাক, বিনন্দ রাখাল এবং লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে যে ব্রতটি আছে, তার কথা: অলস বালক বিনন্দ জীবিকার্জন করত গরু-ছাগল চরিয়ে। লক্ষ্মী তাকে স্বপনে দেখা দিয়ে বললেন নদীর পারের সবটা জমি খন্তা দিয়ে খুঁড়ে দেখতে; তাহলে সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হবে। দেবীর স্বপ্নাদেশ-অনুযায়ী বিনন্দ জমি খুঁড়তে শুরু করল; তার ঐ 'পাগলামি'-র ফলে অন্য রাখালরা গরু-চরানোর জমি নষ্ট হওয়ায় বাধা দিতে এল বটে, কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত জমিটাই খুঁড়ে ফেলা হয়ে গেছে। খন্তা দিয়ে পিটিয়ে বিনন্দ তাদের ঐ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিল। কিছুদিন পরেই নদীর পার জুড়ে ফসলের যেন বন্যা এল। দেবী যে-সম্পদের কথা বলেছিলেন, এইভাবে তার

মালিক হল রাখাল বিনন্দ।

স্পষ্টতই, রাখাল (পশুপালক) বিনন্দের কৃষকে পরিণত হবার রূপক এই ব্রতকাহিনী। অন্য রাখালদের বাধা দেবার ঘটনাটি হল পশুপালকগোষ্ঠী এবং কৃষিজীবীগোষ্ঠীর শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনাবাহী। ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল এই নিছক 'মেয়েলি' ব্রতের গল্পটির মধ্যে এভাবেই চিত্রিত আছে অলক্ষ্যচারী হয়ে।

অলক্ষ্মীপূজার যে ব্রতকথা আছে, ঠিক এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে থেকেও এই রকমের একটি ঐতিহাসিক স্তর খুঁজে পেতে পারি আমরা। রাজা ঘোষণা করেছিলেন, সারাদিনের পর যে-ব্যবসায়ীর যা-কিছু অবিক্রীত থাকবে রাজকোষ থেকে দাম দিয়ে সেগুলি সব কিনে নেওয়া হবে। এইভাবে একদিন রাজপুরীতে এসে পৌঁছল অলক্ষ্মীর মূর্তি। অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে লক্ষ্মী রাজাকে ছেড়ে চলে গেলেন। নিদারুণ দুরবস্থার পড়েও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে রাজা আবার সব ফিরে পেলেন। রাজলক্ষ্মী আবার প্রতিষ্ঠিতা হলেন, আর অলক্ষ্মীর জন্যে এই ব্যবস্থা হল যে, এরপর থেকে প্রাসাদের ভিতরে নয় বাইরেই তাঁর পূজা হবে।

এই কাহিনীর অবলীন যে-ইতিহাস, তার পরিবেশ অনেকখানি অগ্রসর সমাজের; যে-সমাজে রাষ্ট্রের (রাজা) পক্ষ থেকে বণিক (ব্যবসায়ী)-কে আর্থিক সহায়তা করা হতো। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বণিকতন্ত্র ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী দুই দেবীকে কেন্দ্র করে দুটি গোষ্ঠীর শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে অলক্ষ্মী-উপাসকদের হটে যাবার ঘটনাই এর মধ্যে রয়েছে।

লোককথার মধ্যে সমাজ বিবর্তনের ক্রমান্বিত ছবিগুলি কীভাবে স্তরে-স্তরে সজ্জিত থাকে, তার একটি চমৎকার নিদর্শন মেলে 'শী-কিং' গ্রন্থে সংকলিত একটি চৈনিক লোকপুরাণের কাহিনীতে। ঐ গল্পে বর্ণিত বিবরণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"কুন্ কখন শাসনকর্তা ছিলেন, তখন মানুষ থাকত মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে, কিংবা পাহাড়ের গুহায়, অথবা গাছের ডালে। কুনের ছেলে চাও-ইউ শেখালেন বাড়ি বানানোর কায়দা। কুন্ বহুবারই চেষ্টা করেছিলেন হোয়াং-হোর বান ঠেকাতে তাঁর সঙ্গে ছিল জ্ঞানী কচ্ছপ আর ড্রাগন,' কিন্তু জলের তোড় ঠেকানোর কোনও সুরাহাই হয়নি! ... চাও-ইউ শিশুবয়সেই মহাবীর হয়ে দৈত্য-দানো ভূত-পেত্নীদের সঙ্গে লড়াই করে হারিয়ে দিয়ে গড়েছিলেন বিশাল-বিশাল মাটির বাঁধ, আর খাল কেটে নদীর জলকে নানাদিকে বইয়েও দিয়েছিলেন তিনি।

সুই-জেন শিখিয়েছিলেন কাঠে-কাঠ ঘষে আগুন বের করতে। রান্না এবং নাচ-গানও তো তাঁরই আবিষ্কার। রঙিন্ সুতোয় গিঁট বেঁধে কথা বোঝানোও তাঁরই আমলে শুরু হয়। তাঁর পরে এলেন ফু-সি, তিনি ছিলেন অর্ধেক মানুষ— অর্ধেক ড্রাগন। তিনি শেখান ছবির—হরফ, তিন-তিথির হিশেব, আর পঁয়ত্রিশ তারের বাজনাও তাঁরই তৈরি। ঘোড়া, কুকুর, ষাঁড়, ভেড়া, শুওর, মুরগী— এই সব

পোষাও তাঁর আমলেই শুরু। মাছ ধরার জাল বুনতেও তিনিই শেখান। ফু-সির সবচেয়ে বড় কাজ ছিল পাকাপোক্তভাবে বিয়ে-শাদীর পত্তন করা। তাঁর আমল থেকে ইচ্ছেমতো জুড়ি পালটানো বন্ধ হয়ে গেল। তিনিই প্রথম ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছিলেন বুড়ো কর্তাদেবকে · নিয়তি, ভাগ্য এসব নিয়েও তিনিই সবার আগে ভেবেছিলেন।

এরপর আসেন আধা- মানুষ, আধা-ষাঁড় সেন-লুং। নামেই বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন দেবতাদের স্নেহধন্য কৃষক। চাষ-বাসের শুরু তাঁর সময়েই। ব্যামো সারানোর গাছ-গাছড়া-ওষুধ-বিষুধও তিনিই চিনতে শেখান। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তনীও ঐ তখনই হয়। এর পরের গল্প তো সবারই জানা। ''. মানব-সংস্কৃতির আদিম পর্ব থেকে সভ্যতার ক্রমবিবর্তন কেমনভাবে ঘটেছে, এই মিথে তার পরিপূর্ণ পরিচয়টিই ব্যক্ত হয়েছে।

উদাহরণ হিশেবে আমাদের দেশেরই আরও দু-একটি লোককাহিনীকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এই সূত্রেই। বাংলার সংস্কৃতি-বলয়ে ব্যাপকভাবে পরিচিত শিবরাত্রি-পালন ব্রতের একটি কাহিনী আছে সমস্ত দিন শিকারের সন্ধানে বনে-বনে ঘুরে এক ব্যাধ রাতটুকু কাটানোর উদ্দেশ্যে ক্লান্ত দেহে একটা বেলগাছের উপরে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে ব্যাধ হাত নাড়াবার ফলে শিশির ভেজা কয়েকটি পাতা খসে গিয়ে, গাছের নিচে পড়ে-থাকা শিবরূপী এক খণ্ড পাথরের ওপর পড়লে 'আশুতোষ' মহাদেবের কৃপায় তার 'অক্ষয়পুণ্য' সঞ্চিত হয়; এবং পরদিন বনের মধ্যে সহসা তার জীবনাবসান হলে, যমদূতেরা ব্যাধের আত্মাকে যখন পরলোকে নিয়ে যাবার জন্য তোড়জোড় করছে, ঠিক সেই সময়ে শিবদূতেরা সেখানে হাজির হয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করে হারিয়ে দিয়ে 'পুণ্যবান' নিষাদের আত্মাকে শিবলোকে অর্থাৎ কৈলাসে নিয়ে চলে গেল।

প্রাগৈতিহাসিক কালের শিকার-নির্ভর জীবন চর্যার যে-স্মৃতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত থেকেছে, এই লোককথার মধ্যে সেটিই লুকিয়ে আছে। শিকারের সন্ধানে মানুষ বনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; একটি বিশেষ গাছ 'পবিত্র' বলে গণ্য হচ্ছে; গাছের পাতা এবং শিশিরের জলে প্রস্তরখণ্ডরূপী 'দেবতা' তুষ্ট হচ্ছেন; আর 'ইহলোকে' মৃত-শিকারের অধিকার নিয়ে দুই আদিম মানবগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের আদলেই 'পরলোকের' আধিদৈবিক-অতিলৌকিক সত্তারাও মরা-মানুষের আত্মাটার ওপর দাবী জানিয়ে যুদ্ধ করছে। বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, অচেতন বস্তুতে চেতনার কল্পনা করা-ইত্যাদি সত্ত্বেও এই কাহিনীর মধ্যে যে-সমাজস্তরটি শিলীভূত (ফসিলাইজড) হয়ে আছে, তাকে চিনতে পারা কঠিন নয়।

ঠিক এইভাবেই, আরও একটি প্রচলিত কাহিনী বিশ্লেষণ করলে, তার মধ্যেও সমাজের বিবর্তনের ছবিটা সুন্দরভাবে খুঁজে পাই। মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে 'ভীম'-পূজা হয়, তাকে কেন্দ্র করেও ঐ এলাকায় কিছু লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, যাদেরকে হয়ত আঞ্চলিক লোকপুরাণ বলেও অভিহিত করা যায়। এখানেও শিব ঠাকুর আছেন; তিনি একটু সম্পন্ন চাষী, এই যা! অজ্ঞাতবাসে থাকার সময়ে

ভীম তাঁর মা কুন্তী ঠাকুরাণীকে নিয়ে না-কি ঐ এলাকায় কিছুদিন ছিলেন এবং তখন জীবকা হিশেবে 'শিবু-চাষী'-র 'মুনিষের' কাজ নেন। শিবের আদেশে মাঘী শুক্লা একাদশীতে বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে মাটিতে প্রথম লাঙল ঠেলে তিনি চাষবাসের পত্তন করেছিলেন পৃথিবীতে (আর সেই কারণেই না কি ঐ বিশেষ তিথি তাঁর নামে চিহ্নিত হয়েছে 'ভীম একাদশী' হিশেবে)। ঐ দিন নিরম্বু উপবাসে থেকে শিবের আদেশ পালন করার জন্যই তিনি পরে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করতে সমর্থ হন, এই গল্পের সূত্রে এমনও প্রচলিত আছে। কোথাও আবার জরাসন্ধ বধের হেতুরূপে এই গল্প চালু আছে। শিব ঠাকুরের নির্দেশে ভীম কেন কৃষিকর্মের সূত্রপাত করলেন, তারও হদিশ মেলে ঐ কাহিনীতে : ফলমূল কুড়িয়ে কিংবা চেয়ে-চিন্তে জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়লে, শিব ভীমকে বলেন কিছু একটা সুরাহা খুঁজতে। আর তখনই নাকি ভীম শিবের ত্রিশূল ভেঙে লাঙল তৈরি করে চাষবাস শুরু করলেন। কৃষির পত্তন করার জন্য, মিথে যাকে 'কালচার-হিরো' বলে, এখানে ভীম সেই মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেন তো বটেই, তা ছাড়াও ত্রিশূল ভেঙে লাঙল তৈরি করার ব্যাপারটা স্পষ্টতই শিকারভিত্তিক আর্থ-সামাজিক পর্যায় থেকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে বিবর্তনের সঙ্কেত-সূচনা করেছে।

এই কৃষির পত্তনমূলক আঞ্চলিক-মিথের আরও কয়েকটি উল্লেখ্য বিষয় আছে। ঐ কাহিনীর মধ্যে একটি অংশে আছে যে, মাঘের শীতে কুন্তী দেবী পুকুরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে কষ্ট পেতেন বলে. এবার ভীম হাল চষতে-চষতে উঠে এসে আগুনে লাঙলের ফাল তাতিয়ে নিয়ে সেটি পুকুরে ডুবিয়ে দিলে সমস্ত জলটা গরম হয়ে যায় এবং কুন্তীও শীতের হাত থেকে রেহাই পান। লাঙলের ফালকে উত্তপ্ত করে জলে-ডোবানো অবশ্যই উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা প্রতিষ্ঠিত হবার স্মারক। লাঙল, উত্তাপ, জল এবং তাতানো-লাঙল তাতে চোবানো—সবই হল বিশিষ্ট কিছু উর্বরতাতান্ত্রিক প্রতীক যা মনোবিজ্ঞানীরা সহজেই ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। আর এই চাষবাসের সূত্রপাত-নির্দেশী কাহিনীর সঙ্গে দুর্যোধনের (মতান্তরে, জরাসন্ধের) হত্যার প্রসঙ্গোল্লেখ, প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজ শুরু করার সঙ্গে শস্যক্ষেত্রে নরবলি দানের একটি বহুল ভাবে পালিত নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কারকেই পরোক্ষে সূচিত করছে যে, অসংশয়ে সে কথাও বলা চলে।

ব্রতকাহিনীর মতো প্রত্যক্ষভাবে যা লোকসংস্কৃতির বস্তু নয়, অথচ যার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে লোকায়ত কৃষ্টির অনিবার্য উপকরণ, ইতিহাসের বাস্তব-অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা সেখানেও অবশ্য সম্ভব। পুরাণ-অন্বেষণের যে-কথা বলেছি কিছু আগে এই সব প্রসঙ্গে, তারই সূত্র ধরে এখানে নানা জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত কিছু-কিছু পুরাণকথার বিশ্লেষণ করা যায় অতঃপর যে-সমস্ত পুরাণ-কথাকে অবলম্বন করে 'ওলড টেস্টামেন্ট' গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে একটি হল আদম ও ইভের দুই পুত্র কেইন ও আবেলের কাহিনী। বাইবেলীয় পুরাণ-অনুযায়ী কেইন ছিল পৃথিবীর প্রথম খুনী, সে নিজের সহোদর আবেলকে হত্যা করেছিল। ঐ পুরাণ-

কাহিনীতেই আছে আবেল ছিল পশুপালক, আর কেইন কৃষক। কৃষিজীবী গোষ্ঠীর হাতে পশুপালকদের চূড়ান্ত পরাভবই রূপকের আড়ালে বর্ণিত হয়েছে বাইবেলের এই পুরাণ-কাহিনীর মাধ্যমে।

মিশরীয় পুরাণে সূর্যদেবতা রা-এর সঙ্গে শস্যদেবী আইসিসের দ্বন্দ্বও একই ধরণের ঐতিহাসিক সংঘাতের সূচক। শস্যদেবী আইসিস এবং তাঁর ভাই-তথা-স্বামী ওসিরিস পশুপালকদের উপাস্য রা-এর কাছ থেকে বিশ্বশক্তির উৎস-সম্পৃক্ত জ্ঞান কেমন করে কেড়ে নিলেন, মিশরীয় পুরাণ-কথায় সেই কাহিনীটি বিবৃত আছে। আবার ওসিরিসের অনুজ রা-পূজক সেট-এর হাতে তার মৃত্যু ঐ দ্বন্দ্বের আরেক অধ্যায় : আইসিস—ওসিরিসের পুত্র হোরাসের প্রতিষ্ঠা পাওয়া হল ঐ দ্বন্দ্বেরই শেষ পরিণাম।

আইসিস-ওসিরিস ভ্রাতা-ভগিনী হয়েও স্বামী-স্ত্রী। প্রাচীন মিশরের ঐ সমাজবিধিও এই কাহিনীর মধ্যে সূচিত। আদিম গোষ্ঠীসমাজের ঐ বিধি প্রাচীন মিশরে প্রচলিত থাকলেও সেটা আবার প্রাচীন বৈদিক আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলিতে কালক্রমে অপ্রচলিত হয়েছিল যে, ঘটনার হদিশ মেলে ঋগ্বেদের যম-যমীর উপাখ্যান থেকে। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে যৌন-সম্পর্কের ট্যাবু সেখানে গড়ে উঠেছিল বলেই, যম ঐ উপাখ্যানে যমীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে-সুনির্দিষ্ট লৌকিক সমাজবিধি অবলম্বনে ঐ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল. তার ঐতিহাসিক স্তরটিকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়; বাঙালীর ঘরের ভাইফোঁটা-ব্রতের মধ্যে সেই নূতন মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজের চেতনাই প্রবহমান আজও।

অনুরূপ একটি পাপ-পুণ্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কারের ভিত্তি-নির্ভর সমাজের ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে গ্রীক পুরাবৃত্তের অইদিপাউস-কাহিনীর মধ্যে। আদিম গোষ্ঠীমানব পরিণত বয়সে পিতাকে হত্যা করে নিজের জননীসহ গোষ্ঠীর সমস্ত নারীকেই অধিকার করত। এর ফলে যে অজাচার ঘটত, সেটাকে 'পাপ' বলে উপলব্ধি করতে শিখল যখন মানুষ, অইদিপাউসের গল্প রচিত হল তখনই। আর কালক্রমে লোকসমাজের স্বাভাবিক সংস্কার-নির্ভর ঐ কাহিনী পরিণতি পেল পুরাণ-কথায়।

পাপ-পুণ্য, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ সচেতন হয়েছিল সভ্যতার ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে? এঙ্গেলসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যখন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ অর্জন করল, তখন থেকেই তার ফলশ্রুতি হিশেবে সম্পর্কগত বিধিনিষেধও প্রতিষ্ঠিত হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং তার 'যথার্থ' উত্তরাধিকার বর্তানোর প্রশ্নটা যখন থেকে সমাজে ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যৌন সম্পর্কের সিদ্ধতা, নিষিদ্ধতার বিধানও তখন থেকেই বিহিত হতে শুরু করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের ঘড়ি দিয়ে এই ঘটনার বয়স মাপা যাবে না, নানাভাবেই এর প্রচলন দেখা গেছে। বৈদিক গোষ্ঠীসমাজে ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ দেখছি, কিন্তু তার পরবর্তীকালীন 'দশরথ জাতক' -এর একটি পাঠে রাম ও সীতা পরস্পরের ভাই-বোন। অবশ্যই দুই বিভিন্ন সমাজের পরিচয় বহন করছে এরা,

যদিও ঐ যৌন-ট্যাবু-সম্পন্ন সমাজটি ট্যাবুহীন সমাজের চেয়ে প্রাচীনতর। আবার পরবর্তীকালের কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সীতার জন্ম কল্পিত হল কৃষিকাজের সময় হলকর্ষিত মাটির মধ্যে।

ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হবার যে-ব্যাপারটি বৈদিক উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে একটা জায়গায় যমী নিজেকে যমের পত্নী হিশেবে নিবেদন করতে চাইলে, যম তাঁকে নিরস্ত করছেন এই বলে যে, ও-রকম সম্পর্ক পুরাকালে প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে তার অনুসৃতি দেবতাদের ক্রোধ উদ্রেক করবে। স্পষ্টতই, সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধও রূপান্তরিত হয়, এই কাহিনী তারই সূচকস্বরূপ। 'দেবতাদের ক্রোধ' বস্তুত ট্যাবুরই সঙ্কেতবাহী।

ঠিক একই ট্যাবুর অনুবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের দেশে প্রচলিত 'কাজলরেখা'র গল্পে। সাইবেরিয়ার চুক্‌চী উপজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি উপকথাতেও এই ধরনের সামাজিক-নিষেধাজ্ঞার খোঁজ পাওয়া যায়; পাওয়া যায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতি, প্রজাতি এবং অধিজাতির লৌকিক সাহিত্যের মধ্যেই। ইতিহাসের এক বিস্মৃত যুগের পরিচয় তাদের মধ্যে মাটির তলার ফসিলের মতো লুকিয়ে রয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই আধুনিক গবেষকদের অনেকেই লোকসাহিত্যেকে 'মৌখিক প্রত্নতত্ত্ব' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

।। ৩।।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে শুধুমাত্র প্রাগিতিহাসের কিংবা ইতিহাসের উষাকালের আলো-আঁধারই লুকিয়ে থাকে, এমন নয়। ইতিহাসের স্পষ্ট রূপটি যখন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠতে থাকল, তখন থেকে উত্তরকাল অবধি বহুবিচিত্র বিবর্তনের চিহ্নও স্তরে-স্তরে সন্নিবিষ্ট আছে লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণগুলির মধ্যে।

উৎপাদনের মাধ্যম পরিবর্তিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপেক্ষিকভাবে সামাজিক কাঠামোরও বদল ঘটে যে, সেকথা আমরা জানি। এই মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সূত্র ধরেই লোকজীবনের সামাজিক ইতিহাসের বহু আপাত-অব্যাখ্যাত জটিলতারও সমাধান করা যায় লোকায়ত সংস্কৃতির নানাবিধ প্রকরণের বিশ্লেষণ করলে।

আমাদের নিজেদের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই না-হয় বিচার করা যাক : বৈদিক আর্যভাষী এবং আবেস্তীয় আর্যভাষী দুই জ্ঞাতি-শত্রুর দল যথাক্রমে ভারতে ও ইরানে প্রবেশ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি কোনও সময়ে। উভয় গোষ্ঠীর এই জ্ঞাতি-শত্রুতার ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে দুই দেশে তাঁদেব উত্তরপুরুষরা পরবর্তীকালে যে-মিথ বা লোকপুরাণের ঐতিহ্যানুসরণ করে এসেছেন, তার মধ্যে। ইরাণীয় আর্যরা 'অসুর' (অহুর) উপাসক, তাঁদের ভারতীয় জ্ঞাতিরা 'দেব'-পূজক। এদেশের পুরাবৃত্তে তাই দেবশত্রু অসুরদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, ইরানীয় পুরাণকথায় ঘটেছে ঠিক তার বিপরীতটি।

প্রাগিতিহাস এবং প্রত্ন-ইতিহাসের সন্ধিলগ্নের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপারটা অবশ্য দুর্বোধ্য কিছু নয়। দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হল এরপর থেকে। বৈদিক পুরাণবৃত্তে অসুরদের সঙ্গে সঙ্গে 'দাস' এবং 'দস্যু' অভিধেয় আরও একটি কিংবা একাধিক জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখা যায় 'দেব'-উপাসক আর্য-ভাষীদের সুগভীর একটা।

ঋগ্বেদের সূত্রে ঐ দাস-তথা-দস্যুদের 'অশ্মময় (পাথরের) পুরী' ধ্বংসের বর্ণনা করা হয়েছে; বলা হয়েছে কেমন করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের 'সালঙ্কারা যুবতী'দের 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' করা হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় কেমনভাবে পরাজিত বিধ্বস্ত এবং ধর্ষিত করা হয়েছিল দাস-বা-দস্যুদের, তার ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে যেখানে।

এই দাসদের কুৎসাকীর্তন করেছেন ঋগ্বেদের কবি এইভাবে : এরা লিঙ্গপূজক, মূর্তিপূজক ঃ ‘শিশ্নদেবাঃ, মূরদেবাঃ’’। এঁরা কারা? বহু পণ্ডিতেরই সিদ্ধান্ত হল এই যে, এঁরা ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রের মানুষ; এমনকী হরাপ্পা (হরিযূপীয়া) নগরীর উল্লেখও ঋগ্বেদে পাওয়া গেছে।

সিন্ধুরাষ্ট্রে উপাসিত শিব এবং মহামাতৃকাদেবীকে কিন্তু উত্তরকালে, যারা সেই রাষ্ট্র বিধ্বস্ত করেছিলেন, সেই বৈদিক আর্যভাষীরাও নিজেদের উপাস্য প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতা রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। মূর্তিপূজা, লিঙ্গপূজাও প্রচলিত হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। বিজিত জাতির ধর্মবিশ্বাসকে বিজয়ী জাতির গ্রহণ করার এই আপাত-প্রহেলিকাটির সমাধানের সূত্র প্রচলিত প্রথানুগ ইতিহাস-বিচারের পদ্ধতির সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর সমাধান মিলবে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী এবং লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর কাছে। বৈদিক আর্যভাষীরা যাযাবর জাতি হবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাতিক হারটা অসম ছিল। এই কারণেও বটে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের চিরকালীন নিয়মেও বটে, আর্যভাষী বিজয়ীরা পরাজিত দাস-দস্যু জাতীয়দের (মনে রাখা দরকার, শব্দ দুটি এখন যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা হত না; ওদুটি কথা জাতিবাচকই ছিল তখন) কন্যা-বধূদের কেড়ে নিয়ে আসত; ঋগ্বেদীয় সূক্তেও যে সেসব ঘটনার প্রমাণ আছে, সে কথা ওপরে বলেছি। এই নারীরা, একদা- যাযাবর, পরে জনপদবাসী এবং কৃষিজীবী হওয়ার ফলে নিশ্চিন্ততা-লাভকারী আর্যভাষীদের অন্তঃপুরে ঢুকতেন নিজেদের পিতৃকুলের ধর্ম, আচার, সংস্কার এবং দেবকল্পনাকে নিয়েই। এইভাবেই প্রাগার্য সৈন্ধবদের দেবদেবীরা, আর্যশিবিরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কালক্রমে বৈদিক দেবতা (মূলত পুরুষ) বর্গকেই পিছনে সরিয়ে দিলেন।

এ জিনিস যে ঘটেই থাকে, তার প্রমাণ লোকসংস্কৃতিবিদের কাছে খুব দুর্লভ নয়। চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে রয়েছে, শিবপূজক ধনপতির ঘরে এসেও চণ্ডী-উপাসক পরিবারের কন্যা খুল্লনা পিতৃকুলের ধর্মবিশ্বাস-অনুযায়ী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতেন। 'ডাইনী দেবতা'র ঘটে পদাঘাত করে ধনপতি সেটিকে ভেঙে দিলেও, অবশেষে ঘটনা-পরম্পরায় চণ্ডী-উপাসনা সওদাগরের গৃহেও স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। প্রচলিত ইতিহাসের তথ্যের মাধ্যমে সৈন্ধবীয় দেবদেবীরা কেমন করে উত্তরকালে হিন্দুধর্মে

(সিন্ধু ধর্মে?) প্রধান হয়ে উঠল তার হদিশ না মিললেও, লোকসংস্কৃতিবিদ্ কিন্তু লৌকিক চণ্ডীকাহিনীর সূত্র অবলম্বন করে ঐ ঐতিহাসিক ধাঁধার রহস্যভেদ করে দিতে সক্ষম।

যাযাবর জাতির পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৃষিসভ্যতা-ভিত্তিক জাতির নারীরা এইভাবে যে পিতৃকুলে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-শাসিত চতুর্বণনির্ভর সমাজে গড়ে-ওঠা দুয়েকটি প্রবাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করলে পরে, তার সমর্থন মিলবে ঃ

১. স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি

২ নবাণাম্ মাতুলক্রমঃ

স্মৃতি-সংহিতা-গৃহ্যসূত্র-নিয়ন্ত্রিত হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণীয় পুরুষরা 'দুষ্কুল' (অর্থাৎ, তাঁদের মানদণ্ডে যা 'নীচ' কুল (শূদ্র-বলে অভিহিত শ্রমজীবী) অর্থাৎ প্রাক্তন দাস-দস্যু ইত্যাদি- জাতি থেকে স্ত্রী আহরণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; পুরাণকাহিনীর রাজা শান্তনু-কর্তৃক ধীবরকন্যা সত্যবতীকে গ্রহণ করা, তার ধ্রুপদী উদাহরণ! এই 'দুষ্কুল'-আগত 'স্ত্রীরত্ন'-রা তাঁদের সন্ততিদের মধ্যে তাদের মাতুলকুলের ভাবধারাকে দৃঢ়প্রোথিত করে দিতেন হয়ত অনেকটা প্রতিশোধের বশেও। আর সেইজন্যই মাতুলকুলের 'ক্রম' বা আচার বিশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠত তারা। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য যে, বহুজনীন অভিজ্ঞতার উপাদানে তৈরি-হওয়া এইসব প্রবাদও লোক-সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

॥ ৪॥

শ্রেণীগত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যে-নতুন সমাজ-পরিস্থিতি গড়ে ওঠে, সেটির সঠিক বিশ্লেষণের পিছনে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের যে কী ভূমিকা, তার গুরুত্ব যে কতখানি, সেটি আমরা এখনই দেখেছি। প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী-বিরোধ লোকসংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে, কতটা প্রতিফলিত হতে পারে এবং ইতিহাসের চলার পথের নির্দেশ সে কতটা দিতে পারে, সেইটুকু বিচার করা অতঃপর একান্তই প্রাসঙ্গিক।

সিন্ধুর দেবদেবীরা যেমন বৈদিক দেব-দেবীদের পশ্চাৎপটে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই পরাজিত মিশরীয়দের প্রধান দেবতা আইসিস ও হোরাস (এঁদের কথা আগে বলেছি) বিজয়ী রোমানদের দেবকুলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে নিয়েছিলেন। আইসিসের কোলে হোরাসের মূর্তির উপাসনা খ্রিস্টপূর্ব আমলের শেষদিকে রোম সাম্রাজ্যে এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে, বহিরাগত হলেও তিনি প্রায় লৌকিক দেবতাতেই পরিণত হয়েছিলেন। এর সুযোগ নিয়েই রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই যীশুর কোলে নেওয়া মেরীর মূর্তিকে উপাসনা করতে শুরু করেছিলেন রাজশত্রু এবং গণশত্রু বলে ঘোষিত প্রথম আমলের খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা। এর ফলে ধরা পড়লেও যীশু ও মেরীর মূর্তিকে হোরাস ও আইসিসের মূর্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার পথ থাকত। রোমানদের মধ্যে প্রথাগতভাবে প্রচলিত শিল্পপ্রতীকোপাসনার

লোকায়ত রীতির সুযোগে অনুরূপভাবেই ক্রুশ-উপাসনা করারও রেওয়াজ চালু ছিল তাঁদের মধ্যে। কালক্রমে খ্রিস্টধর্ম রোমের রাজধর্মে পরিণত হলে রোম রাজত্বের দরিদ্র এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর অসহায় কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষগুলির ঐ ছদ্ম-উপাসনার আর প্রয়োজন রইল না; মোটামুটিভাবে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কাঠামোটি অপরিবর্তিত থাকায়, অ-খ্রিস্টান রোমানরাও যীশু-মেরীর মূর্তি এবং ক্রুশকে ধীরে-ধীরে মেনে নিলেন। এইভাবেই প্রচলিত লৌকিক পূজারীতির মাধ্যমে, রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম প্রহরে একটি দীর্ঘকালস্থায়ী শ্রেণীদ্বন্দ্বের গতি-বদল ঘটল। খ্রিস্টান চার্চ ক্রমে-ক্রমে শোষিত থেকে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু সে অন্য কথা, এখানে প্রাসঙ্গিক নয় তার আলোচনা।

শ্রেণীগত যে-দ্বন্দ্বের গতিপথ-নির্ণয়ই হল ইতিহাসের যথার্থ বস্তুবাদী বিচার, সেই দ্বন্দ্বের চিত্রও সুপ্রাচীনকাল থেকে লোকসংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আসছে। রাজা-রাজত্ব বৈভব-ক্ষমতা-কেন্দ্রিত ইতিহাসে তারা ঠাঁই না পেলেও, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে মানুষের মুখে মুখে, পুরুষানুক্রমিক স্মৃতিতে তারা সুরক্ষিত থেকেছে :

"সাদা গমের বস্তা আমাদের বইতেই হবে
সারাদিন ধরে।
গোলাবাড়িগুলো উপ্‌চিয়ে পড়ছে
গমের ভারে। জাহাজগুলোও বোঝাই,
গমের ভার উপ্‌চিয়ে পড়ছে।
তবুও আমাদের বইতেই হবে
সাদা গমের পাঁজা।
আমাদের বুকগুলো নিশ্চয়ই
তামায় গড়া।"

ধনীর শস্যভাণ্ডার উপ্‌চে পড়ছে ভারে-ভারে শস্য বিদেশে চালান যাচ্ছে মুনাফার জন্যে, অন্যদিকে দেহশ্রমী মানুষের দলকে অনেকের পেট এবং পকেট ভরানোর জন্য খেটে যেতে হচ্ছে— এই মর্মান্তিক অনুভূতি সুগভীর শ্রেণীচেতনারই ফসল। লোহার আবিষ্কারের আগের আমল থেকে (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অনামা এই লোককবি নিজেদের বুক তামায় বাঁধানো বলছেন সেই জন্যে: সম্ভবত, এ কবিতা সাড়ে তিন হাজার বছরেরও পূর্ববর্তী, কারণ লোহার আবিষ্কার হয় ঐ সময়েই) আজ অবধি এই গান নীলনদের তীরের প্রাচীন অধিজাতিগুলির স্মৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীন চীনের যে-কৃষক কবি স্মরণাতীতকালে কবিতা বেঁধেছিলেন ঐ একই রকম শ্রেণীচেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে, তাঁর লেখায় দেখি :

"শোন হে মনিব মশাই,
তুমি তো ধান বোনোওনি, কাটোওনি,
তবে কেন তিরিশ লাখ গুচ্ছি ধান তোমার ঘরে?
চাষের বলদগুলোই বা তোমার প্রাসাদে কেন?

সমর্থ লোক কখনও পরিশ্রম না-করে খায় না:
মনিবমশাই,
তুমি কিন্তু তাই খাও!"

চীনের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে এই কবিতা বহু শতাব্দীর ধূলিতেও অমলিন। ঠিক এই শ্রেণীগত বঞ্চনার কাহিনীই ব্যঞ্জিত হয়েছে সমুদ্র-মন্থনের গল্পে অসুরদের শ্রমে-লব্ধ অমৃত নিয়ে দেবতাদের পালানোর বর্ণনায় কিংবা, গ্রীকপুরাণবৃত্তে দেবভোগ্য অগ্নিকে মানুষের ব্যবহারের জন্য মর্ত্যে নিয়ে- আসার অপরাধে টাইটান প্রমেথিউসের ত্রিশ হাজার বছর ধরে ব্যাপ্ত লাঞ্ছনার বিবরণে। 'বঞ্চিত এবং প্রতারিত' অসুরেরাও একবার রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং দেবভূমি অধিকার করেছিল বলে যে-লোকপুরাণ-কাহিনী আমাদের ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠ, তার অন্তরালেও কি ঐ শ্রেণী-সংগ্রামের সচেতনতাই ফল্গুধারার মতো প্রবহমান নয়?

আবহমানকাল ধরে সভ্যতার ইতিহাসের এই বস্তুময় মূর্তিটি রচিত হয়ে চলেছে। মর্গানের 'এনসেন্ট সোসাইটি'-র ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ সমাজ-বিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস তাঁর 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট' বইতে যে-ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক শতাব্দীরও আগে, তার ব্যাপকতর বিশ্লেষণ করতে হলে আজকের ইতিহাস-তাত্ত্বিককে তাই লোকসংস্কৃতির উপকরণকেও অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি বস্তু বলে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতপক্ষে, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথা সমাজবিজ্ঞানচর্যার অধুনাতম পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর স্বীকার না-করার কোনওই সঙ্গত যুক্তিই নেই।

লোকসংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভূমিকা যে ঠিক কী হতে পারে, তার যথাযথ সন্ধান পেতে হলে, প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি দিকনির্দেশী গবেষণার কথা এখানে একটু না বললে, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্যই মার্ক্সের 'এ কনট্রিবিউশ্যান টু দ্য ক্রিটিক অব পোলিটিক্যাল ইকোনমি' (১৮৫৯) গ্রন্থের কথা বলতেই হবে এই উপলক্ষে সবার আগে। মার্ক্স সেখানে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন গ্রীসের পুরাণবৃত্তান্তগুলির মাধ্যমে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কীভাবে এক দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থেকেও, ধীরে-ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে, দেবতার সঙ্গে মানুষের যে-সব সংঘাত সেখানে চিত্রিত হয়েছে, তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক উদ্বর্তনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞান। ঐসব অতীত দিনের কাহিনীমালাকে তিনি এই বইয়ের নানা জায়গাতেই, পরবর্তীযুগের মানুষের পথ-নির্দেশী-ঐতিহ্য বলে ধার্য করেছেন। প্রমেথিউসের কাহিনীকে তিনি দেবরাজ জিউসের সঙ্গে মানুষের স্বাধিকার অর্জনের, প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম হিশেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ঐ পুরাণবৃত্তের মধ্যে বস্তুতপক্ষেই তিনি আর্থ-রাজনৈতিক একটি ইতিহাসের সত্যকে অন্বেষণ করেছেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের অগ্নির আধিপত্য নিয়ে ঐ দ্বন্দ্ব, প্রকৃতপক্ষে সেই ইতিহাসেরই

পৌরাণিক রূপক-বিশেষ।

পোল লাফার্গের 'স্কেচেজ অব দ্য হিস্ট্রি অব প্রিমিটিভ কালচার' (১৮৯০) বইটির কথাও এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। সমাজবিকাশের গতিধারার প্রেক্ষিতেই লোকসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনকে বোঝাতে চেয়েছেন লাফার্গ। বিভিন্ন লোককাহিনীর ঘটনার অনুষঙ্গে তিনি অর্থনৈতিক বিন্যাসকেও বোঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর লেখায় একটা কথা খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে : লৌকিক সংস্কৃতিকে তিনি, শ্রমনির্ভর জীবনযাত্রার মধ্যে সাময়িক অবসরকালে গড়ে-ওঠা সেই জীবনেরই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বলেছেন। এখানে একটা কথা বুঝতে হবে : মার্ক্সের ঐ বইতে কোনও লোককাহিনীর পরিবেশ এবং সেই কাহিনীর সৃষ্টিকালীন সমাজবিকাশের স্তর যে সর্বদাই পরস্পরসাপেক্ষ নয়, এমন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আকর্ষণ উত্তরকালে কমে না, কারণ ঐ সব কাহিনীর অন্তর্কাঠামোর মধ্যে মানুষ নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তকেই খুঁজে পায়। পক্ষান্তরে, লাফার্গের লেখায় ইতিহাস-অন্বেষণ নয়— তার পুনর্গঠনের উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে, সেই সূত্রে লোককথার প্রত্যাশিত একটি ভূমিকাই নির্দেশ করা হয়েছে। মার্ক্সের সঙ্গে লাফার্গের ভাবনার ফারাক হল এইটিই যে, মার্ক্স যেখানে লোকসাহিত্যকে ইতিহাসের অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন, লাফার্গের উপলব্ধিতে সেটা হল আসলে ইতিহাসের উপকরণ।

এই দুই ভাবনাকে সংহত করে বেঁধেছেন ম্যাক্সিম গোর্কী তাঁর 'ডিজইনটেগ্রেশ্যন অব দ্য পার্সোনালিটি' প্রবন্ধে, এবং অন্যত্রও।

লোকসাহিত্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিফলন কীভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাই দেখাতে গিয়ে তিনি নানা চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে বস্তুবাদী ইতিহাস-চেতনার মৌল সত্যটির কথাই বলছেন। একদিকে যেমন লোককথার মধ্যে প্রকৃতির ওপরে মানুষের বিজয়বার্তা প্রতিধ্বনিত হয় দুরূহ সমস্ত কাজের সফল সমাপনের ফলশ্রুতি হিশেবে, তেমনই অন্যদিকে আবাব শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 'সাধারণ' মানুষের প্রতিবাদী সংগ্রামও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে অভিব্যক্তি লাভ করে। মার্ক্স যেটা বলেছিলেন— পুরাণবৃত্ত, লোককথা -ইত্যাদি উত্তরকালকে বুক বেঁধে দাঁড়ানোর প্রেরণা দেয় অলক্ষ্যে, তার সঙ্গে লাফার্গ যা বলেছিলেন— এসবের মধ্যে সংগ্রামী মানুষের সত্তা নিজের প্রতিবিম্বকে খুঁজে পায়—এই দুই ভাবনার সমন্বয় করেছেন গোর্কী। শোষকশ্রেণী লোককথা-লোকসঙ্গীতকে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুক না-কেন, বস্তুতপক্ষে সেগুলি শোষিত মানুষের কাছে এক ধরণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সাফল্যের ইশতেহার হয়েই দাঁড়ায় শেষ পরিণামে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকসাহিত্যের দিক্‌বলয়

ক. লোককথার বিচিত্র মূর্তি

বিশ্বসংসারের অজস্র ঘটনার মূল উপলক্ষ যে কী, তা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এই সমুন্নত যুগেও বহুক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধির অনায়ত্ত থেকে গেছে। শুধু তাই নয়; বহু প্রাকৃতিক-সংঘটনের বৈজ্ঞানিক কারণ আজ মানুষের জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে এসে পৌঁছলেও নানান্ আদিম সংস্কার এখনও আমাদের মনে শিকড় গেঁথে অনড় হয়ে বসে আছে, আর আমাদের আচার-আচরণ অভ্যাস ইত্যাদির মধ্যে সে-সব সংস্কার নিত্যনিয়ত প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। সভ্যতার এই অত্যুন্নত পর্যায়ে পৌঁছেও যখন আমাদের মানসিকতার অন্তর্নিহিত আদিম বিশ্বাসের শিকড়গুলো উপড়ে যায় নি, তখন সত্যিসত্যিই মানুষ যখন আদিম এবং অসভ্য ছিল, সে সময়ে তার বিশ্বাস এবং কল্পনার মধ্যে অলৌকিকত্বের স্থান কতখানি-জায়গা জুড়ে যে ছিল, সেকথা সহজেই অনুমেয়। যে-জিনিষেরই তারা স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হতো, তার পিছনেই একটা কিছু অলৌকিক শক্তি সক্রিয় আছে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে এক-একটা কাহিনী গড়ে তুলত। লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদেরকেই বলা হয়ে থাকে মিথ বা লোকপুরাণ।

কেন ভূমিকম্প হয়? আকাশের চাঁদ ক্ষয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ একদিন কোথায় অদৃশ্য হয়? আবার কোথা থেকে যেন ফিরেও আসে ফের? মৃত্যু হলে মানুষ কোথায় যায়? কোথাও কী যায়? মাকড়সার কেন আটখানা পা? বাঘের গায়ে ডোরাকাটা কেন? অজস্র, অগুণ্‌তি সব প্রশ্ন, যার স্বাভাবিক বিজ্ঞান-সম্মত উত্তরটা আমাদের প্রাগৈতিহাসিক-প্রপিতামহদের অনধিগম্য ছিল। আর ঠিক সেজন্যেই তাঁরা নিজেদের একটা করে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এই সব 'অবোধ্য' ব্যাপারের রহস্য সমাধান করতে প্রয়াসী হতেন।

একটা উদাহরণ দেখা যাক বরং : সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ-লাগা আদিম মানুষের জীবনে অবশ্যই একটা নিদারুণ কৌতূহল এবং ভীতির সঞ্চার করত। এমন যে সর্বশক্তিমান সূর্য (বা চন্দ্র), যার আলোয় সমগ্র বিশ্বচরাচর আলোকিত হয়ে ওঠে তার মতো মহাশক্তিধর দেবতা (যে কোনও আয়ত্ত-বহির্ভূত বস্তু বা ঘটনার পিছনেই তাঁরা এক বা একাধিক দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করতেন।) যার দ্বারা আক্রান্ত এবং বিপন্ন হতে পারে, সেও নিশ্চয় মহাশক্তিধর আর এক অলৌকিক সত্তা। সুতরাং সৃষ্টি

হল 'রাহু' নামে রাক্ষসের, তৈরি হল রাহু-কর্তৃক সূর্য-চন্দ্র গলাধঃকরণের মিথ।

লৌকিক কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে মিথই হল প্রাচীনতম। আদিম প্রপিতামহদের বিভিন্ন অব্যাখ্যাত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা এই মিথগুলিকে "প্রাক্ বিজ্ঞান যুগের বিজ্ঞান কল্পনা" বলে আখ্যা দিয়েছেন অনেক লোকবিজ্ঞানী। সম্পূর্ণভাবে অলৌকিকত্বের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই কাহিনীগুলি গড়ে ওঠে, একক প্রয়াসে নয়---গোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রচেষ্টায়। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের ওপর থেকে সেই অলৌকিকত্বের প্রতি আদিম ধরনের বিশ্বাসের গুরুভার যত কমে যেতে থাকে, এই ধরনের কাহিনীগুলি ততই অপ্রচলিত, অন্তত পরিবর্তিত, হতে থাকে। এখানে আর একটা কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এই সব মিথ বা লোকপুরাণের সঙ্গে আদিম কালের ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় এবং সে জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেবতা বা দেবতাকল্প কোনও কিছু এই কাহিনীগুলির মুখ্য চরিত্ররূপে প্রতিভাত হতো। বহুবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার সুবিধার জন্যই যে এইসব দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের প্রাগৈতিহাসিক বৃদ্ধ-প্রপিতামহরা, সে-কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

কিন্তু অলৌকিক-সংঘটনের প্রতি আদিমকালীন আস্থার ফলে এই সব মিথ আজকে যতই আজগুবী রূপে প্রতিপন্ন হোক না কেন, এদের মধ্যে সুদূর অতীত কালের আচার-সংস্কার, প্রথা রীতি-নীতির অজস্র হদিশ খুঁজে পেতে পারি আমরা। উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যে একই ধরণের মিথ বিভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে কোনও-না-কোনও সময়ে। উদাহরণ হিশেবে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত পুরাকাহিনীর কথা বলা যেতে পারে : হিন্দু পুরাণকথায় যে "প্রবল পয়োধি জল" এর কথা উল্লেখিত হয়েছে (শতপথ ব্রাহ্মণ), সেখানে দেখি যে স্বয়ং বিষ্ণু মৎস্য-অবতার রূপে পৃথিবীর সর্বপ্রকারের প্রাণীর একটি করে স্ত্রী ও পুরুষকে রক্ষা করে সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। এই একই গল্প একটু ভিন্ন মূর্তিতে বাইবেল-কথিত 'নোআ'র কাহিনীর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। আসীরিয়া থেকে পলিনেশিয়া, পেরু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা---প্রায় সমস্ত দেশের লোকপুরাণের মধ্যেই অনুরূপ এক-একটি করে কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যে, মিল শুধু এই একটিমাত্র কাহিনীর ক্ষেত্রেই প্রাপ্য নয়।

লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর কাছে এই ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন হিশেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে না-হয় সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে জাতিতে জাতিতে যোগাযোগ স্থাপিত হতে পেরেছিল বলে, একদেশের প্রচলিত গল্প ভিন্নদেশে গিয়ে হাজির হতো। কিন্তু আদিম জাতিগোষ্ঠীগুলি তো একটা-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপের মতো অন্যনিরপেক্ষ থাকত; তা হলে তাদের মধ্যে এই একই রকমের কাহিনীগুচ্ছের সৃষ্টি হয়েছে কী করে দেশে-দেশে?

দু ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা চলতে পারে। প্রথমত, আদিম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা সর্বত্রই অল্প-বিস্তর সমান হবার ফলে, দেশ-কাল-ভেদ সত্ত্বেও

একই ধরণের অভিজ্ঞতা এবং ঘটনার ব্যাখ্যা একরকম ভাবেই তারা কবছে, ফলে একই ধরনের মিথেরও উদ্ভব ঘটেছে সর্বত্র। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল এই যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যখন বৈবাহিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়ে উঠল, তখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত মিথগুলিরও পারস্পরিক বিনিময় ঘটল। মনে রাখতে হবে যে, তখনও বিজ্ঞান-নির্ভব প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত না-হওয়ার ফলে মিথগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এখনকার তুলনায় সে যুগে অনেক বেশিই ছিল।

তবে মিথ মানেই যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এইরকম সর্বগ্রাসী একটা ধারণা পোষণ করাও লোকসংস্কৃতিবিদের পক্ষে যথার্থ নয়। শুধু মাত্র আচাব, সংস্কার, রীতি, প্রকরণ ইত্যাদিরই সত্য-নির্ভর উৎস এদের মধ্যে প্রাপ্য তা নয়; কোনও-কোনও প্রাকৃতিক সংঘটনেব ইতিহাস-সম্মত হদিশও খুঁজে পাওয়া যায় এক-এক সময়। ধরা যাক ঐ মহাপ্লাবন-মিথের প্রসঙ্গই : ভূতত্ত্ববিদ্‌রা একথা প্রমাণ করেছেন যে হাজাব দশেব বছর আগে শেষ-তুষার যুগ সাঙ্গ হবার মুখে সারা পৃথিবী জুড়েই একটা বরফ-গলা জলের প্রবল প্লাবন ঘটেছিল। সে-সময়ে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে কাহিনী তৈরি করার মতো যথেষ্টই 'সভ্য' হয়ে উঠেছিল এবং ঐ প্লাবন থেকে যাঁরা তখন রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরপুরুষদেব মধ্যে প্রচলিত পুরাণকথার ঐতিহ্যে তাবই স্মৃতি-বিধৃত হয়েছে সর্বত্র। সেই স্মৃতিরই সাহিত্যিক রূপান্তরণ ঘটেছে এই সমস্ত মহাপ্লাবন মিথের ভিতর।

মোটামুটিভাবে চৌদ্দটি প্রকরণের মিথ তৈবি হতে পারে বলে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা সর্বজনীনভাবে মেনে নিয়েছেন। এবা হল :

১. সৃষ্টিরহস্য ২. মহাপ্লাবন ৩. আত্মা ৪. দেবতার জন্ম ৫ মানুষের উদ্ভব ৬. দেব-দানবের দ্বন্দ্ব ৭. চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ৮. দিন-রাত্রি ৯. বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ১০. স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য ১১. জন্ম-মৃত্যু ১২. আচাব-সংস্কার-রীতি-নীতি ১৩ অগ্নি ১৪. বিভিন্ন শিল্পবস্তুর উৎপত্তি। এই সমস্ত প্রসঙ্গ-সম্পর্কিত অজস্র গল্পই সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে প্রবাহিত এবং পরিবর্তিত হতে- হতে এসেছে। মিথ থেকে টেল, তার থেকে লিজেণ্ড—বিচিত্র সব রূপে এই কাহিনীদের রূপান্তরণ ঘটেছে।

।। ২ ।।

মিথ বস্তুটিই হল মৌখিক-সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী। গ্রীক শব্দ 'মুথোস্' থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'মিথ' এবং 'মাউথ'—এবং এরা মোটামুটি সমার্থব্যঞ্জক। বর্ণমালা সৃষ্টির আগেই আদিম মানুষ ঐসমস্ত লোকপুরাণেব কাহিনী সৃষ্টি করেছিল বলে, প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র বা অন্যবিধ প্রত্ননিদর্শের মাধ্যমে বহু সময়েই মিথকে রূপায়িত করত তারা। প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে আদিমকালীন নানান্ গল্পের ব্যঞ্জনা নির্দেশ করার রেওয়াজও এ-কাল পর্যন্ত চলে, আসছে; গল্পগুলির বাইরেব রূপ বদলে গেলেও মূল কাঠামোটি অপরিবর্তিতই থাকে। আল্পনাসহ বাংলাদেশের

ব্রতকাহিনীগুলি এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিশেবেই গণ্য। সে কথায় পরে আসব।

এই ধরনের কাহিনীগুলির মধ্যে বিবর্তনশীল মানব-সমাজেব প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। অলৌকিকতা এদের মধ্যেও আছে, কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তির অধিকারী দেব-দেবীদের গুরুত্বের পাশাপাশি মানব-মানবীদের/পশু-পাখিদের গুরুত্ব বৃদ্ধিও এদের বৈশিষ্ট্য। এই সব লোককথাকে লোকায়নবিদ্‌রা "ভেঙে-পড়া লোকপুরাণ" আখ্যা দিয়েছেন। এখানে একটি বীজগণিত-সুলভ সাঙ্কেতিক সূত্র নির্ণয় করা চলে : 'ল' = মিথ (লোকপুরাণ), 'র' = টেল (লোককথা) এবং 'দ$_১$' = ডিভাইনিটি (ঐশীভাবের প্রাবল্য) ধরে নিলে, সেই সূত্রটি হবে এই রকম :

(ল) - (দ$_১$) = (র)

ঋগ্বেদের কাহিনীতে প্রাথমিকভাবে উষা এবং সূর্যের যে-মিথ বর্ণিত হয়েছে, কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে সেটিই রূপান্তরিত হল উর্বশী এবং পুরূরবার লোককথা বা টেল-এ। ঐ ঋগ্বেদের কাহিনীর মধ্যেই যম-যমীর যে-বিবরণ একটি সূক্তে সংগৃহীত আছে, সেটি পুরোপুরিভাবেই লোককথা। অগ্রসরমান সমাজের চিন্তা এই কাহিনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সহোদর ভাই-বোনের বিবাহের অনৌচিত্য ঘোষণার মাধ্যমে। যমযমীর ঐশীভাব এই কাহিনীর মধ্যে হারিয়ে গেছে অগ্রসর মানব-সমাজের সংস্কারের দ্বারা তাঁদের নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে। এ-কারণেই এটি মিথ নয়, টেল। স্বভাবতই এখানে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মিথ যেমন সভ্যতার উষালগ্নের বস্তু, টেল তেমনই তার গড়িয়ে-যাওয়া সকালবেলায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু এভাবে ঐশীভাব-বিমুক্ত হয়ে লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনীগুলো চিরস্থায়ী একটি রূপের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনি। টেল-এর সঙ্গে নূতন করে আবার ঐশীশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা, অসাধারণতার প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি যুক্ত হতে শুরু করেছে ইতিহাসের স্তর-পর্যায়ের বিবর্তনেব সঙ্গে-সঙ্গে। এর কারণ যে কী, এই অধ্যায়ের শুরুতেই তা বলেছি; মানুষের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অলৌকিকত্বের প্রতি অনড় আস্থা থেকেই গেছে। মিথ মূলত ধর্ম ও দেবতাকে নিয়ে তৈরি; টেল-এর মধ্যে মানুষ এবং তার সামাজিক সংস্কারই প্রধান; আর নূতন যে বিবর্তিত লৌকিক কথামালার উল্লেখ এখানে করছি, সেই লিজেণ্ড হল এক-একজন অসাধারণ ক্ষমতাশীল মানুষের ওপর দৈবী অথবা অলৌকিকত্বের আরোপণের ফলশ্রুতিতে গড়ে-ওঠা কাহিনী। 'ক' = লিজেণ্ড (কিংবদন্তী) এবং এই নূতন আরোপিত দৈবীশক্তির প্রতি আস্থাকে 'দ$_২$' ধরে নিলে এখানেও আগের মতো একটি বীজগাণিতিক সূত্র নির্দেশ করা যায় :

(র) + (দ$_২$) = (ক)

(লোকপুরাণ → লোককথা → কিংবদন্তীব ক্রমবিবর্তন-সংক্রান্ত এই গাণিতিক সূত্রটিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠিত করা হবে কিংবদন্তী সম্পর্কিত আলোচনার সময়ে, পরের একটি অধ্যায়ে। এখানে তাব মুখপাত কবে রাখা গেল শুধু।)

মিথ এবং টেল-এর মধ্যে মানুষ, দেবতা এবং পশুব ভূমিকা বহুক্ষেত্রেই সমরূপ, একথা এখানে মনে রাখতে হবে; লিজেণ্ডে বরং এর ব্যত্যয় ঘটেছে কিছুটা। একই

উৎস থেকে দেবতা, মানুষ এবং পশুর সৃষ্টি হবার লোকপৌরাণিক বিশ্বাস লিজেণ্ডের আমলে, অর্থাৎ সভ্যতার প্রাক্‌-মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল প্রহরে বিলুপ্ত বলেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। তবে অলৌকিকত্বের প্রতি যে-আস্থা আজও মানুষের মনে অনড়, তার জন্যেই লিজেণ্ড অল্পবিস্তর এখনও গড়ে ওঠে; ব্যাপকভাবে যদি না ও হয়, স্থানীয়ভাবে। লিজেণ্ড শব্দের উৎসতেও ধর্মীয় সংস্কারই বিদ্যমান। ধর্মীয় ব্যাপার, ব্যক্তি, স্থান, ঘটনাকে নিয়ে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন গল্প মধ্যযুগের ইউরোপে লিজেণ্ড রূপে আখ্যাত হতো। লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানেও মোটামুটি সর্বজনীনভাবে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে শব্দটি।

লিজেণ্ড কেমন করে গড়ে ওঠে? একটি বিশিষ্ট উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এর উত্তরে। রাঢ় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান মাতৃকা দেবী হলেন যোগাদ্যা। বিভিন্ন গ্রামেই এঁর মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। আবার এঁদের মধ্যেই বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর কিন্তু একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে : এই দেবীর বিগ্রহ সারা বছর জলের তলায় থাকে, শুধু পূজার রাত্রে সেটিকে ওপরে তোলা হয়। এই দেবীকে নিয়ে একটি লিজেণ্ডও প্রচলিত আছে স্থানীয় অঞ্চলে, যার মাধ্যমে এই প্রথার তাৎপর্যকে ভক্তমণ্ডলী ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে থাকেন। প্রচলিত কাহিনীটি হল এই রকম ঃ বহুকাল আগে একদিন ভোরবেলায় গ্রামের পুকুরের পাড় দিয়ে এক শাঁখারী তাঁর পশরার বোঝা নিয়ে চলেছেন। পুকুরের ঘাটে-বসা একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে নিজের পছন্দমতো একজোড়া শাঁখা পরলেন। দূরে যোগাদ্যার মন্দিরের চূড়া দেখিয়ে মেয়েটি শাঁখারীকে সেখানে যেতে বললেন তার শাঁখার দামের জন্য; সেখানকার পুরোহিত তার বাবা, লক্ষ্মীর চুবড়িতে রাখা টাকার কথা বললেই তিনি দাম মিটিয়ে দেবেন। শাঁখারীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পুরোহিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন · তাঁর কোনও মেয়েই নেই। তারপর কী ভেবে লক্ষ্মীর চুবড়ি এনে তিনি দেখলেন যে, ঠিক শাঁখার দামটিই শুধু সেখানে জোগানো আছে। শাঁখারীকে নিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত পুকুরঘাটে এসে পৌঁছলে দেখা গেল শাঁখা-পরা দুটি সুডৌল হাত জলের তলা থেকে উঠে একবার মাত্র দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন স্থানীয় মানুষেরা অনেকেই। এবং এই কাহিনীর মাধ্যমেই দেবীপ্রতিমার জলতলে বসতির প্রথাকে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। এই একই ধরনের মৌল উপাদান নিয়ে—দেবীর ভক্তকে ছলনা করে অন্তর্ধান করা—বহু গল্পই বাংলা দেশেই চালু আছে। যথা, রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বেঁধে মহামায়ার চলে-যাওয়া, কিংবা দেবী চণ্ডিকার কালকেতুকে প্রথমে গোধিকা এবং পরে সাধারণীরূপে ছলনা করা। এটা বাংলাদেশের লৌকিক সংস্কৃতির নিজস্ব একটি উপকরণ। এক-একটি কাহিনী এক-একটা মূর্তি পরিগ্রহ করে গড়ে উঠেছে একে অবলম্বন করে।

কিন্তু এই বিশেষ লিজেণ্ডটি গড়ে উঠল কেন? আসলে কোনও অজ্ঞাত প্রাচীন

প্রথানুসারে অথবা কোনও বিস্মৃত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে ঐ দেবীমূর্তিটি জলের তলায় লুকিয়ে রাখার রেওয়াজটা আগে থেকেই চালু ছিল। পরবর্তীকালে মূল কারণটি বিস্মৃতিবিলীন হয়ে গিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐ নিজস্ব মোটিফ বা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে স্থানীয়ভাবে একটি গল্প গড়ে উঠেছে। এভাবেই লিজেণ্ড তৈরি হয়।

লিজেণ্ডও মিথের মতো দেশে-দেশে কালে-কালে একই ধরনের ছকে গড়ে ওঠে। যোগাদ্যার লিজেণ্ডকে মতো স্থানীয় কিংবদন্তীগুলির মধ্যে কিছু-কিছু অনন্যতা থাকলেও, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করে যেসব লিজেণ্ড গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে প্রকরণ এবং অভিপ্রায়গত মিলগুলো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

যে-বৌদ্ধ লিজেণ্ডকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে বাইবেলের 'গস্‌পেল অব জন'-এর তৃতীয় অধ্যায়ের একটি কাহিনীর আনুরূপ্য প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের অন্তর্গত ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন এবং গ্রীক-পুরাণবৃত্তের হারকিউলেস-কর্তৃক নদীর স্রোতের গতিপথ আয়ত্তে এনে ঈজীয় রাজের অশ্বশালায় জমে-থাকা জঞ্জালের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার গল্পটির মিল এ-ধরনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কোনও বিশেষ ধরনের চিহ্ন বা মূর্তিলক্ষণের মূল কারণটি উত্তরকালের মানুষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেও, কিংবা একটি কাহিনীর চেহারাটার বদল হলেও, একটি নূতন ব্যাখ্যা গড়ে উঠার অবকাশেও লিজেণ্ডের সৃষ্টি হয়। মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া ত্রিশীর্ষ যোগারূঢ় পশুপতি মূর্তিকে মার্শাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই একবাক্যে এযাবৎ প্রাপ্ত আদিতম শিবমূর্তি হিশেবে গ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় ঋগ্বেদের কাহিনীতে বর্ণিত জলস্রোতরোধকারী-বৃত্রের সঙ্গেও আবাব এই মূর্তির যোগাযোগ স্বীকৃত হয়েছে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক জোড়া মহিষশৃঙ্গ ঐ দেবমূর্তির মাথায় সজ্জিত থাকতে দেখা যায়; সম্ভবত সেটা তদানীন্তন সিন্ধুরাষ্ট্রে আভিজাত্য এবং ঐশিত্বের প্রচলিত লক্ষণ হিশেবেই গণ্য হতো। পরবর্তী সময়ে শিবের মাথার বঙ্কিম চন্দ্রকলা এবং গঙ্গার অবস্থানেব লিজেণ্ডও এই দুটি উপলক্ষ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে মনে করলে ভুল হবে না।

মহেঞ্জোদড়ো এবং চন্‌হুদড়োতে পাওয়া ছ'টি শীলমোহরকে ক্রমবিন্যস্ত করে একটি কাহিনীর কাঠামো গড়ে তার সঙ্গে বৌদ্ধ কাহিনী ব্যাঘ্রজাতকের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক ড: হাইনৎস মোদে। অনুসন্ধান করলে, প্রচলিত বহুবিধ লিজেণ্ডরই উৎস প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ননিদর্শ থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বাংলা ব্রতকথাগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত চিহ্নগুলিও এ-ধরনের কিছু-কিছু হদিশ দিতে পারে।

।। ৩ ।।

একথা ঠিকই যে, মিথ এবং লিজেণ্ডের মধ্যবর্তী বিভাজন-রেখাটি বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্ষীণ! তার ফলে এই দুই পর্যায়ের মাঝামাঝি শ্রেণীর গল্প অর্থাৎ টেল-এর সঙ্গেও অনেক সময়ে এদের মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। টেলগুলি মোটামুটিভাবে মিথ এবং লিজেণ্ডের তুলনায় ধর্ম এবং দেবতা-নিরপেক্ষ, তাই এদের সর্বজনীনতা অন্য দুই প্রকরণের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। বলতে পারা যায় যে, তিনটি প্রকরণের কাহিনীর মধ্যে মিথ প্রাচীনতম, টেল-এর বিস্তৃতি ব্যাপকতম এবং লিজেণ্ডের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃহত্তম।

টেল-কেও মিথ-এর মতো বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানে। এগুলি হল : ১. (ক) ফেয়ারী টেল (খ) ম্যরশেন্ (গ) রূপকথা ২. বীরকথা ৩. পশুকথা ৪. নীতিকথা এবং ৫. কৌতুককথা। এদের সঙ্গেই, ভারতবর্ষ এবং পারস্যে প্রচলিত আরও একটি নিজস্ব কাহিনী- প্রকরণ সভাকথা এবং বাংলাদেশের নিজস্ব কাহিনী-প্রকরণ ব্রতকথার উল্লেখও করা দরকার।

ইংরাজী ফেয়ারী টেল্-এর বদলে বাংলায় রূপকথা শব্দটি কোনও-কোনও লোকতত্ত্ববিদ্ ব্যবহার করলেও, এর ফলে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফেয়ারী বা পরীর ভূমিকা আমাদের রূপকথায় প্রায় শূন্য বললেই চলে। এমন কী বিখ্যাত ফেয়ারী টেল 'সিণ্ডারেলা'-র প্রায় সমরূপী বাংলা রূপকথা 'সুখু-দুখু'-র মধ্যেও ইউরোপীয় অর্থে ফেয়ারী বা পরীরা গরহাজির আছে। আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ-ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেনি। রূপকথা এবং জার্মান ম্যরশেন্ বরং বহুলাংশেই সমানধর্মী। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে রাজা-রাণী, রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনী-ইত্যাদিকে বাদ দিলে বাংলা রূপকথাগুলি, এবং দেবতাকে বাদ দিলে বাংলা ব্রতকথাগুলি একই প্রজাতির কাহিনী বলে গণ্য হবে। দোষীর শাস্তি, নির্দোষের প্রথমে দুঃখ-লাঞ্ছনা, পরে সুখ এবং আনন্দময় পরিণতি এই সব কাহিনীর অনিবার্য শর্ত। কঠিন কোনও কাজ সমাধা করতে পারার ঘটনাও এই সব ফেয়ারী টেল্, রূপকথা, ম্যরশেন্ ইত্যাদির নিয়মিত উপকরণ।

রূপকথা বা ফেয়ারী টেল-এর নায়ক-নায়িকারা অনেক সময়েই যে-সব কঠিন বা বীরত্বপূর্ণ কাজ নিষ্পন্ন করে, সেখানে প্রায়শই একটা ছক-বাঁধা কাঠামোই অনুসৃত হয়। বীরকথা বা হিরো টেল-এর ঐ রকম পূর্বনির্দিষ্ট কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। বাংলা ধর্মমঙ্গলের গল্প কিংবা সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পগুলোকে এই ধরণের লোককাহিনীর নমুনা হিশেবে অবশ্যই উল্লেখ করা চলে। বহু সময়েই অবশ্য হিরো-টেল এবং লিজেণ্ড পরস্পর-সম্পৃক্তই হয়ে পড়ে। সে-রকম ক্ষেত্রে এগুলি এপিক বা জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হয় কালক্রমে : যেমন, রামায়ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদিকে 'গাথা নারাশংসী' বা বীরকথা বলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বারবারই উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণ-কাহিনীর মূল কাঠামোটাই যে রূপকথা-ধর্মী সেকথা ভুলে গেলেও কিন্তু চলে না।

বীরকথারই একটি উপশাখা হিশেবে অনেক সময়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী বা নভেলার উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প, হাতেমতাইয়ের গল্প, ডেকামেরণ-প্রভৃতি যে-সব কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে— সেগুলিও এই উপশাখার অন্তর্গত। বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্যে এর হদিশ দুর্লভ। কারুর-কারুর মতে গ্রীক এপিক অডিসীও আসলে ঐ নভেলারই উপকরণ-সমৃদ্ধ।

পশুকথার ভাল উদাহরণ হল আমাদের পঞ্চতন্ত্র। লোকসাহিত্যের সর্বত্রই পশু-পাখির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, মিথ থেকে শুরু করে পরবর্তী সব রকমের কাহিনী-প্রকরণের মধ্যেই তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আগেই বলেছি যে আদিম মানুষ দেবতা, মানুষ এবং পশুরা একই উৎস থেকে সঞ্জাত, এমন কল্পনা করত বলেই, তারাও একে অপরের দোষ-গুণ-সম্পন্ন হয়ে উঠত কাহিনীর মধ্যে হর-হামেশাই। এই জন্যেই পশুকথার মধ্যে পশুদেরও পুরোপুরি মানুষের মতো আচরণ করতে দেখা যায় : বরং মানুষই এ সব গল্পে হয় অনুপস্থিত, না হয় গৌণ চরিত্র!

পশুকে উপলক্ষ অথবা রূপক হিশেবে গ্রহণ করে রচিত নীতি-উপদেশমূলক কাহিনীই হল নীতিকথা বা ফেবল। নীতিকথা অবশ্য পশুকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষকে নিয়েও গড়ে উঠতে পারে। 'ঈশপ'স ফেবলস' দু-রকমের গল্পেরই উদাহরণ-স্থল। শেয়াল পণ্ডিত যখন গুরুমশাই সেজে পাঠশালা খুলে বসেন এবং কুমীরের ছেলেদের খেয়ে ফেলেন তখন তিনি একই সঙ্গে মানুষ এবং পশুর গুণসমৃদ্ধ; এই গল্প তাই নির্ভেজাল পশুকথা। কিন্তু যখন বাঘের গলায় হাড় ফোটে এবং সারস তার ডাক্তারী করার পারিশ্রমিক চেয়ে বিপন্ন হয়, তখন সেটা নীতিকথা। মানবিক গুণ (না-কি দোষ?) উপকারীর অপকার প্রবণতা-সম্পন্ন বাঘ এবং মানবীয় মূঢ়তা (!)-সম্পন্ন সারস এখানে রূপক চরিত্র হিশেবে প্রতিভাত। পশুবিহীন নীতিকথার নজিব হিশেবে, মৃত্যুকালে কোনও বৃদ্ধ তার দশছেলেকে দশটি কাঠি আনতে বলেছিলেন এবং সেগুলির মাধ্যমে একতাই যে সবচেয়ে বড় বল তা প্রমাণ করেছিলেন যে-গল্পে, সেটিকে উল্লেখ করা চলে। ঈশপ'স ফেবল্‌স-এর অনুরূপ নীতিগল্পের আর একটি বিখ্যাত সঙ্কলন হল, হিতোপদেশ। বাংলা কথামালাও এদেরই ধারানুসারী। উল্লেখযোগ্য যে, নীতিকথা এবং পশুকথা, প্রায় হুবহু একই রূপে দেশে-দেশে দেখা যায়; মিথ বা লিজেণ্ডের মতো তাদের বাইরের চেহারাটা বদলে যায় না। নীতি-উপদেশের একটা সর্বজনীন আবেদন আছে এবং পশুকথা আর নীতিকথার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ বলেই, এদেব রূপ দেশে-দেশে, কালে-কালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। সামাজিক শিক্ষার মৌলিক আদর্শগুলি সর্বদাই, সর্বত্রই যেহেতু সমান।

হিউমারাস টেল বা কৌতুককথাগুলির মাধ্যমে একটি জাতির নিজস্ব সামাজিক চিন্তার কাঠামো এবং জাতিগত রস বোধ খুব নিবিড়ভাবে ফুটে ওঠে। সচরাচব এক জাতির কৌতুককথার রস অন্যজাতির মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না বলেই, লোককাহিনীর একমাত্র এই শাখার সৃষ্টিগুলিই দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় না, কিংবা একইভাবে গড়ে ওঠে না। গোপাল ভাঁড়েব নামে প্রচলিত গল্পগুলির রস

কোন্ ফরাসি বা মিশরীয় ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে? ঢাকাইয়া কুট্টিদের গল্পের মজা কোনও জার্মান বা স্কচ্‌কে পাওয়ানো সম্ভব হবে কী? মোল্লা নাসিরুদ্দীন যেসব গল্পের নায়ক, মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে তাদের তেমন জনপ্রিয়তা নেই এই কারণেই।

মূলত কোনও-না-কোনও বোকামির অথবা অন্য কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গেই এই ধরনের গল্প গড়ে উঠতে দেখা যায় সচরাচর। প্রত্যেক, দেশের, প্রত্যেক অঞ্চলের, প্রত্যেক সমাজের এমনকী প্রত্যেক পরিবারেরও পর্যন্ত নিজস্ব কতকগুলো বাঁধা-ধরা ঠাট্টা, রসিকতা থাকে, সেগুলিই কৌতুককথায় পরিণত হয় অনেক ক্ষেত্রে। পরিহাসাত্মক এবং বিদ্রূপাত্মক, দু-ধরনের কাহিনীই এই শ্রেণীতে পড়ে, একথা উল্লেখযোগ্য।

লোকাল লিজেণ্ড বা স্থানীয় কিংবদন্তীকে অনেক লোকতত্ত্ববিদ্‌ই টেল-এর শাখা হিশেবে গণ্য করতে চান না। তাঁদের মতে, প্রকরণ হিশেবে লিজেণ্ড এবং লোকাল লিজেণ্ডের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তফাৎ শুধু তাদের প্রচার কতখানি অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত, তার হেরফেরে। কিংবদন্তীর সঙ্গে প্রবাদেরও একটা মোটামুটি আত্মীয়তা আছে। প্রতিটি প্রবাদের পিছনে না হলেও, অনেকগুলির আড়ালেই একটা কাহিনী বা তার অংশ লুকিয়ে থাকে। গোটা কাহিনীটাই যখন বর্ণিত হয় তখন সেটিকে অভিহিত করতে পারি কিংবদন্তী রূপে; আবার কাহিনীটির সারাৎসার যখন একটি বা দুটি বাক্যের আধারে প্রকাশিত হয়, তখন তার নাম প্রবাদ। বহুক্ষেত্রেই প্রবাদের পিছনের গল্পটি লুপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে থাকে তার ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যবাহী সারকথাটি কোন্ তাঁতি কবে কী লোভ করে বিপন্ন হয়েছিল, সে-কাহিনী আজ হারিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু সেই ঘটনার তাৎপর্যময় উল্লেখ-সম্পর্কিত প্রবাদটি। প্রবাদ-কাহিনী অবশ্য সর্বদাই স্থানীয় কিংবদন্তী নয়, বহুদেশিক এবং সর্বজনীন প্রবাদও আছে অজস্র। এর হেতু, দেশকাল-ভেদ সত্ত্বেও মানুষের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য। অর্থাৎ সে-ই মর্গ্যানীয় তত্ত্বের কাঠামোই রয়েছে এই ব্যাপারের আড়ালেও।

বীরবলের গল্প, শাহনামা-ইত্যাদি সভাকথা-জাতীয় গল্প একেবারেই প্রাচ্যদেশীয়। সে-কথা ওপরে উল্লেখিত। গোপালভাঁড়ের গল্পগুলিও কিছু পরিমাণে এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইংরেজীতে যাকে 'কোর্ট জেস্ট্' বলে এদের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য হল যে, এগুলি নিছক বিদ্রূপ বা পরিহাস নয়, এদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেরও প্রয়াস আছে।

ব্রতকথাগুলি সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, এরা রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। উল্লেখযোগ্য যে এগুলি আদিম ধর্মবিশ্বাসের বীজ আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহন করে এনেছে। অথচ পরিবর্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীগুলি বহিরঙ্গে সর্বদাই বিবর্তিত হয়ে যেতে পেরেছে। ধর্মীয় আচার এবং সংস্কারই এগুলিকে গড়েছে, রূপকথা এবং কিংবদন্তীর কাহিনীরেণু সংকলন করে।

সূত্রধারণকারী কাহিনী বা ফরমুলা টেল এবং ক্রমসম্প্রসারমান কাহিনী বা কিউমুলেটিভ টেল-এই দুই রকমের কাহিনীর বৈশিষ্ট্যও লোকসংস্কৃতি সিদ্ধান্তে বহু

সময়ে আলোচিত হয়েছে। এ-ধরনের কাহিনীগুলো প্রায়ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন এবং একঘেয়েমিভরা কথায় বোঝাই থাকে; মূলত ছেলেভুলোনো গল্প হিশেবেই এদের সৃষ্টি। টেল-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেই এদের যৎসামান্য খোঁজ পাওয়া যায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী লোককাহিনীর এই বহুবিচিত্র প্রকরণগুলি প্রত্যেকটি দেশে, প্রতিটি জাতির মধ্যে প্রবহমান রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এদেরকে সূক্ষ্ম, স্থূল নানা বর্গ, অনুবর্গতে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু যাঁদের মধ্যে এ সব কাহিনীধারা প্রচলিত আছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অমূল্য এক সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে, তাঁদের কাছে এদের সবগুলিরই পরিচয় 'গল্প' রূপে। সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি যেসব জাতির আছে, তাদের মহাকাব্যগুলির মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণ করলেও এই সব লোককাহিনীর 'টাইপ' বা প্রকরণ এবং 'মোটিফ' বা অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হয়; রামায়ণ থেকে বেউলফ্ এবং অডিসী থেকে কালেভালা—কোনও প্রাচীন মহাকাব্যই এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাসের অমোঘ তুলিকা সেই উপকরণগুলির ওপর সংহতির রঙ্ বুলিয়ে দিয়েছে, এইমাত্র।

আসলে লোককথাকে বুঝতে হবে শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যার স্মৃতি, সম্প্রতি এবং ভবিষ্যতের সমন্বিত অভিব্যক্তি হিশেবেই। সাধারণ মানুষের আশা-উদ্দীপনা এবং সংগ্রামের অলক্ষ্যে প্রেরণা হিশেবে ম্যাক্সিম গোর্কী লোককথার যে-মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁর 'ডিজইনটেগ্রেশ্যন অব পার্সোনালিটি' প্রবন্ধে, সেটাই এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা। আপাতভাবে তার মধ্যে অলৌকিকতা, জাদু, অবিশ্বাস্যতা, দেবতা-পরী-জিন-দৈত্য- রাক্ষস-ড্রাগন-ভূত-প্রেত-ডাইনী কিংবা রাজা-রাজড়াদের কীর্তিকলাপ যাই থাকুক না-কেন, প্রকৃতপক্ষে সেসব হল বাইরের ব্যাপার। ভাবনার অন্তর্কাঠামোয়, সেগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের উপলব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের সুসংহত দ্যোতনাই বহন করে আনে।

খ. লোককথার বিশ্বজনীনতা

১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা একটি বিষয়ে একমত হতে শুরু করলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককাহিনী সমূহের মধ্যেই ভাব এবং রূপগত ক্ষেত্রে নানা-ধরনের সুনিবিড় সমধর্মিতা রয়েছে, তখন থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নও সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে, এই সমধর্ম-বা-ঐক্যের উৎস কোথায়?.... এ নিয়ে মোটামুটিভাবে দুটি মত দেখা যায়। একটা মত হল এই যে, আদিমকাল থেকেই মানুষ গল্প গড়তে শিখেছে এবং যতই এক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মানুষের বাণিজ্য, বিবাহ, যুদ্ধ-ইত্যাদি উপলক্ষে যোগাযোগ ঘটেছে, ততই একের গল্প অন্যে গ্রহণ করেছে এবং নিজের সমাজ পরিবেশ এবং মূল্যবোধ-ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত করেছে। আর অন্য মতটি হল এইরকম : আদিমকাল থেকে মানুষের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা অল্প-বিস্তর একই রকমের স্তরপর্যায়কে সর্বত্রই অতিক্রম করতে-করতে এসেছে ; ফলে সমস্ত দেশ-কাল-সংস্কৃতির মধ্যেই কতকগুলি সমধর্ম বিশ্বাস এবং উপলব্ধিরও সৃষ্টি হয়েছে। এরই পরিণতিতে ধর্ম, সংস্কার, আচার এবং ব্যবহারিক-ও-মানস-সংস্কৃতির সর্বস্তরেই সাধর্ম্য সৃষ্টি হবার বাস্তব সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। আর ঐ সব কিছুরই প্রতিফলন কোনও-না-কোনও সময়ে লোকায়ত সাহিত্যের মধ্যে ঘটেছে বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে এত ব্যাপক পরিমাণে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এক সময়ে এই দুটি মতবাদের প্রবক্তারা এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেও, আজকের বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটিভাবে দুটি চিন্তাকে যৌথভাবে স্বীকার করে নেবারই পক্ষপাতী। বহু-হাজার বছরের চিন্তার বিকাশকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা সামগ্রিক মানবসভ্যতার ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিশেবেই লোকায়ত সংস্কৃতিকে তাঁরা গণ্য করেছেন। দেশ-কাল-পরিবেশ-অনুযায়ী মানুষের মৌলিক ধ্যান-ধারণার যে-সব হেরফের ঘটে বলে ওপরে উল্লেখ করেছি, তারা নেহাৎই আপেক্ষিক; মূল্যগত উপলব্ধি এবং তার প্রকাশের সাদৃশ্যটাই সেখানে আসল কথা।

ব্যবহারিক সংস্কৃতি এবং মানস-সংস্কৃতির সর্বস্তরেই ঐ-মিলটা থাকলেও, কল্প-কাহিনী ইত্যাদির ক্ষেত্রেই সেই সব সাদৃশ্যের ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়। এর কারণ হল এই যে শিল্প হিশেবে গল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল তার বিশ্বজনীনতা। সে জন্যে একের গল্প, অন্যের কাছে যত তাড়াতাড়ি রসের আবেদনটুকু পৌঁছে দেয়, অতটা দ্রুতগতি বোধ হয় আর কোন শিল্পমাধ্যমেরই আয়ত্ত নয়।

গল্পের ভ্রাম্যমাণ চরিত্রের তাত্ত্বিকরূপে খ্যাত গ্রীম-ভাইয়েরা পারস্য, ভারতবর্ষ, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকায়ত কাহিনীর সহধর্মিতার উৎস হিশেবে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিবর্তিত ঐতিহ্যের কথা বলেছিলেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার, থিওডোর বেন্‌ফী এবং ইমানুয়েল কসক্যাঁ এমন তত্ত্বও প্রচার করেছিলেন যে,

পৃথিবীর সমস্ত- লোককথারই আদি উৎসভূমি ছিল ভারতবর্ষ। লোক্সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের গবেষণা সময়ের বিবর্তনে যত বিস্তৃত এবং গভীর হযেছে, ততই অবশ্য এতখানি সর্বপ্লাবী সিদ্ধান্ত করার প্রবণতা কমে গেছে পণ্ডিতদের মধ্যে। বিশেষত, এন্‌ড্রিউ ল্যাং, ই. বি. টাইলর, লুইস হেনরী মর্গ্যান, ব্রনিশ্লউ ম্যালিনৌস্কি এবং স্যার জেমস্ ফ্রেজার প্রমুখ নানান্ জাতির সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে যেভাবে অজস্র তথ্য সংকলন এবং বিশ্লেষণ করেছিলেন গত শতকের শেষ-দুই এবং এই শতাব্দীব প্রথম-দুই দশকের মধ্যে, তাতে লোককাহিনীর পরিভ্রমণতত্ত্ব বাতিল বলে গণ্য হয়নি ঠিকই, কিন্তু অনুরূপ-পরিবেষ্টনীতে তুলনীয়-কাহিনী সৃষ্টি হবার তত্ত্বটি দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অধ্যাপক ফ্রয়েড তাঁর যৌনপ্রতীকধর্মী তত্ত্বের সর্বজনীনতাব দাবীর মাধ্যমেও ঐ দ্বিতীয় মতেরই পরিপোষণ করেছেন। ফ্রয়েডের শিষ্য কার্ল গুস্তাভ য়ুং যৌথ-অবচেতনার যে-তত্ত্ব প্রচার করেছেন, সেটি এবং অন্যপক্ষে এরিখ ফ্রোম, ব্রুনো বেটেলহেইম, গেজা রোহিম-প্রমুখ মনোবিশ্লেষণপন্থী লোককাহিনী-তাত্ত্বিকদেব বক্তব্যও ঐ, বহু-উৎসবাদ বা 'পলিজেনেসিসের' ধাবণাকেই নানাভাবে পরিপুষ্ট কবেছে। পক্ষান্তরে, মার্ক আজাদোভস্‌কী, ওয়াই. এম. সকোলভ, এন পি. আন্দ্রীভ-প্রমুখ ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দর্শনে-প্রত্যয়ী লোকায়নিকরা ফ্রয়েডীয় এবং নব্য- ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণবাদীদেব চিন্তাধারার সঙ্গে ভাবনাগত ক্ষেত্রে শরিক না হয়েও যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেখানেও প্রাধান্য পয়েছে পলিজেনেসিসই, আবার ক্লোদ লেভী-স্ত্রোস তো বটেই, এবং তিনি ছাড়া রুথ বেনেডিক্ট, ফ্রানৎস্ বোয়াস প্রমুখ যে-সমস্ত এককালীন লোক-তথা-নৃবিজ্ঞানীরা মার্ক্সবাদী বিচার-পদ্ধতি মানতে অনিচ্ছুক তাঁরাও কিন্তু এক্ষেত্রে (বিচিত্রভাবেই!)· সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মার্ক্সবাদী বিদ্বান্‌দেব সঙ্গেই একমত।

ফলত, এখন লোককাহিনীর পরিভ্রমণ-ওরফে-মাইগ্রেশ্যন-তত্ত্ব বনাম 'পলিজেনেসিস'-তত্ত্বের উনিশ শতকীয় দ্বন্দ্বেব পবিবর্তে দ্বিতীয়টিকে মুখ্য এবং প্রথমটিকে গৌণ কারণ হিশেবে গণ্য কবেই লোককাহিনীব তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে মত, চিন্তা এবং প্রত্যয় নির্বিশেষে। বরং এমন কথাও মনে কবা হয়ে থাকে যে, পলিজেনেসিসের লব্ধফল হিশেবেই মাইগ্রেশ্যন-করা কাহিনীরা এক-সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর-সংস্কৃতিতে গিযে বাসা বাঁধতে সক্ষম হয।

বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিব লোককাহিনীর চরিত্র ও উপকরণ বিশ্লেষণ করে ফিনল্যাণ্ডের পণ্ডিত এন্টি আর্নে এবং আমেরিকার পণ্ডিত স্টিথ টমসন 'টাইপ' এবং 'মোটিফ' বলে যে দু-ধরনের বর্গীকরণ-পদ্ধতির বিন্যাস করেছেন, এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের সম্বন্ধে কিছু ধারণা কবে নিতে হবে। 'টাইপ' হল একটি লোককথার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার জন্য গৃহীত একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অবলম্বনের উপকবণ। একটি ছকের আদলে গড়া এক ধরনের কাহিনীর অজস্র রূপান্তর/পাঠান্তর নানা দেশেই পাওয়া যায়; এইটিই হল আর্নের নির্দেশিত 'টাইপ'। আর যে-সমস্ত উপকরণ নিয়ে 'টাইপ' তৈরি হয়, তাই হল 'মোটিফ'। এই

মোটিফগুলি কাহিনীর ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ, এগুলি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ কতকগুলি অনুলক্ষণ, যাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে 'অ-সাধারণত্ব' থাকতে হবে। যেমন ঃ 'হেঁটে যাওয়া' কোনও মোটিফ নয়; কিন্তু 'অদৃশ্য হয়ে হেঁটে যাওয়া' অবশ্যই একটি মোটিফ। এ-অবধি প্রায় আড়াই হাজার টাইপ এবং হাজার পঁচিশেক মোটিফ নির্দেশিত হয়েছে; এই সংখ্যা, স্বচ্ছন্দেই আরও বাড়ানো যায়। টমসন তার পথনির্দেশ দিয়েই রেখেছেন : যতই নূতন-নূতন সংস্কৃতিবলয়ের কাহিনী সংকলিত বিশ্লেষিত হবে, ততই টাইপ-মোটিফের অভিনয় বৈচিত্র্যও বাড়বে। কিন্তু তাতে মূল থিওরির কিছু হেরফের ঘটবে না।

বাংলা লোককথা 'সুখু-দুখু' নিয়ে জার্মান গবেষক র‍্যালফ্ ট্রোগার এবং আমেরিকান গবেষক ওয়ারেন রবার্টস পৃথকভাবে দুটি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ঐ-একই টাইপের কাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অন্তত ৯০০টি রূপান্তরে ছড়িয়ে আছে। বিশ্ববিখ্যাত 'সিণ্ডারেলা' কাহিনীর তো এক হাজারেরও বেশি রূপান্তর খুঁজে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু মোটিফগত পার্থক্যের জন্যই 'সুখু-দুখু' এবং 'সিণ্ডারেলা' দুটি আলাদা টাইপের অন্তর্গত বলে গণ্য হয়, নইলে অভ্যন্তরীণ আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করলে এই দুটি গল্পের মৌলিক প্রাণসত্তায় কোনই তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিকভাবে, বহু দূর-দূরান্তের সংস্কৃতিতে একই রকমের গল্প কেমনভাবে ভিন্ন-ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে হাজির থাকে তার কয়েকটি নমুনা মিলিয়ে যদি দেখা হয়, তাহলে এই বক্তব্যগুলির যাথার্থ্য যাচাই করার সুবিধেই হবে। এখনি 'সুখু দুখু'র গল্পের কথা উল্লেখ করেছি। ঠিক একই ছকের একটি রূপকথা পাই নাইজেরিয়াতে : মাতৃহীনা কন্যা এক জাদুশক্তিসম্পন্ন কুকুরের ('সুখু-দুখু'তে এই চরিত্র, এক দরিদ্র বৃদ্ধার) অনুগ্রহে ধনী এবং বিত্তবতী হয়ে উঠায়, তার বিমাতা নিজের মেয়েকে তার কাছে পাঠালে সে-বেচারীর কপালে জোটে যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বনা। 'সুখু-দুখু'তে মাতৃহীনা দুখুর বিয়ে হয় রাজপুত্রের সঙ্গে; এখানে মাতৃহীনার বিয়ে হয় গোষ্ঠীর সর্দারের সঙ্গে। বাংলা গল্পে সুখুকে গিলে ফেলে অজগর, নাইজেরিয়ার গল্পে দুর্বিনীতা এবং লোভী দ্বিতীয়া মেয়েটি গোষ্ঠী থেকে নির্বাসিতা হয়। অর্থাৎ ভাবগত কাঠামোর দিক থেকে দুটি গল্পই এক, রূপগত কাঠামোতেও প্রায় এক। পোল্যাণ্ডের লোককথায় দুই বৈমাত্রেয় বোন 'অ্যাগনিসিয়া-ম্যারিসিয়া'র গল্পও ঠিক ঐ এক ছকেই গাঁথা।

মাছের পেট থেকে আংটি বার হবার সূত্রে সমস্ত ঝঞ্ঝাটের অবসান হবার যে-লৌকিক কাহিনী 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের মারফতে ভারতীয় পাঠকের কাছে সুপরিচিত, ঠিক সেই মোটিফেরই একটি লোককথা আবিষ্কৃত হয়েছে আফ্রিকার ঘানাতে। সদ্যোজাত শিশু জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই নানা ধরনের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিচ্ছে, কিংবা শিশুকালেই পরিণত বয়স্ক মানুষের মত দক্ষতা দেখাচ্ছে, এমন একটি কাঠামোর গল্প প্রায় সব দেশের লোককাহিনীতেই দেখা যায়। গ্রীস বা ভারতবর্ষের মতো যে-সব দেশের সংস্কৃতিতে উন্নতিশীল বিবর্তন অনেক বেশি

পরিমাণে ঘটেছে, সেখানে এই মোটিফ নিয়ে ধ্রুবপদী পৌরাণিক কাহিনীও গড়ে উঠেছে। গ্রীক মিথোলজির হার্মেসের কিংবা আমাদের পুরাণবৃত্তের কৃষ্ণের কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণযোগ্য। শিশু বয়সেই কৃষ্ণ যেমন পূতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন, ঠিক তেমনিই জুলুজাতির লোককথায় সদ্যোজাত লাকানইয়ানাকে দেখি জন্মের কদিন পরেই এক চিতাবাঘকে মেরে তার ল্যাজ ধরে টানতে-টানতে বাড়িতে নিয়ে আসতে, হার্মেসও তেমি জন্মের অব্যবহিত পরেই বিশালদেহী কচ্ছপকে হত্যা করে বীণামন্ত্রের উপকরণ বানিয়েছিল তার খোলটি দিয়ে। লাকানইয়ানা এবং হার্মেস দুজনকেই দেখি জন্মের পর থেকেই গোরুর পাল চরাচ্ছে; শিশু অবস্থায় কৃষ্ণকেও সেই কাজ করতে দেখা যায়। স্পষ্টতই পশুচারণ-নির্ভর আর্থনীতিক স্তরের প্রতিবিম্বন ঘটেছে এই তিনটি পৃথক সংস্কৃতি-জাত কাহিনীতে। আবার কৃষ্ণের পুতনাবধের মত একটি জুলু উপকথার বালক নায়কও এক লম্বাচুলো রাক্ষসকে খতম করে সকলকে নির্ভয় করেছে।

এক খ্যাঁকশিয়াল কেমন করে শুধু ধাপ্পা দিয়েই কাঠুরে কসমোকে রাজা বানিয়ে দিল, রাশিয়ার এক উপকথায় দেখি তার বিশদ বর্ণনা। হুবহু ঐ একই কাহিনী মিলেছে জাঞ্জিবার দ্বীপে, শুধু সেখানে শেয়ালের জায়গা নিয়েছে হরিণ। কাঠুরের ছেলের বরাতে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভের অনুরূপ কাহিনী আমাদের দেশেও তো অবিরল? বাংলাদেশ ও আসামের লোককথায় প্রায়ই যে ট্যাটোনের নানান্ গল্প পাওয়া যায়, তারও একটিতে দেখি কেমন ভাবে সে নিজেই ধাপ্পা দিয়ে মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করল এবং পরিণামে মন্ত্রীকেই ঠকিয়ে নিজে বিরাট এক ধনী হয়ে উঠল।

॥ ২॥

এই ধরনের তুলনা সংখ্যাতীত। যেসব টাইপ এবং মোটিফের সমধর্মিতার জন্য অনুরূপ-ছকে তৈরি-হওয়া শত-শত গল্প গড়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে, সেগুলিই সমধর্মিতা বিচারের শেষ কথা নয়। আরও অজস্র সব টাইপ- মোটিফ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে আরও বেশী-সংখ্যক সংস্কৃতির অন্বিষ্ঠ বিশ্লেষণ করলেই যে, সেকথা একটু আগেই বলেছি।

এর থেকে একটা কথা অবশ্য প্রমাণিত হচ্ছে : সমাজ-সমীক্ষার ওপরই সংস্কৃতির স্বরূপ-নির্ণয়ের ব্যাপারটি নির্ভরশীল। সুতরাং সমাজ-বিবর্তনের ধারাটির বিশ্লেষণ করলে লোককাহিনীর বিবর্তনের পথটিকেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সমাজের বিকাশের যে-যে পর্যায়ে যা-যা মানস-অভিব্যক্তি সম্ভাব্য, সেগুলিই কাহিনীতে, গানে, প্রবাদে, ছড়ায়, ধাঁধায়, সংস্কারে, ধর্মের বিশ্বাসে, আচারে, শিল্পে, ভাস্কর্যে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সমাজ-বিকাশের স্তরগুলিরই প্রতিফলন ঘটে এ-সবের মধ্যে। ঐ সমাজ-বিকাশেরও একটা, গাণিতিক ক্রমপরম্পরা আছে। সমাজ যখন সেই পরম্পরার কোনও একটি বিশেষ পর্যায়ে গতিশীল থাকে, তার সামগ্রিক মানস সৃষ্টি করে নিজের

উপযুক্ত শিল্প-সাহিত্য। অন্য একটি সমাজে যখন ঠিক সেই ধরনের পর্যায়ক্রম আবির্ভূত হয়, তখনই আবার সেখানে ঠিক ঐ একই মানস-প্রক্রিয়া-সঞ্জাত শিল্প-সাহিত্যেরই বিকাশ ঘটে। তাই ভিন্নতর এবং নিঃসম্পর্কীয় সংস্কৃতিগুলির মধ্যেও কোনও-না-কোনও সময়ে অনুরূপ সামাজিক পরিবেশে গড়ে ওঠার লব্ধফল হিশেবেই অনুরূপ প্রত্যয় সংস্কার, অভিজ্ঞতা এবং কাহিনী গড়ে উঠেছে। আর এইখানেই আবারও অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে পড়ে মর্গ্যানের তত্ত্বের প্রসঙ্গ।

ইতিপূর্বেই 'সংস্কৃতির সিঁড়ি' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কীভাবে, প্রতিটি পৃথক-পৃথক কৃষ্টির মানুষই সমাজ-বিবর্তনের ক্রমান্বিত স্তরগুলোকে মূলত একটি গণিতকল্প অনিবার্য হিশেব-মাফিক ধাপে ধাপে পেরিয়ে আসে। তারই ফলে একই ধরণের অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবিই প্রমূর্ত হয় সংস্কার, বিশ্বাস, লোককথা-ইত্যাদিতে।

আমাদের জানা আছে যে, মর্গ্যান উত্তর-আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীদের সঙ্গে একান্তভাবে মেলামেশা করে তাঁদের সূত্রে আরও অনেকগুলি রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ইউরোপের বিভিন্ন জাতিবর্গ নানা সময়ে যে-সব আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উপনীত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে এই সমস্ত রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর ব্যবহারিক সংস্কৃতির সাদৃশ্য-সৌষম্যগুলি তিনি গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে খুঁজে পেয়েছিলেন। এরই লব্ধফল তার ঐ যুগান্তকারী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। উত্তরকালে ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে যে-সব আদিবাসী জাতির সংস্কৃতির নিদর্শন বিশ্লেষণ করে বহু বিচিত্র তথ্যকে আলোয় আনলেন সেগুলির সঙ্গেও মর্গ্যানীয় তত্ত্বের ভাবসাযুর্জ্য প্রতীত হয়। সামান্য- সামান্য হেরফের থাকলেও, মর্গ্যানের তত্ত্বের মূল সত্যটি যে অলঙ্ঘ্য তা তো আমরা আগেই দেখেছি। এবং এও দেখেছি, যে রাজনৈতিক কারণে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা অনেকে তাঁকে এড়াতে চান বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে সেটা সম্ভব নয় কোনওভাবেই।

প্রত্নতাত্ত্বিক যেমন মাটি খুঁড়ে অতীতের সভ্যতার হদিশ বের করেন, বস্তুনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রাও ঠিক তেমনভাবেই, ছড়া, ধাঁধা, প্রবচন, লোককথা ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য খুঁজে বের করে অনুরূপ পর্যায়ের ক্রমান্বয়ী ইতিহাসকে সন্ধান করে থাকেন। ঠিক এই একই মানসিকতার সূত্রেই প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য-সম্ভারকে বিশ্লেষণ করে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব দেশের তদানীন্তন বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক স্তরপর্যায়গুলিকে দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবেই, তুলনীয় পারিবেশিক স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করেই তিনি গ্রীস ও রোমের আদিম এবং প্রাচীন সমাজক্রমের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার আদিবাসী বিভিন্ন সমাজের ক্রমিক স্তরধারাকে সমীকৃত করেছেন তিনি, এবং প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর সর্বত্রই মোটামুটি ঐ পরম্পরাটি অনুসারেই সমাজের বিবর্তন হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির মাত্রাগুলিও আনুপাতিকভাবে অন্বিত হয়েছে। (যদিও, এই কথাগুলি আগেই সবিস্তারে বলা হয়েছে, তবু এখানে খুব সংক্ষেপে একবার মূল পরিপ্রেক্ষিতটা পুনরবলোকন করে নিতেই হল- পরবর্তী আলোচনার সুবিধের জন্য।)

এই সাংস্কৃতিক স্তরের সমীকরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে বলেই সম্পূর্ণ অ-সম্পৃক্ত জাতিবর্গের মধ্যেও ভাবনার ঐক্য পরস্পরিত হয়ে অনুরূপ 'টাইপ' ও 'মোটিফ' অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। মর্গ্যান যে-সূত্র নির্ধারণ করেছেন তার ধারানুসরণ করেই সভ্য স্তরের বিভিন্ন উপ-পর্যায়ের অভিক্ষেপও বড় কম নয়, ববং আপাতিক-পরিমাণটা সেখানে বৃহত্তরই।

আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদী সংস্কার, অর্থাৎ অচেতন বস্তুব মধ্যে প্রাণসত্তার কল্পনাই লোককথার মধ্যে কথা-বলা গাছ, সজীব পর্বত, জাদুক্ষমতা-সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের বস্তু-ইত্যাদির অবতারণা করেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে। পশুর মধ্যে মানব-সুলভ বিভিন্ন দোষ-গুণের কল্পনাও একটি অতি-আদিম স্তরের বিশ্বাস। মানুষের পশুতে এবং পশুর মানুষে রূপান্তবিত হওয়াও অনুরূপস্তবেব সঞ্জাত-প্রত্যয়। দৈত্য, রাক্ষস, পরী, ডাইনী-ইত্যাদিব কল্পনাও মূলত 'আদিম' জাদুশক্তিনির্ভর বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

আর আদিম মানুষের বহুসংখ্যক দেবতার উপর অপরিসীম নির্ভরতার ছবিই প্রতিফলিত হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত-থাকা মিথ বা পুরাণকথার মধ্যে। এবং সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে লোকায়ত পুবাণই রূপান্তরিত হয়েছে ধ্রুবপদী পুরাণে।

বন্যস্তর থেকে সভ্যস্তর পর্যন্ত উদ্বর্তনের এই পুরাণ-প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে ইতিহাসের পথরেখা। আদিম শিকারীর জীবন থেকে পশুপালক এবং কৃষিজীবী পর্যায় অবধি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পশুর গুরুত্ব বিশেষভাবেই ছিল এবং তারই অভিব্যক্তি পশু-প্রধান কাহিনীগুলির মধ্যে ঘটেছে। পাশাপাশি পশুকে 'টোটেম' বা কুলকেতুরূপে গণ্য করার চিন্তাও উপস্থিত হয়েছে। বাংলা উপকথা ও রূপকথাগুলিতে আদিমতর সাম্য নির্ভর যে কৌম-বা ট্রাইব্যাল সমাজের ছায়াপাত ঘটেছে, এ-কথা মনে করার যথেষ্টই কাবণ রয়েছে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী প্রমুখের যে-শ্রমনির্ভর জীবনযাত্রার ছবি সেখানে দেখি, তাতে এই কথার সপক্ষেই সমর্থন মেলে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় ফেয়াবী টেলগুলি অনেক পরবর্তী, এমনকী নাগরিক জীবনচর্যার ছাপও তাদের মধ্যে আছে। আবার তাদের মধ্যেও আলৌকিকতা, জাদু ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাচীনতর প্রত্যয়ও এসেছে। (অন্যত্র এই আলোচনা বিশদভাবে করা হয়েছে।)

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই হাসির বা রগড়ের গল্পও লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে গণ্য করা হয়। 'হিউমার' বা পরিহাস এবং 'স্যাটায়ার' বা শ্লেষ যেহেতু অনেক পরিশীলিত মানসিকতার ফসল তাই সেগুলি যে উন্নত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

কিংবদন্তী ওরফে লিজেন্ড সভ্য মানুষের সময়কালে উৎপন্ন অবশ্যই কিন্তু সভ্যতার কোন্ পর্যায়ে? মিথ বা লোকপুরাণ যেমন দৈব বিশ্বাসকে সত্য বলে মানুষকে ভাবতে শিখিয়ে ছিল আদিমকালে, তেমনই আবাব সত্যকে দৈব-আশ্রিত

বলে ভাবতেও শেখাল সভ্যতার মধ্য-পর্যায়কালে (গর্ডন-চাইল্ডের ভাষায় যা হল নগর সভ্যতার পত্তনের ফলশ্রুতিতে-ঘটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং শিল্প-বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনের মধ্যবর্তী স্তর) এক কথায় ইতিহাসে যাকে মধ্যযুগ বলে।

নগর-পত্তন-সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা শিল্প-বিপ্লব মানুষের মনের ওপর আধুনিকতার পলেস্তারা লাগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু অন্তর্লোকে এখনও দৈব এবং অলৌকিকতায় প্রত্যয় যথেষ্টই সক্রিয়। তাই মধ্যযুগে 'লিজেণ্ড' গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু দেব-দ্বিজ মহাপুরুষের প্রতি আস্থা আজও কিংবদন্তীর মালা গড়ে তোলে। বাংলার ব্রতকথাগুলি যে এখনও প্রতিদিনের ব্যবহারিক আচার-প্রক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে, এটাও তো আবার কিংবদন্তীর প্রতি আস্থার পরিচয়ই বহন করে।

মধ্যযুগে অধিকাংশ সভ্য দেশেই 'কোর্ট টেল' বা 'সভাকথা' নামে এক ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেছিল। আজকের পৃথিবীতে তার অবশ্য নতুন করে গড়ে ওঠার অবকাশ নেই। অবশ্য তাতে গল্পগুলির বিলুপ্তি ঘটেনি। মূল লোককাহিনীর মৌলিক 'মোটিফ'-গুলির ওপর নাগরিক মনের প্রলেপ দিলেও তাদের লোকায়ত চরিত্র ঢাকা পড়েনি।

ইতিহাসকে ভিত্তি করে লোককাহিনীর বিশ্বজনীন চরিত্র নির্ণয়ের জন্য সমাজ-বিবর্তনের ধারাকে অবলম্বন করার এই পদ্ধতি ব্যাপক গবেষণার ওপর নির্ভরশীল অবশ্যই। তবে সাধারণভাবে এই একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে নিম্ন-বন্য স্তরের সমাজের কাঠামোতে কাহিনী গড়ে-তোলার মতো সাংস্কৃতিক দক্ষতা সম্ভবত সৃষ্টি হয়নি; তবে সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস পুরুষানুক্রমে বাহিত হয়ে মধ্য এবং উচ্চ-বন্য স্তরে এসে লোকপুরাণের সূত্রপাত করেছে ধরা যেতে পারে।

প্রমেথিউসের অগ্নিহরণের যে-পরিশীলিত পুরাণবৃত্ত বহুলভাবে পরিচিত, তার অনুরূপ অসংখ্য কাহিনীই পৃথিবীর নানান্ সংস্কৃতির লোকপুরাণে মেলে। আগুনের ওপরে মানুষের অধিকার অর্জনের স্মৃতিই এদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। এমন উদাহরণ অসংখ্য, অজস্র।

কৃষি-এবং-পশুপালন-ভিত্তিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পশুকাহিনী সংগঠিত হয়েছে, সেগুলি নিম্ন-ও-মধ্য বর্বর-পর্যায়ের। তবে পশু যেখানে মানবিক গুণান্বিত নয়, সেখানে কাহিনীগুলি পূর্বতন বন্য স্তরের স্মৃতিবাহী। উচ্চ-বর্বর পর্যায়ের কাহিনী সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে বাংলার রূপকথা কিংবা ইউরোপীয়, 'ম্যরশেন'-গুলি। নগরসভ্যতার পত্তনের পরবর্তী স্তরের কাহিনীর ছায়াপাত হয়েছে 'ফেয়ারী টেল' ঐ মধ্যযুগেরই কিংবদন্তী। হাসির গল্প এবং সভাকথা জাতীয় বিস্ময়কর যা (যেমন আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, সিন্ধবাদের পরিভ্রমণ ইত্যাদি) গল্পগুলি ঐ সময়ে উৎসারিত হলেও ব্যাপ্তি লাভ করেছে শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে। তত্দিনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীতে নৈকট্য বেড়েছে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে।

প্রাচীন পৃথিবীতেও (আদিম নয়) সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, তবে শিল্প-বিপ্লব পর্বের তুলনায় তা কম তো বটেই, এমনকী মধ্যযুগের তুলনাতেও। তাই আদিম এবং প্রাচীন পৃথিবীতে পলিজেনেসিসের তত্ত্বটিই বেশী প্রযোজ্য। সংমিশ্রণের (ডিফিউজন) তত্ত্ব পরবর্তীকালের ব্যাপার। তাই কাহিনীর উপাদান এবং সক্রিয়তার লক্ষণগুলি বিচার করে কোনটি কত পুরোনো, সেটা বার করা কঠিন নয়। তবে মানুষের মৌলিক রূপটি সারা পৃথিবীতেই যেহেতু এক, তাই সেই অন্বেষা কঠিন হবেই বা কেন।

গ. লোককথা ও শ্রেণীচেতনা

প্রচলিত একটি অভ্যাস অনুযায়ী প্রায় সকলেই লোককাহিনীর সমস্ত উদাহরণকেই মোটামুটিভাবে এক-একটি কল্পলোকের গল্প হিশেবে গণ্য করে থাকেন। রাজা-রাণী, রাজপুত্র, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্যদানা, ডাইনী, পরী, মানুষের মতন কথা-বলা এবং কাজ করা পশু-পাখি, জাদু, অলৌকিক ঘটনা, দেবতা --- এই সব নিয়েই রূপকথা-উপকথা-পুরাকথার যে-জগৎ গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর কোনও সংস্কৃতি-বলয়েই তাদের মধ্যে সত্যি বাস্তবধর্মিতা কোথাও নেই! জীবনের রূঢ়, নির্মম সত্যগুলির উপলব্ধি, যা প্রতিনিয়তই শ্রেণী-বিভাজিত সমাজের অংশীদাররূপে আমাদের হয়ে থাকে, ঐসব কল্পকথার মধ্যে সেভাবে তো কই তাদের প্রতিফলন ঘটতে দেখি না? বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শেষ পর্যন্ত যাঁরা সুখে দিন কাটান, তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই রাজা-রাণী, কিংবা রাজার ছেলে বা মেয়ে বা জামাই বা পুত্রবধূ। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ যদি সেখানে কোনও সময়ে আসেনও, তাহলে নিতান্ত গৌণ পার্শ্বচরিত্রের বেশি কিছু গুরুত্ব তাঁদের জোটে না। বস্তুবাদী এবং শ্রেণী-সচেতন দৃষ্টিতে বিচার করলে সেক্ষেত্রেও রূপকথা, পুরাকথা ইত্যাদিকে তাহলে তো জীবন-বিমুখ একটি শিল্পধারা বলেই গণ্য করা উচিত!

অথচ লোককাহিনীর মধ্যে এত ধরনের বস্তু-ধর্মবিচ্যুত, অবাস্তব এবং সাধারণ জীবনচর্যার আয়ত্তাতীত বিষয় ও চরিত্র অন্তর্লীন হয়ে থাকা সত্ত্বেও, এদের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে সমস্ত প্রাচীন জাতির ঐতিহ্যের ভিত্তি। বস্তুজীবনবিমুখ বলে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীত হলেও এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও তাহলে জীবনের বাস্তব উপকরণ লুকিয়ে রয়েছে ব্যাপকভাবে, তা না-হলে এদের মাধ্যমে সমস্ত জাতির লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতির মূল রূপটির কাঠামো গড়েই উঠতে পারত না। বস্তুতপক্ষে লোককথার সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যেই সমাজের শ্রেণীচেতনার ধারা ফল্গুতোয়া হয়ে বহমান থাকে। একালের সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং লোকসংস্কৃতিতাত্ত্বিকরা অনেকেই এদের বিশ্লেষণ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে , বিশেষত চীনে, এই রীতিতে গবেষণা হয়েছে, নিজেদের দেশের লোকসংস্কৃতির এইভাবে মূল্যায়ন করার পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব দেশের গবেষক ও পণ্ডিতবর্গ লোককাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে-থাকা বাস্তব ইতিহাসের অজস্র সংকেতকেই চিহ্নিত করেছেন। আমাদের দেশের লোককাহিনীগুলির ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদভিত্তিক রীতিনির্দেশ করে সমাজ ও ইতিহাসের অনেক হারানো পথ-প্রস্তরই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে; এবং এটা বিশ্বের সব সংস্কৃতিবলয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজের যে-শ্রেণীবিভাজন ঘটে আসছে, একটি শ্রেণী আর একটি শ্রেণীর উপর যে শোষণ ও প্রভুত্ব করে আসছে, বৃহত্তর জনজীবনের শিল্প-সাহিত্যে তার অভিক্ষেপ হয়নি, এমন কথা ইতিহাসের বিরোধী। বরঞ্চ, লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতি-চেতনায় ঐ শ্রেণীশোষণের এবং দ্বন্দ্বের কথা অবিচ্ছিন্নভাবেই প্রবহমান হয়ে রয়েছে। এমনকী প্রাত্যহিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শোষণ এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে-প্রতিবাদ বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারেনি, সেই

প্রাকৃতবাদই প্রচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই লোককাহিনীগুলির মধ্যে, এমনই বুঝতে হবে সন্ধিৎসু গবেষককে।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। লোকসাহিত্যে শ্রেণীচেতনার অভিক্ষেপ কতখানি, এ কথা শুধোলে সংশয়ী পণ্ডিত হয়ত তর্ক শুরু করবেন এই বলে যে, লোকসাহিত্য—যা-কিনা সৃষ্টি হয়েছে মূলতই নিরক্ষর এবং সরলবুদ্ধি গ্রামীণ মানুষদের সীমাবদ্ধ বোধ-বিশ্লেষণের এলাকার মধ্যে, সেখানে শ্রেণীচেতনার মতো একটি আধুনিক কালে গড়ে-ওঠা প্রত্যয়, প্রতিফলিত হয় কী করে? এই তর্ক আপাতশ্রবণে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক : সচেতনভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি যে অনুধাবন করতে পারে, এবং সেই-বৈষম্যের ফলশ্রুতিতে যে-সামাজিক স্তরভেদের সৃষ্টি হয় — তাকে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের জটিল বিশ্লেষণে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ছাড়া প্রকৃত অর্থে শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন মানুষ আর কেই-বা হতে পারে! একালীন রাজনৈতিক শিক্ষায় প্রবুদ্ধ গ্রামীণ কৃষকসমাজ অবশ্য বহুলাংশেই সেই চেতনার অধিকারী। কিন্তু তারিখ হারিয়ে যাওয়া-সময় থেকে বিবর্তিত হতে-হতে আসা লোকসাহিত্যের নানান্ প্রকরণ — গল্প, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা এইসবের মধ্যে এই নেহাৎ নিছক একালীন ভাবনার অভিক্ষেপ কেমন করে ঘটবে?

কেমন করে যে তা ঘটতে পারে, সেই ব্যাখ্যায় পৌঁছনোর আগে আলোচনার সুবিধের জন্য কিছু লোককাহিনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার যাদের বিশ্লেষণের সূত্রে সংশয়ী পণ্ডিতদের ঐ কূট-বিতর্কের সওয়াল-জবাব করা সম্ভব। ব্যাপারটা যে বিশ্বজনীন একটি সূত্রে আবদ্ধ, সেইটি প্রমাণের স্বার্থেই, এইসব নমুনাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতি-বলয় থেকেই অবশ্য সংকলন করা দরকার। লোককাহিনীর ক্ষেত্রে একটি বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, গল্পের শেষ পরিণামে যে কিংবা যারা অবহেলিত, প্রবঞ্চিত, দুর্বল, অসহায় কিংবা অত্যাচারিত — তারাই জয়ী হয়, কৃতী হয়, সফল হয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে; অত্যাচারী দৈত্য, রাক্ষস মানুষ-অথবা পশুরা ধ্বংস হয় অনিবার্যভাবেই। এমন ক-টি কাহিনী পৃথিবীর লোকসমাজ থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে শেষ পরিণতিতে অত্যাচারী, অনাচারী, প্রবঞ্চক, দুর্নীতি-পরায়ণ কিংবা অন্যায়কারী যে, সে বিজয়ী হয়েছে কিংবা পরিত্রাণ পেয়েছে? অথচ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তো সেরকম ঘটনা অবিরত ঘটে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। শ্রেণীসমাজের সভ্যতার ইতিহাস মানেই যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঘাত প্রতিঘাত এবং দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রতিফলিত বিবরণী, সেখানে লোককাহিনীর মধ্যে তাহলে এই ব্যাপারটি 'বাস্তবতা'-বিবর্জিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে ঘটে কী করে?

গণমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শী বিশ্লেষণ না করলে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন ধরনের লোককাহিনীর অন্তর্নিহিত মানসিক ভিত্তিভূমিটির উপাদান কী হতে পারে, সেই জিজ্ঞাসা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। মনোবিজ্ঞানী জোসেফ জাসট্রো এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, যার মর্মার্থ হল :

রূপকথা বস্তুতপক্ষে গণমানসের সচেতন স্বপ্নেরই গল্পরূপী উদ্ভাস আর লোকপুরাণ হল একটি জাতির মানসস্বপ্ন। বিচিত্র-সব স্বপ্নকল্প চিন্তার মাধ্যমে নানান

আকাঙ্ক্ষাপূরণের তৃপ্তি লাভ করা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিশেষ প্রবণতারই ভিন্ন-ভিন্ন মূর্তি। ... জাসট্রো 'ড্রীম- থিংকিং', 'উইশ-থিংকিং', 'ড্রীম-থট', 'ফোক-ড্রীমস' প্রভৃতি কতকগুলি তাৎপর্যবাহী শব্দও এইসূত্রে ব্যবহার করেছেন যে সেটা এখানে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ধরণের লোককাহিনী গড়ে ওঠার অন্তরালে সামগ্রিকভাবে যে গোষ্ঠীমানস ক্রিয়াশীল থাকে, তার সুস্পষ্ট এবং ঋজু পরিচয় মিলেছে ঐ অভিমতের মধ্যে। পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক একটি ঐতিহ্য জাতি বা গোষ্ঠীর গণমানসেই সুনির্দিষ্ট কতকগুলি মূল্যবোধ তৈরি করে দেয়। সংকেত, প্রতীক, রূপক ইত্যাদির মাধ্যমে সেই জাতি বা গোষ্ঠীর সবার মনেই কিছু-কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনীর চিত্রকল্প বা ইমেজ তৈরি হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সূত্র ধরে নিজেদের অজান্তেই গড়ে তোলে এক-একটা গোষ্ঠীবদ্ধ উপলব্ধি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, বোধের এই গোষ্ঠীবদ্ধ বাহিরঙ্গিক রূপটির মধ্যে লীন হয়ে রয়েছে মনের যে অন্তরঙ্গ স্তরটি, ঐ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে-সব উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল, তাদের দ্বান্দ্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্রেই সেই স্তরে, ঐসব প্রতীক, সংকেত ইত্যাদি শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়। জাসট্রো এই ব্যাপারটিকেই বলেছেন 'ড্রীম-থট', 'ফোক-ড্রীমস', 'ড্রীম থিংকিং' এবং 'উইশ থিংকিং'। য়ুং-এর উদ্ভাবিত পরিভাষায় এই হচ্ছে 'কলেকটিভ আনকনসাস্' বা যৌথ অবচেতনা। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ কোনও ভাবনা বা ঘটনা নির্দিষ্টভাবে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত-অথচ অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বলে পাভলভ বলেছিলেন – গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সেই রকমের একটা প্রতিবর্তন হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটিই লোকসমাজের মনে নিজেদের অজ্ঞাতে অর্থনৈতিক অসাম্য জনিত একটি শ্রেণীর পার্থক্যগত অনুভব সৃষ্টি করে। সেই অনুভবগুলিই পরিবর্তিত হয়ে ঐসব প্রতীক, সংকেত রূপক-ইত্যাদিকে মাধ্যম রূপে তৈরি করে এবং সেই শ্রেণীপার্থক্যের বোধকেই প্রকাশিত করে তাদের সূত্রে।

॥ ২ ॥

যেসব প্রতীক, সংকেতের কথা বলছি বারবার, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কী রকম ধরণের? রাক্ষস, খোক্কস, দৈত্য, দানা, ডাইনী, পেত্নী— এরা, গোষ্ঠীর (এবং অবশ্যই ব্যক্তিরও) মনের অন্তঃশীলা স্তরে অশুভ বা ক্ষতিকারক বা অমঙ্গলসূচক বলে যা-যা প্রতিভাসিত হয়, তাদেরই বাহিরাঙ্গিক স্তরের ভাবনার প্রতীকস্বরূপ— একথাটি বুঝতে হবে। আমি লাঞ্ছিত হচ্ছি আমার প্রাপ্য থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি, আমার সম্ভ্রমের হানি ঘটানো হচ্ছে, আমার দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ক্ষুধা ব্যাধি ইত্যাদির পিছনে ঐ [illegible] ব্যাপারগুলিই রয়েছে আসলে - এইটা বোঝার জন্য কে কাকাকে রাজনৈতিক দর্শনে দীক্ষিত হতে হয় না, এটা মানুষ সহজাত বোধবুদ্ধি দিয়েই অনুভব করে, এই সমস্ত ব্যাপারের পিছনে যারা আছে, প্রত্যক্ষভাবে হয়ত তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উপযুক্ত সুযোগ বা ক্ষমতা বা পরিবেশ বা এর কোনও কিছুই থাকে না বলে বাস্তবে সে লড়াই

সমাজের নিচের তলার মানুষেরা করতে পারেন না— সেই যুদ্ধের প্রতীকী বিজয় তাঁরা নিজের অনবচেতন উইশ-থিংকিং-এর মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা করেন এইসব লোককথার অনুষঙ্গে।

আমাদের পুবাণবৃত্তে দেব-দানবের দ্বন্দ্বের যে-কাহিনী আছে, সিদ্ধরস-বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তার পুনর্মূল্যায়ন করা হয়, তাহলেই এ বক্তব্যেব সমর্থনে সাক্ষ্য মিলতে শুরু করবে (একালের লোকসংস্কৃতিবিদ্যায় পুরাণবৃত্ত বা মিথোলজি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে, সে কথা স্মরণযোগ্য। এই অধ্যায়ের পরের দিকে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বমূলক কতকগুলি মিথকে বিশ্লেষণ করে এই শ্রেণীচেতনার ব্যাপারটি কতখানি পরিব্যাপ্ত সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা যাবে)। পুরুষানুক্রমে প্রচারিত এবং স্বীকৃত সংস্কার-অনুযায়ী, পুরাণকথার অসুর বা দানবেরা ছিল পাপ ও অনাচারের প্রতীক, পক্ষান্তরে দেবতাকুল ধর্ম এবং পুণ্যের প্রতিভূ। বৈদিক গাথা থেকে এই প্রচারের শুরু। আগের অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে সিন্ধু-সংস্কৃতি এবং বৈদিকসংস্কৃতির ধারক দুটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণামের কথা বিস্তারিতভাবেই বলা হয়েছে।

আধুনিক প্রত্ন-ইতিহাসবিদ্‌দের অনেকেই — যেমন, দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর নাম করতে পারি — সিন্ধুসংস্কৃতির প্রত্ননিদর্শ এবং বিভিন্ন বৈদিক সূক্তকে যৌথভাবে বিশ্লেষণ করে এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, ঐ অসুর বা দানবেবা ছিল প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাগার্য জাতিগোষ্ঠী, যারা বাহুবলে পবাভূত হয়েছিল বৈদিক আর্যভাষী বহিরাগতদের কাছে। (কোশাম্বীর 'মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি' বইটি উৎসাহী পাঠক প্রয়োজনে পড়তে পারেন এই প্রসঙ্গে।)

উত্তরকালে বৈদিকসংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগ স্তিমিত হয়ে গিয়ে, পরাভূত প্রাগার্য-ভারতীয়দেব ধর্মধারাকে অবলম্বন করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটলেও, পরাজিতদের সম্পর্কে বিজয়ীদের উন্নাসিক ঘৃণাই দেবাসুর-দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যানের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু এই পরাভূত মানুষগুলির উত্তরপুরুষেরা কোথায় গেলেন? 'হিন্দু' ভারতের বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক সুবৃহৎ শূদ্র শ্রেণীর পূর্বপুরুষবা ছিলেন বৈদিক সূক্তে কথিত অসুর বা দাস জাতির মানুষ। জাতিবাচক 'দাস' পরিচয়, পরবর্তীকালে কর্মবাচক 'দাস' অভিধায় রূপান্তরিত হল। 'পিতামহদের কাহিনী' তারা শুনে যেতে লাগল সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারায় সৃষ্টি করা বিবরণীর মাধ্যমে।

অথচ ব্যাখ্যাটা তো অন্যভাবেই কবা সঙ্গত। দেবাসুর-দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে সমুদ্রমন্থনের কাহিনীর উল্লেখও আগের অধ্যায়ে করেছি। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে ফের ধরা যাক ঐ সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটিকেই: দেবকুল-অসুরকুলে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' হয়েছিল— মন্দারমন্থনে যা উঠবে, তার ভাগ হবে সমান-সমান। দেবতাদের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে নাগবাসুকির ফণাগুলি ধরেছিল অসুরেরা, আর তাই তার বিষে জর্জর হয়ে পড়েছিল তারা, সেই সুযোগে সমুদ্রোত্থিত অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে দেবতারা পালিয়ে গেল। .. এ কাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটা রূপক ছাড়া আর কী ? শ্রমজীবী মানুষের মেহনতে সভ্যতাব সুধাভাণ্ড ভরে ওঠে, আর তার অধিকার বর্তায় 'দেব'-রূপীওপরতলার মানুষের ওপর;

মেহনতের বিষে জর্জর হয়ে ধুঁকতে থাকে দেহশ্রমী 'শূদ্র' কিংবা অসুরদের উত্তরপুরুষেরা।

লোকজীবনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে অজস্র কাহিনী। আপাতদর্শনে নানান অলৌকিক ঘটনার সমাহারে এদেরকে বাস্তবতা-রহিত-সৃষ্টি বলে হয়ত মনে হতে পারে; কিন্তু একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই দেখতে পাওয়া যায়, লৌকিক জীবনের মূল চালিকাশক্তি যে শ্রেণীবিরোধের চেতনা, তার কাঠামোর উপরই কল্পলোকের রং-পালিশ চড়ানো হয়েছে এদের মধ্যে। উদাহরণ হিশেবে ধরতে পারি আমাদের বহুল পরিচিত 'টুনটুনি আর নাককাটা রাজা' গল্পটাতে। টুনটুনি সেখানে দুর্বল সাধারণ মানুষের রূপক, যাদেরকে ইংরাজী করে হয়ত বলতে পারতাম 'কমনার'। রাজার শুকোতে-দেওয়া টাকার পাঁজা থেকে একটি টাকা তুলে নিতে পেরে টুনির যে-উল্লাস, সেটা আমাদের অপরিচিত নয় ঃ দরিদ্রের ছেলে পিটুলিগোলা খেয়ে দুধ খাবার সাধ পুরিয়ে যে-আনন্দ করেছে বহু শতাব্দী আগের পুরাবৃত্তে, সেখান থেকেই এইসব 'কমনার' টুনিদের এই অসহায়-আনন্দের খবর আমরা রাখি। রাজা ওরফে ওপরতলার হুজুরদের বিরুদ্ধে টুনিদের জমিয়ে বহু শতকের পুঞ্জ-পুঞ্জ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ এই কাহিনীর রূপকের আবরণে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে ধাবমান হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রাজা-রাণী, পাত্র-মিত্রদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনায়, সাত রাণী এবং রাজার নাককাটা যাওয়া হল তারই চূড়ান্ত পরিণতি। শরৎচন্দ্র তাঁর 'মহেশ' গল্পে গফুর জোলাকে দিয়ে বিধাতার দরবারে প্রার্থনা করিয়েছিলেন, যাতে উৎপীড়ক উঁচুতলার মানুষের মাথায় নেমে আসে তাঁর অভিশাপ; কিন্তু টুনির স্রষ্টা অনামা লোককথক সেই শাস্তির জন্য কোনও ভগবানের দ্বারস্থ হননি, 'বিধাতার ন্যায়দণ্ড' তিনি স্বয়ং হাতে তুলে নিয়েছেন।

উপকথা কিংবা রূপকথায় সব সময়েই দেখা যায় 'অন্যায়' এবং 'পাপ' যে করে, পরিণামে তাকে শাস্তি পেতেই হয় অনিবার্যভাবে। এ হল লোককাহিনীর অপরিহার্য শর্ত। সারা পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত লোককথা সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। বিদেশী 'সিণ্ডারেলা', 'হ্যানসেল অ্যান্ড গ্রেটেল', 'স্লীপিং বিউটি', 'স্নো হোয়াইট', 'ব্লু-বেয়ার্ড', 'টম থাম্ব' কিংবা আমাদের নিজেদের দেশের 'মালঞ্চমালা', 'কাঞ্চনমালা-কাঁকনমালা', 'বুদ্ধু-ভুতুম', 'সুখু-দুখু', 'শ্বেত-বসন্ত', 'ডালিমকুমার'— যে গল্পের কথাই বলি না কেন, এর কোনও ব্যতিক্রম দেখি না; একমাত্র ' লিট্‌ল রেড-রাইডিং-হুড' কাহিনীর পেরোল্‌ত সংকলিত ফরাসী-পাঠে দেখি, শয়তান নেকড়ে বাঘ পরিণামে কোনও শাস্তি পেল না; যদিও গ্রীম্ ভাইদের সংকলিত জার্মান এবং অ্যান্ড্রু ল্যাং-প্রদত্ত বৃটিশ-পাঠে তার সেই প্রাপ্য শাস্তির বিবরণ সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে।

যারা উৎপীড়িত হয়, অন্যের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়, নিরপরাধ হয়েও লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাদের সম্বন্ধে লোককাহিনীর অন্তহীন এই সহানুভূতির উৎস কোথায়? ভয় যারা দেখায়, পীড়ন এবং লাঞ্ছনা যারা করে, পরিণামে তাদেরকে শাস্তি কেন পেতেই হয়? ... এর পিছনে একটি সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে, যা ফ্রয়েড বা য়ুং থেকে শুরু করে একালের গেজা রোহিম কিংবা ব্রুনো বেটেলহেইম পর্যন্ত কোনও লোককথার-

মনস্তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতই অন্বেষণ করেননি। মূলত যৌন-চেতনাকে বিশ্লেষণের তুলাদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করারই পরিণতি হল তাঁদের লোককথা-সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি। অন্যপক্ষে আন্দ্রেইয়েভ, ঝুর্মিনিস্কি, সকোলভ, বির্জুকোভ-প্রমুখ মার্ক্সবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও লোককাহিনী সৃষ্টির বিশ্বজনীন কোনও সূত্র অনুসন্ধান তাঁরাও করেননি। মূলত দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে রুশ জাতির মানসিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সামগ্রিক কর্মযজ্ঞের অন্যতম হাতিয়ার হিশেবেই তাঁদের অন্বেষণের সার্থকতা সীমাবদ্ধ।

কিন্তু সেই বিশ্বজনীন সূত্র অবিষ্কার করার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। অন্তত মার্ক্সবাদে প্রত্যয়শীল লোকসংস্কৃতির ছাত্রের কাছে সেটা খুব দুরূহ নয়। লোভী এবং উৎপীড়কের পরিণামে শাস্তিলাভ আর লাঞ্ছিত ও অসহায়ের মর্যাদা ও স্বস্তি অর্জন— এই বিশ্বজনীন কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই লোককাহিনীর সার্বিক মনস্তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

যারা দ্বিতীয় দলে অর্থাৎ লাঞ্ছিত, তারা প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক, সকলেই 'টুনটুনি'; আর প্রথম দলের সকলেই 'রাজা' 'নাককাটা'-র রূপকের মাধ্যমে তাদেরই শাস্তি বিহিত হয়ে থাকে — এক-একটি গল্পে হয়ত বা এক-এক রকমভাবে। কোথাও, সুয়োরাণীর হেঁটোয়-কাঁটা ওপরে-কাঁটা, কোথাও রাক্ষসের 'প্রাণভোমরা'কে মেরে তার বিনাশ। কোথাও বা দুষ্টমতি সুখুকে অজগরে গিলে ফেলে, প্রায়-পেশাদার পত্নীঘাতক নীলদাড়িওয়ালা লোকটা তার সর্বশেষ স্ত্রীর ভাইদের হাতে সাবাড় হয়; যাদের হাতে তারা নিগৃহীত হয় — তাদের সঙ্গেই নিজেদেরকে সমীভূত করে ফেলেন লোককথকরা। যে-সুখ, প্রতিপত্তি এবং সমৃদ্ধি বাস্তবে তাঁদের অনায়ত্ত, কল্পনায় সেগুলিকেই পাবার একটা দুর্নিবার্য আকাঙ্ক্ষাই এই বাহিরাঙ্গিক শ্রেণীরূপের গোত্রান্তর ঘটায়। নিজেরা যদি রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর-ইত্যাদির সঙ্গে সমীভূত হয়ে যান — তাহলে বাস্তবে তাঁদের যারা শ্রেণীবৈরী — সেই আসল রাজা-রাজপুত্তুরদেরকেই অশুভ অমঙ্গলের প্রতিভূ-তথা প্রতীক হিশেবে রাক্ষস-দৈত্য-শয়তান-জন্তু ইত্যাদিতে পরিণত করতে হয়। লোককথায় এই রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরদের যে-বিজয় বর্ণিত হয় দৈত্য-দানোদের সঙ্গে লড়াইতে, সেটা আসলে চেতনার অন্তর্লোকে রাজপুত্তুর-মন্ত্রীপুত্তুরদের জীবনের লড়াইতে হারিয়ে দেবার অনিবর্সিত বাসনারই রূপক : শুধু বিপ্রতীপভাবে প্রতিফলিত, এই যা।

এই শ্রেণীচেতনার গ্রন্থিগত জটিলতা অন্যভাবেও লোককাহিনীর মধ্যে মিশে রয়েছে। বাস্তবের রাজপুত্তুর কতখানি কঠিন শ্রম কিংবা আয়াসসাধ্য কাজ করে থাকেন সেটা অনুসন্ধানের বিষয় হলেও, লোককথায় তাঁরা অবশ্য দুরূহ পরিশ্রমই করে থাকেন, এমনটিই দেখা যায়। পরিশ্রমজীবী লোককাহিনী রচেতা তখন নিজেকে রাজা কিংবা রাজকুমার বানিয়ে ফেলেছেন চেতনার অগোচরেই। রূপকথার রাণীরাও অতএব বাটনা বাটেন, কুটনো কোটেন, রান্না করেন, বাসন মাজেন। শ্রেণীসম্পৃক্ত চেতনার ক্ষেত্রে এই সমীকরণ এবং জটিলতার আরও একটি অভিক্ষেপ ঘটতে দেখা যায় লোককাহিনীতে . যেখানে নায়ক বা নায়িকা সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে রূপেই চিত্রিত, সেখানেও কিন্তু পরিণামে তারা রাজার জামাই বা রাজপুত্রের বৌ হলে তবেই গল্পের শেষ হয়।

।। ৩ ।।

সাধারণ-মানুষ 'সাধারণ' থেকেও অবশ্য লোককথায় নিজের শ্রেণীচরিত্রের অবস্থান থেকে সরেনা, এমনও হামেশাই দেখা যায়। প্রতীক বা রূপক সেখানেও আসে। হবু রাজা, গবু মন্ত্রীরা সে-সব ক্ষেত্রে গরীব প্রজার বুদ্ধিতে বোকা বনে যায়। টুনটুনি পাখির প্রতীকে সেখানে লোককথার অনামা রচয়িতারা রাজার নাক কাটে, সাত রাণীকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে। রাজাকে ব্যাঙের মাংস খাইয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।

শ্রেণীর বৈষম্যজাত চেতনা যখন লোককথায় প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্নে সর্বদাই প্রবাহিত, তখন শ্রেণী-শোষণেরই চিত্রায়ণই বা সেখানে না-থাকবে কেন? ধরা যাক ঐ টুনটুনির গল্পের কথাই . রাজার এত টাকা জমে গেছে যে, তাতে ছাতা অবধি পড়েছে — তাই সে রোদে টাকা সেঁকতে দিয়েছে । এর থেকে টুনি একটি মাত্র টাকা তুলে নিয়েছে এবং ফূর্তির বশে তারপর চেঁচিয়েছে "রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধনও আছে ।" তো, এত টাকা রাজা জমিয়েছে টুনিদের মতো ছোটখাট মানুষদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েই। টুনি তার থেকে একটি মাত্র টাকা ফিরে 'আদায়' করেছে মাত্র। এই অপরাধে (এবং রাজার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার 'ধৃষ্টতা'র জন্যেও) রাজা তাকে ধরে আনছে, গিলে খাচ্ছে, ভেজে খেতে চাচ্ছে, রেঁধে খেতে চাচ্ছে। 'টুনি'-র চরিত্র যেমন একটা রূপক, এই সব শাস্তিও ঠিক তাই-ই।

এই ধরনের দমন-পীড়নের চিত্র লোককথায় বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি বলয়েই আগুনের অধিকার নিয়ে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে সভ্যতার প্রদোষ-মুহূর্ত থেকেই। বহু-প্রচলিত প্রমেথিউসের কথা আমরা জানি সবাই। 'দেবভোগ্য' অগ্নিকে 'মানুষ' প্রমেথিউস নিয়ে এসেছিলেন সর্বমানবের সেবার জন্য। সেই 'অপরাধে' পুরাবৃত্ত অনুযায়ী তিরিশ হাজার বছর তাঁকে দেবতার ক্রোধের শাস্তি হিশেবে শৃঙ্খলবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল পর্বতের নির্জন চূড়ায়। প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি একটি শকুনজাতীয় পাখি তাঁকে ঠুকরে-ঠুকরে খেত এবং সারা রাত ধরে দেবতার 'মহিমা'-য় সে-সব ক্ষত যেত নিরাময় হয়ে; পরের দিন আবার আসত শকুন। .. প্রমেথিউসকে মেরে ফেললে তো তার 'পাপের' জন্য তিরিশ হাজার বছর ধরে শাস্তি দেওয়া যেত না। 'অগ্নিহরণ'-এর জন্য এই রকম ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা প্রায় বিশ্বের সমস্ত আগুন-পাওয়ার কাহিনীতেই দেখি এটা এখানে উল্লেখনীয়।

এই নৃশংসতা সমাজের ওপরতলার ক্ষমতাবান মানুষের দল চিরন্তনভাবেই করে এসেছে। ব্যাধের ছেলে একলব্যের প্রতিভা দেখে প্রমাদ গুণেছিলেন রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য · নিজে থেকেই যদি এ এতবড় ধানুকী হয়, তাহলে রাজপুত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব তো ঘুচে যাবে! অতএব, একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিতেই হবে। শূদ্র হয়ে যাগযজ্ঞ করেছে । . . সুতরাং সেই 'পাপের' শাস্তি স্বরূপ স্বয়ং রামচন্দ্রই শূদ্ররাজার শিরঃচ্ছেদ করবেন।

নৃশংসতার সঙ্গে-সঙ্গে অপমান বা লাঞ্ছনার চিত্রায়ণই কি কম দেখি। সূতপুত্র বলে পরিচিত হওয়ায় মহাবীর কর্ণকে রাজকুমারীর স্বয়ংবর সভা থেকে গলাধাক্কা খেয়ে বিতাড়িত হতে হয়। ধীবরকন্যাকে অপহরণ করেন স্বয়ং রাজা। দেবতাদের ভোগের পাত্রী হয়ে সন্তানের জন্ম দিতে হয় কুমারী কুন্তীকে। .....এই ধরণের ঘটনাগুলিও সারা বিশ্বেরই লোককথা, পুরাকথায় দেখতে পাওয়া যায় অবিরলভাবে। মনে রাখতে হবে ধ্রুবপদী ঐসব পুরাণবৃত্তান্ত গড়ে উঠেছিল প্রাচীন আমলে, সেইসব কালে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী-ধারার ওপর ভিত্তি করেই। লোককথার মধ্যে যে বাস্তব-সমাজচিত্র প্রতীকে, সংকেতে ব্যঞ্জিত হয়, পরিশীলিত পুরাণকথায় সেটাই সরাসরি প্রতিফলিত, তফাৎ শুধু এইটুকুই।

এই ধরণের শ্রেণীপীড়ন কতদূর অবধি যেতে পারে, তার একটি হদিশ মিলবে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত এই লৌকিক পুরাণবৃত্তান্তটির মধ্যে :

ঋষি জমদগ্নির বধূ রেণুকা, স্নানরত এক গন্ধর্বকে দেখে আকাঙ্ক্ষায় জর্জর হয়ে ওঠার ফলে যে 'পাপ' করেছিলেন, তারই শাস্তি হিশেবে নিহত হলেন স্বামীর আদেশে, নিজের পুত্র পরশুরামের হাতে। পিতার আদেশে কুড়ুল দিয়ে মায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করে ফিরে এলে, জমদগ্নি পরশুরামকে বর দিতে চাইলেন। পরশু মায়ের জীবনটাই ফেরৎ পেতে আগ্রহী হলেন। জমদগ্নি বিধান দিলেন যে, সেটা সম্ভব হবে যদি ঐ কুড়ুলটি দিয়েই মাতঙ্গ জাতির কোন শুচিদেহা যুবতীর মুণ্ডচ্ছেদ করে আনা হয়, তবেই। অতঃপর মাতঙ্গী-যুবতীর 'শুচিশুদ্ধ' কুমারীদেহের সঙ্গে রেণুকার ছিন্নমুন্ড সংযুক্ত করে তাঁকে ইয়েলাম্মা দেবী-রূপে পরিচিতা করা হল, আর রেণুকার পর-পুরুষস্পৃষ্ট অপবিত্র দেহটির সঙ্গে মাতঙ্গ-নারীর ছিন্নমুণ্ড জুড়ে দিলেন দেবতারা । এইভাবে, 'ভ্রষ্টা' ব্রাহ্মণপত্নীর দেহের শুচিতা ফিরিয়ে আনতে নিষ্কলুষ মাতঙ্গ-কুমারীকে বিসর্জন দিতে হল প্রথমে জীবন এবং তারপরে সেই জীবনের মূল্য স্বরূপ নিজের শুচি-শরীরটি ; এবং ব্রাহ্মণীর ব্যাভিচারের দায়বাহী হয়ে ঐ সমাজের নিচের সিঁড়ির অভাগিনীকে রেণুকার কলঙ্কিত শরীরটি আজীবন বহন করতে হল। অতঃপর যেন করুণা করেই ব্রাহ্মণ্য-বিধান-শাসিত বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিত সমাজের শিরোমণিরা মাতঙ্গীরও একটা পূজার ব্যবস্থা করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে শ্রেণীসমাজের যে-নিষ্করুণ স্বার্থপরতা ফুটে উঠেছে এবং সমাজের ওপরতলার মানুষের যে-অপরাধের দায়ভাগ নিচের তলার মানুষকে বহন করতে হয়, তার ছবি যেভাবে আঁকা হয়েছে, সেটার চেয়ে তীব্রতর রেখায় শ্রেণীসচেতনতার রূপায়ণ বোধ হয় খুব বেশি করা সম্ভব নয়।

ওপরতলার মানুষের এই পীড়ন এবং প্রতারণার চিত্র সর্বদেশে, সর্বকালের লোককাহিনীর মধ্যে খুঁজে পাবেন উৎসাহী পড়ুয়ারা। টিউটনীয় লোককাহিনীতে দেখি, গরীব চাষী এগাইলের ছেলে দেবতা থরের অসংখ্য ছাগলের মধ্যেই একটাকে কেটে ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছিল বলে, দেবতার ক্রোধ থেকে বাঁচতে গিয়ে তাঁর হাতে নিজের যুবতী বোনকে তুলে দিতে হল তাকে। কঙ্গো অঞ্চলের বাকুবা-বুশোবো জাতির

লোককথায় দেখতে পাই, কেমন ভাবে প্রেমে-পড়ার ভান করে রাজার মেয়ে কাতেঙ্গে এসে গরীব প্রজা কেরিকেরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে, তার কাছ থেকে আগুন জ্বালানোর রহস্য শিখে নিয়েই পালিয়ে গেল টিট্‌কিরি দিয়ে। নরওয়ের লোকগল্পে আছে, কীভাবে ফ্রেইয়া দেবী রামধনুর হার হাতানোর জন্যে চার-চারজন গরীব স্যাকরার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে, হারটি পাবা মাত্র ঠিক একইভাবে উধাও হয়েছিলেন। গুয়োতেমালার বিখ্যাত 'পোপোল ভূ:' পুরাণবৃত্তে সংকলিত রেড ইন্ডিয়ান লোককাহিনীতে আছে, কী রকম করে দেবতাদের অনুগ্রহ-ধন্য কিচে জাতির লোকেরা অন্য জাতিগুলিকে বাধ্য করেছিল আগুন-পাবার বিনিময়ে নিজেদের মেয়ে-বউদের সম্ভ্রম এবং যুবকদের প্রাণ বিসর্জন দিতে। ফিলিপাইনের লোককাহিনীতে রয়েছে, কেমন করে দুই খাদ্যদেবী ক্ষুধার্ত এক মানবীকে ফসল বোনার বিদ্যা শেখাতে টালবাহানা করে যেতেন দিনের পর দিন।

এ ধরনের কাহিনী অসংখ্য, অজস্র অবিরলভাবে পাওয়া যায় সারা দুনিয়ায়। এই বিশ্বজনীনতাই প্রমাণ করে যে পৃথিবীতে কোনও দেশে, কোনও কালে মানুষ শোষণ, অপমান এবং বঞ্চনাকে বিধিলিপি বলে অন্তত মনে-মনে মেনে নেয় নি। লোকসাহিত্যের মধ্যে তার সেই না-মানা ক্রোধ এবং প্রতিবাদ নানান প্রতীক-সংকেতে-রূপকে ফুটে উঠেছে। কখনও আবার সরাসরিই আত্মপ্রকাশ করেছে সেই বিক্ষোভের আতীব্র অভিব্যক্তি।

অবশ্যই সেই বিক্ষোভ কোনও একজন মানুষের জবানিতে গল্পের মধ্যে ব্যক্ত হলেও, বস্তুত সেটা কিন্তু সমগ্র গোষ্ঠী বা সামাজিক শ্রেণীরই সার্বিক উপলব্ধি। এখানে সমাজ-মনস্তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখানে অবশ্য একটা সমস্যারও মুখবন্ধ না-করে রেহাই নেই। সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানীরা যে ক-টি ভাবধারায় প্রবুদ্ধ — তাদের মধ্যে বহুলাংশেই পারস্পরিক বিপ্রতীপ এক-একটা প্রবণতা রয়েছে। ফ্রয়েড থেকে শুরু করে আর্নেস্ট জোন্স, গেজা রোহিম অবধি যৌন-গূঢ়েষণাবাদীরা, য়ুং-প্রমুখ সামূহিক-নির্জ্ঞানপন্থীরা, পাভলভ-প্রমুখ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসীরা এবং ব্রুনো বেটেলহেইমদের মতো বিভিন্ন ভাবনা-শৃঙ্খলার সমন্বয়বাদীরা—সবাই মিলে এক ধরনের কঠিনসাধ্য পরিমণ্ডল তৈরি করে রেখেছেন।

॥ ৪ ॥

মনোবিজ্ঞানীদের এক বৃহদংশই লোককথার সমস্ত ধরনের প্রকরণকেই সংঘবদ্ধ সমাজ-মানসের অবচেতনা-উৎসারিত ভাবনার প্রতিফলন বলে গণ্য করেন। ফলত, ফ্রয়েডপন্থী পণ্ডিতদের যৌনভাবনা-কেন্দ্রিক অভিপ্রেরণা এবং পাভলভ-অনুগামীদের প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার তত্ত্বের মধ্যে যে বিরোধই থাকুক না-কেন, লোকসমাজের সামগ্রিক লালন-পালনে বেড়ে-ওঠা এই ধরনের শিল্প-প্রকরণগুলির সৃষ্টি-ও-অস্তিত্বের অন্তরীক্ষে একটি সামাজিক মনই যে সক্রিয় হয়ে থাকে, তাতে বিশেষ মতভেদ নেই। প্রতিটি সংস্কৃতি-বলয়ের নিজস্ব সামাজিক-মন (অর্থাৎ, সোস্যাল,-সাইকী) পরিবেশের মাধ্যমে

মানুষের মগ্নচৈতন্যের ওপরে গভীরভাবেই ছাপ ফেলে বলে, রূপকথা-জাতীয় শিল্পের উপজীব্য চরিত্র-ও-ঘটনাবলীর সঙ্গে তার একাত্ম হওয়ার পথে বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন ঘটে না।

এখানে একটা কথা একটু অনুধাবনযোগ্য : যে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীমানসের কথা বলা হল একটু আগে, তার অন্তর্কাঠামোর সঙ্গে শিশুর মনের বহির্কাঠামোর এক ধরণের সমধর্মিতা আছে। তাই রূপকথা, ম্যারশ্যেন, মিথ-জাতীয় লৌকিক কাহিনীর ভাবনাগত অভিব্যক্তিব অন্তরালে পরিণত মানুষের মনেও একটা শিশুসুলভ-আকর্ষণ লুকিয়ে থাকে। শিশুর মনস্তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝতে পারলে, তারই অনুষঙ্গে লোককাহিনী-সম্পর্কে পরিণতবুদ্ধি মানুষের ভাবনার গতি-প্রকৃতির অন্বেষণ করাও সহজসাধ্য হয়। তবে রূপকথা বা তার সমগোত্রীয় সৃষ্টিপ্রকরণগুলির প্রতিভাস শিশুর মনে কতখানি, সেই বিচার করার পথে প্রথমেই একটি বিরাট দ্বিধা প্রতিবন্ধক রূপে হাজির হয়।.. ফ্রয়েডীয় চিন্তাধাবার অনুসরণ কতখানি করা যেতে পারে? ফ্রয়েডবাদীরাও তো নানা মতের, নানা পথের! পক্ষান্তরে, অন্যান্য বর্গের মনোবিজ্ঞানীবাও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন সমস্ত কিছু। অতএব শিশুব মনের পরিকাঠামো-বিশ্লেষণের ব্যাপারটা যত স্বাচ্ছন্দ্যেব সঙ্গে সম্ভব বলে মনে হয়, আসলে সেটি অত সহজসাধ্য নয়। সুতরাং বিভিন্ন তত্ত্বানুসারী দৃষ্টিকোণ থেকেই সেই প্রয়াস করতে হয় / ফ্রয়েডপন্থীদের মূল অংশটি যে-ভাবনার শবিক, তা হল এই : মানুষের মগ্নচৈতন্যে লীন-থাকা একটা প্রবল যৌনাবেগ তার চেতন-অবচেতন সমস্ত ভাবনাকে, এবং তাদের সূত্রেই সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। নির্জ্ঞান-স্তরের ঐ প্রবণতা তাব সজ্ঞান-ও-অজ্ঞান যাবতীয় কিছুর ওপর সার্বিকভাবে প্রভাবে ফেলে বলে রূপকথা-জাতীয় শিল্প-প্রকরণও এব ব্যতিক্রম হয় না। আবার ফ্রয়েডপন্থীদের অনুভাবিত এই যৌন-গূঢ়েষণার এমন সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা মানতে চাননা অনেকেই । তাঁদের বৃহদংশের অভিমতের সামগ্রিকভাবে যদি কোনও সংহত প্রতিবেদন করা যায় তাহলে দেখব যে, যৌনবোধের বিষয়টি সেখানে গৌণ; জীবনের অন্যতর দুটি মৌল প্রবণতা—ক্ষুধা-ও-ভয় — তাদের গুরুত্বই সেখানে অনেক বেশি। সমাজ-মনস্তত্ত্বের কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের বিচাবে সামাজিকভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক-ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্ব-সমন্বযের প্রতিভাসও সমস্ত ধরনের শিল্প-সৃজনের (অতএব রূপকথা-উপকথারও) ভিতরে খুঁজে পাওয়া যাবেই। ....এই বিচিত্র সব বিপ্রতীপতার ফলশ্রুতিতে রূপকথা এবং শিশুব মনের পাবস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ বস্তুতপক্ষেই একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

লোককথার বিভিন্ন চরিত্রেব সঙ্গে শিশুর মন প্রায়শই নিজেকে একীকৃত করে ফেলে। বাস্তবজীবনে যেটা সচরাচর হয়না, রূপকথার কল্পজগতে সেটিকে ঘটতে দেখে নিজের অজান্তেই সে তার মুখ্য-অংশীদার বা সংঘটক হিশেবে নিজেকে দাঁড় করায় অবচেতন একটি অভিপ্রেরণায়। সুতরাং মনের গভীরতব স্তরে যারা অশুভের প্রতীকবাহী — রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো, ডাইনী-পেত্নী এদেব বিরুদ্ধে লড়াইতে শিশু নিজেকে রাজা, রাজপুত্তুর, রাজকন্যা, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল-প্রমুখের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলে কল্পনার মাধ্যমে।

লোককথার জগৎ যে শিশুর কাছে কতখানি বাস্তব হয়ে প্রতীত হয় তার চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন একজন প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ : একটি ছোট্ট মেয়ে তার বাবার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে হুটোপাটি শুরু করেছিল; অধ্যাপক পিতা মেয়েকে শান্ত করে বসিয়ে রাখবার জন্যে তাকে খেলবার জন্য দিলেন একটা দেশলাইয়ের খালি বাক্স আর তিনটে পোড়া কাঠি। বাচ্চাটা সঙ্গে-সঙ্গেই খুশিমনে খেলতে বসে গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জুড়ে দিল হাঁউমাউ কান্না! তিনটে কাঠির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোড়া যেটা, সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বাবার কাছে বায়না ধরল "ওই ডাইনীটাকে এক্ষুণি সরিয়ে দাও।" .... পরে তার কান্না থামলে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই — ওর খুব প্রিয় গল্প হল হ্যানসেল-গ্রেটেলের সেই রূপকথাটি (যেখানে সৎমায়ের কুমন্ত্রণায় ভুলে বাবা দুই ছেলে-মেয়েকে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলে, তারা একটা কেক-চকোলেটের তৈরি বাড়ি দেখে লোভে পড়ে তার ভিতরে ঢুকে এক ডাইনীর খপ্পরে পড়েছিল এবং তার পরে বুদ্ধি করে ডাইনীকে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল), এবং দেশলাইয়ের বাক্স-কাঠি নিয়ে ঐ কাহিনীটিই নিজের খেলার উপজীব্য করে খেলতে শুরু করেছিল ও। একটু পরেই তার কাছে দেশলাইয়ের বাক্সটা আসল-ডাইনীর বাড়ি হয়ে গেল, সবচেয়ে পোড়া কাঠিটা হল ডাইনী আর অন্য দুটো হল হ্যানসেল আর গ্রেটেল! নিজেও মানসিকভাবে সে একাত্ম হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। এই ঘটনার পরিণতিতেই ঐ কান্নাকাটি ! বাচ্চাটির অবচেতন মনে তখন কাঠিটা সত্যি এক পুরোদস্তুর ডাইনী — ভয়ংকরী এক অপশক্তি! চেতন মনে, ঐ ভয়টাই কান্নায় 'প্রকাশিত' হয়েছে। ('দ্য প্রিমিটিভ মিথোলজি' : জোসেফ ক্যাম্‌বেল ; ১৯৬৯; দ্রঃ পৃঃ ২২)।

বাচ্চাটা যে বাস্তবে-কল্পনায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিল সেটাও যেমন ঠিক, তেমনই আবার বাস্তব পারিপার্শ্বিকটা তার কাছে পুরোদস্তুরই হাজির ছিল, তাও কিন্তু ভুল নয়। স্বভাবতই সে নিজেকে রূপকথার বালিকাটির সঙ্গে এক করে ফেলেছিল, কিন্তু গল্পের-বালিকা বাবার জন্যেই জঙ্গলে গিয়ে ডাইনীর খপ্পরে পড়েছিল যদিও, বাস্তব পারিপার্শ্বিকে, নিজের বাবার কাছেই সে কিন্তু এসে ভরসা খুঁজেছে। অথচ, রূপকথার গল্পটাও তার কাছে সমান সত্যি । যে-বাবা 'শাস্তি' দেয় (রূপকথায়, হ্যানসেলের এবং গ্রেটেলের বাবা) এবং যে-বাবা নির্ভয়ে আশ্রয় দেয় (বাস্তবের অধ্যাপক পিতা), এরা পরস্পরের প্রতিকল্প নয় বলেই, ঐ বাস্তবে-কল্পনার দ্বান্দ্বিক-সম্বন্ধটি তার স্বল্পক্ষম বিচারশক্তির মধ্যে একটি অসহায়তার সৃষ্টি করেছিল। এরই ফল, ঐ কান্না।

উদাহরণটি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করতে হল এই জন্যে যে, এর সূত্রেই মানুষের মনে রূপকথা-জাতীয় কথাশিল্পের অভিঘাত কতখানি গাঢ়বদ্ধ হয়ে পড়ে, সেটি অনুধাবন করা যাবে। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই বিভিন্ন ধরনের সহজাত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা-ও-প্রশিক্ষণলব্ধ-উপলব্ধির সঙ্গে রূপকথা-উপকথার ঘটনা-এবং-চরিত্রের ভাবরূপগত সাযুজ্য কেমন করে সে খুঁজে পায়, তারও হদিশ মিলবে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুযায়ী কথিত যৌনতাব বোধ মানুষের মগ্নচৈতন্যে কতখানি অবলীন থাকে — সে-বিচারে পরে যাব।

তার আগে, অন্য ধরনের মৌল প্রবণতা তাকে কতখানি নাড়া দেয় এই ধরনের বাক্‌শিল্পের মাধ্যমে, সেটি বোঝা যাক স্বচ্ছন্দ।

ক্ষুধা, এই প্রবণতাগুলির মধ্যে অন্যতম মুখ্য স্থানের অধিকারী। এরই সূত্রে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দরিদ্র-ও-ধনী, বঞ্চিত-এবং-অধিকারীদের অবস্থানগত পার্থক্যটা পরিবেশগতভাবে শিশুর মনে স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত হয়ে যায়। ঠিক কাদের জন্যে সে, তার ভাই-বোন, বাবা-মা, আত্মীয়-প্রিয়জনেরা অনেক কিছু পায় না, আর আশপাশের চেনা-পরিচিত, কিংবা দূর-থেকে যাদের দেখছে তাদের অনেকেই সেই সব 'লোভের' জিনিসগুলির অধিকারী হয়, এটা সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে না বুঝতে পারলেও, অসাম্য যে একটা আছেই, তা সে জানে, বোঝে। বাস্তবে যখন যাদের-আয়ত্তে-নানারকম-লোভের-জিনিস-আছে, তাদের মতো হওয়াটা সম্ভবপর নয়, তখন কল্পনায় সে নিজেকে তাদেরই-প্রতিকল্প (রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র-ইত্যাদি) যারা, তাদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে। রূপকথা-উপকথায় এরাই পরিণামে জয়ী হয়, সফল হয় এবং এরা যাদেরকে পরাভূত বা বিধ্বস্ত করে (ঐ দৈত্য-দানা, রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনী, হিংস্র জন্তু) — শিশু তাদেরকেই নিজের অবচেতনে যাদের-জন্য সে-এবং-তার-আপনজনেরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়, তার প্রতিভূরূপে ধরে নেয়। ফলত, বাস্তবে যে-সামাজিক শ্রেণীর মানুষদের জন্য সে নিজের-আপনজনদেরসহ বঞ্চনার শিকার হয়, কল্পনায় তাদের সঙ্গেই নিজেকে সে সমীকৃত করে ফেলে। এবং কল্পনায় সে ঐ অশুভ-দ্যোতক চরিত্রগুলির ক্ষতি-বিপদ প্রত্যক্ষ করে, নিজের প্রকৃত কারণ-না-বোঝা বঞ্চনাজনিত দুঃখকে ভুলতে পারে।

কখনও-কখনও আবার কল্পনার মধ্যে নিজের যথার্থ শ্রেণীপরিচয়টি বজায় রেখেই শিশু নিজের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। সেইজন্যই দুখিনী দুয়োরাণী (তার কল্পনায় যে তার নিজের মায়েরই প্রতিরূপা) এবং তার ছেলেদের দুঃখনিবৃত্তি এবং সাফল্যের সে-ও মানসিকভাবে অংশীদার হয়। রাখাল ছেলের সঙ্গে যখন রাজকন্যার বিয়ে হয়, কিংবা কাঠকুড়ুনির সঙ্গে রাজপুত্রের-— তখনও, সেখানে ঐ আত্মবীক্ষণই করে সে ! লোককথার নিজস্ব চরিত্রলক্ষণ-অনুযায়ী সর্বদাই যে-বা-যারা বঞ্চিত প্রতারিত উৎপীড়িত — তারাই পরিণতিতে সুখী-তৃপ্ত-সফল হয় — সেই ব্যাপারটা তার বাস্তবে-বঞ্চিত মনটিকে অজান্তেই খুশি করে তোলে। আর এইটাই হল জাস্‌ত্রৌ-কথিত 'ড্রীম-থট', 'উইশ-থিংকিং'-ইত্যাদি অভিজ্ঞান, যা বড়দের প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। লোককথার অন্তর্নিহিত 'ছেলেমানুষী'-র অন্তরালে তাই পরিণত-বয়স্ক মানুষেরও দিবাস্বপ্নের মতো একটা অবচেতন ঘোর যে থেকেই যায়, সেকথা এখানে একান্তই প্রাসঙ্গিক।

এটা ঠিকই যে, লোককাহিনীর বৃহদংশ জুড়ে রয়েছে রাজা-রাজড়াদের গল্প। সর্বক্ষেত্রে তারা যে উৎপীড়ক বা শোষক এমনও নয়; অনেক সময়েই রাজপুত্র গিয়ে দৈত্য বা রাক্ষসকে বধ করল এমন বিবরণীও দেখি অবিরলভাবে। এসব গল্পে ঐ দৈত্য বা রাক্ষসই হল ওপরতলার উঁচু মানুষের রূপক। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, রাক্ষস-খোক্কস-ডাইনী-দানোকে হত্যা করার জন্য রাজপুত্র-কোটালপুত্রের দরকার কি? সাধারণ মানুষের

ছেলে কি সে কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে না? পারে নিশ্চয়ই; বহু লোককাহিনীতে সে-বিবরণীও চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন, 'হ্যানসেল গ্রেটেল'-এর গল্পে দরিদ্রের পুত্র হ্যানসেলই শেষ অবধি ডাইনীকে পুড়িয়ে মারল, আর তার পরে ছোট বোনকে নিয়ে ফিরে এল সেই বাবা মায়ের কাছেই, যারা দারিদ্র্যের তাড়নায় ছেলেমেয়েকে বনের মধ্যে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

আসলে যে-সামাজিক পরিবেশে এই গল্পগুলি গড়ে উঠেছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গসীমা ছিল রাজার মতো বিত্তে এবং প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই কল্পনার মই বেয়ে তাঁরা যখন কাহিনীকে গড়তে-গড়তে উঠে গেছেন, তখন সেই বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছেন নিজেদেরকে রাজা কিংবা রাণী, রাজপুত্তুর কি রাজকন্যারূপে ভেবে নিয়ে। আর যাদের কারণে তাঁরা পদানত এবং প্রপীড়িত, তাদেরকে রূপকায়িত করেছেন কখনও রাক্ষস-খোক্কসে, কখনও বা খল-চরিত্র রাণী ইত্যাদির মধ্যে।

যে-বিশেষ সামাজিক পরিবেশে এ-ধরনের গল্প গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল, সেটি প্রকৃতপক্ষে কী? অন্তত বাংলা রূপকথাগুলির ক্ষেত্রে একটি জিনিস বিচার করে সে সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা করা চলে। বাংলা রূপকথা-উপকথায় দেখি যে সব রাণীদেরকে, তাঁরা রূপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুয়ে-বসে বেলা কাটানোর ফুরসৎ পান না; দস্তুরমতো জল তোলেন, বাটনা বাটেন, কুটনো কোটেন, রাঁধেন-বাড়েন; তাঁরা 'কমনার'-দের ঘরের বৌ-ঝিদের মতোই :

(ক) "আজ বড়রাণী ভাত রাঁধিবেন, মেজরাণী তরকারি কাটিবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন'-রাণী জল তুলিবেন, কনেরাণী যোগান দিবেন, দুয়োরাণী বাটনা বাটিবেন, ছোটরাণী মাছ কুটিবেন। পাঁচ রাণী পাকশালে রহিলেন; ন'রাণী কুয়োর পাড়ে গেলেন; ছোটরাণী পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।"

('কলাবতী রাজকন্যা' : ঠাকুরমার ঝুলি : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)

(খ) "একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ্ থপ্ করে যাচ্ছে। সাত রাণী তাকে দেখতে পেয়ে খপ্ ধরে ফেললেন আর বললেন, "চুপ চুপ। কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিকে খেয়েছেন।"

('টুনটুনি আর রাজার কথা' : টুনটুনির বই : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

তাহলে যে ঐতিহ্য থেকে দক্ষিণারঞ্জন বা উপেন্দ্রকিশোর এইসব গল্প সংকলন করেছিলেন, রাজার ঘরের বৌ-ঝি সম্পর্কে সেখানকার ধারণা, সাধারণ ঘরের মেয়ে বৌদের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার বিষয়ে অভিজ্ঞতার চেয়ে কিছু পৃথক নয়। এ জিনিস ঘটা সম্ভব আদিম কৌমসমাজ থেকে উন্নততর শ্রেণীবিভাজিত সমাজে বিবর্তিত হবার কোনও একটি মধ্যবর্তী স্তরে। পরশ্রমজীবী উচ্চবিত্ত সমাজ তখনও গড়ে ওঠেনি ঠিকভাবে, অথচ আদিম সাম্যনির্ভর কৌমসমাজের মধ্যে ততদিনে, প্রাথমিক ভাবে হলেও, শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। এখন ব্যাপারটা অবশ্য বিলিতি ফেয়ারী টেল বা ম্যরশ্যেন-ইত্যাদির মধ্যে দেখিনা ; তার সম্ভাব্য কারণ, ওখানে যখন সুনির্দিষ্ট চেহারায়

শ্রেণীবিভাজিত অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠেছে, এই ধরনের গল্পগুলো হল সেই আমলের সৃষ্টি।

রূপকথা এবং উপকথা পশুদেরকে যেভাবে আঁকা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রায়-মানুষ : আদিম কৌমসমাজের যেসব পশুকথা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সেখানে কিন্তু পশুরা নিতান্তই পশু ; মানবধর্মী নয়। কিন্তু যেখানে পশুরা-পাখিরা মানুষের মতো প্রতারণা করে ('লিটল রেড-রাইডিং-হুড'-এর নেকড়ে বাঘ), মানুষের মেয়ের সঙ্গে মামা-ভাগনী সম্বন্ধে পাতায় ('মালঞ্চমালা-র বাঘমামা), ভবিষ্যৎবাচন করে রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রের উপকার করে, ('ফকিরচাঁদ'-এ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী), পাঠশালায় পণ্ডিতগিরি করে (বোকা কুমিরের কথা'-য় শেয়াল), সেখানে গল্পকারের কল্পনা আদিকালের টোটেম-নির্ভর সমাজের ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলেই বুঝতে হবে। পশুর সঙ্গে মানুষের এক ধরনের অভিন্নতার বোধটা অবশ্য আছেই, সেজন্যে পশুপাখির প্রতীকে মানুষকেই ব্যঞ্জিত করতে চাওয়া হয়েছে। পুরোনো টোটেম ভাবনাটুকু তার পরোক্ষ উৎসে আছে এইমাত্র।

ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, মূলত পশুকেন্দ্রিক যেসব লোককাহিনী বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজিত সামাজিক স্তরের চেতনা বরং নির্ভেজাল রূপকথা বা ফেয়ারী টেল-জাতীয় কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট। দুর্বল প্রাণী সেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিভূ : ছলে-কৌশলে সে সবল প্রাণী তথা ক্ষমতা-প্রতিপত্তিশীল স্তরের মানুষকে পর্যুদস্ত করেছে। শুধু ঐ 'নাককাটা রাজা'র গল্পেই নয়, নানান্ জায়গার পশুকাহিনীতেই এই জিনিস দেখি আমরা।

শুধুমাত্র বিষ্ণুশর্মার নামে প্রচলিত সিংহ-শশকের পরিশীলিত 'সফিস্টিকেটেড' কাহিনীতেই নয়, ঐ ধরনের গল্পের প্রাচীনতর 'আর্কিটাইপ'-গুলিতেও সে জিনিস দেখি আমরা। পুয়েব্লো রেড-ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'পশুকুল বনাম পক্ষীকুলের যুদ্ধ' কাহিনীগুলি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শেয়াল সেনাপতির লেজ যতক্ষণ উঁচানো থাকবে, ততক্ষণ অবধি পশুরা হার স্বীকার করবে না, এ খবর জেনে পাখিরা বোলতাকে পাঠাল তার ল্যাজে কামড় বসাতে, যার পরিণামে শেয়ালের-কামড় খাওয়া ল্যাজ নামানো এবং পশুদের হার-মানা। মহা-মহা শক্তিধর প্রাণীদের এভাবে 'ল্যাজ গুটিয়ে' পালানোর পিছনে দুর্বল পাখিদের যে বুদ্ধির অস্ত্র সক্রিয় ছিল, সেইটিই লোককাহিনীর স্রষ্টা সাধারণ মানুষদের সব চেয়ে বড় সম্বল। সেই বুদ্ধির অস্ত্রই ঝল্সে উঠেছে এই সাঁওতালী উপকথাটির মধ্যেও :

এক বাঘকে একবার একটা ছবি দেখানো হয়েছিল যার বিষয় ছিল জনৈক দুর্বল শরীর মানুষের দ্বারা কোনও-এক হাত-পা-বাঁধা পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রের পাদুকা-প্রহৃত হওয়া। বাঘ দেঁতো হাসি হেসে মন্তব্য করল, 'বাঘেরা যদি ছবি আঁকতে পারত, তাহলে এ ছবির বিষয়বস্তু অনেক বেশি গুরুতর কিছু অবশ্যই হতো। এই তির্যক-মন্তব্যটিই লোককাহিনী-স্রষ্টা দুর্বল 'কমনার'-দের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটার যথার্থতম সূচক হিশেবে গণ্য হবার যোগ্য। বন্দী এবং অপমানিত বাঘ এখানে পদানত মানুষের প্রতিনিধি: যদি

সুযোগ থাকত, সে ঐ অবমাননার জবাব দিত।

ইউরোপীয় 'ফেয়ারী টেল'-গুলি ভারতীয়, বিশেষত বাংলার রূপকথাগুলির তুলনায় পরবর্তী স্তরের, সেকথা তাদের রাজা-রাণীদের জীবনযাত্রার তুলনা করলেই বোঝা যায়। একটু আগেই সেকথা ওপরে বলা হয়েছে। কিন্তু পশুকেন্দ্রিত কাহিনীগুলির ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে না। উভয়ক্ষেত্রেই তারা সমাজ-বিবর্তনের সমান পর্যায়ে উদ্ভূত হয়েছে এবং রূপকথা ফেয়ারী টেল এবং ম্যারশ্যেনের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে এসেছে এগুলি। অন্যান্য মহাদেশের লোককাহিনীগুলিতে সমাজবিবর্তনের সেই স্তর প্রতিফলিত হয়নি, যেখানে রূপকথা কিংবা ফেয়ারী টেলের মতো রাজা-রাণীর সামাজিক শ্রেণী বিদ্যমান। কিন্তু অ্যানিম্যাল টেলের ক্ষেত্রে তারাও এশীয়-ইউরোপীয় কাহিনীগুলির সমান পর্যায়ভুক্ত।

তাহলে কৃষির পত্তনের লব্ধফল হিশেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের পরে, আদিম কৌমসমাজ যখন শ্রেণী-সমাজে পরিণতি লাভ করতে শুরু করছে তখন থেকে সাজে, তখনকার শ্রেণীচেতনাই বিবর্তিত হয়েছে আজও-প্রচলিত পশুকথাগুলির আর্কিটাইপ বা আদিরূপে। এ দেশের রূপকথাগুলি তার পরবর্তী সময়কালের, যখন শ্রেণী-সমাজ গড়ে উঠলেও, প্রাচীনতর সমাজিক বিন্যাস পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। এর পরের স্তরে ইউরোপের ফেয়ারী টেল এবং ম্যারশ্যেন (যাদের মধ্যে ফেয়ারী বা পরীর কোন ভূমিকা নেই, এমন গল্প) আবির্ভূত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সিন্দবাদ নাবিক কিংবা আরব্য রজনীর গল্পগুলিও ফেয়ারী টেলের মতো সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাজিত সমাজের ফসল বলেই স্বীকার্য ।

প্রশ্ন করা হয় যদি, এরা সবাই না-হয় শ্রেণীর উন্মেষ অথবা বিকাশের কোনও-না-কোনও-স্তরে উদ্ভূত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষে হোক, প্রচ্ছন্নে হোক এদের কাঠামো গড়েছে শ্রেণীগত চেতনা; কিন্তু লোকপুরাণ বা মিথ, যা-কিনা শ্রেণীর উদ্ভবের পূর্ববর্তী সামাজিক স্তরকে প্রতিফলিত করে, তাদের মধ্যে শ্রেণীর চেতনা এল কেমনভাবে? আদিম মানুষের সংস্কৃতিতে যে-মিথ গড়ে উঠেছিল, তার বৃহদংশই ছিল বিচিত্র প্রাকৃতিক বিষয়ের কল্পিত ব্যাখ্যান। এই ব্যাখ্যানকারী গল্পগুলি পরবর্তী যুগে পশুকাহিনীর মধ্যে টিঁকে গেছে : যেমন, ভালুকের লেজ নেই কেন? বাঘের গায়ে ডোরাকাটা কেন? গরুর একপাটি দাঁত কোথায় গেল? ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরবর্তীকালের সামাজিক-সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্পগুলির বাইরের চেহারাটা কাঠামোর তুলনায় 'আধুনিক' হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন ভিয়েতনামী উপকথায় দেখি : প্রাচীনকালে ঘোড়ার দাঁত ছিল না কিন্তু গরুর দু'পাটি দাঁতই ছিল। একবার এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যাবার আগে ঘোড়া গরুর কাছ থেকে দাঁতের ওপরের পাটিটি ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই ধার আর কোনওদিন শোধ হয় না। সেই থেকে গরুদের একপাটি করেই দাঁত।

এই কাহিনীটির মধ্যে শ্রেণীসমাজের চেতনা সুস্পষ্ট নিমন্ত্রণ বাড়িতে দাঁতের 'অলংকার' চড়িয়ে সেজে না গেলে ঘোড়ার মান থাকবে না। বাইরের আড়ম্বরনির্ভর উন্নত এবং শ্রেণীবিভক্ত পরিবেশের সুনিশ্চিত সংস্কারের সাক্ষ্য বহন করছে এই

কাহিনী। কিন্তু ঠিক অনুরূপ একটি হাঙ্গেরীয় কাহিনীতে আছে : গরু তার একপাটি দাঁতের বদলে শিঙের জন্য প্রার্থনা করেছে ভগবানের কাছে ; ভগবান তখন ঘোড়ার শিং দুটি গরুকে দিয়ে বিনিময়ে ঘোড়াকে তার ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে দিলেন (ঘোড়ার এর আগে একপাটিই মাত্র দাঁত ছিল) — সেই থেকে গরুর একপাটি দাঁত। এ গল্পের উপকরণের মধ্যেই প্রাচীনতর সংস্কার দৈবনির্ভরতা সুপরিস্ফুট।

অর্থাৎ মিথ যে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যেতে পারে আপেক্ষিকভাবে, সেকথা মনে রাখলে প্রচলিত মিথগুলির মধ্যে শ্রেণীচেতনা কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে সে-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইতে এই বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে মার্ক্স খুব স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন: "সমস্ত পুরাণবৃত্তই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে কল্পনাগত ভাবে নিয়ন্ত্রিত, অধিকৃত এবং সুবিন্যস্ত করতে চায় ; এই চাওয়ার মাধ্যমটিও অবশ্যই কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্যি-সত্যিই প্রকৃতির বিচিত্র শক্তিকে বশে আনতে পারল, তখন থেকেই মিথও নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে শুরু করল।" অর্থাৎ মিথের বাইরের রূপটুকু বদলে যেতে থাকল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বে। সমুদ্র-মন্থন বা প্রমেথিউসের আগুন সংগ্রহ-ইত্যাদি মিথ উত্তরকালের সুমার্জিত ভারতীয়, গ্রীক প্রভৃতি সংস্কৃতির পরিবেশে পরিশীলিত হয়ে উঠেছে,, কাজে-কাজেই তাদের মধ্যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রতিফলিত যে হবেই, তাতে আর আশ্চর্য কী? আদিম-সংস্কার (আগুনের অধিকার, মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের সন্ধান) এদের মধ্যে আছে ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীসমাজের পটভূমিতে গড়ে ওঠার ফলে এদের মধ্যে শোষণ ও পীড়নের চিত্রও বিধৃত হয়েছে। ককেশাসের পাহাড়ে শৃঙ্খলিত প্রমেথিউস এবং বিষে-র্জজর প্রতারিত অসুরদের মধ্যে প্রাচীন কথক নিজেকে এবং নিজের সামাজিক শ্রেণীকেই প্রত্যক্ষ করেছেন যে!

কিন্তু লোককাহিনীর শ্রেণীচেতনা কি সবটুকুই শৃংখলের ভার আর বিষের জ্বালা? রূপকের আড়াল ছাড়া কি বঞ্চনা এবং অপমানের ক্ষোভ সেখানে লজ্জায় ফুটে ওঠেনি?... উঠেছে। লোককথার একটি পরম নির্ভরশীল উপকরণ হল পরিহাস। পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ হুল মর্মে-মর্মে বিঁধিয়ে-দিয়ে যেসব কাহিনী গড়ে তুলেছেন শ্রেণীসচেতন অনামা লোককথকেরা, তাদের মধ্যে জ্বালা বা গ্লানির চেয়েও প্রত্যাঘাতের মানসিকতাটুকুই প্রবলতর মূর্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ, এ তো হামেশাই দেখতে পাই। এই লোককথাটি তারই পরিচয় বহন করে : ব্রাহ্মণ জমিদারের ছোট নাতির অন্নপ্রাশনের নীচের উঠোনে খেতে বসে দীন-দরিদ্র 'ছোটজাতের' প্রজারা দেখতে পেলেন — ওপরের দালানে বাবুদের পংক্তিতে যে-পায়েস পরিবেশিত হচ্ছে, তার বর্ণ শুভ্র ('অর্থাৎ চিনির পাক), আর তাদের পাতে যে-পায়েস পড়েছে তার রং ধূসর (অর্থাৎ, ভেলী গুড় দিয়ে তৈরি বলে সেটার রং অমন) একজন তখন সবিনয়ে, করজোড়ে (এঁটো হাতেই!) জনৈক কর্মকর্তাকে বলে উঠলেন : কত্তায় জোদি ভরোসা দ্যান তে এউগ্‌গা কথা কই?... আইস্‌সা বাবু ঐ হাদা মিষ্টান্ন(শাদা পায়েস)গুলিন প্যাটে হান্দাইলে (গেলে) বুঝি নমো-শূদ্রের পোলাগো মিত্যু অইব, আঁই?' লোককাহিনীকার এই তীক্ষ্ণ শ্লেষের মধ্যেই গল্পের শেষ

করেছেন। যে-তীব্র শ্রেণীর চেতনা এমন মর্মস্পর্শী বিদ্রূপের জন্মদাতা, তার পিছনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোন্ অবমাননা এবং গ্লানির পুরুষার্জিত স্মৃতি পুঞ্জিত হয়ে আছে, সেটা তো অনায়াসেই অনুমেয় ... এ চেতনা সর্বকালের সর্বসমাজের।

ঠিক এই একই রকমভাবে শ্রেণীবিভেদের চেতনা এবং তার সূত্রে সঞ্জাত-হওয়া প্রতিবাদের আকেগা ফুটে বেরোয় আমেরিকার কালো মানুষদের নিজস্ব লোককথাগুলির মধ্যে। তাঁদের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত প্রভেদটা শুধু আর্থ-সামাজিকই নয়, তার সঙ্গে আরও একটা মাত্রা অন্বিত হয় ঐসব কাহিনীগুলির মধ্যে। শাদা-মানুষ, কালো-মানুষের যে-প্রভেদ প্রতীচ্য জগতে আতীব্র হয়ে থেকেছে সেই সপ্তদশ শতক থেকে একাল অবধি; তারই জ্বালা ফুটে বেরিয়েছে ঐ সব 'নিগ্রো স্লেভ টেল'-গুলির মধ্যে। পুরানো লোকপুরাণবৃত্ত পর্যন্ত এই সূত্রে নূতন প্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। একটি এইরকম 'স্লেভ মিথ'-এ দেখি :

আদম এবং ইভের বড় ছেলে আবেলকে তার ছোট ভাই কেইন খুন করে (ইতিপূর্বে এই বাইবেলীয় মিথের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও লোকসংস্কৃতি' অধ্যায়ে) পালানোর সময়ে সহসা সে ঈশ্বরের মুখোমুখি পড়ে যায় : পরমপিতা তাকে শুধোন, তার দাদা কোথায়? প্রথমে কেইন না-শোনার ভান করলেও ঈশ্বর তাকে আবার যখন প্রশ্ন করলেন, তখন আতঙ্কে তার শরীর শাদা (ফ্যাকাশে) হয়ে গেল।

এরপর থেকেই তার বংশের সবাই শাদা মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগল এবং কড়া রোদে দীর্ঘসময় ধরে আবেলের মৃতদেহ পড়ে থেকে কুচকুচে কালো হয়ে গিয়েছিল বলে, তার বংশধরেরা হল কালো-মানুষ। ঈশ্বরের নির্দেশে শাদা-মানুষরা গিয়ে বসতি করল উত্তরদিকে (অর্থাৎ, ইউরোপে), আর কালো-মানুষেরা হল দক্ষিণদিকের (অর্থাৎ আফ্রিকার) বাসিন্দা; আর সেই থেকে আজ অবধি, উত্তরের শাদা মানুষরা দক্ষিণের কালো-মানুষদের হত্যা কিংবা নির্যাতন করে আসছে।

এই রকমই আরও একটি 'পুরাণ' কাহিনীতে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলা হয়েছে যে নানা রঙের মাটি দিয়ে ঈশ্বর নিগ্রো, ভারতীয়, চীনা, আরব প্রভৃতি আর সব জাতিকে তৈবি করার পর যখন ফরাসি এবং ইংরেজকে গড়তে গেলেন, তখন সব মাটি ফুরিয়ে গেছে। তাই তিনি পিঁপড়ে থেকে ইংরেজকে এবং প্রজাপতি থেকে ফরাসিকে তৈরি করে মানুষ- গড়ার পালা শেষ করলেন নেহাৎ নিরুপায় হয়েই।

অর্থাৎ শাদা মানুষেরা 'খুনীর বংশ'- জাত বলেই এত নৃশংস এবং ইংরেজের ব্যবসাবুদ্ধি আর ফরাসির বিলাসপ্রিয়তার উৎস হিশেবে পিঁপড়ের সঞ্চয়ী-কৃপণতা এবং প্রজাপতির ফুরফুরে হয়ে ফুলে-ফুলে মধু খাওয়াকেই ইঙ্গিত করার মধ্যেও নিগ্রো ক্রীতদাসদের গড়ে তোলা এই কাহিনীগুলিতে একভাবে-না-একভাবে শ্রেণীচেতনা ব্যপ্তিত হয়েছে। এটা নিছক জাতিবিদ্বেষ নয়। তার থেকে ঢের বেশি একটা নিরুদ্ধ ক্রোধের আবেগ, এমনই বুঝতে হবে।

ঘ. লোককথার শেষ বিবর্তন

শ্যামাসঙ্গীতে একটি পদ আছে ঃ 'ওমা দেখ্ চেয়ে ওই ব্রহ্মময়ী — রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।' পদটির কাব্যগুণ অথবা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বিচার করা এখানে যে অভীপ্সিত নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এই গানের চরণটির অন্তরীক্ষে একটি যে বহুল-পরিচিত লোক-প্রসিদ্ধি লুকিয়ে আছে — তার সূত্র ধরে এক বিশেষ ধরনের লোককাহিনীর স্বরূপ এবং বিচিত্র চরিত্রের অন্বেষণই এর একমাত্র অভিপ্রায়। সেটি হল কিংবদন্তী, লোককথার ক্রমবিবর্তনে যা হল শেষতম পর্যায়।

রামপ্রসাদের কুটিরের বেড়া বাঁধার সেই কাহিনীতে আছে যে, তাঁর কন্যার অনুপস্থিতি খেয়াল না করেই এই সাধক-কবি না-কি ঘরের দাওয়ার ওপরে আল্‌গা হয়ে-যাওয়া বেড়াটি শক্ত করে বাঁধবার সময়ে তাকে ডেকেছিলেন হাতে-হাতে দড়িগুলো তুলে দিয়ে একটু সাহায্য করার জন্যে। বেড়া বাঁধা হয়ে যাবার পর মেয়ে কলসীতে জল ভরে বাড়ি ফিরে দেখে যে, বাবা আপন মনেই যেন বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন! হঠাৎ মেয়েকে কলসীকাঁখে দেখে বিস্মিত হয়ে কবি শুধোলেন যে, এই এক মুহূর্ত আগেই তো সে বেড়া বাঁধায় তাঁকে সাহায্য করছিল — এর মধ্যে সে ঘাটেই বা গেল কী করে, আর জল ভরে ফিরলই বা কখন!

এই জিজ্ঞাসার সূত্রেই কবির উপলব্ধি হল যে, স্বয়ং দেবী কালিকাই তাঁর কন্যার রূপ ধরে এসে না-কি তাঁকে হাতে-হাতে বেড়া-বাঁধার দড়ি জুগিয়ে দিয়ে, আবার অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন! . স্বভাবতই এক কাহিনীর অন্তর্লীন অলৌকিকতার উপাদানটুকু নিয়ে যুক্তিশীল পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠবে। এখানে বলে রাখা দরকার ঐ অলৌকিকতাই হল এক ধরনের কিংবদন্তীর প্রাণস্বরূপ। যে কাহিনী-অভিপ্রায় — লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানে যার টেকনিক্যাল নাম মোটিফ — এই গল্পটিতে দেখছি, তা হল, দেবী সাধারণীর ছদ্মবেশে আবির্ভূতা হয়ে ভক্তকে ছলনা করেছেন। এ-মোটিফ যেমন এই কাহিনীতে রয়েছে, তেমনই আছে চণ্ডীমঙ্গলে . প্রথমে গোধিকার মূর্তিতে তারপরে 'ষোড়শী কন্যা'-র রূপে; আছে অন্নদামঙ্গলে . দেবী একবার জরতীর ছদ্মবেশে আর একবার কুলবধূর রূপে ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা করছেন।

এই অভিপ্রায়টিকে বাংলা লোককথার একেবারে নিজস্ব সম্পদ বলতে পারি হয়ত। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই লোকায়ত উৎস থেকেই। আঞ্চলিকভাবে বহু দেব-দেবীর সম্পর্কেই ঠিক এই একই ছকের গল্প সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরোহিতের বিবাহিতা কন্যার রূপ ধরে দেবী যোগাদ্যা শাঁখারিকে ঘাটের ধারে ডেকে এনে শাঁখা পরছেন - এই গল্পটি রাঢ় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুপ্রচলিত। কিছু আগেই সেই কাহিনীর উল্লেখ করেছি। ঠিক একই ছকের একটি টুসু গানও মল্লভুম অঞ্চলে এখনও গাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, কাছাড়ে, ত্রিপুরায়, মানভূমে — এককথায় সারা বঙ্গসংস্কৃতির সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই এ-জিনিষটিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মোটিফ বা অভিপ্রায় এই একটিই মাত্র নয়। এত বিচিত্র ধরনের কিংবদন্তী এই

বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে যে, কোনও উদ্যমী গবেষক শুধুমাত্র সেগুলির নিবন্ধীকরণ শুরু করলেই দীর্ঘ সময়কাল ধরে ব্যস্ত থাকতে পারবেন। বলাই বাহুল্য, লোককথার অন্য সমস্ত প্রকরণ — লোকপুরাণ বা মিথ এবং কাহিনী বা টেল-এর মতো কিংবদন্তী ওরফে লিজেণ্ডের ব্যাপ্তিও বিশ্বজনীন। মানুষের সংস্কৃতির আদিমতম গল্পসাহিত্য মিথ থেকে টেল হয়ে লিজেণ্ডে পরিণতি লাভের একটি গাণিতিক সূত্রও নির্দেশে করা যায়। সে কথায় পরে আসছি; তার আগে কিংবদন্তীর স্বরূপলক্ষণটি বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

॥ ২ ॥

কিংবদন্তী সর্বদাই গড়ে ওঠে কোনও অসাধারণ বিষয় নিয়ে। ঐ অসাধারণত্বের উপলক্ষ হতে পারে কোনও ঘটনা, কোনও স্থান, কোনও বস্তু অথবা কোনও মানুষ। মূলে এদের উৎসে কোনও-না-কোনও বাস্তব ঘটনা থাকেই — যেটার সম্পর্কে হয়ত আপাতবুদ্ধিতে কোনওরকম বিশ্লেষণ আয়ত্তগম্য হয় না, আর তাই, ঐ অবিশ্লেষিত ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান, বস্তু অথবা মানুষের প্রসঙ্গে কালক্রমে একটা করে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। বহু সময়ে বিশ্লেষণ বলে আদৌ কিছু করাই হয় না, মানবমনে অলৌকিক কিংবা ব্যাখ্যাতীত হিসেবে কোনও কিছুকে গণ্য করার সহজাত যে-একটি প্রবণতা আছে, সেই সংস্কারের সূত্রেই কিংবদন্তীর পত্তন হয়। একটা বা কখনও একাধিক গল্প গড়ে ওঠে, কখনও আবার একটা প্রবাদ কিংবা প্রবাদানুর হয় সৃষ্টি। বহু গাথা এবং গীতিকারও উৎসে কিংবদন্তীর অস্তিত্ব খুঁজে বার করেছেন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পণ্ডিতবর্গ।

কথাগুলো অবশ্যই উদাহরণসাপেক্ষ। শুরু করি এবং এক বিখ্যাত লেখকের প্রায়বিস্মৃত একটি গল্পকে অবলম্বন করে। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা ঐ 'দেবতার জন্ম' গল্পটিতে দেখি — অন্ধকারে একটা বিরাট পাথরের চাঙড়ায় হোঁচট খেয়ে রাগের চোটে পা দিয়ে সেটাকে ঠেলতে-ঠেলতে 'লেখক' গলির মোড়ের ওধারে রেখে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কদিন পরে দেখলেন, কে বা কারা যেন সেটার গায়ে সিঁদুর-টিঁদুর মাখিয়ে কিছু ফুল-বেলপাতা ইত্যাদি ফেলে গেছে। আরও কদিন পরে দু-চারটে পয়সাসহ একটা তামার পাত্র দেখা গেল, তাতে আবার গঙ্গাজল ভরা। ধীরে ধীরে একটি মন্দিরও তৈরি হল জনসাধারণের অর্থে; জুটে গেল এক সেবায়েৎ — এক ধান্দাবাজ, প্রথম দিনের ঘটনার সাক্ষী একটি পড়শী। রটে গেল, ঐ প্রস্তররূপী বাবা 'ত্রিলোকেশ্বর' নাকি পাতাল অবধি প্রোথিত। লেখক ছাড়া পাড়াশুদ্ধ লোক ঐ পাথুরে-বাবার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ। সর্ববিধ সমস্যা এবং বিপদ থেকে তিনি না-কি উদ্ধার করতে পারেন। এমন এক সময়ে, আকস্মিকভাবে পাশের পাড়ায় লাগল বসন্ত মহামারী। পাথর-দেবতার মাহাত্ম্যে এ-পাড়া যাতে তার থেকে বাঁচে, সেজন্যে পাড়াশুদ্ধ লোকের ভক্তির বাড়াবাড়িতে বাবা 'ত্রিলোকেশ্বর' যদি মানুষ হতেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতেন। কিন্তু যেহেতু 'দেবতা' তাই ভক্তির ঘুষ-এবং-আতিশয্যে সহনশীলতা—সবই তাঁর বেশি। ব্যতিক্রম শুধু

লেখক; ভক্তির প্রবল জোয়ারের পাশে থেকেও তিনি ক্যানিউট রাজার মতন তাকে প্রতিহত করতে একান্তভাবেই উদ্যমী। অবশেষে একদিন রোগটি এসে হানা দিল পাড়াতে। কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন লেখক।

কয়েকদিন পরে; পাড়াতে রোগটা বেশ ভালভাবেই ঢুকেছে; লেখকের হঠাৎ নজরে পড়ল তাঁর নিজেরও মুখে দু-একটা ফুসকুড়ি। ব্রণ হতে পারে, নাকি বসন্তের গুটিই? অফিস থেকে ফেরবার পথে সন্ধ্যের আলো-আঁধারির মধ্যে নিরালা গলিটার মুখে এসে দাঁড়ালেন লেখক। এদিক-ওদিক চেয়েই পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে তামার থালায় রেখেই গড় হয়ে 'পাথুরে বাবা'-কে প্রণাম করে আবার এদিক-ওদিক চেয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি। গল্পটি বহুদিন আগে পড়া। মূল বিবরণটি এই রকমেব। সূক্ষ্ম ডিটেইল্‌সে ভুল হতেও পারে একটু-আধটু!... এই গল্পটির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কিংবদন্তী গড়ে ওঠার ছবি। ঐ পাথুরে-বাবার ইতিহাস যিনি আদ্যোপান্তই জানেন — এবং একমাত্র তিনিই জানেন, এমন লোকটিও যখন অবচেতন সংস্কারের বশে ঐ পাথবের মধ্যে অলৌকিক মাহাত্ম্যের অস্তিত্ব কল্পনা করে বসেন এই সমুন্নত বিংশ শতাব্দীর নাগরিক পরিবেশেব মধ্যেও, তখন আগেকার দিনের অনগ্রসর সমাজমনের প্রেক্ষিতে এমন জিনিষ কতটা বেশি সম্ভব ছিল তা তো সহজেই বুঝতে পাবা যায়।

।। ৩ ।।

'আগেকার দিন'— কথাটা লেখা হল বটে, কিন্তু এব মধ্যে খানিকটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে; সেটা বলা দবকাব। কিংবদন্তীব পিছনে বাস্তব ইতিহাসের একটা কাঠামো সর্বদাই অবলীন থাকে। তার ওপরে মানুষের মনের অবচেতনে সর্বদাই যে অতিলৌকিক, সাধারণাতীত কিছুর সম্পর্কে একটা ভয়, কিছুটা বিস্ময় এবং অনিবার্য আগ্রহ থাকে, সেই সব-কিছু মিলে ঐ বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর ওপব কিংবদন্তীর বহিরঙ্গের কাহিনীসৌধ-তথা-সুপার-স্ট্রাকচারটিকে গড়ে তোলে। যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ তখন বৃথা হয়ে পড়ে · সংস্কার, বিশ্বাস, অন্ধ প্রত্যয়ই তখন হয় মুখ্য। যে-পাথরের ইতিহাস পূর্বাপর 'দেবতার জন্ম' গল্পের উত্তম-পুরুষের পরিজ্ঞাত ছিল, সেই পাথরই যখন তাঁর মনেও ভয় এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে 'দেবতা' বনে গিয়ে প্রণাম ও প্রণামী আদায় করতে পারল, তার থেকেই এটি সহজবোধ্য হয় যে, কিংবদন্তী গড়ে তোলার পিছনে এমন একটি মানসিকতা সক্রিয় থাকে, যার শিকড় স্মরণাতীত প্রাগিতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন সময়কাল থেকে মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে সহস্রপ্রজন্ম পরম্পরায়।

এই বিশ্বাসের স্তর কতখানি গভীর তা দু-চারটি ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ উদাহরণ থেকেই বুঝিয়ে বলি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাব ঘুটিয়াবী শরীফে সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলে অনুভাবিত এমন এক পীরসাহেবের সমাধি আছে। আঞ্চলিক বিশ্বাস অনুসারে : তাঁব জীবৎকালে ঐ এলাকায় এক 'রাক্ষসী' বসবাস করত। ঘুটিয়ারী শরীফের কাছে যতবার রেল লাইন বসানোব ব্যবস্থা করতে গেছে রেল কোম্পানী,

ততবারই নাকি সেই রাক্ষসীর উৎপাতে কাজের বিঘ্ন ঘটে যেত। অবশেষে রেল কোম্পানী পীর সাহেবের স্মরণ নিলে, তিনি তাঁর 'অতিলৌকিক' ক্ষমতার বলে তাকে একটি পাথরে রূপান্তরিত করে দেন। লাইন তারপর নির্বিঘ্নেই বসানো হয়।

পাথরটি পীরসাহেবের সমাধিভবনের সিঁড়ির নীচে সর্বদাই পড়ে থাকে। এটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতির খেয়ালেই হোক আর যেভাবেই হোক একটি পূর্ণবয়স্কা নারী সটান শুয়ে থাকলে তার আবয়বিক কতগুলি উচ্চাবচতা যেমন নজরে পড়বেই — ইংরেজী করে কনট্যুর বললে কথাটা হয়ত সহজবোধ্য হবে — ঠিক সেই সব আবয়বিক আদল ঐ পাথরটির মধ্যে দেখা যায় — খানিকটা দূর থেকে যদি দৃষ্টিক্ষেপ করেন কেউ, তাঁর ঠিক সেই রকমই মনে হবে।

এ অবধিও ঠিক আছে। ঐ প্রাকৃতিক তক্ষণের ফলে সৃষ্ট নারীদেহের বৈশিষ্ট্যধারী প্রস্তরখণ্ডটিকে নিয়ে গল্প গড়ে-তোলা হয়েছিল বহুকাল আগে মানুষের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ মনের অনিবার্য চরিত্রানুযায়ী। বিবিধ কারণে রেল লাইন পাততে বিঘ্ন হবার সঙ্গে ঐ পাথরটিকে সংযুক্ত করে, পীরসাহেবের অলৌকিক কিছু-একটা সংঘটন-করার মাহাত্ম্য প্রচার করাই ছিল মূল অভীপ্সিত বিষয়। নারীদেহের আদল-আসা প্রস্তরখণ্ডটি এর সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল : মানুষ এই ধরনের তুলনা করতে যে ভালবাসে সে-কথা পুনরায় স্মর্তব্য। কিন্তু অবাস্তর অলৌকিক ঘটনার মাত্রা মানুষের মনে কতদূর অবধি সম্প্রসারিত হতে পারে, তার প্রমাণ এই কিংবদন্তীর পরবর্তী পর্যায়ে মিলবে।

'রাক্ষসী' পাথরটির কোলের কাছে আর একটা ছোট পাথর— হাতখানেক লম্বা — বিঘৎখানেক করে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় বিশ্বাসে ওটি হল ঐ রাক্ষসীর ছেলে। এবং প্রতিবছর না কি তার একটা করে ছেলে জন্মায় কোন এক জ্বিনের সহযোগে। অর্থাৎ ছোট পাথরটা প্রতি বছর বদলে যায় (বা বদলে দেওয়া হয়)। এটি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে সংশয়াতীত একটি বাৎসরিক ঘটনা।

এই ব্যাপারটি তাঁদের কাছে এমনই স্পর্শকাতর একটি বিষয় যে, একবারের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে আকাদেমী অব ফোকলোরের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন স্থানীয় এক উৎসাহী স্বেচ্ছানিযুক্ত গাইডের কাছে এই সব বিবরণ শুনে লিপিবদ্ধ করছেন এমন সময়ে পাথরের বছর-বছর বাচ্চা হয় শুনে তাঁদের একজন লিখতে-লিখতে মুখ টিপে হাসি লুকোবার চেষ্টা করা মাত্র সেই প্রবীণ গাইড ক্ষুণ্ণ হয়ে কথা বলা বন্ধ করলেন এবং সোচ্চারভাবে ক্ষোভও প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে। নানাভাবে তাঁর কাছে মার্জনা চেয়েও, তাঁকে দিয়ে আর একটা কথাও বলানো গেল না। তাঁর আহতবিশ্বাসকে নিরাময় করতে কেউই কোনওভাবে পারলেন না, মায় খোদ 'আসামী' ঐ ছাত্রীটিও। শুধু তিনিই নয়, তাঁর সঙ্গে স্থানীয় আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এই ব্যাপারটায় যথেষ্টই আঘাত পান।

অথচ সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে যে একটা হাস্যকর অবাস্তবতা লুকিয়ে আছে, সে কথা কে অস্বীকার করবেন, যদি তিনি যুক্তিমান ব্যক্তি হন? পাথর-হয়ে-যাওয়া রাক্ষসীর কোলে প্রতি বছর এক অদেহী জ্বিনের সন্তান আবির্ভূত হয়, এমন ঘটনা বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট

মনন থাকলে তো কেউই বিশ্বাস করেন না নিশ্চয়। সুতরাং ঐ মেয়েটি যে তাঁর হাসি চাপতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন লোকসংস্কৃতির ছাত্রী এবং ক্ষেত্রগবেষক হিশেবে সেটা নিশ্চয়ই তাঁর ত্রুটি হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পড়ুয়া হলেও অল্পবয়সিনী একটি মেয়ের পক্ষে ঐরকম একটা দৃঢ়প্রত্যযসমর্থিত অসম্ভাব্য ঘটনার কথা শুনে মজা পেয়ে সেই ভাবটুকু লুকিয়ে রাখতে না-পারাটাও খুব একটা অমার্জনীয় কিছু নয়।

কিন্তু এ-সবে অবিশ্বাসীর সংখ্যার সঙ্গে যাঁরা এগুলিতে বিশ্বাস করেন তাঁদের সংখ্যার অনুপাত কষলে দেখবেন হয়তো অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে ৫ : ৯৫ কিংবা ১০ : ৯০ নিদেনে ১৫ : ৮৫ বা ২০ : ৮০ । অর্থাৎ, নিরতিশয় বিষমানুপাতিক। এই ধরনের অলৌকিক বা অসম্ভাব্যতায় বিশ্বাস কতদূর বিস্তৃত হতে পারে যে, তার আর একটা নজির ঐ একই সমীক্ষাক্ষেত্র থেকে হাজির করা যেতে পারে : ওখানে একটি পুষ্করিণী আছে, যার নাম মক্কাপুকুর। স্থানীয় বিশ্বাসে এই জলাশয়ের তলায় একটি সুড়ঙ্গ আছে, যেটি আরব দেশের ঐ পুণ্যনগরীর কাবা মসজিদের সংলগ্ন পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত করেছে এই মক্কাপুকুরকে। এই বিশ্বাসের উৎসে কোনও আপাত-সম্ভাব্য হেতু অবশ্যই নেই। প্রথমে কেউ এই কথাটি প্রচার করেছে অন্যরা ধর্মবিশ্বাসের জন্যই হোক, আর যে বলেছে তার প্রতি ভয়ে বা ভক্তিতেই হোক, এই কথাটি বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর এই থেকেই কিংবদন্তীটি ধীরে-ধীরে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

ঘুটিয়ারী শরীফের পুকুরের জলের সঙ্গে মক্কানগরীর পুকুরের জলের সুড়ঙ্গ পথে সংযোগ থাকা, বাবা 'ত্রিলোকেশ্বর'-এর প্রস্তরমূর্তি পাতাল অবধি প্রোথিত থাকা ইত্যাদি অসম্ভাব্য ব্যাপারের সঙ্গে কিংবদন্তী সৃষ্টির একটি অতি-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পটি নিশ্চয়ই স্মরণের আছে? মেয়েটিকে সবাই দেবী ভগবতীর অংশ বলে ভাবতে আরম্ভ করলে, অবশেষে তার নিজের মনেও এই নিয়ে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুরু হল : এই দ্বন্দ্বের উৎসেই রয়েছে আদিম সংস্কার, যা ইতিহাসের পরবর্তীকালে কিংবদন্তী সৃষ্টি করে। বস্তু, ব্যক্তি এবং স্থানের মধ্যে কোনও ধরনের অ-সাধারণ কিংবা অলৌকিক শক্তি নিহিত থাকার এই আদিম সংস্কার এবং তার পরবর্তী উত্তরাধিকারের স্বরূপটি এখানে বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতৃপুরুষেরা তাঁদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা করতে পারতেন না বা কারণ খুঁজে পেতেন না। এই ফাঁকটা তাঁরা পূরণ করতেন কল্পনা দিয়ে, যার এলাকাও খুব বিস্তৃত ছিল না। ফলে পাথরের মধ্যে, পাহাড়ের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, অরণ্যের মধ্যে, প্রান্তরের মধ্যে, হ্রদের মধ্যে, নদীর মধ্যে ঐসব ব্যাখ্যা না-করতে পারা জিনিসগুলির অন্তর্লীন নানা অলৌকিক সত্তা ওরফে 'মান্যা'র অস্তিত্ব কল্পনা করতেন। এই ভাবনার অনুষঙ্গরূপেই আদিম লোকপুরাণগুলি সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। অলৌকিকত্বে প্রত্যয় থেকেই মিথ ওরফে লোকপুরাণগুলির সম্পর্কে একটি ধর্মকেন্দ্রিক পবিত্র ভাবনাও গড়ে উঠেছিল।

এই ধরনের পবিত্রতার বোধ অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান থাকে একটা সময় পর্যন্ত। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আদিম পর্ব শেষ হয়েছে কৃষির আবিষ্কার ও পত্তনের সঙ্গে,

প্রাগিতিহাস পর্যায়েরও শেষ সেইখানে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যতই মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল, ততই তার স্বকীয়তার বোধ অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়ও বাড়তে লাগল। তার সংস্কৃতির সামগ্রিক সীমানা এতাবৎকাল ধর্মভাবনা ও পবিত্রতার বোধ ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি এবং দৈবনির্ভরতা বিষমানুপাতিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমন কথাই সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন; সুতরাং প্রচলিত কাহিনীধারার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত ধর্মীয় পবিত্রতার ভাবনাও (যার অন্তর্কাঠামোয় রয়েছে অলৌকিক মান্যা) কালপ্রবাহে লঘু হতে শুরু করল। ধর্মীয় ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল ধ্রুবপদী পুরাণসূত্র, অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসীর ইত্যাদির অন্তর্গত কাহিনীমালা; দেবতা এবং দেবকল্প অ-সাধারণ অবতারররূপী মানুষেরা থেকে গেলেন সেই সবের মধ্যে, আর দৈবনির্ভরতা পবিত্রতার বোধ-ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে লাগল লোককথা, যাদের লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় নাম হল টেল, মারশেন, বীলিনা, সাগেন, রূপকথা, পরনকথা, পবস্তাব, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

দৈবনির্ভরতা এবং পবিত্রতার বোধ — এই উপাদানদুটি যে অলৌকিক শক্তিতে প্রত্যয়ের মৌলভাবকণিকার সমাহারেই গঠিত, সে কথা ওপরে বলেছি। ঐ প্রত্যয় হল এদের অন্তঃকাঠামো বা ইনফ্রা-স্ট্রাকচার। বহিঃকাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার, এ বোধ দুটি সংকীর্ণ হয়ে গেলে, সেই শূন্যের পূরণ হয়েছে অন্তঃকাঠামোর অলৌকিক প্রত্যয়ের সূত্রে জাদু বা ম্যাজিকের ওপরে আস্থার দ্বারা। এরই লব্ধফল হিশেবে মিথোত্তর লোককথায় এর গুরুত্ব খুবই বেশি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মানুষের মনের গহনে যে আদিম দৈবনির্ভরতা নির্মূলিত হয়নি (কেন হয়নি তা মনোবিজ্ঞানীরা জানেন) পরবর্তীকালেও, তার একটা অভিক্ষেপণ ঘটলেও প্রবণতাটি মাঝে-মাঝেই সোচ্চারভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । এরই ফলশ্রুতি, কিংবদন্তী।

॥ ৪ ॥

এই সমস্ত ব্যাপারটিকে একটা গাণিতিক ছকে মেলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম সূত্র 'দৈবনির্ভরতা' এবং 'আত্মপ্রত্যয়' এদের সম্পর্ক হল বিষমানুপাতিক ।

$$\therefore \text{(১)} \quad \text{দৈবনির্ভরতা} \propto \frac{\text{১}}{\text{আত্মপ্রত্যয়}}$$

দ্বিতীয় সূত্র : আদিম লোকপুরাণের 'সক্রিয়মূল একক' (অর্থাৎ ফাংশনাল ইউনিট) হল 'দৈবনির্ভর-পবিত্রতার বোধ'; আদিম লোকপুরাণ (বা, অরিজিন্যাল মিথ) কালপ্রবাহে প্রথম সূত্রের শর্তানুযায়ী তাকে প্রত্যক্ষভাবে লঘু থেকে লঘুতর রূপে পায়: অর্থাৎ 'দৈব-পবিত্রতা' লৌকিক কাহিনীতে গৌণ হতে-হতে অবশেষে বহিরঙ্গে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় টেল, রূপকথা-ইত্যাদির মধ্যে। আদিম 'লোকপুরাণ'-কে যদি 'ল',

'রূপকথা' ইত্যাদিকে যদি 'র' এবং 'দৈব-পবিত্রতা'-র উপকরণকে যদি 'দ', এই তিনটি সঙ্কেতচিহ্নে সূচিত করা যায়, তাহলে :

(২) ল-দ$_১$ = র

আবার কিংবদন্তীর মধ্যে ঐ 'দেবীপবিত্রতা'র বোধ পুনরুত্থিত হয় ; 'কিংবদন্তী' = 'ক' এবং পুনরুত্থিত 'দৈবীপবিত্রতা' = 'দ'$_২$ ধরলে

(৩) র + দ$_২$ = ক

'দ$_১$' এবং 'দ$_২$' — এই দুয়েব পারস্পরিক সম্পর্কও বিচাব করার দরকার আছে এখানে। কেননা ,
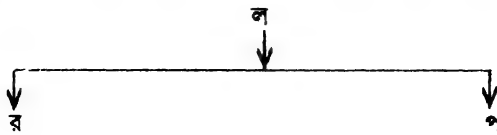
(যদি, ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্তকে 'প' হিশেবে চিহ্নিত করি) ;

দ$_১$ = দৈবী-পবিত্রতার বোধ এবং অলৌকিকত্বে আস্থা হল তারই অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ; এই ধরণের অজস্র উপকরণে সমাহারে তার সৃষ্টি ;

∴ দ$_১$ = দ (অ) + দ (আ) + দ (ই) + দ (ঈ).. .... α

(যদি, ঐ উপকরণগুলিকে দ (অ), দ (আ)... এইভাবে পৃথক-পৃথক চিহ্নে সূচিত কবা হয়);

এদের মধ্যে, সঙ্কেতসূচনার সুবিধার জন্য দ (অ), দ (ই), দ(উ), দ (এ), দ (ও) ইত্যাদিকে পুরোপুরি দৈবীপবিত্রতার দ্যোতক এবং দ (আ), দ (ঈ), দ (ঊ), দ (ঐ), দ (ঔ), ইত্যাদিকে অন্যবিধ অলৌকিকতার দ্যোতক বলে যদি গণ্য করা হয়, তাহলে সূত্র (২)-এ (ল - দ$_১$) যখন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তখন 'ল'-এর অন্তর্গত 'দ$_১$' এর অভ্যন্তরীণ সমস্ত কিছুই বাদ যাচ্ছেনা ; বাদ যাচ্ছে 'দ (অ) + দ (ই) + দ (উ) + দ (এ) + দ (ও)...' সূচিত উপকরণ ক-টি ; 'দ (আ) + দ (ঈ) + দ (ঊ) + দ(ঐ) + দ (ঔ) . ' সূচিত উপকরণ, অর্থাৎ দৈবী-পবিত্রতার ভাবাতিরিক্ত যেগুলি, যেগুলি বজায় থাকছে 'র'-এর মধ্যেও। 'র'-এর মধ্যে তারা থাকছে জাদুবিশ্বাস-ইত্যাদি রূপে। এরাই যখন তাদের জাদু উপাদানের বদলে ধর্মীয় বা অ-সাধারণ কিছু উপাদানের অনুষঙ্গে পরিণতি পায় তখন তাদের সামগ্রিক-সূচক হল 'দ$_২$'।

∴ (৪) দ (আ) + দ (ঈ) + দ (ঊ) + দ (ঐ) + দ (ঔ) .... জ

(যদি 'জ' জাদুবিশ্বাসের সূচক হয়)

আবার 'ক' মধ্যে কালনিরপেক্ষ নতুন করে দৈবীমহিমা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেগুলি সেটি সূচিত হচ্ছে 'দ$_২$' দ্বারা। তাহলে :

(৫) দ (অ) + দ (আ) + দ (ই) + দ (ঈ) + দ (উ) + দ (ঊ) .....= দ$_২$:

আবার,

'দ - [দ (আ)+দ (ঈ) + দ (ঊ) + . .]' = আদিমকালীন দৈবীপ্রত্যয় অর্থাৎ, 'দ-জ' = আদিমকালীন দৈবীপ্রত্যয়,

আবার, জ > পরবর্তীকালীন দৈবীপ্রত্যয়=দ ;

আদিম-লোকপুরাণ থেকে ঐতিহাসিক-কিংবদন্তীয় বিবর্তনের গাণিতিক এই হিশেব করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে 'প' অর্থাৎ, ধ্রুবপদী পুরাণে এইসব সক্রিয়মূল এককগুলি কতটা থাকছে, কতটা থাকছে না — সেটাও একটু দেখা দরকার। এটি প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, বহুসংখ্যক স্থানিক-কিংবদন্তী আছে, যেগুলির সঙ্গে ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্তের নানান্ ঘটনা এবং ব্যক্তিকে যুক্ত করা হয়। যেমন, দিল্লীর পুরাণা-কিল্লাকে স্থানীয় কিংবদন্তী-অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কেল্লা বলা হয়ে থাকে ; উৎসাহী লোকেরা 'কুন্তীজীকা মন্দির'-ও দেখিয়ে দেন আগ্রহের আতিশয্যে। মধ্যভারতের বিশ্বখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রালয় ভীমবেট্‌কা পাহাড়কে পৌরাণিক মধ্যম পাণ্ডবের আলয় বলে বুঝিয়েছিলেন আমাদেরকে স্বয়ং সরকারী-সংস্থা 'অন্তর্দেশীয় ভ্রমণোন্নয়ন নিগম'-এর (আই-টি-ডি-সি) নিযুক্ত ড্রাইভার-এবং-গাইড। ঐ পাহাড়ের কোলে একটি উপবনেই যে ভীম-হিড়িম্বার সাক্ষাৎ এবং প্রেম-ভালবাসা-ইত্যাদি ঘটেছিল সেই গল্পও তিনি করেছিলেন একটি টিলার ওপরে উঠে হাজার-দশেক বছর আগের আঁকা-বলে স্বীকৃত কয়েকটি মনুষ্য-প্রতিকৃতি দেখাবার সময়ে ! অযোধ্যা, মথুরা, বারাণসী, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থান তো পুরাণ-প্রথিত পুরুষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণেই বিখ্যাত !

সে-সম্পর্ক থাকুক, আর না-ই থাকুক— কিংবদন্তীর সঙ্গে ধ্রুবপদী পুরাণের একটা পরোক্ষ সম্বন্ধ কিন্তু রয়েছেই।

'দ (অ) + দ (ই) + দ (উ) ....' ইত্যাদি নিছক দৈবীমহিমাত্মক লোকপৌরাণিক এককগুলি 'র' থেকে যখন বর্জিত হয়, তখন যেগুলি মানুষের আত্মপ্রত্যয় বাড়ার ফলশ্রুতিতে কি সামাজিক-মনন থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়..... না, তা হয় না। তবে? ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্ত, যা নাকি পরিশীলিত-শিল্প বলে, সমাজের ওপরতলার উৎসর্জন হিশেবেই গণ্য হবে, তার মধ্যে গিয়ে সঞ্চিত হয় সেগুলি। দৈবীমাহাত্ম্যকীর্তন ওপরতলা নিজের স্বার্থেই করে, কেননা সেটিও শ্রেণীশোষণের অন্যতম হাতিয়ার। অতএব, কৃষির উদ্ভবের পরিণতিতে যেমন একদিকে মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্ধন ঘটেছিল, তেমনিই তখন আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়ে পরিণামে শ্রেণীভিত্তিক সমাজের পত্তনও হয়েছিল। শ্রেণীসমাজ থাকবে, শ্রেণীশোষণ থাকবে না, তা তো সম্ভবপর নয়। অতএব ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্ত তার দৈবীমাহাত্ম্যকীর্তন-কারী চরিত্র নিয়েই নিচের সিঁড়ির লোকায়ত কাহিনীমালার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যেহেতু, সংস্কৃতির চক্রাবর্তন ঘটে তাই ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্তের ওপরও যেমন রূপকথা ইত্যাদির ছায়াপাত ঘটল, তেমনই আবার লোকায়ত কাহিনীধারার ওপরও অভিক্ষেপ ঘটাল সে; রূপকথা-ইত্যাদির মধ্যে জাদুবিশ্বাস-কেন্দ্রিক যেসব অলৌকিকত্ব-প্রদর্শনে

উপাদান থাকে, সেগুলি ঐ অভিক্ষেপণের পরিণতিতে রূপান্তরিত হয়ে কিংবদন্তীর গোড়াপত্তন করে। সুতরাং, আগের সারণীটিকে একটু সম্প্রসারিত করলে সমস্ত ব্যাপারটুকু সুস্পষ্ট একটা চেহারা পাবে .
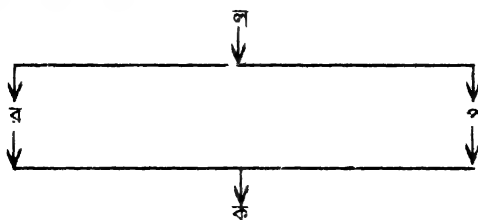
ঐতিহ্যবাহী কাহিনীধারায় কিংবদন্তীর সঠিক স্থানটি কোথায়, এই গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে অতঃপর সঠিকভাবে সেটুকু বোঝা যাবে অবশ্যই।

॥ ৫ ॥

কিংবদন্তী কত ধরনের হতে পারে ?

মূলত দুই ধরনের এদের বিভাজন করা চলে : ক (১) ধর্মীয় এবং (২) ধর্মনিরপেক্ষ এবং খ. (১) আঞ্চলিক এবং (২) বৃহত্তর সংস্কৃতি-বলয়-কেন্দ্রিত। 'ক' এবং 'খ'-এর এই বিভাগগুলি আবার সব-সময়েই নিজের বর্গের বাইরের বর্গটির বিভাগগুলির উভয়ের সঙ্গে সাপেক্ষ-সম্পর্কে আবদ্ধ। এর অর্থ :
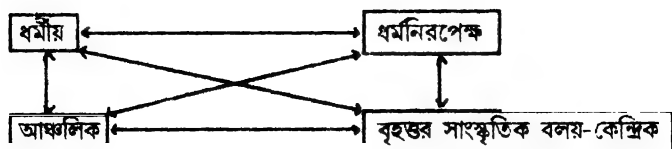
এইসব পরস্পর-সাপেক্ষ প্রকরণগুলির উদাহরণ বিশ্লেষণ করলেই এদের যথাযথ চরিত্র উদ্ঘাটিত হবে।

প্রথমেই ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ কিংবদন্তীগুলির কথা ঃ বুদ্ধ, যীশাস-প্রমুখ যাঁরা বাস্তবে-কল্পনায় বিমিশ্রিত এবং বিচিত্রিত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নিয়ে যে-সমস্ত কিংবদন্তী আছে, সেগুলি মূলত জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পর্যান্তর মাত্র। যীশাসের

স্পর্শে অন্ধ দৃষ্টিমান হল, কিংবা কুষ্ঠরোগী নিরাময় হল, কি যজ্ঞক্ষেত্রে বুদ্ধের উপস্থিতি মাত্র পশুবলির খড়্গ আর তুলতেই পারলনা কেউ, অথবা মোজেসের ইঙ্গিতে সমুদ্র দ্বিধা হয়ে পথ করে দিল ইজরায়েল-সন্ততিদের — এইসব কিংবদন্তীর অনুরূপ বিবরণ লোককথাতে অজস্রই পাওয়া যায়। সুতরাং এদের অন্তর্নিহিত জাদু-উপাদানগুলি সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে, তাদের কাঠামোর ওপর নির্ভর করেই এই সমস্ত কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়েছে। বিশেষত, এই সব মহামানবের জীবনকথা বলে যা-কিছু প্রচলিত আছে বহু শতাব্দী ধরে, তার কতটা সত্য আর কতটাই বা কল্পনা, সে তো আর এতকালের দূরত্ব অতিক্রম করে যাচাই করার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ মজুত নেই। সুতরাং এঁদের নাম করে যা প্রচলিত, তা যে উত্তরকালের সংযোজন নয়, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। এমন সম্ভাবনা কিংবদন্তীতে থেকেই যায়।

এই ধরনের ধর্মীয় কিংবদন্তী মূলতই বিশ্বজনীন। এদের চেয়ে ব্যাপকতায় স্বল্পতর, কিন্তু তা-সত্ত্বেও সুবৃহৎ একটি সাংস্কৃতিক-বলয়ে প্রচলিত আছে এমন ধরনের ধর্মীয়-কিংবদন্তীও সংখ্যাতীত। শ্রীচৈতন্যের প্রসাদী তাম্বুলের স্পর্শে কবি বৃন্দাবন দাসের মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের কিংবদন্তীটি স্মরণযোগ্য। এই ধরনের ইম্যাকুলেট কনসেপ্‌শান কিন্তু রূপকথায় হামেশাই দেখা যায় : সন্ন্যাসীর দেওয়া শিকড়ের গুণে রানীরা পুত্রবতী হলেন। যীশাসের জন্মবৃত্তান্তেও ঐ একই সক্রিয়মূল উপাদান, অর্থাৎ, জাদুশক্তিতে প্রত্যয়। লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানে মোটিফ বা অভিপ্রায় কাকে বলে সে-কথা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলেছি ; এটি হল সেই রকম হাজার-পাঁচিশেক মোটিফ উপাদানের অন্যতম। বিশ্বজনীনভাবে যীশাসের ক্ষেত্রে এটি দেখি ; শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিন্তু সুবৃহৎ একটি সাংস্কৃতিক বলয়েও এটি আছে। আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বড়িশার কাছে 'বাবা ভূতনাথের কাছারী'-র প্রাঙ্গণে বিশেষ একটি গাছে ঢেলা বেঁধে পরপর তিনদিন ছুঁয়ে এলে নারীর কোলে সন্তান আসে — এই কিংবদন্তী হল আঞ্চলিক সীমানায় আবদ্ধ। পীরের দরগায় সিন্নি মানা, ঢিল বাঁধা-ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত অনুরূপ কিংবদন্তীও তো অজস্র ! সেগুলিও আঞ্চলিক। তবে মূল অভিপ্রেরণা অবশ্যই বিশ্বজনীন। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা জাদুবিশ্বাসটাও যে বিশ্বজনীন ব্যাপার।

ধর্মনিরপেক্ষ কিংবদন্তীগুলির সঙ্গে ধর্মীয় কিংবদন্তীর পার্থক্য মূলত একটাই : ধর্মীয় কিংবদন্তী মোটামুটিভাবে কোনও সন্তপুরুষ কিংবা তাঁর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত স্থান-বা-বস্তুকে নিয়ে তৈরি হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মনিরপেক্ষ কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে ঐ ধরনের কেউ থাকেননা। যাঁরা থাকেন, তাঁদের অন্যবিধ অ-সাধারণত্বই কিংবদন্তীর উপলক্ষ হয়। হারকিউলিস, প্রমেথিউস, ভগীরথ যদি পুরাণপুরুষ না হয়ে ইতিহাসের মানুষ হতেন, তাহলে তাঁদের অ-সাধারণত্বের জন্যই তাঁরাও কিংবদন্তীরই নায়ক হতেন। যা অন্যেরা পারে না — তা যে পারে, সেই হল কিংবদন্তীর পুরুষ; চলতি কথায় প্রবাদ-পুরুষ।

এই অসাধারণত্বের খ্যাতি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের বিশ্বজনীন পরিচিতি অবশ্য ধর্মপুরুষদের তুলনায় অনেক কম। শেরউড বনের রবিন হুড যেমন এই ধরনের একটি উদাহরণ। ঠিক একই রকমের চরিত্র আমাদের দেশের রঘু ডাকাত কিংবা ভবানী পাঠক-প্রমুখ। কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বলয়ের বাইরে তাঁদের পরিচিতি নেই।

শিবাজীর ফলের ঝুড়িতে করে পালানো, কিংবা নেতাজীর কাবুলিওলার ছদ্মবেশে দেশ

থেকে চলে যাওয়ার ঘটনাও কালক্রমে হয়ত কিংবদন্তীতে পরিণত হবে। কল্পনার রং-পালিশ তাদের ওপর অনুলেপিত হবে। এইগুলিকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে ব্যপ্ত কিংবদন্তী বলা যাবে হয়ত। আলেকজাণ্ডার ও পুরুর কাহিনী কিংবা পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী এইভাবেই সর্বভারতীয় কিংবদন্তী হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ঢেঁকি ঘুরিয়ে ডাকাত তাড়ানোয় বিখ্যাত আশানন্দ ঢেঁকি, একমণ চালের ভাত খাওয়া মুণকে রঘু থেকে মুহূর্তে বিশাল-বিশাল অংক মুখে-মুখে করে-দেওয়া শকুন্তলা দেবী-প্রমুখ অনন্যসাধারণ দক্ষতা বা প্রতিভার অধিকারী মানুষগুলিকে নিয়ে যেসব কিংবদন্তী হয় — তারও সংখ্যা প্রচুর, সেগুলির মধ্যে কোনও ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ না থাকলেও, লোকে সেইভাবেই ভাবতে ভালবাসে, অ-সাধারণকে অ-লৌকিক বলে ভাববার একটা প্রবণতা অধিকাংশ মানুষের সহজাত বলেই। বস্তুতপক্ষে, অ-ধর্মীয় কিংবদন্তীগুলির মধ্যে সপ্রশংস বিস্ময়ের যে-মনটি প্রকাশমান হয়, সেটিও অলৌকিক বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যেহেতু স্বার্থসিদ্ধিব প্রয়োজনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অতিলৌকিক বিশ্বাস করার প্রবণতাকে উস্কে দেবার লোকের অভাব হয় না শ্রেণীসমাজে। শিবরামের ঐ গল্পের ধান্দাবাজ সেবায়েতের প্রসঙ্গ স্মরণ করতে হয় এখানে।

কিংবদন্তীর বাস্তব সংগঠনের ক্রমপরম্পরাটির পথরেখাটি দেখিয়ে আলোচনা শেষ করব। বর্ধমান জেলার যোগাদ্যা উমার মন্দির সংক্রান্ত কিংবদন্তীর উল্লেখ এর আগে একাধিকবার করেছি। ঐ দেবীর বিগ্রহ সারা বছর জলের তলায় থাকে, শুধু বার্ষিক পূজার রাত্রে ঘন অন্ধকারে তাঁকে তুলে এনে পূজান্তে আবার জলের তলায় ফের এক বছরের জন্যে রেখে দেওয়া হয়। এই প্রথার কারণ অজ্ঞাত : কোনও আদিম তান্ত্রিক অভিচার এর পিছনে থাকতে পারে, নয়ত, কোনও ধর্মগোষ্ঠীর শত্রুতার বাস্তব-ভয়ও অসম্ভাব্য নয়। কিন্তু যেহেতু দেবীর বিগ্রহ জলের তলায় থাকে, তাই তাঁর স্পষ্ট না-হলেও অস্পষ্ট একটা কারণ না - দেখালে মানুষের প্রশ্নমনস্কতা নিরসিত হবে না। আর মনে প্রশ্ন জাগলেই ভক্তির মাত্রা কমে। ভক্তিকে সার্বভৌম করে রাখতে হলে প্রথমেই প্রশ্নের প্রবণতাকে নির্মঞ্ছিত করা দরকার। অতএব দেবী জলের তলায় চলে গেলেন কীভাবে তা নিয়ে একটি কাহিনী-গড়া কায়েমী ধর্মীয় স্বার্থের প্রয়োজনে জরুরী হল। স্থানীয় ধনাঢ্য শংখবণিকদের স্বাচ্ছল্য, সমৃদ্ধির হেতুরূপে তাঁদের পূর্বপুরুষের হাতে দেবীর শাঁখা পরার গল্প গড়ে এবং দেবীকে ব্রাহ্মণ পূজারীর কন্যারূপে দেখিয়ে একই সঙ্গে অনেক প্রভাবশালী মহলের মাহাত্মাই কীর্তিত করা হল।

কালের বিবর্তনে আসল কথাগুলো বিস্মৃতির অতলে লুকিয়ে পড়ে। শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যটুকু সুচতুরভাবে লুকানো থাকে প্রথম থেকেই। উত্তরকালের পলিতে সেটা একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়। বেঁচে থাকে শুধু কিংবদন্তীর গল্পটি। ধর্মীয় কিংবদন্তীর এই অলৌকিক মাহাত্ম্যকীর্তনকারী চরিত্রটি উত্তরকালেও মানুষের মনকে দুর্বল করে রাখে। মহুয়া, মলুয়া, সোনাই—ভাবনা কাজী, দেওয়ানা-মদিনা কি নক্‌সী-কাঁথার মাঠ কিংবা সোজন বাদিয়ার ঘাট নিয়ে যেসব অ-ধর্মীয় কিংবদন্তী আছে, সেগুলি এই ধর্মীয় এবং অলৌকিক কিংবদন্তীর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

ঙ. সমাজভাবনার তির্যক্ আরশি : প্রবাদবচন

ফ্রান্সিস বেকন বহুদিন আগেই বলেছিলেন, 'একটি জাতির প্রতিভা, বৈদগ্ধ্য এবং তাদের প্রকাশ মূর্তিমন্ত হয় তার প্রবাদ-বচনের মাধ্যমে।' অর্থাৎ, মানুষের প্রাত্যহিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলির মর্মনির্যাস সঞ্চিত হয় যেসব সুসংগঠিত, সরল অথচ বৈদগ্ধ্যভরা ঐতিহ্যবাহী উক্তিগুলির মধ্যে, তারাই হল প্রবাদ। এ সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে একটি বহুলভাবে-প্রচলিত বিলিতি মন্তব্যে : "দ্য উইজ্‌ডম অব মেনী অ্যান্ড দ্য উইট্ অব ওয়ান।" একই ধরণের ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে যে-কোনও প্রবাদেরই অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি তৈরির মাল-মশলা সংগৃহীত হয়ে থাকে। অনুরূপ অভিজ্ঞতাকে যাতে অন্যরাও পরবর্তীকালে সমানভাবে উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা করতে পারে, এমনই একটি যৌথ-সামাজিক মানসিকতা থেকে প্রবাদগুলি গড়ে উঠেছে, উঠছে এবং ভবিষ্যতেও উঠবে। অভিজ্ঞতার ফসল যাতে সবাই ঘরে তুলতে পারে, এই ধরনের একটা সামাজিক-প্রকল্পই প্রবাদের উৎসে নিহিত থাকে সর্বদা। আর তাই, এই সমস্ত প্রবাদগুলির মাধ্যমে একটি জাতি অথবা গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আরও নানানরকমের মূল্যবোধ প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। তবে প্রক্ষেত্রেই প্রবাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত এবং মূল্যবোধের মাপকাঠি যে বিশ্বজনীন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বরং সেটাই বেশি স্বাভাবিক ; মর্গানের তত্ত্বের অনুসারে সেটাই অনিবার্য বলে গণ্য হয়ে পড়ে।

প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রবাদের পিছনে একটা-না-একটা কাহিনীর অস্তিত্ব থাকে। কোনও একটা বিশেষ ঘটনা, একটা কিংবদন্তী, একটা বিশেষ কোনও সংস্কার, কোনও নির্দিষ্ট একটি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কাহিনী — এই রকম কিছু-একটা প্রত্যক্ষ উৎস সচারচর থাকেই এদের সৃষ্টির মূলে। সেই একক বা বিশেষ ব্যাপার বা উপলক্ষটি প্রবাদের মাধ্যমে সার্বিক বা নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। প্রবাদের মাধ্যমে কালক্রমে একটি ঘটনা অনুরূপ বহু ঘটনার উপমাস্থল হয়ে ওঠে বলেই প্রবাদের চরিত্র সর্বজনীন। সুতরাং প্রবাদের সৃষ্টি-বিবর্তনটি ঘটে এইভাবেই সাধারণত : "বহু ঘটনার-অভিজ্ঞতালব্ধ সারনির্যাস>প্রবাদ>অনুরূপ-বহু ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের চাবিকাঠি".....। প্রবাদের প্রত্যক্ষ-উৎসের কাহিনীটি কালক্রমে হারিয়ে যায় বা তাৎপর্যহীন হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ বিলুপ্ত গল্পগুলির 'অন্তর্লীন ভাব মর্মটুকু কোনও সময়েই নির্মূল হয় না; মৃদু একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উপযুক্ত পরিস্থিতির ব্যাখ্যানে তার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলত, একটা জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে এই প্রবাদগুলি অনুবীক্ষণের গুণসমৃদ্ধ। অবশ্য এরই সঙ্গে-সঙ্গে এদের বিশ্বজনীন চরিত্রটির কথাও ভুললে চলবে না। মানুষ যে মূলত এক এবং অবিচ্ছেদ্য ঐতিহ্যেরই অধিকারী— সর্বদেশে, সর্বকালে প্রবাদ সেটাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাঁর সারা জীবনের ক্ষেত্র-গবেষণালব্ধ তথ্যের বনিয়াদের ওপর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা জানি, সেই লুইস হেনরী মর্গান তাঁর 'এনসেন্ট সোসাইটি' বইতে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর সমস্ত সমাজই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের

কতকগুলি সুনির্দিষ্ট স্তরকে অনিবার্যভাবেই অতিক্রম করে-করে অগ্রসর হয়। তাই অনুরূপ অর্থনৈতিক স্তরে একই ধরণের সামাজিক অভিজ্ঞতারও সাক্ষাৎ মেলে : আর এইটিই হল প্রবাদের বহু-উৎসজতা বা পলিজেনেসিসের উৎস।

সমস্ত সমাজেই প্রবাদের বাহিরঙ্গিক কাঠামোটাও মোটামুটি অনুরূপ; এগুলি সচারচর খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ব্যঞ্জনাবহ হয় এবং অনেক সময়েই দুটি চরণের মধ্যে একটা ছড়াসুলভ দ্রুত ছন্দোঝংকারও এদের বিশিষ্ট একটি লক্ষণরূপে প্রতীত হয়। আপাতদর্শনে বহু সময়ে প্রবাদ শ্লথ-রুচির দ্যোতক হলেও, এর মধ্যে যে-সরসতা এবং বাক্-বৈদগ্ধ্য হামেশাই দেখা যায়, সেটার গুরুত্ব ঐ রুচি-শ্লথতার চেয়ে অনেক বেশি। ওটিকে বরঞ্চ গ্রামীণ-সারল্য হিশেবে গণ্য করতে পারি।

এক ধরণের প্রবাদ আছে যাদেরকে সাধারণত আমরা 'প্রবচন' বলে থাকি। যেমন: ডাকের বচন, খনার বচন ইত্যাদি ('ডাক' অর্থে জাদুসিদ্ধ পুরুষ ; 'ডাকিনী' স্মর্তব্য) অধিকাংশ সময়েই এগুলি মূলত কৃষি এবং শুভাশুভকেন্দ্রিক নানা ধরণের বিধান এবং আদিম-জাদুবিশ্বাস-ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্কারকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। দু-চারটে উদাহরণ প্রাসঙ্গিকভাবে দেখা যেতে পারে ঃ

ক. ''কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'—
বল্‌গে' চাষায় বাঁধতে আল,
আজ না হয়, তো হবেই কাল''

(বৃষ্টি ও কৃষি সম্পর্কে খনার বচন)

খ. ''দিনে রোদ রাতে জল
দিন দিন বাড়ে ধানের বল (ঐ)

গ. ''যদি বর্ষে আঘনে
রাজা বেরোয় মাগনে
যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'' (ঐ)

ঘ. ''শূন্য কল্‌সি শুক্‌না না'
শুক্‌না ডালে ডাকছে কা'
সে বাধাও পায়ে ঠেলি
যদি না-দেখি মাকুন্দ তেলি।'' (শুভাশুভ-সংস্কারকেন্দ্রিক, ঐ)

ঙ. ''ভরা থেকে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়
আগে থেকে পিছে ভাল যদি ডাকে মা'য়।'' (ঐ)

'ডাকের বচন' বলে যেগুলি প্রচলিত সেগুলিও এই ধরণেরই তবে তাদের মূল উপজীব্য হল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্য ও নীতিবোধ, সময়-অসময়-দিন-ক্ষণ-কেন্দ্রিত কিছু ধারণা। যেমন

চ. ''পরিহব দুই গ্রামে বাস

পরিহর দু'যুবতীর আশ।''

এই প্রবচনেরই প্রবাদ-পরিণতি হল ঃ 'দু-নৌকায় পা,' 'হর্নস ইন আ ডিলেমা'-জাতীয় কথা। ডাকের বচনের দিন-ক্ষণ-ভিত্তিক একটি উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব ঃ

ছ ''মঙ্গলে ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।''

এখানে একটি কথা বলতে হয় ; যথা-অর্থে যা প্রবাদ, তার ভিতর এ-ধরণের সংস্কার-ভিত্তিক বাক্‌বিন্যাস থাকার কথা নয়, কেননা প্রবাদের মধ্যে খুব স্বল্প-পরিসরে মৃদু অথবা তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করে মূলত উপমা ও তুলনার মাধ্যমেই বক্তব্যকে হাজির করা হয়— উপমানটিই শুধু সেখানে উপস্থিত হয় কথার মধ্যে, উপমেয় থাকে বাস্তবে গরহাজির। এ-কারণে প্রবাদ মাত্রেই রূপক ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের গুণসম্পন্ন। এই সশ্লেষ তির্যক্-তুলনাই হল প্রবাদের প্রাণ; এবং প্রবচনে সেটা বিশেষ সুপ্রাপ্য নয় প্রায়শই।

এই রকমের তুলনাত্মক বর্ণনার ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রবাদ যখন গড়ে ওঠে, তখনকার বাক্‌রীতির মধ্যে সর্বজনীনতা কতখানি থাকতে পারে, অতঃপর সেটি বিশ্লেষণ করে দেখান গেল :

১ ক. ফাঁপা ঢাকের বাদ্যি বেশি;
খ. সফরী ফরফরায়তে;
গ. এম্‌টি ভেসেল্ সাউন্ডস মাচ।

২ ক. উঠন্তি মূলো পত্তনে মালুম;
খ. মর্নিং শ্যোজ দ্য ডে।

৩ ক. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে;
খ অ্যাডিং সল্ট টু ইঞ্জুরি।

৪ ক. বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা;
খ. পাইথন্'স এমব্রেস।

৫ ক. ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে
ভূত বলে আমি পেলাম কাছে;
খ. ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ারী ওভেন।

৬ ক মারীচের দুরবস্থা;
খ. এগোলে নির্বংশের ছা, পেছোলে ভেড়ের ভেড়ে;
গ. কট্ বিট্যুইন স্কাইলা অ্যান্ড শ্যারিবডিস।

৭ ক. অঙ্গার শতধৌতেন মালিন্যং ন মুঞ্চতে;
খ. স্বভাব যায় না ম'লে;
গ. কয়লাকি ময়লা ছোড়ে
যব আগ করে পরবেশ।
ঘ আ লেপার্ড ক্যান'ট চেঞ্জ ইট্স স্পট্স।

৮ ক একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ;
খ. অ্যাডিং ফুয়েল টু ফায়ার।
৯ ক ন মণ তেলও পুড়বে না
আর রাধাও নাচবে না;
খ. দ্য স্কাই উইল নেভার ক্র্যাশ,
লার্কস উল নেভার ক্যাচ।
১০ ক. খাল কেটে কুমীর আনা,
খ টু কোর্ট ওয়ান'স ডেথ।
১১ ক নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল;
খ. হাফ আ লোফ্ ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড।
১২ ক. খিদের জ্বালায় বাঘে ধান খায়;
খ হাঙ্গার ইজ দ্যা বেস্ট সস্।

প্রতি গুচ্ছের প্রবাদগুলির মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্যগত প্রাকৃতিক ও অর্থ-পারিবেশিক (ইকোলজিক্যাল) শব্দ-উপকরণগুলি (যেমন ঃ ঢাক, সফরী, মুলো, বাঘ, পাইথন, ফ্রাইং প্যান, মারীচ, স্কাইলা, শ্যারিবড্‌স, লেপার্ড, মনসা, ধুনো, রাধা, লার্ক, কুমীর, মামা, লোফ, ধান, সস্ — ইত্যাদি) সর্বদাই অনুবাদ-সাপেক্ষ নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভাবগত ঐক্য এদের প্রতিটি গুচ্ছের অন্তর্গত (বিভিন্ন-সংস্কৃতির জাতক) এই প্রবাদগুলির মধ্যে রয়েছে, সেইখানেই এদের সর্বজনীনতা প্রত্যক্ষ। সমতুল্য তির্যক্ শ্লেষের বাহিরঙ্গিক প্রকাশগুলিও তো দেশ-জাতি ইত্যাদির প্রভেদ সত্ত্বেও অটুট। গঠনাঙ্গিক নিয়ে এই আলোচনার শেষাংশে বিচারকালে অন্তরঙ্গ-কাঠামোর ঐক্যটির স্বরূপও পরে আলোচ্য।

প্রবাদের অবলীন কাহিনীর উৎসগুলি যদি খুঁজে বার করা যায় তাহলে সামাজিক-ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অনুচ্ছেদকেই পুনর্গঠিত করা সম্ভব হবে। যেমন

ক) "কাঙালি মেরে কাছারি গরম" কিংবা

খ) "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" অথবা

গ) "বাউনের বাড়ে কাঁকর তোলা'ম"। এই তিনটি প্রবাদের অন্তরালে যে কাহিনীগুলি রয়েছে সেগুলি (যথাক্রমে) হল

ক) এক জমিদারের কাছারিতে সবাই ম্রিয়মান হয়ে বসে আছে, কেননা অজন্মার জন্যে খাজনা পত্তর পড়ছে না। নাচ-গান-মহ্‌ফিল-হৈ-হল্লা সব বন্ধ কাজে-কাজেই। অজন্মার জন্যে দেশে দুর্ভিক্ষও লেগেছে, সবাই 'হা অন্ন', 'যো-অন্ন' করছে। ঐ অন্নের অভাবেই চাষী মেহনতীরা দলে দলে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। এমনই এক চাষী জমিদার কাছারিতে এসে চারটি চাল চেয়েছে — ভেবেছে, জমিদার হল রাজা, সে কী আর দুঃখী প্রজাকে দুটি ভিক্ষে দেবে না? কাঙালিকে কাছারিতে ঢুকতে দেখে তো মোসাহেবের দল ফুর্তিতে হৈ হৈ করে উঠল, যারা সব আমোদ তা পয়সার অভাবে বন্ধ, তো এই কাঙালিকেই সবাই মিলে পিটিয়ে মজা করা যাক মারধোর খেয়ে যখন আধমরা হয়ে বেচারি মারা যাচ্ছে তখন সে গজর-গজর করতে করতে গেল এই বলে —

শালার ব্যাটা শালারা, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই ! হারামজাদার পো'রা কাঙালি মেরে কাছারি গরম কচ্চেন।''

খ) এক ধোপার ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ঠাকুর মশাইকে শুধোল : ''হ্যাঁ গা ঠাউর মাশায়, মাকড় (মাকড়সা) মাল্লে কী হয় গা?'' পুরুত ঠাকুর তো মওকা বুঝে বিধান ফাঁদলেন : ''সে কী রে ধোপার ছেলে হয়ে তুই মাকড় মাল্লি। তাও আবার এই চোত্তির মাসের বিরস্পতিবারের ভরদুপুরে। তোর প্রাচিত্তির করা লাগবে — এ-কদিন আমিষ লবণাহার বন্ধ রেখে সংক্রান্তির দিন ঠিক সূয্যি ওঠার সময় পাঁচ পণ কড়ি, পাঁচ কাহন আতপ তণ্ডুল, পাঁচ ছটাক ঘি, পাঁচ কিতে পান, পাঁচ গণ্ডা সুপুরি, পাঁচ ছড়া মর্তমান কলা, পাঁচ আনা পয়সা আর একখানা নতুন কোরা বস্তর নিয়ে আসবি নাইবার পর — আর আনবি শ্বেত-হলিদ্দা (হরিদ্রা) ফুল। আরে দেব ; দেব'খন তোর মাকড় মারার মহাপাপ খণ্ডন করিয়ে।'' ধোপার ছেলে বলে, ''আরে ঠাকুর তা'লে তোমার ন' ছেলেকে বল গো এসব আনতে। মাকড়টা তো মাল্ল সে-ই !'' ঠাকুরমশাই লম্বা একটা নিঃশ্বেস ফেলে বললেন ব্যাজার মুখে : ''আরে বাপুরে বাপু! বামুনের ছেলে মাকড় মাল্লে ধোকড় (অর্থাৎ,কিছুই না) হয় এটাও জানিসনে?'' 'ট্যাবু' প্রসঙ্গে গল্পটির আরেকটি পাঠ আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

গ) কথক ঠাকুর গাঁ-শুদ্দু মেয়েদের কাছে নরকের বিবরণ দিচ্ছিলেন। পরপুরুষের সঙ্গ করলে যে-পাপ হয়, তার শাস্তি কেমন, সেটি বোঝাতে গিয়ে কথক বল্লে যে, সেই সব অসতী স্ত্রীলোকদের যমদূতেরা কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে মাথার লম্বা চুল ধরে হেঁচড়ে কাঁকরের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, শুনে তো উপস্থিত সতী-অসতী সবাই খুব ভীত। কে জানে বাবা, পরপুরুষের দিকে লোভ করে তাকানোর শাস্তিই বা কী! ঐ ভিড়ের মধ্যে কথকের রক্ষিতা একটি স্ত্রীলোকও ছিল। রাত্তিরে ঠাকুর যখন তার দরজায় গিয়ে টুক্‌টুক্ করে টোকা মেরেছেন, মেয়েটা ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বল্লে, ''না বাপু ঢের হয়েছে, আর আমি উপপতির মধ্যে নেই ! উদোম গায়ে কাঁকরের উপর হেঁচ্‌ড়ানো আমি সইতে পারবুনি বাপ্‌!'' ঠাকুর তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে '' আরে বাপুরে, তোর ভয়টা কী? তুই হলি বাঁউনের রাঁড়! তোর বেলা তোর নাগরের — মানে এই আমার বম্মতেজে কাঁকর স-ব মোলা'ম্ হয়ে যাবে। তুই এখন দরজা খোল দিকিনি!''

স্পষ্টতই শ্রেণীভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শোষণটির স্বরূপ যে কী, তার তির্যক্ এবং তিক্ত প্রকাশ এই কাহিনীগুলির মধ্যে হয়েছে । প্রাসঙ্গিক প্রবাদগুলি হল সেই প্রকাশেরই সংহততর রূপ। এই দ্বন্দ্ব পরবর্তী সময়ে যখনই সমাজে-মানসে ভাসমান হয়েছে, তখনই তার অর্থটা বোঝাবার জন্যে এই সব প্রবাদও ব্যবহার করা হয়েছে । প্রবাদের অবলীন সমস্ত কাহিনীর সন্ধান যদি এইভাবে করা হয় তা হলে দেখা যাবে যে, এগুলি সামাজিক-বিবেকরক্ষী হিশেবেই আসলে আত্মপ্রকাশ করে।

আসলে প্রবাদের মধ্যে লোককথার চেয়ে শ্রেণীচেতনা থেকে সঞ্জাত বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনার উপলব্ধি আরও বেশি ঘনপিনদ্ধ ভাবে প্রতিভাত হয়। কারণ গল্পের সারাৎসারটুকু প্রবাদে পরিণতি পাবার সময় যে গাঢ়বদ্ধ ভাবটি অর্জন করে তার ফলেই,

প্রবাদ সর্বদাই প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট ভাষায় ঐ বৈষম্যজনিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। একথার উজ্জ্বলতম উদাহরণ : 'কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কই।' একের মেহনতের সুবাদে অন্যের আরামই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিধান, সামান্য একটি পংক্তির মধ্যে সেকথা তীব্র এবং স্পষ্টভাষায় যেন ধিক্কার দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন অনামা প্রবাদস্রষ্টা।

সর্বত্র হয়ত তীব্রতাটা এতখানি বেশি দেখা যায় না, কিন্তু তাতে উপলব্ধির গভীরতাটুকু যে কম, তা ভাববার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রবাদের মধ্যে যেখানেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ এসেছে, সেই পার্থক্যের জন্য দায়ী কারা এবং সেই দায়িত্বের কারণে কতখানি ঘৃণা বা ধিক্কার বা বিদ্রূপের যোগ্য সেটা স্পষ্টই প্রতীত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি এই রকম প্রসঙ্গ-সম্পৃক্ত প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে :

১. টাকার মুখ খোলা তো সত্যের মুখ বন্ধ (রাশিয়া)
২. টাকার সামনে রাজার মাথাও হেঁট (জার্মানী)
৩. টাকা হচ্ছে অদৃশ্য অত্যাচারী (গ্রীস)
৪. টাকার গলার জোর সবচেয়ে বেশী (ইজরাইল)
৫. টাকা হল মনুষ্য-শিকারী (পারস্য)
৬. টাকা থাকলে দেবতারাও তোমার বশ (চীন)
৭ টাকার সামনে সব পথই মসৃণ (আফগানিস্তান)
৮. ভিক্ষুকের জমিদারী তো সর্বত্রই (বেলজিয়াম)
৯. নতুন আইন হলে তার থেকে নতুন চোরও গজাবে (রুমানিয়া)
১০. গরীবের ধার-দেওয়া পিদিম ধনীর দান-করা মশালের চেয়েও বেশি আলো দেয় (জাপান)
১১. পয়সাওয়ালা কঞ্জুস গরীবের থেকেও গরীব (আরব)
১২. রাজার সুনজর, না, নেকড়ের আদর (মঙ্গোলিয়া)

বিদেশী প্রবাদের এই ডজনখানেক নমুনাই বোধ হয় যথেষ্ট হবে গণমানসের অন্তর্লীন শ্রেণীবৈষম্যের প্রতি বীতরাগের পরিমাণ বোঝানোর জন্যে। আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক বলয়ও এই বিশ্ববিধানের ব্যতিক্রম নয় তার প্রমাণ এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই প্রবাদগুলি :

১. রাজার দাম দু-সিকি আর দেমাক হাজার টাকার (ওড়িশা)
২. ধনীর জন্যে শুধু স্বর্গের দরজা বন্ধ (বিহার)
৩. গরীব খাবার চায়, পয়সাওয়ালা চায় খিদে (রাজস্থান)
৪. রূপোর জুতো লোহার পা-ও নরম করে (মহারাষ্ট্র)
৫. টাকা রাজাকেও কিনতে পারে (পাঞ্জাব)
৬. পয়সা ছোঁয়ালে মরা মানুষ জ্যান্ত হয় (কাশ্মীর)
৭. টাকার ডাকনাম খুনী (তামিলনাড়ু)
৮ ধনী, ধনীকে খাওয়ায়, গরীবও তাই (অন্ধ্র)

৯. টাকার টুংটাং হল মড়া জিয়োনোর শব্দ (কর্ণাটক)
১০. দরিদ্রের একমাত্র পাপ দারিদ্র্য (আসাম)
১১. রাজা, নারী এবং লতানে গাছ, কাছে গেলেই পেঁচিয়ে ধরে (হরিয়ানা)
১২. টাকার সামনে সব যুক্তিই ভোঁতা (উত্তরপ্রদেশ)

ঠিক এই একই পটভূমিতে বাংলা প্রবাদেরও একটি গুচ্ছ সংকলন করে এই বক্তব্যের সমাপ্তি করা যেতে পারে :

১. জোর যার মুলুক তার
২ পরের ধনেই পোদ্দার বড়লোক
৩. বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, রাজায় ছুঁলে বিশ
৪ বাঁদির মেজাজ চাঁদিতে চড়ে
৫. বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ
৬. রাণীর যদি উপপতি, তবু তিনি মহাসতী
৭. পৃথিবীটা কার বশ?
পৃথিবী টাকার বশ
৮ রাজার মা ডাইনী হলেও, বোলো না
৯ কাজী কল্লে বিচার, তার নেইকো চার
১০. রাজার শালাও প্রজার ঠাকুর
১১ কড়িতে বাঘের দুধও মেলে
১২. রাণীর গর্ভে কানির মাতন

॥ ৬ ॥

সমস্ত প্রবাদের পিছনেই এরকম প্রত্যক্ষ শ্রেণী-বৈষম্যের অভিজ্ঞতা থাকে, তা অবশ্য বলা চলে না। ফল কথা এই যে, সমাজসৌধের সমস্ত সীমানাই এই সব প্রবাদগুলির অন্তরীক্ষে ঢাকা রয়েছে। নারীর স্থান এই পুরুষ-শাসিত সমাজে যে কী-তারও সুষ্ঠু রূপ প্রবাদের মধ্যে কেমনভাবে সঞ্চিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে পাঁচমিশেলি ভাবেও কিছু নমুনা সাজালে অন্তত এই প্রসঙ্গটির স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে :

১. পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই
২. ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে
৩. বটের ছায়া, কূপের বারি, ইটের বাড়ি, শ্যামা নারী
৪. বৃন্দাবনে সবাই সতী, ধরা পড়েছে রাধা
৫. ঘোমটার ভেতর খ্যামটা
৬. কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে ঘর
৭. যেমন পাত্র ভজহরি, তেমনি কনে বিদ্যেধরী

স্বভাবতই, নারী সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-সূচক এই উক্তিগুলি একটা বিশেষ সমাজ-মানসের ছবিকেই পষ্ট করে। এই গুচ্ছের মধ্যে নারীর প্রতি অনুকূল মনোভাব শুধু একটির মধ্যে দেখি, (৩) অন্য সবগুলিই প্রতিকূল। তবে এদের মধ্যে (৪) এবং (৭) অবশ্য শুধু নারী নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

উল্লেখযোগ্য এই যে, সচরাচর মেয়েদের সম্পর্কে এই বিরূপতাসূচক প্রবাদগুলির স্রষ্টা মেয়েরাই! অন্তঃপুরের দ্বন্দ্বভিত্তিক কিছু প্রবাদের খোঁজ করলেই এ-কথার সমর্থন মিলবে :

১. গিন্নী মলে শিন্নি দেব আমি গিন্নী কবে হব

২. নাচ আর কোঁদ বউ, ভাত আমার হাতে

৩. একলা ঘরের গিন্নী এবার হলি না-কি মা?

(বেয়ানের মৃত্যুশয্যার পাশে মেয়ের মায়ের উক্তি)

নিশ্বেসকে বিশ্বেস নেই নড়ছে যেন পা!

(মেয়ের সন্দিগ্ধ জবাব)

৪. ভাল কথা মনে প'ল আঁচাতে-আঁচাতে

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে-নাচাতে।

(সকালে নদীতে নাইবার সময়ে ননদকে আচমকা কুমীরে নিয়ে গেছে, সেই কথা বউ এসে বাড়িতে বলছে দুপুরের খাওয়ার পর)

৫. আন্ (অন্য) সতীনে নাড়েচাড়ে

বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে

সংসারের এই খুঁটিনাটিগুলো যেমন প্রবাদের মাধ্যমে চিত্রিত হয়ে সমাজমনের একটা দিককে প্রতিফলিত করে, ঠিক তেমনই মানুষের-গাছপালার এবং পশু-পাখি-সরীসৃপের নানা বৈশিষ্ট্য প্রবাদের মধ্যে এসে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে ভাবপ্রকাশের একটি অনন্য উপকরণ হয়ে ওঠে, যা অন্য কোনো ভাবেই সম্ভব নয়:

১. সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে

২. মাছের মায়ের পুত্রশোক

৩. ললিত লবঙ্গলতা

৪ দা ক্যাট্ হ্যাজ নাইন লাইভস

৫ লজ্জাবতী লতা

৬ জলবিছুটির জ্বালা

৭ মহিষের গোঁ

৮ শম্বুকগতি

৯ ঘোড়ায় কামড়

১০ কানা কন্যের নানা রোগ

চক্ষু ঢালা পায়ে গোদ।

১১. ওরে ক্যাংলা ভাত খাবি 'সে—
না, হাত ধোব গো কোথা?

১২ আহ্লাদী যায় মরতে তিনফুল যায় ধরতে,
ও আহ্লাদী মরিস নি লোক হাসানো করিস নি

এই ধরণের ব্যঞ্জনাবহন পুরাণবৃত্তকেন্দ্রিক প্রবাদগুলির মাধ্যমেও ঘটে থাকে। কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে যে-সব মানুষকে নিয়ে, তাঁদের উল্লেখ করেও অনুরূপ গুণসম্পন্ন প্রবাদ তৈরী হয়ে থাকে :

১. ধনুর্ভঙ্গ পণ
২. কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ
৩. রামভক্ত হনুমান
৪. দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ
৫. অশ্বত্থামা হত ইতি গজ
৬. ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির
৭. দাতাকর্ণ
৮. লক্ষ্মণ দেবর
৯. হারকিউলিয়ান টাস্ক
১০. নারদের আবির্ভাব

এগুলো হল পুরাণ-উৎসজ; অবশ্য সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরণেরই ব্যঞ্জনা আনে ঐ কিংবদন্তী উৎসজ প্রবাদেরবা :

১. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন
২. হরিহরছত্রের মেলা

আলোচ্য গুচ্ছগুলির অনেক ক-টির মধ্যেই প্রবাদের পুরো আয়তনটা নেই। এগুলিকে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা প্রবাদানু (প্রোভার্ব মলিক্যুল) নাম দিয়েছেন। এগুলির তাৎপর্য অবশ্য নির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্গত মানুষদের কাছেই স্পষ্ট। এগুলির ঠিক অনুরূপ কিছু অন্য সাংস্কৃতিক বলয়ে পাওয়া শক্ত।

॥ ৭ ॥

প্রবাদের বয়স কত? মর্গ্যান কথিত 'বন্য' স্তর অতিক্রম করার মুখে এসে পৌঁছনোর সমকালেই প্রবাদের হদিশ পাওয়া যায়, এটা সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন। আদিম জীবনচর্যার বহুলাংশই নিয়ন্ত্রিত হতো, পিতৃপুরুষের প্রজ্ঞার উত্তরসরণ করে, তাই প্রবাদের সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে থাকবেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। লিখিত সাহিত্যে প্রবাদের খোঁজ মিলছে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিতেই। মিশরের 'মৃতের পুঁথি' (± খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে তিন সহস্রাব্দ) ভারতের 'ঋক্' ও 'অথর্ব' সংহিতা (± খ্রিস্টপূর্ব দেড় সহস্রাব্দ) থেকে শুরু করে গ্রীসের ইলিয়াড ও অডিসী, ভারতের রামায়ণ মহাভারত ধম্মপদ জাতক পঞ্চতন্ত্র, চীনের শী-কিং প্রভৃতি পৃথিবীর অতি প্রাচীন সব বইগুলির

মধ্যেই প্রবাদের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এমনকী পৃথিবীর প্রাচীনতম বই মেসোপটেমিয়ার 'গিলগামেশ' মহাকাব্যের (± খ্রিস্টপূর্ব চার সহস্রাব্দ) মধ্যেও প্রবাদানুর সন্ধান পেয়েছেন পণ্ডিতেরা।

প্রবাদের এই প্রাচীনত্ব এবং সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তার অবিচ্ছিন্ন বিবর্তন কেমনভাবে ঘটে আসছে তার খুব সুন্দর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান করেছেন বন্ধুবর ড: দুলাল চৌধুরী তাঁর 'চাকমা প্রবাদ' (১৯৮০) বইতে :

"কতগুলি বিচ্ছিন্ন জীবন ও সমাজরেণু নিরন্তর ঘুরতে ঘুরতে এক একটি সুস্থিত সমাজে স্বচ্ছ দানা বেঁধে একটি প্রবাদ সৃষ্টি করে। দার্শনিক সত্য ও জীবনের তথ্য এই প্রবাদের অনন্ত বাণীরূপ লাভ করে সর্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হয়। পরে এই অনিন্দ্য সাহিত্যের ভাষা চিরায়ত সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং এর পরিবর্তন সহসা হয় না।" (পৃঃ ১৬)

এই অনবচ্ছিন্ন ধারাটি সামাজিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে নানারূপে সংস্কৃতিব বিচিত্র ধারাগুলির মাধ্যমে বহমান থাকে। প্রবাদ যেহেতু এই রকমই একটি মাধ্যম, তাই এর মধ্যে সেই সামাজিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয় (বলতে পারি থিসিস X অ্যান্টিথিসিস > সিন্‌থিসিস্) অধিকাংশ সময়েই অন্তর্লীন থাকে। প্রবাদের উৎসে যে সম্ভাব্য গল্পগুলি থাকতে পারে, সে আলোচনার প্রসঙ্গে ওপবে এই উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন ধরণের সামাজিক দ্বন্দ্ব (প্রায়ই যা শ্রেণীকেন্দ্রিক) কেমন করে প্রবাদে উদ্ভাসিত হয়, তার আরও কয়েকটি উদাহরণ তুলে তাদের প্রেক্ষিতে প্রবাদের আঙ্গিকগত কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা সঙ্গত :

১ কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কই
২ উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে
৩. গাঙ্ পেরোলে কুমীর শালা
৪. দই খেলেন রমাকান্ত, বিকারেব বেলা গোবর্ধন
৫. আব্‌ডালেতে কান পাতলে
রাজার মাকেও ডাইন্ বলে
৬ যার ধর তার ধন নয় নেপোয় মাবে দই

এত প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার উৎসজাত দ্বন্দ্বটি প্রবাদে সর্বদা প্রতিফলিত হয় না; তবে এই দ্বন্দ্ব কোনও না কোনও ভাবে যে অন্তঃসলিলা হয়ে থাকেই তার মধ্যে, সেটা নিঃসংশয়িত সত্য। সেই জ্বালাটাই ফুটে ওঠে প্রবাদের অন্তর্লীন তিক্ত শ্লেষের অভিব্যক্তিতে।

॥ ৮ ॥

প্রবাদ নিয়ে একালের গবেষণায় যে-সব পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি (হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিস্টিক) এবং আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি (স্ট্রাকচারালিস্টিক)। প্রবাদের মধ্যে লোকজীবনের চলমান

ইতিহাসকে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে পেতে হলে এই দুই পদ্ধতির যৌথ প্রয়োগ করতে পারাই বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের তত্ত্বগত দিকটি প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে এবং প্রবাদের রূপগত দিকটির বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণীত করা যাবে এর ফলে। ভাব এবং রূপ এই দুইয়ের মধ্যে একটা সাযুজ্য স্থাপন করতে পারলে যে-কোনও প্রবাদেরই সামগ্রিক-বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। সমাজ-কাঠামোর শ্রেণীদ্বন্দ্বটা আঙ্গিকবাদের মুখ্য প্রবক্তা ক্লোদ্ লেভি-স্ত্রোসের নির্দেশিত বাইনারী অপোজিট' ('আছে' X 'নেই' — এই রকমের বৈপরীত্য) তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হলে প্রাসঙ্গিক নমুনাস্বরূপ এখানে চারটি প্রবাদ নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পাবে .

১. শক্তের ভক্ত, নরমের যম
২. একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ
৩. সাপ হয়ে কাটো তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো
৪. সেলফ্ হেল্‌প ইজ দ্য বেস্ট হেল্‌প

১. ক 'শক্ত'— প্রথম আর্থ-সামাজিক একক
খ 'নরম'— দ্বিতীয় ,, ,,
গ অনুল্লেখিত— তৃতীয় ,, ,,

এই 'অনুল্লেখিত' এককটিরই আপেক্ষিক সক্রিয়মূলতা (f) প্রবাদটিকে নিয়ন্ত্রণ কবছে .

ক α গ = f 'ভক্ত' এবং খ α গ = f 'যম'

'ক' ← 'ভক্ত' -- 'গ' — 'যম' → 'খ'

সমাজিক মধ্যস্তর-(গ)-বর্তী মানুষদের দোরোখা শ্রেণীচরিত্রটি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়ে বিবৃত হয়ে পড়েছে এই আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

২. ক 'মনসা' ভয়ের উৎস

খ 'ধুনোর গন্ধ' = 'ক'-কে তোয়াজ করা / উস্‌কে দেওয়া > আরও উগ্রতা / উৎপীড়ন

'ক' f 'খ' = উগ্রতা পীড়নের পরিবর্ধন। সামাজিক প্রেক্ষিতে পীড়ক / অত্যাচারীকে উসকে দিলে তোয়াজ করলে যে পীড়ন / দমন বাড়েই, সেই সত্য এই প্রবাদের গঠনের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠ।

৩. ক. সাপ হয়ে কাটো তুমি = উদ্দেশ্য (উ.)
খ. ওঝা হয়ে ঝাড়ো = বিধেয় (বি.)

'সাপ' = উ ১; 'তুমি = উ. ২; 'ওঝা' = বি. ১; 'কাটো = f উ. ১.১;
'ঝাড়ো' = f বি. ২.
'কাটো' = '+' (মন্দ) = f উ.
'ঝাড়ো' = '+' (ভাল) = f বি.
এখন, f বি. > f উ.
আবার, উ. ১ + উ. ২ < বি. ১

$\therefore$ (-) + (-) < (+)

$\therefore$ বি. > উ.

সামাজিক ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে পরিণামে 'ভাল'-র যেমন 'মন্দ'-র ওপব জয়যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছিত, তেমনই ভাবটিই এর গঠনাঙ্গিকের মধ্যেও বিধৃত হয়েছে বলে এটি নিখুঁত প্রবাদ। .

৪. ক 'সেল্‌ফ হেল্‌প' : এর অর্থ, আরও কেউ আছে 'হেলপ' করতে; স্পষ্টতই অবসরভোগী ওপর মানুষের কথা বঞ্চিত এর মধ্যে;

খ 'বেস্ট হেলপ . অবসবভোগী মানুষ অন্যের 'হেলপ'-এর ওপর জীবন নির্বাহ করে তাই সেটা মন্দ,

ক : খ :: ১/অবসরভোগী : শ্রমজীবী (বিপরীত অনুপাতের নিয়মানুযায়ী)

এর চেয়ে বাঞ্ছিত সামাজিক অবস্থা আর কী খুব আছে? এই সমাজমনও তো বিশ্বজনীন; প্রবাদগুলি তার আয়না মাত্র।

চ. ধাঁধা-হেঁয়ালির অন্তরালে

প্রখ্যাত পণ্ডিত মরিস ব্লুমফীল্ড একটি বক্তৃতায় প্রায় আশি বছর আগে ধাঁধা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছিলেন : ''সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদিম মানুষের মন পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে যে চেষ্টা করে এসেছে, তারই পরিণতি হিশেবে ধাঁধার সৃষ্টি।'' (আন্তর্জাতিক কলা ও বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, সেন্ট লুইস, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯০৪) এই অভিমতের অন্তর্গত মূল সত্যটি আজও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার করেন।

স্বভাবতই এখানে প্রারম্ভিকভাবেই একটি প্রশ্ন ওঠে : ধাঁধা বলতে সত্যি-সত্যিই কী বোঝায়? ধাঁধা আসলে হল এক ধরণের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার; এদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি। এ-দুয়ের মাধ্যমেই একটি জাতিকোমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহুবিচিত্র সব অভিব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাঁধা-তথা-হেঁয়ালির মধ্যে একটা সাদাসিধে ভঙ্গী থাকে এবং অপ্রত্যাশিত কিংবা অকল্পিত কিছু তুলনা-উপমা রূপকাশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় এর ভিতর। সাদৃশ্য এবং আপাত-বৈপরীত্য—এ দুইই ধাঁধার গঠনের অন্তর্লীন সক্রিয়মূল শক্তিরূপে থাকে; হয় এটি, নয় অন্যটি। সাদৃশ্যমূলক উপকরণের কয়েকটি ধাঁধার সঙ্গে আপাত-বৈপরীত্যমূলক আরও কয়েকটি হেঁয়ালির সমান্তরাল নমুনা দেখলে কথাটা সম্ভবত স্বচ্ছ হবে :

ক) সাদৃশ্যমূলক—

১ এক থালা সুপারি
গুণতে নাহি পারি (আকাশভরা নক্ষত্র)

২. এতটুকু ঘরে
চুনকাম করে (ডিম)

৩. আল্লার কি কুদরৎ
ঠ্যাঙার মধ্যে সরবৎ (আখ)

খ) আপাত-বৈপরীত্যমূলক —

১ জানলা দিয়ে ঘর পালাল
গেরস্ত রইল বাঁধা (জালে পড়া মাছ)

২. দিই ত দিই পরপুরুষকে দিই
দিই ত দিই পথে ঘাটে দিই
দিই ত দিই যখন-তখন দিই
তোমার আমি আমার তুমি
তোমায় দেব কী? (ঘোমটা)

৩ কাটো যদি বড় হবে
না কাটিলে ছোট রবে (পুকুর)

সমস্ত কটি উদাহরণ থেকেই একটি জিনিষ কিন্তু পরিষ্কার হয়ে ওঠে : সমস্ত ধাঁধারই মূল উপকরণ প্রতিদিনের পারিপার্শ্বিক এবং জীবনচর্যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই ধাঁধার মধ্যে লোককথা কিংবা প্রবাদের মতন সর্বজনীনতা নেই, যদিও ও-দুয়ের মতোই সেও মানুষের সভ্যতার উষালগ্নেরই জাতক। একটি বিশেষ গোষ্ঠী যে-বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে জীবনচর্যা নির্বাহ করে, সেই পটভূমি এবং জীবনরীতিই ধাঁধার উপমা, তুলনা, বৈপরীত্য, রূপক-ইত্যাদিকে বিন্যস্ত করে।

আদিকাল থেকেই ধাঁধা বা হেঁয়ালির মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রকাশ করার এই-যে রীতি, এটি আজকের তথাকথিত উন্নত জগতে প্রচলিত নেই। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন : মন যত পরিশীলিত এবং সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে শেখে, ততই এই প্রহেলিকা ধরণের বাক্‌শিল্পের আবেদন কমে যায় তার কাছে। শিশুর মন বয়স্ক মানুষের মতন পরিশীলিত হয়নি বলে, এই জাতীয় জিনিষ তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। শিশুর মনের সঙ্গে আদিম মানুষের মানসিকতার একটা ভাবগত সাদৃশ্য আছেই। অর্থনৈতিক বিকাশ সমাজে যতই ঘটেছে, ততই সমাজ-জীবনে অনেক বেশি জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে; কাজে-কাজেই ধাঁধা-হেঁয়ালির সীমাবদ্ধ-ঐতিহ্যবাহী জটিলতার প্রভাব সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নির্মঞ্ছিত হয়ে যায়।

উন্নততর অর্থনীতি-সম্পন্ন সমাজে ধাঁধার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘুচে গেলেও, যেসব জাতি-অধিজাতিরা এখনও তাঁদের চিরাচরিত, ঐতিহ্যাশ্রিত ধ্যান-ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়াটুকুকে মোটামুটিভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে — যেমন বিয়ের সময়ে, সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরে, মৃতদেহ সৎকারের আগে— ধাঁধা বলার একটা রেওয়াজ চালু আছে। একদা এসব ক্ষেত্রে ধাঁধা জাদুশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রের সমগোত্রীয় বল গণ্য হতো; এখন অনেক ক্ষেত্রেই এটা অবশ্য পালনীয়-রেওয়াজ বলে গণ্য হয়।

এই সব ক্ষেত্রে ধাঁধার পিছনে একটা ধর্মীয় উপলক্ষ আছে যে, তা বলাই বাহুল্য। ধাঁধার মাধ্যমে যে-রহস্যের জাল সৃষ্টি হয়, তাকে অতিক্রম করে কোনও অশুভ ও অপ্রাকৃত শক্তি নববিবাহিত বর-বধূর কিংবা সদ্যোজাত শিশুর ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা মৃতের আত্মা ঐ ধাঁধার জাল কাটিয়ে বেরিয়ে এসে অন্যদেরকে গ্রস্ত করতে পারবে না — এই ছিল আদিম বিশ্বাস।

বিবাহ-উপলক্ষে ধাঁধার ব্যবহারের আরেকটি কারণও সামজতাত্ত্বিকরা এবং লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেন। যখন আদিম প্রপিতামহেরা দ্বীপকল্প ছোট-ছোট গোষ্ঠীজীবন যাপন করতেন তখন 'রাক্ষস-বিবাহই' (জোর করে ছিনিয়ে এনে সঙ্গিনী করা) ছিল কালের রীতি, ওবফে অর্ডার অব দ্য ডে। তখনকার পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষের মধ্যে ঐ নারীহরণ ঘটিত লড়াই-পেটাইটাই সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে কালক্রমে বুদ্ধির লড়াই হিশেবে ধাঁধা শুধোনোর উত্তোর চাপানে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশী মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল-প্রমুখ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আজও কনের বাড়ীতে বর এসে পৌছুলে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রপক্ষকে ধাঁধা শুধোনো হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে

তাদেরকে উত্তরও দিতে হয়। বহু বাঙালী পরিবারেই বাসরঘরে জামাই-ঠকানো হেঁয়ালি জিজ্ঞেস করার রেওয়াজ এই সেদিনও ছিল।

লোকাচারের গণ্ডী অতিক্রম করে এসব ক্ষেত্রে ধাঁধা অনেকসময়েই আনন্দ-বা-বিনোদনের একটা উপলক্ষ হয়ে ওঠে। এগুলি এক-ধরণের গোষ্ঠী বিনোদন বা ম্যাস এনটারটেইনমেন্ট হিশেবেই গণ্য হয়। এই সব বিবাহ-সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের ধাঁধাগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্নই করা হয় যার মধ্যে ধর্মগত কোনও গূঢ় তত্ত্ব বা প্রথারক্ষাগত কোনও ঐতিহ্যবহন নেই, নিছকই আনন্দ পাওয়া এবং দেওয়ার জন্যই এদের ব্যবহার।

॥ ৩ ॥

ধাঁধা গড়ে ওঠার পিছনে যে সমাজ-মানসিকতা ক্রমবিবর্তিত হয়েছে তাদেব উৎসে ছিল এই কটি ভাবনা :

ক) গোষ্ঠীর নিজস্ব কতকগুলি অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞানকে সংকেতের মধ্যে ধরে রাখা, যাতে সেগুলো শুধুমাত্র তাদেরই একান্তভাবে নিজস্ব হয়ে থাকে, অন্য কোনো গোষ্ঠী বা কোমের হাতে যেন সেগুলি না পড়ে।

খ) মনে করা হতো, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত 'অলৌকিক' শক্তিগুলিকে ধাঁধার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে; এর উদাহরণ ওপরে দিয়েছি।

গ) ধাঁধা বহু সময়েই বুদ্ধ্যঙ্ক (আই. কিউ.) নির্ণয়ের মাপকাঠিরূপে ধার্য হয়ে, তার মাধ্যমে গোষ্ঠীসমাজে বিশেষ-বিশেষ পদ বা অধিকার অর্জন করবার যোগ্যতা নির্ণীত হতো।

ঘ) ধাঁধার মাধ্যমে মানুষ বুদ্ধির খেলা খেলে সামাজিকভাবে এক ধরণের আনন্দ লাভ করত।

ঙ) ধাঁধায় মানুষ সর্বপ্রথম সেই-সব প্রতীককে সাহিত্যগতভাবে ব্যঞ্জিত করতে শিখেছিল, যে-প্রতীকব্যঞ্জনা তার ধর্মাচার এবং অন্যবিধ মানসিকতার উদ্বর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই গড়ে উঠেছে।

মূলত এই পাঁচটি প্রবণতাকে উৎসে রেখে ধাঁধার ক্রমপরম্পরিত উদ্বর্তন ঘটেছে মানুষের সমাজে। প্রাচীন সাহিত্যের বহু জায়গাতেই এই সব ধাঁধা ও হেঁয়ালির প্রসঙ্গ দেখা যায়। প্রাচীন সুমেরীয় পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ বিভিন্ন পাঠমালার মধ্যে হেঁয়ালির সন্ধান পেয়েছেন ক্যুনিফর্ম-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা। সম্ভবত লিখিত ধাঁধার এই হল প্রাচীনতম নিদর্শন : ± ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মিশরীয় 'বুক অব ডেড' (± ৩০০০ খ্রিঃ পূঃ) 'ঋক্‌সংহিতা' (±১৫০০ খ্রিঃ পূঃ) 'ওল্ড টেস্টামেন্ট (±১০০০ খ্রিঃ পূঃ) ধ্রুবপদী গ্রীক পুরাণবৃত্ত (ঐ), মহাভারত (±৪০০ খ্রিঃ), বৌদ্ধজাতককাহিনীমালা (ঐ) প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থসমূহে ধাঁধার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এই-সমস্ত গ্রন্থ সমুন্নত সংস্কৃতিবলয়ের সন্ততি হলেও এদের মধ্যে ধাঁধার গুরুত্ব স্বীকৃত। এর কারণ এই যে, এই সমস্ত পরিশীলিত সাহিত্যনিদর্শগুলি লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা থেকে বাহিত হয়ে এসেছে বলেই, এদের মধ্যে ধ্রুবপদী সংস্কৃতির ছাপ সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠা

সত্ত্বেও মূল উপাদানগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; অতএব ধাঁধাও থেকে গেছে স্বস্থানে।

একটি উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। গ্রীক পুরাণবৃত্তে আছে যে, রাজা অয়দিপাউস ভয়ঙ্করী স্ফীংক্স (অর্ধনারী-অর্ধসিংহিনী) রাক্ষসীর সম্মুখীন হলে সে তাঁকে একটি হেঁয়ালি শুধোয়, যার উত্তর না দিতে পারলে মৃত্যুবরণ অনিবার্য। সেই হেঁয়ালিটি ছিল :

'কে ভোরে চতুষ্পদ, মধ্যাহ্নে দ্বিপদ ও অপরাহ্নে ত্রিপদ?' অয়দিপাউস এই ধাঁধার উত্তর দিয়েছিলেন : 'মানুষ'। ঠিক উত্তরটি শুনে স্ফীংক্স রাগে ফেটে মরে গিয়েছিল। এই ক্ল্যাসিকাল ধাঁধার হুবহু প্রতিরূপ বাংলার অজ-পাড়াগাঁয়ের অনক্ষর কৃষকবধূর মুখেও শোনা যায় কিন্তু! —

"সকাল বেলায় চার পায়ে হাঁটে
দুপুর বেলা দু'পায়ে হাঁটে
বিকেল বেলায় তিন পায়ে হেঁটে
দেশে ফেরে লোকটা"

—স্পষ্টতই হামাগুড়ি দেওয়া শিশুকাল, সটান পদক্ষেপ-ফেলা যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এবং যষ্ঠি-নির্ভর ভ্রমণের বৃদ্ধবয়স — এই তিনের রূপক সংবলিত ধাঁধাটি প্রাথমিকভাবেই লোকসংস্কৃতির উৎসজাত : পরিশীলিত সংস্কৃতিসঞ্জাত সাহিত্যেও সেই রূপক-ধর্ম অক্ষুণ্ন। এই লৌকিক ধাঁধারই ভিন্‌প্রদেশী চেহারায় দেখি, যার মাধ্যমে এর সর্বজনীনতার কথাটাও বোঝা যাবে :

"মোদত নালুগউ কাললু
মধ্যিওলো রেনডড়ু কাললু
আখিরইকি মোড়উ কাললু।"

— এই তেলেগু ধাঁধা আর ঐ গ্রীক এবং বাংলা ধাঁধা অর্থে অভিন্ন। এই উদাহরণটির মাধ্যমে ধাঁধার মৌল লক্ষণটিও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত পরিচিত-কিছুকেই আর-কিছু অতিপরিচিত বস্তুর / বিষয়ের / ব্যক্তির সঙ্গে অভেদরূপে রূপকের মাধ্যমে কল্পনা করলেই তাদের অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়ে এই সব ধাঁধা তৈরি হয়। বাইবেলের ধাঁধার একটি নমুনা বিশ্লেষণ করলে এই সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে সূক্ষ্ম রসের উপলব্ধিও যে কেমন করে ঘটে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

"মধুর চেয়েও মিষ্টি কী? সিংহের চেয়েও জোরালো কী?" — উত্তর, "প্রেম" ('বুক অব জাজেস ১৪শ খণ্ড)

বাইবেলের 'প্রাচীন পুঁথির' 'বুক অব কিংস' গ্রন্থে রাজা সলোমন এবং শেবা রাজ্যের রাণীর (আরবীয় সাহিত্যে যাঁর নাম বিলকিস) মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ধাঁধার লড়াইয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। স্যার জেমস ফ্রেজারের 'ফোকলোর ইন ওল্ড টেস্টামেন্ট' (১৯৩০) গ্রন্থটিতে লড়াইয়ের বিবরণ মিলবে।

ঋক্‌বৈদিক হেঁয়ালির দুয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করতে পারি। ধাঁধাকেন্দ্রিক গল্প সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বহু সমাজেই গড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ঋগ্বেদের অন্তর্গত

হেঁয়ালি-মণ্ডলের মধ্যেও অনেক সময়েই গল্প-সুলভ বিস্তৃত বিববণ আছে; অবার গল্পহীন, মণ্ডলের মধ্যেও বহুবিস্তৃত জিজ্ঞাসা বিন্যস্ত হয়েছে। ধাঁধাব উত্তরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত, প্রায় সর্বদাই প্রকাশিত, ঋক্‌বৈদিক ধাঁধায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ৮ম মণ্ডলের ২৯তম সূক্তটি এই ব্যতিক্রমেব চমৎকার উদাহবণ দশটি ঋকের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিচিত্র সংকেতের মাধ্যমে সোম, অগ্নি, ত্বষ্টা, ইন্দ্র, রুদ্র, পূষন্, বিষ্ণু, অশ্বিযুগল এবং মিত্রাবরুণের উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে। ৫২টি ঋক্-সংবলিত ১ম মণ্ডলের ১৬৪-তম সূক্তটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; রূপক এবং সংকেতের সাহায্য নিয়ে এর মধ্যে সূর্যের অয়ন, ঋতুচক্রের আবর্তন, সপ্তাহ, মাস এবং বর্ষের ক্রমান্বয়ী গতি ইত্যাদি বিষয়ও হেঁয়ালির আড়ালে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঋক্‌বেদের অন্যত্রও, এবং অথর্ববেদেরও বহু জায়গায় ধাঁধার হদিশ মেলে।

এ রকম হদিশ মেলে মহাভারতেও। বকরূপী ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের হেঁয়ালি ও তার সমাধান-কেন্দ্রিক সংলাপ স্মরণে আসবে অবশ্যই। 'মহা-উম্মগ্‌গ' এবং অন্যান্য বৌদ্ধ জাতকেও ধাঁধার ব্যবহার সুপ্রচুর। এই পর্বের ধাঁধাব মধ্যে নীতিশিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাপারটিই বড় হয়ে উঠতে দেখি, প্রাচীনতর ধাঁধার ধর্মবিশ্বাস-কেন্দ্রিকতার বদলে।

ধ্রুবপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে — 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-প্রভৃতি বইয়ের মধ্যেও ধাঁধার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত সাহিত্যিক ধাঁধার ভিত্তিমূলে রয়েছে লৌকিক ধাঁধা — যা কি-না আদিমকাল থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে — একথা বলাই বাহুল্য। লৌকিক থেকে ধ্রুবপদী স্তরে উন্নীত হবার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ধাঁধার কী ধরণের রূপ হতে পারে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলির মধ্যে তা দেখতে পাই। হাজার খানেক বছর আগের একটি চর্যায় দেখা যায় :

"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তিন্তিড়ী কুম্ভীর খাই।"

(কাছিম দুয়ে দুধের কেঁড়ে উপচে গেল; কুমীর খেল গাছের তেঁতুল) ... আর একটি চর্যায় আছে

"বাদল বিয়াঅল গবিয়া বাঁজে"

(প্রসব করল বদল, গাভী সন্তান ধারণে অক্ষম)। ... স্পষ্টই এই হেঁয়ালিগুলি জটিল ধর্মসাধনার কোনও এক ধরণের উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও মূলত লোকজীবনের থেকেই এ গুলির প্রাণরস আহৃত হয়েছে যে, তা এদের উপজীব্য বস্তু প্রাণী ও পরিবেশ দেখেই বোঝা যায়।

এই ধরণের ধাঁধাই ধর্মসম্পৃক্ত ভাবটিকে বর্জন করে প্রচলিত উদ্ভট শ্লোক, কালিদাসের হেঁয়ালি ইত্যাদি জাতীয় লোকপ্রসিদ্ধি হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ 'নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কেমনে খেতে, কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে!' (ল্যাজকাটা গরুর পিঠের ঘায়ে মাছি ভনভন্ করছে; তাদের উদ্দেশ করে বলা) কিংবা 'আগে মুড়ি পিছে

খই অবশেষে সাপ— কবি কালিদাস কয় এ কী হল বাপ!' (সজনে) এই সব হেঁয়ালির সঙ্গে কালিদাসের নাম যোগ করা হয়েছে নেহাৎই এদের ওপর 'আভিজাত্য' আরোপ করার জন্য। এটা, সমাজের ওপরতলায় ধাঁধাকে জলচল করার একটা প্রয়াস ছাড়া আর কিছু না; মূলে এগুলি লৌকিক উৎস থেকেই জাত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

কেমন করে এবং কেন, ধাঁধা আদিমকাল থেকে শুরু করে এ-অবধি লৌকিক জীবনের পরিমণ্ডলেই উৎসারিত হয়ে উঠেছে? এর উত্তর কিন্তু ঐ ধাঁধা হেঁয়ালির সমাধানের মতন এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের গোষ্ঠীজীবনের যৌথ-অবচেতনা বা মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম সামূহিক নির্জ্ঞান (সি. জি. য়ুঙের কথিত কলেকটিভ আনকনশাস) পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশকে অবলম্বন করে যেভাবে তৈরি হয়ে ওঠে , তার ওপর ভিত্তি করেই গোষ্ঠীর কোনও-কোনও কল্পনাপ্রবণ-ও-সৃজনশীল মনসম্পন্ন সদস্য এগুলি তৈরি করেছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য প্রতীক রূপক উপমা তুলনার মশলা মিশেল দিয়ে।

আদিমমানুষ বিশ্বপ্রকৃতির বহু কিছুই কার্যকারণ অনুধাবন না-করতে পেরে যে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ত তাদের বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য তারা সেই সব কিছুরই ব্যাখ্যা চাইত অবচেতন-সচেতন উভয়বিধভাবেই; ধাঁধার উদ্ভবের প্রাথমিক পরিবেশ সেইটিই। তারপর ধীরে-ধীরে কালের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নানাভাবে ঐসব রহস্যের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যার কল্পনা থেকে জন্ম নিত মিথ বা লোকপুরাণ; অন্যদিকে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি সংহত হতে-হতে প্রবাদ ইত্যাদিতে পরিণতি পেতে লাগল। প্রতীক এবং সাদৃশ্য বৈপরীত্যের বোধ গড়ে উঠে ধাঁধা এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সেইটিই মুখ্য উপকরণ রূপে গণ্য হতে থাকল।

এই কথাগুলি বিস্তৃততরভাবে বলা দরকার। লোকপুরাণ, প্রবাদ এবং ধাঁধা — এই তিন ধরণের মৌখিক ঐতিহ্য আর চিত্রশিল্প, নৃত্যকলা এবং সঙ্গীত — এই তিন প্রকরণের ব্যবহারিক শিল্পচর্চা প্রায় সমসাময়িকই। এদের মধ্যে ধাঁধার চরিত্রটা কিছু বিচিত্র ধরণের ঃ একদিকে তা মৌখিক শিল্প, আবার অন্যদিকে ব্যবহারিক শিল্পগুলির মধ্যে যেটি সাধারণ ধর্ম, অনুকৃতি, তাও এর মধ্যে সুপ্রবল। অনুকৃতির প্রসঙ্গে সর্বদাই দুটি একক (বা ইউনিট) প্রয়োজন, যাকে অনুকরণ করা হচ্ছে এবং যে অনুকরণ করছে। অনুকরণ যে সর্বদাই সাদৃশ্য-কেন্দ্রিত, একথা বলাই বাহুল্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু-পাখির ডাক, নৃত্যের ক্ষেত্রে তাদেরই চলাফেরা ইত্যাদি এবং চারুশিল্পের ক্ষেত্রে আকৃতিগত নানান্ সৌসাদৃশ্যবিচার — ইত্যাদি এখানে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এই সাদৃশ্যের বোধের সঙ্গে-সঙ্গেই আসে বৈসাদৃশ্যের বোধটিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়। ধাঁধার মধ্যে এই মিল-গরমিলের রূপক ব্যাখ্যানটিই যে মূল উপকরণ তা তো আমরা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে দেখেইছি।

ধাঁধার সঙ্গে ধর্মধারা সম্পৃক্ত হয়ে যাবার ব্যাপারও ঐ প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধানের প্রয়াস থেকেই উৎসারিত। এদিক থেকে ধাঁধার সঙ্গে মিথের প্রাথমিক রূপটির চরিত্রগত একটা সৌষম্য রয়েছে। আদিম ধর্মবিশ্বাস-সম্পৃক্ত মন্ত্র-উচ্চারণ-বিধির সঙ্গে ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা-ইত্যাদির ছন্দোস্পন্দী রূপটির সমধর্মিতাও এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য। স্বভাবতই এই ধাঁধার ধর্মসম্পর্কটুকু কেমন করে আদিমমনস্কতাসম্পন্ন সমাজকে প্রভাবিত করে সেই প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে। একটি ক্ষেত্র-গবেষণা-নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে লেখা বই থেকে এর নমুনা সংকলন করি বরং এখানে :

পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা-গিনি অঞ্চলের ফান্টি-আশান্টিদের মধ্যে দীর্ঘদিন তাঁদেরই প্রায় একজন হয়ে কাটিয়েছিলেন নৃতত্ত্ববিদ্ ক্যাপ্টেন আর. এস. র‍্যাট্রে। যে-গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন, তাঁদের কুলপ্রতীকী পশু বা টোটেম ছিল চিতাবাঘ। এঁদের মধ্যে থাকবার সময়কালে র‍্যাট্রে একটি প্রচলিত কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লেখেন — 'দ্য লেপার্ড প্রিস্টেস' (১৯৩৫)। উপন্যাস হলেও এর প্রতিটি বিবরণ, উপজীব্য পাত্রপাত্রীদের জীবনচর্যার খুঁটিনাটিটুকু অবধি তাঁর ক্ষেত্র-গবেষণা-নির্ভর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল। এই বইতে, ঐতিহ্যাশ্রিত 'ট্যাবু' বা ধর্মধারা-কেন্দ্রিক নিষেধবিধি না মেনে, একই গোষ্ঠীভুক্ত দুটি তরুণ-তরুণী কেমন করে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আত্মদান করার পর দুজনেই ঘটনাচক্রে সিংহের মুখে পড়ে আহত হয়। ট্যাবুভাঙার গোপন কথাটা গোষ্ঠীর কেউ না জানলেও ঐ দুর্বিপাক আচম্‌কা কেন যে ঘটল, সেটা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ায় দৈব গণকের কাছে সেটা জানতে যাবার একটি বর্ণনা দিয়েছেন র‍্যাট্রে। গণক যে-মন্ত্র পাঠ করছে সেটি সম্পূর্ণরূপেই একটি প্রহেলিকার মতো :

" ম্বেয়োম্, ম্বেয়োম্!
মার্, মার্, দমাদ্দম।
কে নষ্ট, জানিস পষ্ট,
কেই বা রেগে বম্!
ম্বেয়োম্, ম্বেয়োম্!"

(রাখাল ভট্টাচার্য ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত ঐ উপন্যাসের অনুবাদ 'বাঘিনী কন্যা' /১৯৪৮ থেকে গৃহীত)

আধিদৈবিক মন্ত্র-অভিচার হওয়া সত্ত্বেও এর অন্তর্গত ধাঁধার সমধর্মী ভাবটুকু সচেতন পাঠকের চোখ এড়ায় না।

বস্তুতপক্ষে, মিথের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রহেলিকার প্রত্যক্ষ-ব্যাখ্যান দেওয়া হতো কল্পনার মাধ্যমে। আর ঠিক ঐ-একই পরিপ্রেক্ষিত থেকে পরোক্ষ-ব্যাখ্যা দেওয়া হত ধাঁধায়। এই পরোক্ষধর্মই তার প্রতীক, রূপক-ইত্যাদির ভিতরে প্রতিফলিত। ধাঁধার সমাধান আদিম গোষ্ঠীসমাজে জাদুকর, পুরোহিত—এরাই করতে পারত বলে তারা নিজেরা এবং অন্যরাও, মনে করত; এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে ধাঁধা সেক্যুলার

হয়ে উঠল, তখনও তার সমাধান যারা করতে সক্ষম হত, তারাই বিশেষ ধরণের খাতির বা সুবিধা পেত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিও রেহাই পেত ঐ ধাঁধার সমাধান করে, অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভও ঘটত। লোককাহিনীতে এসবের অঢেল হদিশ মেলে।

॥ ৫ ॥

"কুদুম কুঁড়িং কুঁড়িং
এঞেল তবাগেম উরুমা,
সঁগে সঁগে ছানঃক',
সিঞখান দয় আদঃক্'আ,
ঞিদী খানগেয় এঞামঃক্
মা লইমে গড়ম কড়া
ভূত কানায় স্যে বঙ্গা?"

এর অর্থ (ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে 'কুদুম' /১৯৮৬ বইতে যে-ভাবে করে দিয়েছেন) ·

"চিল চিল হেঁয়ালি
দেখলে তারে চেনা যায়।
সঙ্গে-সঙ্গে লুকিয়ে পড়,
দিনের বেলায় হারিয়ে যায়,
রাতের বেলা মিলে।
বল দেখি নাতি এবার
ভূত বলি না ঠাকুর?"
—(জোনাকি)

এই সাঁওতালী 'কুদুম' বা ধাঁধাটির মধ্যে আদিমকালীন ধর্মধারা সম্পৃক্ত চরিত্রটির কিছু ভগ্ন-স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আদিমতর ধর্মীয় প্রত্যয়টি কেটে গেছে ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় অনুষঙ্গ-তথা-অতিলৌকিক কল্পনার উপকরণ ('ভূত' এবং 'ঠাকুর') এর মধ্যে কিন্তু থেকেই গেছে। আদিম ধাঁধা থেকে লৌকিক পর্যায়ের ধাঁধায় বিবর্তনের একটি মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে এই ধরণের হেঁয়ালিগুলিকে ধার্য করা যায়।

এই সেক্যুলার পর্যায়ে বিবর্তিত হবার পর ধাঁধার যে-রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী আর্চার টেলর তাকে সুন্দরভাবে বর্গীকরণ করে দেখিয়েছেন তাঁর 'ইংলিশ রিড্‌লস ফ্রম ওরাল ট্র্যাডিশান' (১৯৫১) বইতে। মোটামুটিভাবে টেলরের বর্গীকরণকে সর্বজনীন বলে গণ্য করা গেলেও, প্রত্যেকটি সংস্কৃতিরই কতকগুলি নিজস্ব সংস্কৃতিগত লক্ষণ থাকে, যার জন্যে ঐ বর্গবিভাগটিকে খানিকটা স্থিতিস্থাপক করে নিতেই হয় প্রয়োজন অনুসারে। সাধারণভাবে ঐ বর্গবিভাগে যা করা হয়েছে, বিস্তৃতভাবে তা হল এই

(ক) পশুপাখি ; (খ) গাছপালা-ফলমূল ; (গ) মানুষ এবং মানবদেহের বৈশিষ্ট্য ;

(ঘ) বস্তু, বর্ণ ইত্যাদি; (ঙ) গ্রহ-নক্ষত্র ও অন্যান্য জাগতিক মহাজাগতিক ঘটনা ও আয়তন; (চ) বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম ইত্যাদি । (ছ) বুদ্ধির পরীক্ষা; (জ) ব্যক্তি-সম্পর্ক; (ঝ) তারিখ-অঙ্ক ইত্যাদি ; (ট) গল্পমূলক ; (ঠ) পুরাণবৃত্ত । এদের মধ্যে বুদ্ধির পরীক্ষা-কেন্দ্রিক ধাঁধাগুলির নানা উপবিভাগ হয়, যেমন ১) অক্ষর-শব্দ-ঘটিত ; ২) প্রত্যুৎপন্নমতি-সম্পৃক্ত; ৩) কে-কী-কেন-কবে কী করে-কোথায়-ইত্যাদি প্রশ্নবাচক, ৪) প্রতিস্পর্ধী বা চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গীসূচক-প্রভৃতি। কিছু-কিছু উদাহরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির বলয় থেকে সংকলন করে এইসব বিভাগ উপবিভাগগুলির স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে এখানে ।

ক. প্রাণীবিষয়ক

১ "এক খড়্গ দুই দণ্ড
ডিমা পাড়ে অনন্ত
বিলত চরে পক্ষী
ও ধর্ম তুই সাক্ষী" (চিংড়িমাছ)

২ "জলেতে সর্বদা থাকে নহে জলচর
ভূমেতে ভ্রমণ করে নহে ভূমিচর
খেচরের শক্তি ধরে খেচর তো নয়
বল দেখি মহাশয় কোন্ প্রাণী হয়" (হাঁস)

৩. "বালু দিয়া নাও যায়
চাইর ঠ্যাঙ্গে দাইড় বায়" (উট)

৪ "বাঘার মত্তোন মারে ফাল (লাফ)
কুত্তার মত্তোন বসে
জলের মইদ্যে নামে যহন (যখন)
শোল্লার (শোলার) মত্তোন ভাসে" (ব্যাঙ)

খ) গাছপালাবিষয়ক

১. "বন থেকে বেরোল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে" (আনারস)

২. "একটুখানি গাছে
রাঙা বউটি নাচে" (লঙ্কা)

৩ শিশুকালে অঙ্গ ঢাকা
যৌবনেতে উলঙ্গ
বার্ধক্যে মস্তকে জট

দেহ মধ্যে সুড়ঙ্গ।" (বাঁশ)

৪. " লোট্‌না লোট্‌না লোট্‌কুড়ি
মাঝে মধ্যে বন্ধঝুড়ি
কোন্‌ স্যাকরায় গড়েছে
মণিমুক্তো ভরেছে" (ডালিম)

গ) মানুষবিষয়ক :

১. "এক হাত গাছটি
ডাল তায় পাঁচটি" (মানুষের হাত ও আঙুল)

২. "মা মাসি ভগ্নী ভাগ্নী
ভাইঝি খুড়ি পিসি মামী
বৌদি জ্যেঠি সবায় জানি
জানি না তার বৌরে আমি (আইবুড়ো ছেলে)

৩. "পাপিষ্ঠ মাথাটি দুহাত কুড়ি আঙুল নাকটি
কান চোখ নাই —
কে বল্‌ত ভাই?" (মানুষ)

৪. 'দু' পুকুর মামাদের জল টলমল
পড়িলে একটি কুটা উপ্‌চায় জল" (চোখ)

ঘ) বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক

১. "মরা জন্তু জ্যান্তে খায়
সারা রাস্তা চিবিয়ে যায়" (নতুন জুতো)

২. "এক রাঁধুনী ভর দেশে সব রান্না রাঁধে সে"
(আগুন)

৩. "লোহার ঘোড়া ল্যাজ লম্বা
দৌড়ুলে পরে ল্যাজ কম বা" (সূচ-সুতো)

৪. "কাল সাপ দোলে বাপ
ছোবল মাস্নে' পরে
বিষের বদলে বুকে
ঘৃত মধু ঝরে" (বিনুনী)

ঙ) গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবীবিষয়ক

১ "রাজার বেটা মইর‍্যা রইছে কান্দিবার কেউ নাই
রাজার উঠানে পইড়্যা রইছে ঝাড়িবার কেউ নাই
হাজার ফুল ফুইট্যা আছে, তুইলবার মালী নাই"
(চাঁদ, আকাশ, তারা)

২. "মামা ডাকে মামা বলে, বাবা বলে তাই
ছেলেতেও তাই ডাকে তাই ডাকে মায়।" (চাঁদ/সূর্য)

৩ "আল্লার কি কাম
আজব কুমার সাঁকো বানাইছে
সাইত রঙ্গের পাঁচিল গড়্ সে
ছামুতে নাই থাম" (রামধনু)

৪. "মাঠ বন পর্বত সবই সে পেরোয়
নদীর সামনে গেলে নিমিষে হারায়" (পথ)

চ) বিভিন্ন কাজকর্মবিষয়ক :

১. "পাঁচজনে তোলে বত্রিশ জন ধরে
আর একজন ঠেলে দিলে সুমুদ্দুরে পড়ে" (আঙুল, দাঁত এবং জিভের সাহায্যে খাওয়া)

২. "তুমিও খাও আমিও খাই
মুখ বাড়ালেই পাই,
যতই খাই পেট না ভরে
মরি একি বালাই" (চুমো দেওয়া)

৩. "একটারে দিলাম টিপ্
গুষ্টি শুদ্ধ বুঝি ঠিক।" (ভাত রাঁধা)

৪. "চোদ্দ চরণ দশটি নয়ন
পাঁচটি মুণ্ড চারটি জীবন।" (মড়ার খাটিয়া বওয়া)

ছ) বুদ্ধির পরীক্ষামূলক :

১ "ডালে বসে ডাল কাটো
চন্দ্রকণা শিরে
চোরের রকম দেখে
এত ভয় কী রে ?
বড়টির বকলমে
ছাঁটো ধীরে ধীরে,
নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে
দাও রাঁধুনীরে। — কী বস্তু?"

('ডালে' - 'ডাল' = 'এ'; 'চন্দ্রকণা' = 'চন্দ্রবিন্দু' = 'ঁ'; 'চোর' - 'র' = 'চো'; 'বড়' - 'ব' = 'ড়' 'এঁচোড়')

২. "গাছটিতে বসে ছিল সাত জোড়া পাখি,
দুটি ম'ল গুলি খেয়ে ক-টি র'ল বাকি?"
(একটিও না; কারণ গুলির শব্দে অন্যগুলো উড়ে যাবেই)

৩ "জন্মের আগে মানুষ কোথায় থাকে ?" (মাতৃগর্ভে)

৪ "বউয়ের বরের নাম কী?" (আমি)

"জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর অবধি কোন্ আসবাব সবচেয়ে দরকারী?" (খাটিয়া)

" কে কোনওদিন ফেরে না ? " (চলে-যাওয়া সময়)

এই প্রতিস্পর্ধী বা আক্রমণাত্মক ধাঁধাগুলির বিষয়োপকরণগতভাবে নিজস্ব বর্গ নেই, প্রচলিত আর পাঁচ-রকম বর্গেব ধাঁধাব সঙ্গেই এর ঐ চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গীটা সংযুক্ত হয় মাত্র, যা সম্ভবত প্রাচীনতর কোনও ধর্মাচার বা সমাজাচারেব সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ।

উদারহণত :

৪ 'বক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা—
এই শিলুক ভাঙতে নারলে বুঝব জারজ বেটা।' (কুঁচ)

জ) ব্যক্তিসম্পর্ক-বিষয়ক ·

১. "শাকতুলুনি শাকতুলুনি শাক খাওয়াব তোকে
আমার বাবা বিয়ে করেছে তোর বাবার মাকে" (দিদিশাশুড়ী)

২ "আমরা দু'বাপ ব্যাটা
তোরা দু'বাপ ব্যাটা
তিনটি মানুষ গোটা" (ঠাকুর্দা, বাবা, নাতি)

৩ "আমি তোর ভগ্নীপতির পত্নীব পিতা
আমারে তুই চিনলি না" (বাবা)

৪ "পবণে নালো টরাম ব্যাঙে চিডা খায
মায়ের বিয়া না হইতে মাইয়া নাইয়ব যায।" (প্রথম পক্ষের মেয়ে)

ঝ) তারিখ, অঙ্ক-ইত্যাদি সম্পর্কিত :

"ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।"
(১৪০৬ শকাব্দ; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তারিখ বর্ণনা এইভাবে উল্টো সংকেতের মাধ্যমে হতো)

২ "লিলি পাখি বসে ছিল, ডড পাখি উড়ে গেল
ক'টি পাখি বাকি র'ল"? (৩৩টা· লি·=৯৯, ডড= ৬৬)

৩ "একটি ছেলের সামনে ছেলে, একটি ছেলেব পিছে ছেলে
দুটি ছেলের মধ্যে ছেলে, ক'টি ছেলে খুঁজে পেলে?" (তিনটি)

৪ "চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র দিয়া গ্রহযুক্ত করি।
ইহাতে যে অঙ্ক হয় লভ্যো যত্ন করি।।
ইহার অর্ধেক ত্যাজি পৃষ্ঠে পুষ্প দিয়া।
অবিলম্বে তত টাকা দিবে পাঠাইয়া।।" (১০০ টাকা)

·) গল্পধর্মী ·

১ "বাদশা বেগম নাস্তায় বইসেন,

উজীর ভি এক দাওয়াত পাইসেন,
তানির লগে বুইন রইসেন,
তিন রেকাবে চারজন খাইসেন,
হেইডা ক্যামনে সম্ভব হইসেন?''
(বেগমই হলেন উজীরের বোন)

২. ''কুম্ভকার গড়িলেক যুবতী মাটির
জাদুমন্ত্রে জিয়াইল তাহে জাদুগর
তাঁতি আসি পরাইল লজ্জার বসন,
কাহার ভর্তৃকা কন্যা ইহা স্থির কর।''
(তাঁতিই স্বামী হবার যোগ্য, কেননা সৃষ্টিকর্তা কুম্ভকার এবং প্রাণদাতা জাদুকর উভয়েই পিতৃতুল্য)

ঠ) পুরাণবৃত্ত সম্পর্কিত :

১ ''স্ত্রী পুরুষে খায় পান
দুজনার বাইশ কান— কারা?''
(রাবণ ও মন্দোদরী)

২ ''শ্বশুরের পুত্র নয় স্বামী বল কার?
দশহাত পঞ্চমুণ্ডী পতি যে তাহার।'' (দ্রৌপদী)

৩ মহাসতী পুণ্যবতী পাঁচভাতারী এয়ো
সেই শাশুড়ীর ছেলের যে বউ পাঁচভাতারী সে-ও?''
(কুন্তী ও দ্রৌপদী)

৪ ''আজা হলেন জন্মদাতা
ভগ্নী হলেন মা
ভগ্নীপতি পিতা হলেন
বুঝতে পারলাম না'' (কুশ)

মূলত টেলরের বর্গবিন্যাসকে অনুসরণ করা হলেও, ওপরের উদাহরণগুলির মধ্যে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় হেরফের যে করে নেওয়া হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্যভিত্তিক যে কাঠামোর কথা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলা হয়েছে এদের অনেকগুলিকেই সেই অনুসারে গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে; অন্যগুলি নেহাৎ বর্ণনাত্মক। অবশ্যই বৈপরীত্য অর্থে একটা আপাত-স্ববিরোধিতার কথাই এখানে বলছি — এটিই বুঝতে হবে। সাদৃশ্যবাচক তুলনাকে অবলম্বন করে প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে এই ক-টি গাঠং :

(ক) ১/৩/৪; (খ) ১/২/৩, (গ) ১/৩, (চ) ১, এবং (ছ) ৪।

বৈপরীত্য বা আপাত-স্ববিরোধিতা-ভিত্তিক হল এগুলি

(ক) ২ (খ) ৩, (গ) ৩ (ঘ) ১/২/৩/৪; (ঙ) ২, (চ) ৭; (জ) ২/৪; (ঝ) ৩, (ট) ১; (ঠ) ১/২/৩/৪।

বিবরণাত্মক ধাঁধা হচ্ছে এই কটি :

(গ) ২; (ঙ) ৪; (চ) ২/৩; (ছ) ১/২/৩; (জ) ১/৩; (ঝ) ১/২/৪/; (ট) ২।

ধাঁধার বহিরঙ্গের রূপটির মধ্যে দুটি আরও উল্লেখযোগ্য উপাদান হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় : আপাত-অশালীনতা এবং অসংলগ্ন বা অপ্রয়োজনীয় কিছু বিবরণ। আপাত-অশালীনতাটুকু অবশ্য ঐ আপাত-স্ববিরোধিতারই অনুষঙ্গ হিশেবে এসেছে। সম্ভবত, এই অশালীনতার ভাবব্যঞ্জনা এসেছে প্রাচীন / আদিম কিছু-কিছু ধর্মধারার যৌনতা-কেন্দ্রিত আচারের সূত্র ধরেই। অসংলগ্নতা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে ধাঁধার বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী স্বভাবের সূচক রূপে। ধাঁধার গঠনাঙ্গিক বিশ্লেষণের আগে এই দুটি বিষয় একটু খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়; তার আগে, আপাতভাবে অশালীন কয়েকটি ধাঁধার নমুনা এখানে দেখা যেতে পারে :

১. "দুই ধারে দুই পা থুইয়া গর্তে দিলাম ভরি,
এল গেল কচর-কচর কাজটি নিলাম সারি" (কুয়ো থেকে জল তোলা)

২. "পরের বউ বসল ঠেসে পরপুরুষের পাশে
ধরাধরি চাপাচাপি তোলাতুলির আশে
তোলাতুলি আধেক ক'রে দিল আধেক ভরে
যন্ত্রনায় 'উঃ আঃ' করে, সবটা গেলে হাসে" (শাঁখা পরা)

৩. "চিৎ করে পেলানি রগড়-রগড় কল্লি
লাল জল পড়ে গেল সব কাম সাল্লি"
(মশলা বাটা ও শিল ধোয়া)

৪. "বার মাসই দশ মাস বেড় দেড় হাত
ছুঁচের খোঁচায় তার হয় গর্ভপাত" (বেলুন)

উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ধরণের প্রায়-সব ধাঁধার মধ্যেই যৌনক্রিয়ার ব্যাপারটি প্রতীকে বর্ণিত হয়। তাছাড়া অনেক সময়েই ধাঁধাগুলির শেষাংশে 'যা ভাবছ সেটি নয়'-গোছের একটা বক্তব্য থাকে। এই 'অশালীন'-প্রতিম ধাঁধাগুলি উল্লেখযোগ্য এই জন্যই যে, এদের অন্তরঙ্গ কাঠামোতে কোনওভাবেই অশ্লীলতা নেই; কিন্তু বহিঃকাঠামোতে তা আছে। ফলে এদের গঠনেই একটা বিপ্রতীপমুখিন দ্বি-প্রবণতা আছে। আবার বহিরঙ্গে আপাত-অশ্লীলতা যা আছে, তা আসলে নেই বলে, শুধুমাত্র সেই স্তরটুকুর মধ্যেও দ্বি-প্রবণতা রয়েছে। কেননা একই সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক সক্রিয়মূল শক্তি এবং আপেক্ষিক বৈপরীত্য — এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব সেখানে দেখতে পাচ্ছি। এই বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের জটিলতা অন্য কোনও ধরনের ধাঁধায় সহজে লভ্য নয়।

অসংলগ্ন কথাগুচ্ছ বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দিয়ে ধাঁধার রসকে পরিবর্ধিত করে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে এদেরও গুরুত্ব আছে ঠিকই। তবে যে কোনও ধাঁধারই মৌল বক্তব্যের প্রসঙ্গে এরা নেহাৎই 'ফালতু' বলেও বুঝতে হবে। এরকম ধাঁধারই কিছু নমুনা দিই :

১ "যমুনাতে জল নেই কূলে আসে ঢেউ
বাপের জন্মের আগে পুত আনে বউ" (কলাগাছ)

২. রাজার বাড়ির মেনা গাছটি মেনমেনাইয়া চায়
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরো খাইতে চায়" (শিল-নোড়া)

বাংলা-হেঁয়ালিতে কালিদাস-প্রসঙ্গও এই ধরণেরই অপ্রাসঙ্গিক কিছু একটা রীতি, একথাও মনে রাখতে হবে। 'যমুনা' এবং 'মেনা গাছ'-এর প্রসঙ্গের মতনই অবান্তর শব্দে তৈরি 'কালিদাস'-ঘটিত বক্তব্যগুলিও। নমুনা তো আগেই দেখা গেছে।

।। ৭ ।।

প্রবাদ এবং ধাঁধার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারের সূত্রে ধাঁধার রূপতত্ত্বগত মৌলিক গড়নটিকে বুঝে নেওয়া দরকার অতঃপর। প্রবাদ এবং ধাঁধা কিছুটা সমধর্মী ঠিকই; অন্তত বাগবৈদগ্ধ্য, জীবন-অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যমুখিনতার ক্ষেত্রে। কিন্তু মূল তফাৎটা হল এই যে, ধাঁধাতে অভিপ্রেত বক্তব্যটি প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য একটা সামগ্রিক প্রয়াস দেখা যায়, পক্ষান্তরে, প্রবাদে বক্তব্য বিষয়টি যতটা সম্ভব স্পষ্ট করেই বোঝানো হয়। এই কথারই সূত্র ধরে বলা যায় যে, ধাঁধা হল 'এক্সপ্রেসিভ' কিন্তু 'কনসীলিং' (যথাক্রমে, প্রকাশশীল এবং অন্তর্মুখী) আর প্রবাদ হচ্ছে 'ইমপ্রেসিভ' অথচ 'এক্সপোজিং' (যথাক্রমে প্রভাবশীল এবং বিকাশমুখী) অর্থাৎ ধাঁধাকে ব্যাখ্যাব প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রবাদের আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত। তাছাড়া প্রবাদ প্রধানতই শ্লেষাত্মক, যা ধাঁধা সম্পর্কে বলা যায় না।

এই অধ্যাযে ব্যবহৃত সমস্ত উদাহরণ থেকেই একই জিনিষ বোঝা যাবে যে, খুব পরিচিত কোনও-কিছু বস্তু-প্রাণী, ঘটনা অথবা বিষয়কে কথার মারপ্যাঁচে অন্য কিছু বলে প্রতীত করানোরই চেষ্টা হয় ধাঁধাব মধ্যে। স্বভাবতই ঐ বেশি-কথার অরণ্য থেকে মূল বক্তব্যকে বার করে আনতে হলে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট চিন্তাপদ্ধতিকে অবলম্বন করতে হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশগত বস্তুজ্ঞান সম্পর্কে যে-শ্রোতার অধিকার যত বেশি, তাঁর পক্ষেই ঐ জটিলতার সমাধান করা তত সহজ। প্রায়-ক্ষেত্রেই ধাঁধারও ব্যবহারিক প্রকাশমাধ্যম হচ্ছে যেহেতু ছড়াই, তাই সেই ছড়ার চরণগুলির আপাতবিচাবে একটা বিপ্রতীপ দ্বৈততা (বাইনারিজম) থাকেই; প্রবাদের ক্ষেত্রে আবার এটা সব সময়ে প্রাপ্য নয়। অন্তর্গত এই বিপ্রতীপতাব কথা আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এইটাই ধাঁধারও প্রাণ। বহিরঙ্গে সেটি কেমন করে প্রতিফলিত হয়, তাই এখানে বিচার্য।

'জলে জন্ম জলে বাস, জল ছুঁলে হয় সর্বনাশ' — এই ধাঁধাটিকেই বিশ্লেষণের নমুনা-উপকরণ রূপে নেওয়া যায় : এর প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশের মধ্যে স্পষ্টতই (আপাত) বিরোধিতা থেকে গেছে। ঐ দ্বৈততার প্রকাশতা এই ছড়াকৃতি ধাঁধার অন্তর্লীন গঠনেও (ডীপ-স্ট্রাকচার বা ইনফ্রা-স্ট্রাকচার) আছে। প্রথমত, 'জলে জন্ম' এবং 'জলে বাস' কথাদুটির মধ্যেই আরোপিত দুটি গুণ উল্লেখিত হতে দেখা যাচ্ছ। 'জন্ম' এবং 'বাস' দুটি ক্রিযাই প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বস্তুর ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করলে আরোপ করা হয কৃত্রিমভাবে। তাই 'নুন' এর ওপর প্রাণীসুলভ ধর্মবাচক ক্রিয়ার প্রয়োগ করলে প্রাথমিক ভাবে একটি জটিলতারই সৃষ্টি হয়। সুতরাং একই শব্দের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ

তাৎপর্য এই ধাঁধার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে যারা একটা দ্বৈততারও সৃষ্টি করেছে।

'জল ছুঁলে হয় সর্বনাশ' এই কথাটির মধ্যেও ঐ প্রত্যক্ষ-ও-পরোক্ষ তাৎপর্য নিহিত আছে। নুন জলে গলে যায় — এইটেই তো 'সর্বনাশ' অর্থে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সেটা আদৌ 'সর্বনাশ' নয় — একটা রাসায়নিক রূপান্তর মাত্র। কাজেই 'সর্বনাশ' অর্থে আপাতদর্শনে 'ধ্বংস' বোঝালেও অন্তর্নিহিত অর্থে 'রূপান্তর'-ই ব্যঞ্জিত হচ্ছে। 'জলে জন্ম জলে বাস' অংশে নুনের যে বস্তুগত রূপ, অর্থাৎ 'তরলতা'র ব্যঞ্জনা আছে, তার থেকে ভিন্নতর-বা বিপরীত বলাই শ্রেয়-রূপ 'কঠিনতা'-র ব্যঞ্জনাই নিহিত 'জল ছুঁলে হয় সর্বনাশ' অংশের মধ্যে।

সুতরাং দুই অংশের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বহিরঙ্গে (সুপার-স্ট্রাকচারে) পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য প্রতিফলিত; অন্যপক্ষে অন্তরঙ্গে (ইনফ্রা-স্ট্রাকচারে) সেই স্ব-বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে আদৌ নেই। এই দ্বান্দ্বিকতাই হল ধাঁধার সঠিক বৈশিষ্ট্য।

ধাঁধার মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের অভিজ্ঞানও যে মেলে, পরিশেষে সেটাও বিচার্য। 'এই শিমুক ভাঙ্গাইলে চৌধুরীর বেটা'— এই মর্মে ধাঁধার সমাধানের জন্য চ্যালেঞ্জ করার মধ্যেই তার সামাজিক শ্রেণীচেতনা সীমাবদ্ধ নয়। তেমন-তেমন ধাঁধারও সন্ধান মেলে যার তাৎপর্য আরও অনেক বেশি। নমুনাস্বরূপ একটি সাঁওতালী 'কুদুম' (অর্থাৎ, ধাঁধা) বিশ্লেষণ করলে লৌকিক সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির মধ্যেও ইতিহাসের ক্রম-অন্বিত রূপটি কেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, দেখা যাবে। এটি আপাত-শ্রবণে রামায়ণের কাহিনীর অতি সংক্ষিপ্ত রূপ হলেও, বস্তুতপক্ষে এর আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য বহুদূরপ্রসারী। এই 'কুদুম'-এ বলা হচ্ছে : "রাম ছিল। হরধনু ভেঙে সীতাকে ঘরে আনল। তারপরে রাবণ তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। সীতাকে পরে উদ্ধার করল রাম। তখন হল তার অগ্নিপরীক্ষা। এর পরে সীতার কোলে জন্মাল লব-কুশ। রাম তাদেরকে ঘরে আনল। কিন্তু সীতা লুকোল মাটির তলায়।" এই গল্পের অন্তরালে অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তিত-হওয়া সমাজের গতিপথটিই চিহ্নিত হয়।

আদিবাসী সমাজমানসের সঙ্গে ধ্রুবপদী পুরাণকথার যে মিথষ্ক্রিয়া এখানে ঘটেছে, তার অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক বিবর্তনের সত্যটি হল এই রকম :

রাম = রা— ম (অর্থাৎ, মানুষদের রাজা)
রাবণ = রা — বন (অর্থাৎ, বনের রাজা)
সীতা = লাঙলের ফাল

সুতরাং, রাম হরধনু ভেঙে সীতাকে গ্রহণ করলেন যে, তার নিহিত অর্থ হল, শিকার-নির্ভর জীবনচর্যার শেষে কৃষিকেন্দ্রিত জীবিকা গ্রহণ করা। সীতার হরণ-বৃত্তান্ত হল, বনচর মানুষেরা কৃষি-কর্মের জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলছে তারই সঙ্কেতবাহী। রাম-রাবণের সংঘাত এবং তারপরে সীতার উদ্ধার হচ্ছে, আদিবাসী এবং পরিশীলিত সামাজিক স্তরের মানুষদের দ্বন্দ্ব এবং শেষে আদিবাসীদের পরাভবের কথা। 'অগ্নিপরীক্ষা' হল বনে পড়ে থেকে লাঙলের ফালে মর্চে পড়ার জন্য, সেটিকে ফের পুড়িয়ে ব্যবহারযোগ্য করা (পরিশীলিত সমাজের সতীত্ব-ইত্যাদি ধারণার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাও

এখানে প্রাপ্য) এবং লব-কুশের জন্ম কৃষি ও উর্বরতা-কেন্দ্রিক ভাবধারার দ্যোতক। লব এবং কুশ, যথাক্রমে শস্য এবং তৃণের প্রতীক। তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসার তাৎপর্য, ফসল গোলায় তোলা। আর সীতার মাটির তলায় লুকোনোর অর্থ আর কিছুই না, ফসলী-ঋতুর শেষে মাটির ওপর হলকর্ষণের দাগগুলি ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাওয়া। ধাঁধার মধ্যে আপাতভাবে যৌনতার তাৎপর্যকেও হয়ত উর্বরতাকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মেলানো যায়। সামাজিক চিত্রায়ণের সঙ্কেতেও এক ধরণের বাস্তবধর্মিতা। কিন্তু এই ধরণের ধাঁধা — যা ওপরে এইমাত্র বিশ্লেষণ করা হল — এদের মধ্যে চেতনার গভীরতা অনেকটাই বেশি : ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখেই এদের সঠিক মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব, পরিশেষে এটিই বলবার কথা। (এই ধাঁধাটি বিশ্লেষণে ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের কিছু-কিছু অভিমত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি।)

ছ. লৌকিক ছড়ার স্বরূপ-সন্ধান

কালগতভাবে বিচার করলে, ছড়াকে সম্ভবত মানুষের আদিমতম সাহিত্য-প্রয়াসগুলির একটি বলেই ধার্য করতে হয়। সভ্যতার প্রদোষলগ্নে আমাদের প্রাচীন পিতামহরা যখন বহু-বিচিত্র দেবতাদের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করতেন ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে, তখন থেকেই ছড়ার উৎসারণের পথও খুলে যায়। অর্থাৎ, আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণতি লাভ করেছে। কালক্রমে তার অন্তর্লীন ধর্মবিশ্বাসের ভাবানুষঙ্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত ; সেই জায়গায় পারিবারিক বা সামাজিক কিছু-কিছু অনুভূতি বক্তব্যের মাধ্যমে গাঢ়বদ্ধভাবে সঞ্চিত হয়েছে ছড়ার ভিতর।

ছড়া বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তার মূল প্রকরণ সমস্ত সংস্কৃতিতেই মোটামুটিভাবে দু-রকমের : ছেলেভুলানো ছড়া এবং সর্বজনীন ছড়া। প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি আরও কয়েক ধরনের বাক্শিল্প অনেক সময়েই ছড়ার চেহারায় প্রকাশিত হয় ; ব্রত, বিয়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ছড়ার একটা ভূমিকা আছে; ভূত-ছাড়ানো, বাঘ-তাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ের মন্ত্রগুলির মধ্যেও আছে তা। এইগুলিকে অবশ্য 'খাঁটি' ছড়া বলে গণ্য করা সঙ্গত নয়।

স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, 'খাঁটি' ছড়া তাহলে কোন্‌গুলো? যে ছড়ায় ধর্ম-আচার-সংস্কার প্রভৃতির অভিক্ষেপ ঘটে না, লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা সেগুলিকেই ঐ পদবীতে মণ্ডিত করেন। জাদু-ইন্দ্রজাল-অলৌকিকতা-আধিদৈবিকতা-ইত্যাদির সংস্পর্শে থাকলে ছড়াগুলির অন্তর্কাঠামো মন্ত্রের সমধর্মী হয়ে যায়। আবার ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদিতে ছড়ার যে-বাহিরঙ্গিক রূপটি দেখি, সেটি অন্তরঙ্গের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, কেননা, তাদের মধ্যে একটা ভাবগত সুসংলগ্নতা আছে, যা-কিনা আবার 'খাঁটি' ছড়ার মধ্যে আদৌ প্রাপ্য নয়।

তাহলে, কিছুটা অসংলগ্নতা ছড়ার পক্ষে একটি অনিবার্য শর্ত। ছেলেভুলানো ছড়ার ক্ষেত্রে সেই শর্তের দাবীকে তো সামগ্রিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। সর্বজনীন ছড়ার প্রসঙ্গেও একটা আপাত-অসংলগ্নতা না থাকলে ঠিক ছড়ার প্রত্যাশিত রসটি যেন সেখানেও অপ্রাপ্য হয়। ছড়ার ঐ-রসটির নিবেদনের ব্যবহারিক মাধ্যম হল নিজস্ব একটা ছন্দোস্পন্দন। ঐ ছন্দের চালই ছড়াকে এমন সর্বজনপ্রিয় একটি মৌখিক-শিল্পে পরিণত করেছে। যে শিশু ভালো করে কথা বলতেও শেখেনি, সেও কিন্তু ছড়ার ব্যাপারটাকে যে অতি দ্রুত আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলে, তার মূলেও আছে ঐ স্পন্দিত ছন্দের দোলা।

আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে পরিচিত জগতের বিভিন্ন চিত্রকল্পই প্রধান উপজীব্য হিশেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ তা সত্ত্বেও, টুকরো-টুকরো চিত্রকল্পগুলি এমন একটা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলাদা-আলাদা ভাবে থাকে, যাতে সামগ্রিক কোনও বাক্-প্রতিমা গড়ে ওঠে না সেখানে। কোলাজ্-করা ছবিতে যেমন বিভিন্ন অংশের পরস্পর-নিরপেক্ষতা

থাকলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা ভাবগত 'একক'-রূপ মনের কোনও-না-কোনও স্তরে সেগুলি দানা বেঁধে ওঠে, ছড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই ঘটে।

এখানে একটা উদাহরণকে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে :

'মাসি পিসি বনগাঁবাসী (পাঠান্তরে, 'বনকাবাসী')
বনের ধারে ঘর,
কখনো ত কন্ না মাসি
খইমোয়াটা ধর,
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বিন্দাবন
এত দিনে বুঝিলাম মা বড় ধন।'

এই ছড়ার বিভিন্ন অঙ্গগত উপকরণ যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে

১ম চরণ : মাসি [১] পিসি [২] বনগাঁবাসী [৩];
২য় " : বনের ধারে [৩-ক] , ঘর [৩-খ];
৩য় " : কখনো ত [৪], কন্ না[৫], মাসি [১] ;
৪র্থ " : খইমোয়াটা [৬], ধর [৭];
৫ম " : কিসের মাসি [১-ক], কিসের পিসি [২-ক], কিসের বিন্দাবন [৩-গ],
৬ষ্ঠ " : এতদিনে [৮], বুঝিলাম [৯], মা [১০] বড় ধন [১১]।

স্পষ্টতই, (৩), (৩-ক/খ/গ) ইত্যাদি উপকরণ এই ছড়ার মানসিক কোনও স্তরে উপলব্ধ ভাবগত-একক যেটি, (অর্থাৎ, 'মার স্নেহ > মাসি-পিসির স্নেহ') তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। আবার (৩-গ), (৩-ক), (৩-খ) পরস্পর-সমঞ্জস হলেও (৩ ক) তাদের সঙ্গে বস্তুতপক্ষে সম্পর্কহীন। বিশেষত, 'মাসির বাড়ি' (৩) এবং 'বিন্দাবন' (৩-গ)-ও কোনও ভাবেই আবার ভাবগত-ঐক্যে মিলতে পারে না। কিন্তু এত ভাবগত-বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও পুরো ছড়াটি যে ঐ 'একক'-কে স্পর্শ করেছে, সেটাই এর খাঁটিত্বের প্রমাণ সূচক।

উপরের বিশ্লেষণে ছড়ার অন্তর্নিহিত আপাত-অসংলগ্নতার চরিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রেই এই জিনিসটি ছড়ার নিজস্ব সৌন্দর্যকে বিশেষ ধরণের শৈলীতে মণ্ডিত করে। আমরা দেখছি যে, ঐ-অসংলগ্নতার একটা বড় উপলক্ষ হল এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের কিংবা একই চরণের ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের আঙ্গিকগত বা অন্বয়গত মিল না-থাকা। এই জিনিসটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' বইয়ের 'ছেলেভুলানো ছড়া : ১'— নিবন্ধে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। যেমন, "নোটন নোটন পায়রাগুলির ঝোঁটন বাঁধার" সঙ্গে "তিরপুন্নির ঘাটের রুই-কাতলাদের' যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝানো, এবং বোঝাও কঠিন! এর সঙ্গে "গুরুমশায়ের" আবির্ভাব ঘটা এবং "মাছ নেওয়া" ব্যাপারটাও খুব সুসঙ্গত নয়। আবার দ্বিতীয় মাছটির অপহারকের ভগ্নীর সঙ্গে এই ছড়া-কাটিয়ের দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপন করার ঘটনাটিও বিশেষ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যদি না সেই অজ্ঞাত-অপহারকের শাস্তি হিশেবে তাকে 'শালা' বলে গালাগাল দেওয়াটাই তার অভীপ্সিত হয়! ফের, বিয়ে যদি একটা ঘটেই, তবুও এত

সব নামী-দামী ফুল থাকতে বুনো ‘ওড় ফুলের’ মালাবদল করারই বা কারণ কী? এবং সর্বোপরি এই সবকিছুর বলার পরে ‘দাদার হাতের কলম’ ছুঁড়ে মারার হেতুই বা কী?

এইসব অসংলগ্নতা সত্ত্বেও ছড়াটির মধ্যে যে সামগ্রিক একটা রসের উপলব্ধি ঘটবার প্রেক্ষিত আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই অসংলগ্নতা এবং সামগ্রিকতার দ্বন্দ-সমন্বয়ই হল যে-কোনও ‘খাঁটি’ ছড়ার মূল জীবনীশক্তি।

।। ২ ।।

ছড়ার জগতে একদিকে যেমন প্রতিদিনের বাস্তব জীবনযাত্রার নানা তুচ্ছ ঘটনার সমাবেশ হয়, অন্যদিকে তাব মধ্যে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তিও ঘটতে দেখি। সন্দেহ নেই, ছড়ার—বিশেষত, ছেলেভুলানো অথবা খেলার ছড়ার মধ্যে একটা বড় ভূমিকা হলো শিশুর। স্বভাবতই মায়েরা—বিশেষ করে গ্রামীণ-সমাজের মায়েরা, যাঁদের প্রায় পুরো জীবনটাই গৃহস্থালীর চার দেয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ—তাঁদের ঐ জীবনচর্যার একটা বৃহৎ এবং ব্যাপক অংশই শিশুকে নিয়ে কাটে। তাই ছড়ার মধ্যে শিশুর এই আধিপত্যটুকু স্বতঃস্ফূর্ত, সহজাত এবং স্বাভাবিক।

শিশুর ভাবনার এবং অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহুসময়ে অর্থবিহীন অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয় ছড়াব মধ্যে; এতে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয় তো বটেই, আবার কখনও, বা প্রায়শই, মিলের প্রয়োজনেও এগুলির হাজিরা ঘটে। কোনও-কোনও সময়ে শব্দগুলির হয়তও-বা আঞ্চলিক কিংবা সাময়িক একটা অর্থ থাকে, যা কালক্রমে বিস্মৃত হয়ে যাবার ফলে আপাতভাবে অসংলগ্ন বা অনর্থক বলেই মনে হয়। যেমন :

‘আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ি,
রেল কম ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম।’

সাধাবণভাবে, ‘আইকম, বাইকম’ এই শব্দদুটি নিরর্থক বলেই প্রতীত হয়। ‘পা পিছলোনো’-র সঙ্গে ‘আলুর দম’ নামক সুখাদ্যটির যোগাযোগটাও দুরূহবোধ্য। এরই সঙ্গে ছুটে-আসা বেলগাড়ির সামনে ‘পা পিছলে’ পড়াটাও বাস্তবিক সাংঘাতিক ব্যাপার! ছড়াবিজ্ঞানী যদি এই ছড়াকে বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তিনি কিন্তু এটাকে অন্যভাবে দেখবেন।

প্রথমত, এই ছড়াটির জন্ম হয়েছে যে সময়, তখন লোকসমাজে কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে, শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ চেহারায়। ‘রেল’ এবং ‘কম (যথাক্রমে ‘rail এবং ‘come’) শব্দদুটির মধ্যে প্রথমটি বাংলা শব্দেব ভাঁড়ারে ঠাঁই পেলেও, দ্বিতীয়টি এখনও বিদেশি বলেই গণ্য। এদেশে রেলগাড়ির পত্তন হয ১৮৫৫ সালে; কাজেই এই ছড়ার বয়স কমপক্ষে প্রায় সোয়াশো বছর বা তারও বেশি। এখন ‘আইকম বাইকম’ ঐ ‘come -এব সূত্র ধরে ‘I come ভাই come’ হওয়াটা সম্ভব; I (আই)-

এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে 'ভাই আঞ্চলিক উচ্চারণে 'বাই'; আবার 'রেল' বলছি বটে, খুব সম্ভবত সেটা 'rail' নয়, 'rain'—ঐ আঞ্চলিক উচ্চারণে 'ন'>'ল' হয়েছে। 'rain' হলে ছড়াটির আপাত-অসংলগ্নতা দূর হয়। ঝমাঝম বৃষ্টিতে শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে কাদায় পা পিছলে পড়ে যদু মাষ্টারমশাই চিৎপাত হয়েছেন এবং তাঁর চেহারার সঙ্গে তখন ঝোল-মাখা আলুর দমের উপমা খুঁজে পেয়েছেন যদু মাষ্টারের দ্বারা তাড়িত-ও-শাসিত বেচারী-ছাত্রের স্নেহময়ী মা কিংবা মাসি অথবা পিসি! কিংবা, ছাত্র নিজেই সে মিল খুঁজে পেয়েছে, 'ভাই come'>'বাইকম' কথার সূত্রে এমনও ভাবা চলে হয়ত! ছুটন্ত রেলগাড়ির মুখে পা-পিছলে পড়ে যাওয়া মানুষ, আর যাই হোক লোকসাহিত্যের পক্ষে রসোপকরণ বলে সাব্যস্ত হতে পারে না।

এই-যে চিত্রকল্পটি তৈরি হয়েছে, এর জন্ম বাঙালীর ঘরের বধূর হেঁসেলে। অনাম্নী ছড়াকারিণী কাদামাখা-মানুষের সঙ্গে উপমিত করেছেন ঝোল-মাখা আলুর দমকে; এই গার্হস্থ্যভাবটিই হল বাংলা ছড়ার মূল প্রাণসত্তা।

আবার সর্বক্ষেত্রেই যে এই দুর্বোধ্য বা আপাত-দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ খুঁজে বার করা সম্ভব, এমনও নয়। যেমন :

'এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং সই লো
একটি খবর আইলো
কিসের খবর আইলো
রাজা একটি বালিকা চাইলো
কোন্ বালিকা চাইলো
অমুক বালিকা চাইলো...' ইত্যাদি।

'এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং'-এর তাৎপর্য খুঁজে বার করা সত্যিই খুব দুরূহ। কিন্তু এই ছড়ার বাকি অংশ থেকে একটা বিশ্লেষণযোগ্য সমাজ-ইতিহাসের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। 'রাজা একটি বালিকা চাইলো'— এ-কথা কোন্ সামাজিক চিত্রের আভাস দেয়? 'রাজা'-অর্থে সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা, যারা ইচ্ছামতো সাধারণ ঘরের অমুক বালিকা তমুক-বালিকাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে খবর কিংবা পাইক কিংবা দুইই, একদা পাঠিয়ে থাকত। রূপকথায় এটাই রূপান্তরিত হয়েছে অমুক রাক্ষস কিংবা তমুক দৈত্যের কাছে প্রতিদিন কিংবা প্রতিহপ্তায় গাঁয়ের একটি করে কুমারীকে পাঠানোর কল্পনার মধ্যে; আর ছড়ায় এটাই 'এলাটিং বেলাটিং-এর পর 'রাজার খবর' আসার মধ্যে বিধৃত হয়েছে।

ঐ-সব 'এলাটিং বেলাটিং' ইত্যাদির মাধ্যমে যে শব্দস্পন্দন সৃষ্টি হয়, তাদের সাহায্যেই বাংলা ছড়ার ছন্দের নিজস্ব চলনভঙ্গীটুকু গড়ে উঠেছে। বাংলা ছন্দোরীতির প্রধান তিনটি ধারার মধ্যে একটি তো 'ছড়ার ছন্দ' হিশেবেই পরিচিত ; সেটাই হল 'বাংলা ছন্দ'। কিন্তু শুধু লোকসংস্কৃতির সীমানার মধ্যেই এটি আবদ্ধ নয়, চারমাত্রার পর্ব-বিভাজন করে শব্দের মাঝে বা শেষে ঝোঁক দিয়ে-দিয়ে হলন্ত শব্দ-নির্ভর এই ছন্দের চলনটি পরিশীলিত এবং লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন

করেছে। ছড়া যদি আমাদের সাংস্কৃতিক-মনকে খুব ব্যাপকভাবে প্রভাবিত না-করে রাখত, তাহলে এই ব্যাপারটা কখনোই ঘটা সম্ভবপর ছিল না। এমন-কী বাঙালী গ্রাম্য-মহিলারা যখন পরস্পরের 'স্বামীপুত্রের মাথা খেয়ে' সোচ্চারে কলহ করেন —সেই জটিল এবং উত্তপ্ত মুহূর্তেও ছড়া কিন্তু যথারীতি হাজির থাকে, যেমন থাকে শ্লেষাত্মক প্রবাদে অথবা উপদেশাত্মক প্রবচনেও। নিন্দা-প্রশংসা-সমালোচনা-কলহ-আদর-স্নেহ-বীতরাগ-অনুরাগ সমস্ত রকম ভাবাবেগ প্রকাশের মাধ্যমই বাঙালীর ঘরোয়া জীবনে বহু সময়েই এইসব ছড়াকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে।

॥ ৩ ॥

একথা ঠিকই লোকগল্পের বিশ্লেষণের সময় যেমন লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সূক্ষ্ম-গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাহিনীর আর্কিটাইপ এবং পরিবর্তিত পাঠগুলির অইকোটাইপের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করে গল্পটির ধারা-ও-পথ নির্ণয় করতে পারেন, ছড়ার পাঠান্তর নিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তেমন কোনও পদ্ধতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনও একটা পাঠান্তরিত ছড়ার আদিপাঠ এবং পরবর্তী পাঠগুলির বিবর্তনের স্বরূপটি কোনও ভাবেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। একটি ছড়ার মূল চরিত্রটিকে অনুধাবন করতে গেলে তো সেটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই অনুধাবনের প্রয়াসেই একটা বাস্তব উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে :

ক. 'খুখা গুম্হাইলো ফারা ৎস্উরাইলো
গর্খী আইলো ধ্যাশে।'

দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বঙ্গের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) প্রচলিত এই ছড়াটি ভিন্ন যে রূপে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত, সেটি সকলেরই পরিচিত ঃ

খ. 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এল দেশে।'

এবং সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গের অন্যত্র যে-রূপে বিদ্যমান, তা-ও সকলের চেনা ঃ/

গ. 'খুকা ঘুমাইল পারা জুরাইল
বর্গী আইল দ্যাশে।'

একমাত্র উচ্চারণভঙ্গীর ক্ষেত্রে ছাড়া (খ) এবং (গ)-এর মধ্যে কোনও হেরফের নেই। কিন্তু (ক)-এর সঙ্গে এদের মৌলিক একটি পার্থক্য আছে ঃ 'গর্খী' বা 'বর্গী'/'বর্গী—যাকে মাধ্যমে করেই এদের মধ্যে আদিপাঠ এবং বিবর্তিত পাঠের ধারাক্রমটি অন্বেষণ করা সম্ভব।

'গর্খী' এবং 'বর্গী' / 'বর্গী' শব্দগুলিব মধ্যে কোন্‌টির ব্যবহার এই ছড়ায় প্রাচীনতর, সেটা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলেই কিন্তু ঐ আদিপাঠ ইত্যাদির সমস্যা মেটে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'গর্খী' শব্দের অর্থ 'সামুদ্রিক ঝড়'; 'বর্গী' শব্দের অর্থ-নির্দেশ নিষ্প্রয়োজন। বর্গীর আক্রমণ বাংলাদেশে হয়েছিল ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সামুদ্রিক

ঝড়ের বয়স অতি-অবশ্যই ভাস্কর পণ্ডিত এবং আলিবর্দী খাঁয়েব চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই সামুদ্রিক ঝড়েব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে বর্গীব হাঙ্গামাব স্মৃতির থেকে-উদ্ভূত বর্ণনার চেয়ে প্রাচীনতব। অতএব আদিপাঠ এক্ষেত্রে (ক)। দক্ষিণ পূর্ব বাংলাব 'গর্‌খী'-সম্পৃক্ত ছড়া যখন মুখে-মুখে পশ্চিম পানে এগোতে লাগল---তখন ঐ শব্দটির ব্যবহারও নিবর্থক হয়ে পড়তে শুরু কবল। এতএব, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এল 'বর্গী'---যা-কিনা আবার ধ্বনিস্পন্দনেব কাঠামো-বিচারে 'গর্‌খী'-বই সমগোত্রভুক্ত। সুতবাং---

ক হল এখানে 'আদি পাঠ' (আর্কিটাইপ), এবং

খ হচ্ছে 'প্রথম রূপান্তবিত পাঠ' (অইকোটাইপ-১), আর

গ. হলো 'দ্বিতীয় রূপান্তরিত পাঠ' (অইকোটাইপ-২);

ক > খ এবং গ কেন, ওপরে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখন খ >গ কেন, সেটি দেখা যাক ঃ

(খ) অর্থাৎ রাঢ়বাংলার পাঠটিব পরিপ্রেক্ষিতে বর্গীব আক্রমণ ছিল প্রত্যক্ষ ঘটনাব স্মৃতিবাহী তাই; 'গর্‌খী' >'বর্গী', এটাই স্বাভাবিক। আবাব,

(গ) অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গের পাঠেব প্রেক্ষিতে বর্গী-তথা-বর্‌গীব ব্যাপাবটি পরোক্ষ অভিজ্ঞতাবাহী, কেন-না ভাস্করের বাহিনীর হামলাব মুখে পূর্ববঙ্গবাসীরা পড়েনি প্রত্যক্ষভাবে। তাই পশ্চিম থেকে ছড়াটি আবাব পূর্বমুখে ঘুবে গিয়েছে, শুধুমাত্র উচ্চারণের হেরফেরটুকু ঘটিয়ে। সুতরাং ঃ

ক >খ >গ অর্থাৎ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা—>রাঢ় বাংলা—>পূর্ব বাংলা, এই ভাবেই ছড়াটি বিবর্তিত হয়েছে। ধ্বনিস্পন্দনের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে, আঞ্চলিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কোন্ শব্দ কার বদলে এসেছে, সেটি যদি এইভাবে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে ফেলা সম্ভব হয, তাহলেই তো ছড়াব বিবর্তনে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক চরিত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়।

॥ ৪ ॥

ছড়ায় স্থান-কালের পার্থক্য থাকুক না-কেন, তার মৌল আবেদনটি এক অর্থে চিরকালীন এবং সর্বজনীন, তা সে ছড়া ছেলেভুলানোই হোক, আর ঘুমপাড়ানিই হোক কিংবা খেলাধুলোরই হোক, আবাব ব্রত, প্রবাদ, ধাঁধা প্রবচন ইত্যাদিরই হোক বা শ্লেষ বিদ্রূপ-পরিহাস-কলহের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হোক। একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতিবলয়েব পবিমণ্ডলের অন্তর্গত সকলেব কাছেই ঐ ছড়াগুলিব অন্তর্লীন স্থান-কাল নিরপেক্ষ সর্বজনীন অনুভূতিটি মগ্নচৈতন্যে প্রায সমানভাবেই বাঞ্ছিত হয়।

এই ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, ছড়াগুলির আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচাব করলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে তিনটি প্রচলিত

ছড়াকে ঐভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি .

এক 'ওপারেতে কালো রঙ
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্
এপারেতে জন্তি গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

দুই 'খোকন খোকন করে মায়
খোকন গেছে কাদের নায়
সাতটা কাকে দাঁড় বায়
খোকনরে তুই ঘরে আয়।'

তিন. 'হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্।
তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলাব্যাঙের ছা,
খায় দায় গান গায়
তাইরে নাইরে না।'

'এক'-এর বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, এর প্রতি পংক্তিই মূলত দুটি এককের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিন্যস্ত। ১ম পক্তির একক দুটি 'ওপারেতে' (ক$_১$) এবং 'কালো রঙ' (ক$_২$); বক্তার পরিপ্রেক্ষিতে দুটিই ঋণাত্মক কারণ (ক$_১$) আয়ত্তের বহির্ভূত এবং (ক$_২$) বিষাদসূচক। ২য় পংক্তিতে একক দুটি হলো 'বৃষ্টি পড়ে' (খ$_১$) এবং 'ঝম্‌ঝম্' (খ$_২$); বর্তমান ক্ষেত্রে (খ$_১$) বক্তার বেদনার অনুষঙ্গবাহী এবং (খ$_২$) তারই ভাবদ্যোতক, সুতরাং এরাও ঋণাত্মক। তৃতীয় চরণের 'এপারেতে জন্তি গাছটি' (গ$_১$) এবং 'রাঙা টুক্‌টুক্ করে' (গ$_২$) ধনাত্মক একক কারণ এরা যথাক্রমে আয়ত্তগম্য ও আনন্দসূচক। শেষ লাইনের 'গুণবতী ভাই আমার' (ঘ$_১$) স্নেহ-আবেগের দ্যোতক বলে ধনাত্মক এবং 'মন কেমন করে' (ঘ$_২$) বেদনাব্যঞ্জক বলে ঋণাত্মক একক। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক একক যথাক্রমে যদি '+' এবং '-'রূপে সূচিত করা হয়, তাহলে ঃ

ক$_১$: ক$_২$ :: '-' : '-'
খ$_১$: খ$_২$ :: '-' : '-'
গ$_১$: গ$_২$ :: '+' : '+'
ঘ$_১$: ঘ$_২$ :: '+' : '-'

অতএব, (ক$_১$+ক$_২$+খ$_১$+খ$_২$+ঘ$_২$) > (গ$_১$+গ$_২$+ঘ$_১$) বা, '-৫' > '+৩'

অতএব, এই ছড়ার মূল ভাবানুষঙ্গ যে দুঃখ ও নৈরাশ্যসূচক সেটি আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করেও দেখা যাচ্ছে।

'দুই'-য়ের ক্ষেত্রে প্রতি পংক্তিব দুটি পর্বকে দুটি ব্যবহারিক একক রূপে ধরে নিলে দাঁড়াচ্ছে :

(১ম চবণ) ক$_{১}$ || ক$_{২}$
(২য় ") খ$_{১}$ || খ$_{২}$
(৩য় ") গ$_{১}$ || গ$_{২}$
(৪র্থ ") ঘ$_{১}$ || ঘ$_{২}$

এবং মূল দুটি চরিত্র 'খোকন'-কে একক-(অ) এবং 'মা-কে একক-(আ) ধবে নিলে ·

ক$_{১}$. ক$_{২}$.· অ আ
খ$_{১}$ · খ$_{২}$ :: অঅ . অঅ
গ$_{১}$ গ$_{২}$.: অঅ : অঅ
ঘ$_{১}$: ঘ$_{২}$ ·. অ : আআ

চরণের মধ্যে খোকনের পরোক্ষ প্রাধান্য (অঅ) আর মাযেব পরোক্ষ প্রাধান্য (আআ) বুঝতে হবে এখানে:

অতএব, অ+অঅ+অঅ+অঅ+অঅ + অ>আ+আআ

অর্থাৎ, ২ অ+৪ অঅ>আ+আ+আ

অতএব, এই ছড়াতে খোকনেব প্রাধান্যই বেশি।

'তিন'-এর ক্ষেত্রে ·

'হাট্টিমা টিম্‌টিম্ =ক, 'মাঠে ডিম পাড়া'=fক, 'তাদেব খাড়া দুটো শিং'= কক, 'তাঁতির বাড়ি'= খ$_{১}$, 'ব্যাঙের বাসা'= খ$_{২}$, 'কোলা ব্যাঙেব ছা'= খ$_{৩}$, 'খায-দায় গান গায়'=fখ$_{৩}$ এবং 'তাইরে নাইরে না'= খখ একক-সূচক হিশেবে ধবলে

১ম পংক্তি = ক
২য় " = fক
৩য " = কক
৪র্থ " = ক
৫ম " = খ$_{১}$. খ$_{২}$
৬ষ্ঠ "= খ$_{৩}$
৭ম "=fখ$_{৩}$
৮ম "= খখ

অতএব ক+fক+কক+ক>খ$_{১}$+খ$_{২}$+খ$_{৩}$+fখ$_{৩}$+খখ। আবাব প্রথম চাব চরণ(ধ্রুবক)-এর মধ্যে পরিচালিকা-শক্তি (f) রূপে একটিই একক 'ক'; (হাট্টিমা): পক্ষান্তরে শেষ চাব চরণ (সহায়ক) এর মধ্যে পবিচালিকা শক্তি তিনটি ঃ খ$_{১}$ (তাঁতি), খ$_{২}$ (ব্যাঙ), খ$_{৩}$ (ব্যাঙেব ছা) এবং তাদের মধ্যে তৃতীযটিই শুধু পবিচালিকা শক্তি

(f)-সম্পন্ন একক।

অতএব, ক>খ /খ /খ এবং fক>fখ তাই এই ছড়ায় ধ্রুবক>সহায়ক এবং ভাবগত দিকেও প্রথম চার চরণের তুলনায় দ্বিতীয় চার চরণ লঘুতর।

তিনটি ছড়াকে তিন পদ্ধতিতে, আঙ্গিকগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, এদের স্বতঃস্ফূর্তভাবগুলি—যা শ্রোতা বা পাঠকের মনকে ছুঁয়ে যায় কোনও একটি স্তরে, তারা শুধু বহিরঙ্গেই নয়, অন্তর্কাঠামোতেও সেই-সেই ভাবকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ফলে এদের বিভিন্ন ধরণের এককগুলি একই সঙ্গে দ্বন্দ্ব (যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেল) এবং সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে অনন্য শিল্পবস্তু হিশেবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক চরিত্রের জন্যই খাঁটি ছড়া সর্বদাই সর্বজনীন আবেদন বহন করে. কেন-না সমাজমানসও সর্বদাই একটা-না-একটা দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের সমন্বিত-শক্তির দ্বারা বিবর্তিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারপদ্ধতি সেটাই আমাদের শিখিয়েছে।

বাইরের পাঁচটা সুসংলগ্ন ব্যাপার মনকে সুসমঞ্জস করে রাখে ঠিকই, এবং ছড়ার আপাত-অসঙ্গতিগুলি তার বিপ্রতীপ একটা সক্রিয়তা মনের মধ্যে সৃষ্টি করে যে, সেটাও ঠিক; কিন্তু এই দুই বিপ্রতীপ উপলব্ধির সংঘাতে সঞ্জাত হয় ছড়ার দ্বান্দ্বিকভাবে-সমন্বিত বস্তুভিত্তিক একটি ভাবনা-উপলব্ধি। একটা সংগোপন-শৈশব মানুষের পরিণতি-সমৃদ্ধ মনের মধ্যে সব সময়েই সক্রিয় থাকে। ছড়ার সর্বজনীন আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তার উৎসমুখ সেটাই ; মনে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লব্ধফল হিশেবে সেটি উৎসারিত হয় আমাদের, হয়তো বা অগোচরেই।

জ. গাথা-গীতিকা-ব্যালাড : সাহিত্য, না-কি প্রয়োগশিল্প

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা একে অভিহিত করতেন 'গাথা নারাশংসী' বলে . অর্থাৎ, বীরগাথা—বিজয়গাথা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক নগর থেকে অন্য নগরে, হয়ত এক দেশ থেকে অন্যদেশেও—চারণকবিরা এই বীরকাহিনীগুলি গানে গানে গেয়ে-গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন। পরে যেগুলি 'গীতিকা' হিশেবে পরিচিত হয়েছে, তাদের আদি উৎসের খোঁজ মেলে এখানেই।

এইভাবেই ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে রামায়ণ, মহাভারত। লোকের মুখে-মুখে কাহিনীর রেণুগুলো সমাবৃত হতো, আর একদিকে লোককথা হিশেবে এক-একটা ঘটনাগুচ্ছ উঠত গড়ে; অন্যদিকে, ভ্রাম্যমাণ গায়ন-তথা ভাটের দল সেই সব কাহিনীকে গানের সুরে বেঁধে যে-শিল্পরূপে পরিণতি দিতেন, সেগুলিই হয়ে দাঁড়াত ঐ বীরকথা 'গাথা নারাশংসী'। মধ্যযুগের গীতিকার প্রাক্-রূপ। রামের সভায় লব কুশের গলায় দুঃখিনী সীতার কাহিনী গানের মাধ্যমে বর্ণিত হবার কথা এখানে স্মরণযোগ্য।

এমন ব্যাপারটা প্রতীচ্যেও ঘটেছে। জোনে ব্লুস্টেইন তাঁর 'দ্য ভয়েস অব দ্য ফোক' (১৯৭২) বইতে এ-ব্যাপারে পরিহাস-বিজড়িত ভঙ্গীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন . "আরিস্ততল খুব ভাল করেই জানতেন— যা আধুনিক কালের অনেক পাঠকই জানেন না, যে 'অডিসী' এবং 'ইলিয়াড' আদিতে ছিল লোকগাথা, চারণেরা সেগুলি গাইতেন এবং তাঁদের মূল দায়িত্ব ছিল ঐ মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করাই।" (পৃ.১)। 'অডিসী'-তে আছে জনপ্রিয় এক সভাগায়ক ফীনিশীয়দের শহরে গাথা শোনাতে যাচ্ছেন: ফরাসি ত্রুবাদুর, জার্মান মিন্নেসাং প্রভৃতি মধ্যযুগীয় লোকগাথা গায়ক সভাগাথা-গায়কদের প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখ করা চলে। রুশীয় 'ইগরগাথা', ফীনীয় 'কালেভালা', এস্তোনীয় 'কালেভিপেগ' ইত্যাদিও একদা ব্যালাডই ছিল। ফরাসী 'চার্স দা রলাঁ' ও তাই-ই।

ব্লুস্টেইনের মন্তব্যের শেষ অংশটুকুই অবশ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মৌখিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অব্যাহতভাবে রক্ষা করার মধ্যেই গীতিকা / ব্যালাডের মূল চরিত্রলক্ষণ নিহিত থাকে যে, এই কথাটুকু নিঃসন্দেহে গোড়াতেই বুঝে নিতে হবে।

পাশ্চাত্তে যা 'ব্যালাড' আমাদের দেশে 'গীতিকা' বলতে ঠিক সেটাই বোঝায় কি-না, এ প্রশ্ন অবশ্য অনিবার্যই ; সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে ব্যালাড সম্পর্কিত পশ্চিমী-ধারণার স্বরূপটা যে কী, সেটাই একটু বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আলবার্ট বি ফ্রীডম্যান লিখেছেন . একটি জাতি নিজেকে পরিপূর্ণ করতে কিংবা পবিত্র দায়িত্ব বহন করতে পারে না, যতক্ষণ তার অনন্য অস্তিত্ববোধ অন্যের দ্বারা গ্রস্ত থাকে। লোকগাথা হল সেই স্পর্শমণিগুলির একটি, যাদের ছোঁয়ায় সে বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার দিকে পা বাড়াতে সক্ষম হয়, আর যার অভাবে ঘটে ঠিক উল্টোটাই। ('দ্য ব্যালাড রিভাইভ্যাল', ১৯৬১; পৃ. ১৮৬)।

লোকগাথা বোঝাতে 'ভোকস্লিয়েড' শব্দটি যিনি উদ্‌ভাবন করেছিলেন, ১৮শ শতকের সেই জার্মান মনীষী জোহান গটফ্রীড ফন হার্ডার তাঁর সাধনায় (অর্থাৎ তাঁর সমকালীন আঠারোশোরও কিছু বেশী জার্মানভাষী স্বাধীন অনু-রাষ্ট্রকে একটি সংস্কৃতির বাঁধনে বেঁধে এক অখণ্ড জাতিসত্তার উপলব্ধিতে পৌছে দেবার ব্রতে) পূর্ণসিদ্ধিই লাভ করেছিলেন বলা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী জার্মান চারণকবিদের গাওয়া গাথাগুলির অনুপ্রেরণাকে সমস্ত জার্মানভাষী মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেন তিনি। লোকগাথাকে 'স্পর্শমণি'-র সঙ্গে এই জন্যই তুলনা করেছেন ফ্রীডম্যান।

।। ২ ।।

এই যে সংস্কৃতির 'পরশপাথর', এর আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য কী-কী?...গত শতাব্দীর শেষদিকে এফ. জে. চাইল্‌ড 'দ্য ইংলিশ অ্যানড্ স্কটিশ পপুলার ব্যালাডস' (১৮৮২-'৯৮) গ্রন্থে যে-তিন শতাধিক গীতিকা সংকলন করেছেন সব-শুদ্ধ হাজারখানেক পাঠান্তর সমেত, সেগুলি বিশ্লেষণ করে, এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপের অন্যান্য সংস্কৃতি-বলয়ে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী অনুরূপ লোকগাথাসমূহের (যথা : রুশীয় 'বীলিনা', দেনীয় 'হ্বাইজ', উক্রেনীয় 'দুমি', স্পেনীয় 'রোম্যান্স', সার্বীয় 'জুনাচ্‌কা পেস্‌মে', ফরাসী 'বালাদে'-ইত্যাদি) উপাদান বিচার করে, ব্যালাড-বিশেষজ্ঞরা গীতিকার লক্ষণ হিশেবে কতকগুলি জিনিসকে নির্দেশ করেছেন।

ক. এখন ঠিক যে-ধরনের গীতিকা/ব্যালাড দেখা যায়, তাদের সেই রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগে—যদিচ প্রাচীনকালেই তারা উৎসারিত হয়েছিল। ইউরোপে মোটামুটি ১২শ/ ১৩শ শতাব্দী থেকেই ব্যালাড-জাতীয় লোককলার আঙ্গিকগত পরিপূর্তি ঘটতে শুরু করেছে; এবং পরবর্তী ৩-৪ শতাব্দীর মধ্যে তার সম্পূর্ণ রূপান্বয় সাধিত হয়েছে। আমাদের নাথগীতিকার উদ্ভব ঠিক কবে ঘটেছিল, সেই বিষয়ে নিঃসংশয় না-হওয়া গেলেও, ১৭শ শতকের পূর্বেই যে এই ধর্মীয় কাহিনীগুলি প্রচলিত হয়েছে, এ-সিদ্ধান্ত হয়ত করা যায়। ধর্মধারা-রহিত পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলির বয়সও অন্তত তিনশো বছর। পশ্চিমবাংলায় যে-কয়েকটি গীতিকার হদিশ মিলেছে, তুলনায় সেগুলি বয়োকনিষ্ঠ। ইউরোপে এখন আর বলতে গেলে ব্যালাড গাওয়ার রীতি না থাকলেও, পূব-মৈমনসিংহের গ্রামে বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ আগেও গীতিকার প্রচলন ছিল। দুশান জবাভিতেল এ-ব্যাপারে তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্য জানিয়েছেন 'ফোক ব্যালাডস্ ফ্রম মৈমনসিং' (১৯৬৩) গ্রন্থে।

২ ব্যালাড / গীতিকার দুটি মুখ্য প্রকরণ হল কাহিনী এবং সঙ্গীতধর্ম। সুনির্দিষ্ট একটি গল্পকে অবলম্বন করেই এই বিশেষ লোককলাটির আত্মবিকাশ ঘটে; আর সেই গল্পটি গানের মাধ্যমে হয় পরিবেশিত। চাইল্‌ডের ব্যালাড-সংকলনের স্বরলিপিকার জি. এস. ব্রন্সন তাঁর 'ট্র্যাডিশন্যাল টিউনস অব দ্যা চাইল্‌ড-ব্যালাডস্' (১৯৫৯-৭২)-এর মুখবন্ধে এই ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যান করেছেন .

"প্রশ্ন।। কখন একটি ব্যালাড, ব্যালাড বলে গণ্য হয় না?

উত্তর।। যখন তার মধ্যে গাইবার মতো কোনও সুর থাকে না।''

...এই গীতিধর্মই, বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে গীতিকা/ব্যালাডের প্রাণশক্তি। কাহিনীর ভূমিকা তাই বলে সেখানে যে নেহাৎই তুচ্ছ, এমনটা নয়। বস্তুত এই কাহিনী-উপকরণটা আছে বলেই ব্যালাড /গীতিকা, লোকসঙ্গীতের সঙ্গে পৃথক।

সমস্ত ধরনের কাহিনীতেই যে-উপকরণগুলি অপরিহার্য—চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ এবং উপজীব্য-ভাব—গীতিকা / ব্যালাডের ক্ষেত্রেও তারা গরহাজির নয়। তবে পরিশীলিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে লোককাহিনীর প্রবণতাগত মূল যা পার্থক্য, তার থেকে এই গীতকথাগুলিও ভিন্ন কোনও বর্গীয় নয় : এখানেও চরিত্রের চেয়ে ঘটনার গুরুত্ব আনুপাতিকভাবে খানিকটা বেশি। পরিবেশের বিষয়টা মোটামুটি গৌণই। উপজীব্য-ভাব ব্যালাডের ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র হলেও এদেশী গীতিকাগুলি অবশ্য প্রধানত প্রেমকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে।

এখানে একটা কথা বলার আছে; ওদেশে ব্যালাডগুলি প্রায় নিয়মনির্দিষ্টভাবেই খুব পরিসরায়ত; পক্ষান্তরে আমাদের গীতিকাগুলি প্রায় সমস্ত সময়েই বহু ঘটনার সমন্বয়ে গড়া এক-একটি দীর্ঘ কাহিনী। একটু হাল্‌কাভঙ্গীতে হয়ত বলতে পারা যায় যে, পশ্চিমী ব্যালাড হল ছোটগল্পের পূর্বপুরুষ : পক্ষান্তরে, আমাদের গীতিকাগুলি হচ্ছে উপন্যাসের গোত্রভুক্ত হবার দাবীদার। এমন ব্যালাডও ইউরোপে পাওয়া গেছে, যার গেয়-পংক্তি মাত্র বেয়াল্লিশটি। পক্ষান্তরে এদেশে আবার এমন গীতিকাও আছে, যার পালাগান একবার পুরোপুরি সারতে আড়াই-তিন ঘণ্টার মতো সময় কেটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তাই ডেনমার্কে প্রচলিত 'স্যার পিটাবের প্রেমিকা' ব্যালাডটি এবং আমাদের 'চন্দ্রাবতীর পালা'—দুটিই ত্রিকোণ-প্রেমের কাহিনী হলেও, ঐ একুশটি পদ-যুগলে-গড়া ব্যালাডের চেয়ে দীর্ঘায়তন গীতিকাটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্রায়ণটা অনেক বেশি বিশ্লেষণের সাহায্যে করা সম্ভব হয়েছে।

ফলত, বিলিতি ব্যালাডগুলিতে আয়তনিক সংক্ষিপ্ততার জন্য ঘটনাক্রমের মধ্যে বিস্তৃত বর্ণনার অবসর পাওয়া যায় না, যেটা আমাদের গীতিকাগুলির মধ্যে প্রায়ই মেলে। সংলাপ-প্রবণ ছন্দোবন্ধন বিলিতি ব্যালাডের অন্যতম মুখ্য প্রবণতা, পক্ষান্তরে গীতিকায় বর্ণনার অংশই কিছুটা বেশি। তাছাড়া ব্যালাডে একটি বিশেষ কোনও ঘটনাকেই মুখ্য হিশেবে দেখানো হয়; গীতিকার মধ্যে সেক্ষেত্রে, বহু ঘটনার ক্রমান্বিত সমাবেশ ঘটে; এর ফলে ব্যালাডে 'ক্লাইম্যাক্স' এবং 'ক্যাটাস্ট্রোফি' (নাটকের পরিভাষায়) প্রায়শই উপর্যুপরি এসে পড়ে, সেখানে গীতিকায় ও-দুয়ের মধ্যে সময়ের ফারাকটা যথেষ্টই। এই কারণেই বিলিতি ব্যালাড, কিছুটা ছোটগল্প-ধর্মী।

গ. গীতিকা/ ব্যালাডের সঙ্গীতময়তার কথাটা ঠিক এর পরেই আলোচ্য। মূল লাতিনে 'বল' শব্দের অর্থ সুরের-সঙ্গে-নৃত্য হলেও, 'ব্যালাড'-এর ক্ষেত্রে নাচের ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাপ্য, যদিও এ. এইচ. ক্রাপ তাঁর 'দা সায়েন্স অব ফোকলোর' (১৯৬৪) বইতে দেখিয়েছেন যে, দরবারে-গেয়-ব্যালাডের সঙ্গে পূর্ব-ফ্রান্স জার্মানী এবং ডেনমার্ক—প্রভৃতি দেশে রিফর্মেশ্যান যুগে নৃত্য পরিবেশনের ফ্যাশন চালু

হয়েছিল (পৃ. ১৭৬)। পরে কেবলমাত্র ডেনমার্কেই এটি টিকে থেকেছে। বাংলা গীতিকায় নাচের ব্যাপারটা নেই। চারণগাথার মধ্যেও গানের ঐতিহ্যই সর্বময়ী ছিল—নাচ এবং গান একত্রে ব্যবহৃত হয়নি— যা হয়েছে লোকনাট্য (যেমন, কুশানে, গম্ভীরা, আলকাপ, নৌটংকী)—ইত্যাদির মধ্যে।

ব্যালাড-বা-গীতিকায় কিছু ধবা-বাঁধা সুর নেই। লোককলা হবার সূত্রে বিভিন্ন ধরনের লোকায়ত্ত সুরেব প্রকরণেই এগুলি গেয়। অন্য সব গানের সঙ্গে এর পার্থক্যটা এখানেই যে, এখানে সুরটা সব সময়েই কথার সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম ইউরোপ—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জসহ—ব্যালাডের সুর যথেষ্টই শাদা-মাটা, কথার ভাবকে ব্যক্ত করতে যতটুকু স্বরবিন্যাসের কারুকৌশল দরকার, মাত্র ততটুকুই সেখানে করা হয়। পক্ষান্তরে গ্রীস, বলকান অঞ্চল, রুশদেশ—প্রভৃতি এলাকার ব্যালাডে প্রাচীন বাইজান্তীয় সঙ্গীতধারার উত্তরসরণ দেখা যায়—অর্থাৎ, সুরের ক্ষেত্রে তারা যথেষ্টই পরিশীলিত এবং অকৃত্রিম। স্লাভভাষী দেশগুলিতে—বিশেষত সার্বিয়া, ক্রেয়েশিয়া, শ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যালাড মূলত সুর বজায় রেখে আবৃত্তি করার ভিত্তিতেই পরিবেশিত হয়।

আমাদের পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাগুলি অধিকাংশই করুণ-প্রেমকাহিনী নির্ভর বলেই হয়ত ভাটিয়ালী সুরের গায়নভঙ্গীটাই সেখানে মুখ্য। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলার স্বল্পসংখ্যক গীতিকাব মধ্যে বাঢ়-মল্লভূম অঞ্চলের নিজস্ব সুরধারা ঝুমুরের রূপায়ণই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত। উত্তরবঙ্গের নাথগীতিকার সম্পর্কে গ্রিয়ার্সন সাহেব বহুকথা লিখে গেলেও, সেখানে সুরের প্রয়োগবিধি কী ছিল সে-সম্বন্ধে আলোকপাত করেনি। স্থানীয় মুখ্য লৌকিক সুররীতি যেটি, সেই ভাওয়াইয়ার আদিরূপে এরা গীত হতো হয়ত; এ-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য অপ্রতুল।

॥ ৩ ॥

যদিও পরিশীলিত কিছু গাথা কাহিনী সব দেশেই বচিত হয়েছে, তবু ব্যালাড/গীতিকার মূলধারাটা লোকসংস্কৃতিরই বলয়ভুক্ত। ফ্রীডম্যান এই ব্যাপারটা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন ঐতিহ্যগত ব্যালাডকে "নট লিটেরেচার, বাট ইললিটেরেচার" বলে আখ্যা দিয়ে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০৭)। ম্যাকডোয়ার্ড লীচ অবশ্য ব্যালাড-রচেতাদের 'ইললিটেরেট' বলতে রাজি হননি ঃ তাঁর কথানুযায়ী এঁরা হলেন 'আনলেটার্ড' অর্থাৎ 'অনক্ষর'। ('স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশ্যনারী অব ফোকলোর, মিথোলজি অ্যাণ্ড লিজেণ্ড'; সম্পাদক মারিয়া লীচ; ১৯৪৯, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭) এই দুই মন্তব্যের কোনওটিই আমাদের গীতিকাকারদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বাংলা গীতিকার মধ্যে যে-জটিল কাহিনীর-বুনন বহু সময়েই দেখা যায় (যেমন, মহুয়া', 'তিলকবসন্ত', 'রূপধনকন্যা', 'কাজলরেখা', 'কমলা', 'সখীসোনা', 'মধুমালতী' ইত্যাদির কথা স্মরণযোগ্য) এবং যে-মনোবিকলন দক্ষতা বারবার তাদের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হয়েছে, (যেমন, 'মদিনা', 'আন্ধা বন্ধু', 'চন্দ্রাবতী', 'মলুয়া', 'সোনাই' ইত্যাদি) তাতে তাঁদেরকে 'ইললিটেরেট' / 'আনলেটার্ড' ইত্যাদি কোনও কিছুই বলা যায় না; বলাটা হবে অসঙ্গত

ধৃষ্টতা মাত্র!

এই গীতিকা (এবং ব্যালাড)-রচেতারা তাঁদের নিজস্ব কিছু বাগভঙ্গী, শব্দ-প্রযুক্তি, চিত্রকল্প-ভাবনা ইত্যাদি সর্বদাই নানাভাবে সৃষ্টির মধ্যে ব্যবহার করেন। এই ক্ষেত্রে এক ধরনের ভাষাগত আঞ্চলিকতা মুখ্য হয়ে ওঠে যে, তাতে সন্দেহ নেই। ব্যালাড/ গীতিকার মধ্যে বহু সময়েই স্থানীয় কোনও কিংবদন্তী উপজীব্য হিশেবে দেখা যায় যেহেতু, তাই ঐ ভাষাগত আঞ্চলিকতা সেখানে প্রয়োজনীয় একটা ভূমিকাই পালন করে অবশ্য।

আসলে, লোকভাষার নিজস্ব কিছু প্রকাশভঙ্গিমা আছে—যা লোকসঙ্গীত, গীতিকা ইত্যাদির মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ "লীলুয়া বাতাস", "নিধুয়া পাথার", "আশমানের চান্দ", "গহিন গাঙ", "বেয়াকুল রিদয়", "মনপবন", "কাজলকালো" ইত্যাদি। আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোকসাহিত্য' (২য় খণ্ড, ১৯৮০) গ্রন্থে বিদেশি ব্যালাড থেকে সংগৃহিত এরকম কয়েকটি উদাহরণ খুব সরস ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন : "ইংরেজী গীতিকায় লোককবি horse বা ঘোড়াকে বলেছেন, 'steed'—সে ঘোড়া যদি white হয় তবে 'milk-white', যদি brown হয় তবে 'berry-brown', যদি grey হয় তবে 'dapple-grey', knight-গণ সর্বদাই 'gallant', sword সর্বদাই 'royal', ladies-গণ নিদারুণ বিষাদান্তক পরিস্থিতিতেও 'gay' এবং মৃত্যুবরণ করলেও মানুষের ঠোঁটগুলি 'ruby-red'।" (পৃ. ৪৫)

গীতিকা / ব্যালাডে লৌকিক বাক্‌রীতিরই অঙ্গ হিশেবে একই ধরনের শব্দগুচ্ছের (কখনও-কখনও একই পংক্তির) পুনরুক্তি শোনা যায়, যার নাম রিফ্রেইন বা ধুয়া। গল্প এগিয়ে চলার ফাঁকে-ফাঁকে এই ধুয়াগুলি একরকমভাবে বিরাম বা প্রেক্ষিত পরিবর্তন নির্দেশ করে। অনেক সময় শ্রোতারাও এই ধুয়ার সঙ্গে গলা মেলান।

বিলিতি ব্যালাডের উপজীব্য হিশেবে, বিশেষজ্ঞরা, মোটামুটিভাবে কতকগুলি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন—যেমন : প্রেম (মিলনান্ত, বিষাদান্ত—দুই বর্গেরই) ধর্মপ্রতীতি, লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন, রাখালিয়া পরিবেশ, অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি/ বর্ণনা, গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ, হাস্যকৌতুক, ঐতিহাসিক বিষয় (যুদ্ধ, বিরাট কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় : কোনও বিখ্যাত ঘটনা ইত্যাদি) হাসির উপলক্ষ, কিংবদন্তী ইত্যাদি। বাংলা গীতিকায় ধর্মের ব্যাপারটা নিতান্তই গৌণ (নাথ-গীতিকাগুলি ছাড়া) প্রেম এবং কিংবদন্তীই মুখ্য। দুয়েকটি ক্ষেত্রে রূপকথা (যেমন ঃ 'কাজলরেখা') গীতিকার অবলম্বন হয়েছে। তবে সর্বত্রই নারীর হৃদয়-আকুতি এবং তার জীবনের বিচিত্র ওঠাপড়াই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের ব্যাপার বাংলা গীতিকার বৃহদংশে এতই গৌণ যে, ধর্ম-নিরপেক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলেও হয়ত এই রচনাগুলিকে মেনে নেওয়া যায়। ইংরেজি 'রবিন হুড' জাতীয় কিংবদন্তীর নায়ক-কেন্দ্রিক ব্যালাড বাংলায় বেশি নেই। যদিও ঐতিহাসিক অথবা কিংবদন্তীর কিছু-কিছু চরিত্র সেখানে অন্তর্বিস্তর এসেছে ঃ যেমন, ঈশা খাঁ, মুকুট রায়, ভাবনা কাজী, সোনাভান ইত্যাদি। দস্যু কেনারাম প্রমুখ চরিত্রে ইত্যাদির কথাও হয়ত প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে পারি।

ইউরোপীয় ব্যালাডের সঙ্গে আমেরিকান ব্যালাডের বিষয়-উপজীব্যে বেশ কিছু

পার্থক্য আছে। জ্যান ব্রুনভ্যান্ড 'দ্য স্টাডি অব আমেরিকান ফোকলোর' (১৯৬৮) বইতে যে-বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এ-সম্পর্কে, সেই অনুসারে এর বিষয়-বিভাজনটি হয়েছে এই রকম : যুদ্ধবর্ণনামূলক, কাউবয়দের কীর্তিকলাপ-বিষয়ক, প্রথম-আসা-বাসিন্দাদের স্মৃতিচারণ-কেন্দ্রিক, আসামী এবং বদমাইশদের বিষয়ে, নাবিকদের সম্পর্কিত, দুর্ঘটনা এবং ট্র্যাজেডি-নির্ভর, খুন-খারাপির বর্ণনাত্মক, বোকা-হাবাদের ক্যাবলামি ইত্যাদি এবং নিগ্রোদের নিয়ে রচিত কাহিনী।...স্পষ্টতই ইউরোপীয় ব্যালাড এবং মার্কিনী ব্যালাডের মেজাজ-মর্জির ফারাকটা উল্লেখ্য। প্রেম, নারী, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও অবশ্য আমেরিকান ব্যালাড নেই তা নয়, পল বানিয়ান-জাতীয় কিংবদন্তী-পুরুষদের প্রসঙ্গও এসেছে—কিন্তু সাধারণভাবে একথা বলাই যায় যে, উত্তর আটলান্টিকের এপারে-ওপারে ব্যালাডের মৌল প্রবণতায় যথেষ্টই ফারাক আছে। ইউরোপীয় ব্যালাডের পিছনে যে বহু শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনটা আছে, সেটা আমেরিকায় অপ্রাপ্য বলেই হয়ত এই পার্থক্য।

॥ ৪ ॥

তবে আধুনিকালে বিশ্বজোড়া খ্যাতি সঞ্চয় করেছে যে-ব্যালাডটি, সেটি আমেরিকানই। ঐ 'জন হেনরির ব্যালাড'-কে (হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সৌজন্যে বাঙালী শ্রোতার কাছেও সেটি বিশেষভাবে পরিচিত) অবশ্য সাধারণভাবে বর্গীকৃত মার্কিন ব্যালাডের কোনও বিশেষ একটি ধারার অন্তর্ভুক্ত করা বেশ অসুবিধাজনক। নিগ্রোদের জীবনচর্যা-কিংবা-কিংবদন্তীমূলক ব্যালাডের গোষ্ঠীভুক্ত একে করা যায় না। অথচ, এর ব্যালাড-লক্ষণ একেবারে খুঁতহীন। ঠিক এমন মন্তব্য আমাদের সমকালে (হেমাঙ্গ বিশ্বাস মশায়েরই রচিত) 'শঙ্খচিল' সম্পর্কে কতটা করা যায় জানিনা, তবে তারও গীতিকা-ধর্মিতা অস্পষ্ট নয়, অন্তত আংশিক হলেও।

একালেও যে 'ব্যালাড' শব্দটা একেবারে অচলিত হয়ে যায়নি, রুশীয় চলচ্চিত্র 'ব্যালাড অব আ সোলজার যাঁরা দেখেছিলেন বছর আগে—তাঁরা তা স্মরণ করতে পারবেন। বস্তুত 'ব্যালাড' না হলেও, এই কাহিনীটির মধ্যে যে লিরিক্যাল ব্যঞ্জনা ওতঃপ্রোতভাবে স্পন্দিত হয়েছিল, তার জন্যেই সিনেমাটির অভিধা হিসেবে 'ব্যালাড' শব্দটা ব্যবহার করা একান্তভাবেই সঙ্গত হয়েছিল।

'লিরিক্যাল ব্যঞ্জনা' কথাটার বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। ১৭৯৮-তে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতার বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'. যদিও এককভাবে ঐ কাব্যের কোনো কবিতাই ব্যালাড-পদবাচ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঐ নাম দিয়েছিলেন বইয়ের, যার মধ্যে লিরিকধর্মই মুখ্যতম, প্রায় সামগ্রিকই বলা চলে।

অবশ্যই এখানে একটা বিতর্কের অবকাশ আছে। ব্যালাডের মধ্যে (অন্তত ইউরোপীয় ব্যালাডের ক্ষেত্রে) সুগভীর একটা প্রবণতা দেখা যায়, যাকে ' নৈর্ব্যক্তিকতা' বা 'নিরাসক্ততা' বলে আখ্যা দিয়েছেন কেউ-কেউ। কিন্তু নেহাৎ নিছক বর্ণনা-সর্বস্ব নয়

যেহেতু ব্যালাড, তাই তার মধ্যে গায়ক / রচয়িতার নিজস্ব ভাবাবেগেরও বড় একটি ভূমিকা থাকে। গীতিকবিতার সঙ্গে মূলত পৃথক হলেও, ব্যালাড / গীতিকার মধ্যে এইজন্যেই একটা লিরিকধর্মও থাকে, যা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের 'মহুয়া', 'মদিনা', 'সোনাই'—ইত্যাদি প্রধান যে-কোনও একটি গীতিকাকে উদাহরণ হিশেবে গ্রহণ করলেই এই কথার যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। এই কারণেই ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের অন্যতম অভিপ্রেরণা রূপে অবশ্যই ব্যালাডের কথা মনে করতে হবে। 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' ছাড়াও, কোলরিজের 'দ্য রাইম অব দ্য এনসিয়েন্ট ম্যারিনার' এবং 'ক্রিস্টাবেল', কিট্সের 'লা বেল দেম সাঁ মের্সি,' স্কটের 'মিনস্ট্রেল্সি অব দ্য স্কটিশ বর্ডার', শেলীর 'ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড' ইত্যাদির মধ্যে ব্যালাডের প্রেরণা এবং ভঙ্গী কম-বেশি যে আছেই , তা অনস্বীকার্য। টমাস পার্সির প্রখ্যাত সংকলন 'রেলিক্স্ অব এনসিয়েন্ট ইংলিশ পোয়েট্রি' (১৭৬৫) যে তাঁদের কোনও প্রেরণাই দেয় নি, সেটা কী করে বলা যায়। পার্সির অনেক আগেই স্যার ফিলিপ সিডনী ইংরাজী কাব্যের পরিশীলিতধারার সঙ্গে ব্যালাডের সম্বন্ধ কী এবং কতখানি, সে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন 'অ্যাপোলজী ফর পোয়েট্রি'-র (১৫৬৫) মধ্যে। ১৭১১-এর গোড়ার দিকে 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার ৭০-এবং-৭৪তম সংখ্যায় অ্যাডিসনের রচিত দুটি প্রবন্ধের মধ্যেও এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্বসূরীদের এইসব লেখা, রোম্যান্টিকদের কিছুই প্রেরণা দেয়নি, তা কী করে হয়? তাছাড়া শুধু স্কটই তো নন, অন্যরাও লোকগাথার দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ভালভাবেই, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। রোম্যান্টিসিজমের একটা উৎসই তো ছিল লোকসংস্কৃতির প্রেরণা।

এরই সূত্রে ব্যালাডের লৌকিক এবং পরিশীলিত দুটি রীতির প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা বলতে হয়। 'পপুলার' এবং লিটেরারী'— এই দুই ধারায় ব্যালাডকে প্রায়শই ভাগ করা হয়ে থাকে। ব্রুস্টেইনের যে-মন্তব্যটি এই অধ্যায়ের গোড়ার সংকলিত হয়েছে, এখানে সেটি আবারও স্মরণযোগ্য। 'মৌখিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারবাহী' ব্যালাডের উদ্ভব এবং বিকাশটা ছিল এই ছকের অনুবর্তী : একজন কবি / গায়ক / বার্ড / মিনস্ট্রেল-প্রাথমিকভাবে সেটিকে রচনা করতেন, পরে অন্যরা সেটিই পরিবেশন করতেন মূল চেহারাটা অবিকৃত রেখে কিন্তু অবিরতভাবে কিছু-কিছু চয়ন-বর্জন করতে-করতে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের ক্ষেত্রেও যেমনটা হয়, ঠিক তেমনটিই এখানেও ঘটেছে। এই 'পপুলার' ধারার পাশাপাশি একক স্রষ্টা বা প্রতিবেদকের মানস-অভিজ্ঞানে গড়ে-ওঠা ব্যালাডও বেশ কিছু ছিল, যাদের মূল আশ্রয় ছিল অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের খাস-দরবার। এগুলিই 'লিটেরারী ব্যালাড'। অনেকটা আমাদের দেশের লৌকিক সাহিত্য-ধারা এবং পরিশীলিত রাজসভাশ্রয়ী সাহিত্য-ধারার মতোই আর কি।... উত্তরকালে ব্যালাডের লিটেরারী' ধারাটা গেল শুকিয়ে—পরিবর্তে প্রবাহিত হল 'কোর্ট পোয়েট্রি'-র জোয়ার। কিন্তু 'পপুলার' ব্যালাড কিন্তু বহমান ছিল অব্যাহত গতিতে—কেননা তার পৃষ্ঠপোষক ছিল বৃহত্তর জনসমাজ।

'কোর্ট পোয়েট্রি'-র মধ্যে ব্যালাডের যে রেণুগুলি সঞ্চিত হয়ে রইল, উত্তরপর্বেই

তা-ই আবার পরিশীলিত লিরিক কবিতার মধ্যে তাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। ব্যালাডের অন্তর্গত লিরিকধর্ম এবং পরিশীলিত কবিতার লিরিকধর্ম এই কারণেই একে অন্যের পরিপূরক।

আবার, ব্যালাডের প্রসঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতার যে কথা বলা হয়, এখানে সেটি ফের একবার ভাবা দরকার। গায়ক-পরম্পরায় যে-ব্যালাড প্রচলিত ছিল, সেখানে অদল-বদল একটু-আধটু যা-ই হোক না কেন, একটা মূল ভাব অব্যাহতই থাকত; ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তিক-আবেগ তার মধ্যে প্রতিফলিত হলেও (যে-কথা আগেই বলেছি—), মোটামুটি একটা রীতি-অনুগত প্রতিবেদন-পদ্ধতির অনিবার্যতার ফলে নৈর্ব্যক্তিক একটি প্রতিভাসও অবশ্যপ্রাপ্য হয়।

এই কথাটি অবশ্য 'ব্রডসাইড ব্যালাড' বলে যেগুলি পরিচিত, সেগুলির সম্বন্ধে বলা যায় না। এগুলির মূল উদ্দেশ্য এদের নামেই প্রকাশিত : নিন্দা-তিরস্কার-ব্যঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে গানে-বাঁধা-গল্পে ব্যক্তিক গোষ্ঠীবিশেষকে বিদ্ধ করার যে-রীতি এগুলির মধ্যে দেখা গেছে, তাতে আর যাই হোক নিরাসক্তি-নৈর্ব্যক্তিকতা থাকতে পারে না। এগুলির সঙ্গে আমাদের 'পংখীর গান'-জাতীয় লৌকিক-গায়নরীতির হয়ত একটা তুলনা করা যায়। কিন্তু আমাদের গীতিকায় এই জিনিষটা একেবারেই অপ্রাপ্য।।

সপ্তম অধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ও প্রয়োগকলা

ক. প্রয়োগকলার উৎস

সঙ্গীত এবং নৃত্য — এরা হল সংস্কৃতির যমজ-সন্তান। পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা অংশ থেকে আদিম মানুষের জীবনচর্চার যে-সমস্ত নিদর্শন খুঁজে বার করেছেন, তার থেকে একটা কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নাচ এবং গানের ঐতিহ্য মানুষের সাংস্কৃতিক-বিকাশের ইতিহাসে খুব প্রাচীনও বটে। অন্তত হাজার বিশেক বছর আগেও যে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব-পুরুষেরা নাচে-গানে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে পৃথিবীব বিভিন্ন অঞ্চলের পার্বত্য গুহাচিত্রগুলির সূত্রে। স্পেনের 'আল্‌তামিরা', ফ্রান্সের 'ল্যাস্‌কো', দক্ষিণ আফ্রিকার 'নাউ-গাপ', লিবিয়ার 'খারগুর-তাহ্ল' থেকে শুরু করে আমাদের ভূপালের নিকটবর্তী 'ভীমবেট্‌কা' অবধি, কোনও প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুহাই এর ব্যতিক্রম নয়। কোন্ সুদূর, সুপ্রাচীনকালে আঁকা এই সব ছবিতে দেখা যায় কোথাও মানুষ হরিণ সেজে নাচছে, কোথাও বা সে বুনো গাছের গুচ্ছ দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর আবৃত করে নৃত্যরত; কোথাও আবার বল্লমের মতো কোনও হাতিয়ার নিয়ে নিহত শিকারের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দল বেঁধে নেচে চলেছে: কোনও সময়ে হয়ত বা সেই নাচের উপলক্ষ এই রকম আর কিছু। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই নাচের মূল উদ্দেশ্যটুকু ব্যক্ত হয়েছে কিছু-না-কিছু ব্যবহারিক প্রয়োজনের অনুষঙ্গে।

আদিম মানুষের এই নৃত্যচর্চার ধারাটা আজও অব্যাহত রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী জাতির দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্যে। গোষ্ঠীনৃত্যের মতো গোষ্ঠী-সঙ্গীতও তাঁদের সামাজিক অস্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। শিকার-নির্ভর জীবিকার্জন থেকে কৃষি-নির্ভর রুজিসংগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছে, আদিবাসী নৃত্য-গীতের ধারাটি বিবর্তিত হয়েছে লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্যে। সেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে পরিশীলিত সঙ্গীত, ধ্রুবপদী নৃত্যশিল্প; তত্ত্বগতভাবে সেই প্রসঙ্গ আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি।

জীবিকার্জনের প্রয়োজনে প্রয়োগকলার উদ্ভব এবং বিকাশ কীভাবে হয়েছিল এখানে তার আলোচনাটা প্রাসঙ্গিক। ধরা যাক, হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী কিছু মানুষ দল বেঁধে বেরোনোর আয়োজন করছেন বিশ হাজার বছর আগের কোনও এক গ্রীষ্মের সকালে। গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ছবি আঁকায় পটু ছিলেন (চিত্রশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই-পটুত্বের উদ্‌ভাস কী করে সম্ভব হয়েছিল, তা পরে আলোচিত হয়েছে) তাঁরা কদিন ধরেই গুহার দেয়ালে সবাই মিলে হরিণ শিকাব করছে এমন একটা

ছবি এঁকে অবশেষে সেটা সমাপ্ত করেছেন। জাদুবিশ্বাস এবং মান্যা-অথবা-দেবতায় প্রত্যয় একত্রে তাঁদেরকে প্রণোদিত করেছিল এ-ব্যাপারে। হরিণশিকারের ছবি আঁকলে, সেটা (অনুকরণমূলক) জাদুর জোরে বাস্তবের হরিণ মারার ঘটনায় রূপান্তরিত হবে — এমন একটা বিশ্বাসই ছবি আঁকায় যেমন প্রবৃত্ত করেছে তাঁদের, ঠিক তেমনভাবেই তাঁদের কেউ-কেউ হরিণ সাজলেনও অনুরূপ বিশ্বাসের সূত্রেই। শিং, ছাল-ইত্যাদিতে শরীর সাজিয়ে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে আধো-লুকিয়ে, হরিণের চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গীর নকল করে লাফ-ঝাঁপ-ইত্যাদির মাধ্যমে আসল-হরিণদের বিভ্রান্ত করতে আরম্ভ করলেন। এই হল নৃত্যের আদি সূচনা। এরই সঙ্গে-সঙ্গে ঐ হরিণদের ডাক নকল করে তাদেরকে প্রলুব্ধ করে তীর বা বর্শার পাল্লার মধ্যে এনে ফেলার যে-ব্যাপারটা অবশেষে ঘটল, তাই থেকেই গানেরও শুরু। (এখানে স্মরণযোগ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রীরা 'স-র-গ-ম-প-ধ-ন' — সাতটি স্বরকেই পশুপাখির ডাক থেকে গৃহীত বলে মনে করেন।) এবং ঐ হরিণ-সাজার ব্যাপারটাই হল সুদূর ভবিষ্যতে নাট্যকলার উদ্ভবের বীজস্বরূপ।

হরিণ-সাজা, তার চলা-ফেরা এবং কণ্ঠস্বর নকল-করা — এই সব ব্যাপারগুলিবে বাস্তবে এক ধরণের 'বুদ্ধির ফাঁদ - পাতা' হিশেবে গণ্য করা যায় অবশ্যই। কিন্তু এই একান্ত-বাস্তব কৌশলগুলির ওপরে জাদু-এবং মান্যা/দেবতা-ইত্যাদির একটা কল্পিত আস্তরণও চাপানো হল। সে-ব্যাপারে আদিম সমাজের মুখ্য-ব্যক্তি ছিলেন যিনি, সেই পুরোহিত (বা জাদুবিদ্-ওরফে-ওঝা-তথা-'শামান্') একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। গ্রহণ লাগে কেন, ঝড় হয় কেন, ভূমিকম্প হয় কী জন্যে, এই অসুখ করলে অমুক-গাছের শেকড়, আর ঐ অসুখ করলে তমুক-গাছের পাতা খেলে সেরে যায় কেন — এই সমস্ত কিছু ব্যাপারের বাস্তব কার্যকারণ-ভিত্তিক ব্যাখ্যার চেষ্টা না-করে, তার বদলে অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রসঙ্গ তুলেই যেমন 'শামান্'-রা গোষ্ঠীর ওপরে ক্ষমতা বজায় রাখতেন, শিকার (পরবর্তীকালে, চাষবাসও)-ইত্যাদির ব্যাপারের অনুষঙ্গেও ঠিক একই ভাবে তাঁরা অলৌকিকতার ধারণাকে দিতেন দৃঢ়মূল করে।

এরই ফলে, নৃত্য-সঙ্গীত-ইত্যাদি ব্যাপার প্রাথমিকভাবে এক ধরনের 'রিচ্যুয়াল'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এবং এইসব 'রিচ্যুয়াল' (তথা, ধর্মাচার) ছিল সর্বদাই গোষ্ঠীকেন্দ্রিত। যূথবদ্ধতার এই ধারাটাই আদিম-সংস্কৃতির কাল থেকে লোকসংস্কৃতির স্তর পর্যন্ত বজায় থেকে গেছে। লোকসঙ্গীতে এক-এক সময়ে একক উপস্থাপনা থাকলেও সেটাও প্রয়োগ-ও-গোষ্ঠীভাবনাতেই প্রবুদ্ধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এককভাবে গেয় লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যটাও গোষ্ঠীরই শরিক।

হরিণ শিকারের জন্য মানুষ যেখানে হরিণের ডাক নকল করেছে এবং তারই মতো সেজেছে, হাবভাব নকল করেছে - সেখানে সক্রিয় ছিল বিশেষ একটি মানসিকতা : শিকার জুটিয়ে দেন যে-সব অলক্ষ্য, অদৃশ্য শক্তি (মান্যা; জাদু ; অথবা দেবতা) ঐ সব নাচ-গানের ফলশ্রুতিতে, তাঁদের 'কৃপায়' আসল হরিণরা নাগালের মধ্যে এসে যাবে বলেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন। এই অলৌকিক-তথা-ধর্মপ্রত্যয়ের অনুসূত্রেই সমস্ত

ব্যাপারটুকুই একটা 'রিচ্যুয়াল'-এ পরিণত হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা যায় : কালক্রমে নৃত্য রূপান্তরিত হল 'মাইম', অর্থাৎ অনুকরণমূলক-আচরণে এবং গান, প্রথমে মন্ত্রে এবং তারপর সংলাপে পরিণতি পেল। নাট্যকলার প্রাথমিক পর্বেও, দেবাতাদের মনস্তুষ্টির ব্যাপারটা অবশ্য থেকেই গেল . শিকারের উপলক্ষ থেকে শুরু করে ফসলের প্রার্থনা, সন্তানের আকাঙ্ক্ষা-প্রভৃতি বিষয়ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে-হতে অবশেষে মন্দিরে নাট্যভিনয়ের সূত্রপাত হল। কৃষিব আবির্ভাবের পরিণামে এক সময়ে শ্রেণীভিত্তিক শাসনব্যবস্থারও সূচনা হয়েছে, অর্থাৎ, লোকায়ত জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশীলিত সংস্কৃতির বাহিরাঙ্গিক রূপটিও তৈরি হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতে এবং গ্রীসে মূলত দেবমন্দিরকে কেন্দ্র করেই তো অভিনয় কলার ধ্রুবপদী ধারাটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু লোকায়ত স্তরেও, নৃত্য-গীতেব মতোই নাট্যভিনয়ের ধারাটিও অব্যাহত থেকে গেছে। তাদের কথা, পরে। বরং, গ্রীক নাট্যকলার কথাই আগে বলি : আর্তেমিস দেবীর দেল্‌ফীস্থিত মন্দিরে ছাগ (ত্রাগোস, গ্রীক ভাষায়) বলিদান করে দেবীর মনস্তুষ্টির জন্য যে-অনুষ্ঠান করা হতো, তারই নৃত্য-গীত-অনুকরণ-মূকাভিনয়-সংলাপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে নিবেদিত হতো যে-শিল্পকৃতি সেটার নামই ছিল ত্রাগোদেইয়া; ইংরেজিতে, ট্রাজেডি। আদিম পশুশিকারই বিবর্তিত হল ছাগবলিতে ; জীবিকার্জনের নিমিত্তে আয়োজিত অনুকৃতিমূলক জাদু পরিণত হল পূর্ণাঙ্গ অভিনয় শিল্পে।

ভারতের ক্ষেত্রেও এই মূল ছকটি পৃথক নয়। আমাদের ঐতিহ্যাশ্রিত ধ্রুবপদী মন্দির-নৃত্যের মধ্যে প্রায় সবগুলিই অভিনয়ধর্মী। এদের মধ্যে ভারতনাট্যমের নামটিই তো ঐ অভিনয়-ঋদ্ধি সূচিত করেছে। সে-নাট্যগুণ থেকে কত্থক, কথাকলি, ওড়িশী, কুচিপুড়ি-কোনওটিই বঞ্চিত নয়। এমন কি, ধ্রুবপদী ভারতীয় নৃত্যধারার মধ্যে যেটি মূলত মন্দির-কেন্দ্রিক নয়, সেই মণিপুরী নাচের মধ্যেও অভিনয়াংশ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মণিপুরী ধারার লাইহারুবা, মাঙ্গৈবী কিংবা রাসনৃত্য কি ননীচুরি-নাচ — কোনওটিই এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকী, প্রাচীন বাংলার নিজস্ব নৃত্যকলা যা ছিল (এ নিয়ে বর্তমানে ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় অন্বিষ্টভাবে রিসার্চ করছেন), তারও মধ্যে যে অভিনয়ের দিকটাও গরহাজির ছিল না, তা তো মনসামঙ্গলে দেবসভায় (মন্দিরে) বেহুলার নৃত্য করার যে বর্ণনা দেখা যায়, তার মধ্যেই প্রমাণিত হয় সুনিশ্চিতভাবে।

সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারানুসারে মন্দির থেকে শ্রেণীপ্রভুদের ক্ষমতার কেন্দ্র সরে গেছে রাজসভায়। সুতরাং নাট্য-নৃত্যের পৃষ্ঠপোষণার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকাই হয়ে উঠল মুখ্যতর। লোকায়ত জীবনের জীবিকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্যা যখন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের কাঠামোয় পরিশীলিত হল তখন তার অনুধ্যানের জন্য গ্রামার তথা তত্ত্ববিধিও গড়ে তোলা হল, সমস্ত বিষয়টিকে সাধারণের অনধিগম্য করে রাখার জন্যই ! অতএব গড়ে উঠল ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং আরিস্ততলের 'পোয়েতিকস' । সহজাত-স্ফূরণে সরল, আদিম, জাদুবিশ্বাসেব অভিব্যক্তি হিশেবে জীবিকার প্রত্যাশায় যে শিল্প প্রাথমিকভাবে একসময় গড়ে উঠেছিল, সেইটাই বিবর্তিত হল অবসরভোগী উচ্চবিত্ত

নিশ্চিত-ভবিষ্যৎ-সম্পন্ন ওপরতলার মানুষের-চিত্তবিনোদনের মাধ্যম রূপে। রাজপ্রসাদধন্য চেটী, নট, নর্তকী, গণিকা, দেবদাসী (ভারতে), হেতাঈরী (গ্রীসে), গেঈশা (জাপানে) এবং অন্যত্রও অনুরূপ-বৃত্তিসম্পন্ন নরনারীরা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নাট্য-নৃত্য ধারাকে লোকসাধারণের প্রাত্যহিক জীবিকা ও জীবনচর্যা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। লোকনাট্য-লোকনৃত্য-লোকসঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে ধ্রুবপদী প্রয়োগকলাগুলির বাহিরাঙ্গিক বিচ্ছেদটুকু ঘটল তারপরেই। কিন্তু লোকায়ত শিল্পধারাগুলি মানুষের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় থাকে বলেই, তাদের অস্তিত্ব এ সত্ত্বেও অটুট রয়েই যায়। জীবনের সেই প্রাত্যহিক চর্যাই তাদেরকে প্রবুদ্ধ করে ধর্ম, প্রেম, সমাজ, সুখ, শোক নিয়ে গান বাঁধতে, আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হিশেবে নাচকে ব্যবহার করতে; আর জীবনের আরশি হিশেবে সমাজের মুখকে লোকনাটকে দেখতে এবং দেখাতে।

খ. লোকসঙ্গীত

আদিম-সঙ্গীতকলার আদলেই আদিবাসীদের সঙ্গীতও পুরোদস্তুর গোষ্ঠীশিল্প হিশেবে বিবর্তিত হয়েছে। লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে গিয়ে অবশ্য একক বা দ্বৈত গানের উদ্ভব ঘটেছে ; কিন্তু সেও গোষ্ঠী-ঐতিহ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রায়োগিক-বিধিবিধানকে অতিক্রম করে নয়। এককভাবে একজন শিল্পী (গীতিকার-সুরকাব-গায়ক এসব ক্ষেত্রে অভিন্নই হয়ে থাকেন) একটা বিশেষ-উপলব্ধির অভিপ্রকাশ হিশেবে হয়ত একটা গান বেঁধে ফেললেন। সেই সৃজন কিন্তু শব্দ, চিত্রকল্প এবং সুরের ক্ষেত্রে তাঁর পরম্পরাগত-ঐতিহ্যের বাইরে যায়না কখনওই। এবং একজন বিশেষ শিল্পী ঐ গান বাঁধলেও তারপরে সেটা হয়ে পড়ে সমস্ত গোষ্ঠীরই যৌথ-ঋকৃথস্বরূপ। সকলেই তারা মালিক ; সবাই সেটার ব্যবহারকারী, তা সে এককভাবেই হোক, কিংবা যৌথভাবে।

লোকসঙ্গীত স্রষ্টার ঐ বিশেষ-উপলব্ধিটা কেমন কবে শিল্পে রূপায়িত হয় তার একটা সুন্দর বর্ণনা সি এম বাওরা তাঁর 'প্রিমিটিভ সং' (নিউইয়র্ক, ১৯৬৩) বইতে উদ্ধৃত করেছেন কে রামুসেনের লেখা 'দ্য নেট্সিলিক এসকিমোজ' (কোপেনহ্যাগেন, ১৯৩১) গ্রন্থ থেকে। এস্কিমো গায়ক (যিনি আবার শিকারজীবীও বটেন) ওর্পিংগালিক গানের সৃষ্টি কেমনভাবে হয় তাঁর মনে, সেইটে রাসমুসেনকে বোঝাতে গিয়ে কতকগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন, যা এখানে পুনরুদ্ধৃত করা একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। ওর্পিংগালিক যা বলেছিলেন তার মূল কথা :

'গান হল মনের ভাবনা। মানুষ যখন বিরাট কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সাধারণ সংলাপের মাধ্যমে সেই ভাবনাকে বোঝানো যায় না, তখনই আসে গান — নিঃশ্বাসের মতো স্বচ্ছন্দ হয়ে। স্রোতের জলে-ভাসা বরফকুচির মতো ভাবনাগুলো ইতিউতি যেতে চায়। আনন্দ হলে, ভয় ধরলে, দুঃখ পেলে মানুষের ভাবনারা এক শক্তির প্রবাহে বহে চলে । বন্যার মতো ভাবনাগুলো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাব হাঁপ ধরে, বুক ঢিপ্ঢিপিয়ে ওঠে। আবহাওয়ার মধ্যে থেকে কি যেন একটা এসে তাকে থ' বানিয়ে রাখে। আমরা সব সময়েই নিজেদেরকে খুব তুচ্ছ বলে ভাবি; ঐ রকম সময়ে যেন আরও তুচ্ছ বলে মনে হয় নিজেকে। কথার ব্যবহারে তখন ভয় ধরে। কিন্তু কথারা তখন আপনা-আপনিই এসে যায়। যে কথাগুলো মেলে ধরতে চাই, সেগুলো তখন নিজেরাই গানের মূর্তি ধরে।' (পৃ. ৪১) এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিশেবে একজন শিল্পী যখন একটি গানকে গড়ে তুলে উপস্থিত করেন তাঁর গোষ্ঠীসমাজে— তখন তার প্রায়োগিক অভিব্যক্তিগুলো কিন্তু পরম্পরাগত ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেই প্রকাশিত হয়। এর ফলে সেই গানটিকে গাইতে গোষ্ঠীর কেউই অসুবিধা অনুভব করেন না। যে বিশেষ উপলক্ষে গানটির উদ্ভব, সেইটি সবাই মিলে উদ্‌যাপনের সূত্রে তারপর থেকে গানটিও ব্যবহৃত হতে থাকে তাঁদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই।

এই 'ব্যবহৃত হওয়া'-র সঙ্গে শ্রম ও তার সম্পাদনা-পদ্ধতির একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। শ্রমের কর্মধাবা এবং মানুষের সৃষ্টির আবেগকে একত্র কবে ঐ গানগুলি। শ্রমেব কর্মধারা শুভাশুভকে উপলক্ষ করে ও-দুয়ের মেলবন্ধন ঘটে। শিকার করা, ফসল বোনা শস্যসংগ্রহ - প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক-উপলক্ষগুলি তো বটেই, এমন কী শিশুর জন্ম,

কিশোরীর রজোদর্শন, তরুণ-তরুণীর বয়ঃসন্ধি-উত্তরণ, বিবাহ, গর্ভাধান, বৃদ্ধের মৃত্যুপ্রতীক্ষা এবং গোষ্ঠীর কারুর প্রয়াণে শোকপালন — প্রভৃতি অজস্র অন্যান্য বিষয়ও নৃত্যগীতের এক-একটা পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে : আদিমসমাজ, আদিবাসী সমাজ এবং লোকসমাজ — কোনও ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। জীবনচর্যার বিচিত্র উপলক্ষগুলিও এভাবেই সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। অর্থনৈতিক-উপলক্ষগুলির মতো ঐ সব 'রাইটস দ্য প্যাসাজ'গুলিও (জীবনের পর্ব বদলের আচারবিধান) ছোটবড় উৎসবের কারণ হিশেবে ধার্য হয়। এই সূত্রে ক্রিস্টোফার কডোয়েলের একটি খুব প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তাঁর 'ইল্যুশ্যন অ্যান্ড রিয়্যালিটি' (লন্ডন, ১৯৩৭) বই থেকে এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"উৎসবের সময়ে প্রয়োগকলার মাধ্যমে সংসাধিত সমবেত ভাবের আবেগ, শ্রমের গুরুভারকে হালকা করে দেয়। এর ফলে শ্রমপ্রক্রিয়াটা আরও ভালভাবে পরিচালিত হতে পারে। যেমন জমিতে নিড়েন-দেওয়া, হাল-চষা, বীজ-ছড়ানো, ফসল-কাটাই-ঝাড়াই-এবং-মাড়াইয়ের শ্রমসাধ্য কাজগুলি সবাই মিলে করে যেহেতু, এবং যেহেতু একই সঙ্গে সুরেলা শব্দবিন্যাস (অর্থাৎ, 'গান' : লেখক) তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাই তার নান্দনিক অভিভব এবং প্রায়োজনিক তাৎপর্য এক হয়ে গিয়ে গোষ্ঠীর সামূহিক আবেগকেই ব্যক্ত করে।" (২য় পরিচ্ছেদ; পৃ. ২৮)

প্রত্যক্ষ-অর্থনৈতিক-উপলক্ষ নয়, এমন-সব ক্ষেত্রেও ঐ নান্দনিক এবং প্রায়োজনিক বিষয়গুলি সমন্বিত হয়। প্রাক্তন-জাদুবিশ্বাসের ব্যাপারটি এই-সব উপলক্ষেও ঐ অর্থনৈতিক-উপলক্ষগুলির মতোই অটুট থাকে, তবে আপাতভাবে এই-সবগুলিতে রিচুয়াল-ওরফে ধর্মাচারের অভিঘাতটিই থাকে প্রবলতর শক্তি হিশেবে। জাদুবিশ্বাস-শ্রমপ্রক্রিয়া-ধর্মাচার-নান্দনিকতা -ইত্যাদি বিষয়গুলি গোষ্ঠীজীবনের ঐ সঙ্গীতকলার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত এখানে তার রেখচিত্রটি অনিবার্য হযে ওঠে অতঃপর, কারণ সেটি না-দেখলে সমস্ত ব্যাপারটিই অনচ্ছ হয়ে রইবে :
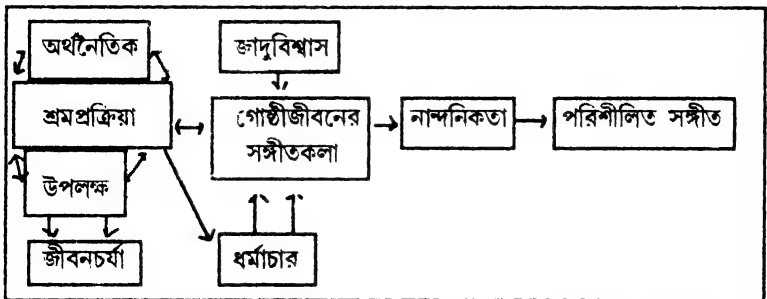
অর্থনৈতিক-উপলক্ষ এবং জীবনচর্যা, এরা আবার সময়ের বিবর্তনে শ্রেণীচেতনার অভিজ্ঞানকেও রূপায়িত করে। তখন লোকসঙ্গীত আরও একটি নূতন মাত্রাতে অন্বিত হয়। এইসব ক্ষেত্রে কখনও-কখনও লোকগীতি একক বা দ্বৈতকণ্ঠের সৃষ্টিরূপেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখও তখন ঐ লৌকিক ঐতিহ্যের শিল্পকলায় এক ধরনের সর্বজনীন আবেগের সৃষ্টি করে: এই সমস্ত কারণেই লোকসঙ্গীতের রূপটি প্রতিভাত হয় বহুমাত্রিক হয়েই।

।। ২ ।।

লোকসঙ্গীতের তাত্ত্বিক অভিজ্ঞানটি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবার আগে তাকে সুর এবং কথা — এই দুই পৃথক মাত্রার প্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। আঙ্গিকগতভাবে লোকসঙ্গীতের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধি আছে, যা তার ঐ সুর এবং ভাষা দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন কিছু-কিছু বিধিগত ব্যাপারও আছে, যা আবার সুর-এবং-কথা দুটিকে একত্রে ধরেই বিচার করতে হয়।

লোকসঙ্গীতবিজ্ঞানী সেসিল শার্প, এইরকম যুগলমাত্রিক বিশিষ্টতা হিশেবে তিনটি লক্ষণকে চিহ্নিত করেছিলেন বহু বছর আগেই : 'কনটিন্যুইটি' (ধারাবাহিকতা); 'ভ্যারিয়েশ্যন' (পার্থক্য); সিলেকশ্যন (নির্বাচন)। এই তিনটি স্তম্ভের ওপর 'আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত পরিষদ' একটি সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন :

''মৌখিক প্রতিবেদনের মাধ্যমকে অবলম্বন করে যে-সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়েছে। লোকসঙ্গীত হল তারই জাতক। যে-বিশেষ বিষয়গুলি ঐ ঐতিহ্যের কাঠামোকে গড়ে তুলেছে, সেগুলি হল : ক. 'ধারাবাহিকতা, যা অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে অনবচ্ছিন্নভাবে জুড়ে রাখে ; খ. 'পার্থক্য', যা ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির সৃজনী-আবেগ থেকে জন্মায় ; এবং গ. 'নির্বাচন,' যা সংসাধিত হয় গোষ্ঠীর দ্বারা — যার সূত্রে সেই-সব-প্রকরণগুলিই নির্দিষ্ট হয়, যারা সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখে।

'লোকসঙ্গীত' এই অভিধাটি 'জনপ্রিয়' কিংবা 'শিল্পিত গীতি'র দ্বারা অপ্রভাবিত কোনও গোষ্ঠীর নিখাদ -প্রাথমিক স্তরের গান সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই গান কোনও একক গীতিকার (সুরকারও) রচনা করেন তারপর সেটি সমগ্র গোষ্ঠীরই অলিখিত কিন্তু সজীব ঐতিহ্যের অর্ন্তগত হয়ে যায়।' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস: 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম', ১৯৭৮ -গ্রন্থে সংকলিত মূল প্রতিবেদনের অনুবাদ ; পৃ. ৩৩)

এই সংজ্ঞাটি হয়ত লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রযোজ্য না-হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে বিচার করলে এটির ব্যাপ্তিই বৃহত্তম বলতে পারি। পরিশীলিত-সঙ্গীত (আর্ট মিউজিক) এবং জনপ্রিয়-সঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের পার্থক্য কী-কী এই সূত্রে সেটিও একবার দেখা বাঞ্ছনীয়। পরিশীলিত সঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের কাঠামোর ওপরই তার সৌধটি গড়ে তোলে। তারও একটা ঐতিহ্য তৈরি হয় ক্রমে-ক্রমে, কিন্তু সেটা যৌথ গোষ্ঠীজীবনের প্রয়াসে বা পরিণামে নয়, মূলত ব্যক্তিক শৈলীর পটুত্বে। ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুবপদী গানের ক্ষেত্রে — অন্তত ভারতীয় সঙ্গীতে — 'স্কুল' -ওরফে-'ঘরানা' সৃষ্টি হয় এক-একজন বড় মাপের শিল্পী এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে। কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়া বা শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হওয়ার ফলে, সেই 'ঘরানা'-কে লোকসঙ্গীতের মতো গোষ্ঠীজীবনভিত্তিক বলে ধার্য করা সম্ভব নয়। তা ছাড়াও আর একটা কথা আছে; লোকসঙ্গীতেরও নিজস্ব গায়কী থাকে — যা তার আর্থ-পরিবেশিক প্রেক্ষিতের উৎসজ। মার্গ সঙ্গীতের কিংবা অন্যবর্গের পরিশীলিত গানের গায়কীর ক্ষেত্রে এই রকম কোনও অপরিহার্য শর্ত থাকেনা। সেখানে থাকে সূক্ষ্ম-এবং জটিল কিছু তাত্ত্বিক-প্রক্রিয়া, যাকে ঐ গানের 'গ্রামার' বলেও মনে করা যায় স্বচ্ছন্দে। আর পাশ্চাত্ত্যের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত তো

সম্পূর্ণরূপেই একক-প্রতিভা-নির্ভর। 'গ্রামার' সেখানেও আছে, তবে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতসুলভ 'ঘরানা'-র ব্যাপারটা পাশ্চাত্ত্যে প্রায় অপ্রাপ্যই।

পপুলার - বা - 'জনপ্রিয়' সঙ্গীতের সঙ্গেও লোকসঙ্গীতের ফারাক যেটা, সেটাও অনেক সময়ে উপেক্ষা করা হয়। চলচ্চিত্রের গান, কিংবা 'পপ্-সং' অথবা দেশি-বিদেশি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভেঙে বহু রকমের সুরের বিমিশ্রণ ঘটানোর লব্ধফল - হিশেবে এই 'পপুলার মিউজিক'-এর ধাবা বহমান থাকে। বহুজন-গ্রাহ্যতা এবং বহুজন-ব্যবহার্যতা থাকলেও, এর মধ্যে কোনও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ব্যাপার নেই এবং গোষ্ঠীজীবনের কোনও - কিছু উপলক্ষেই এগুলি জীবনচর্যা, শ্রমপ্রক্রিয়া, রিচ্যুয়াল কিংবা উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত থাকেনা। ... অর্থাৎ, লোকসঙ্গীতের সঙ্গে এর যেটা তফাৎ, সেটা পুরোপুরিই মূলগত। জনপ্রিয়-সঙ্গীত, গোষ্ঠীর ঋক্‌থ হতে পারে, কিন্তু গোষ্ঠীর লালন-পালন তার জোটেনা — এবং তার প্রচারের উৎস মূলত বৈদ্যুতিন্ মাধ্যম : রেডিও, টি-ভি, সিনেমা এবং ক্যাসেট। অর্থাৎ, এর মৌলিক চরিত্রটা সম্পূর্ণই একালীন, চিরাভ্যস্ত সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাপারটি এর মধ্যে মেশেনা।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'ঘরানা'-র যে কথা এখনই উল্লেখ করেছি, লোকঙ্গীতের 'স্কুলিং'-এর ব্যাপারে সে-রকম কিছু-একটা সুনির্দিষ্ট শব্দ প্রচলিত নেই। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে মৃদু পরিহাসের ভঙ্গীতে 'বাহিরানা' বলে একটি শব্দ চয়ন করেছেন, যেটি কিন্তু সুন্দরভাবে ঐ অভাবের পূরণ করে। এই 'বাহিরানা' চিহ্নিত হতে পারে বিশিষ্ট কয়েকটি স্বরের (স-র-গ-ম ইত্যাদি) নির্দিষ্ট বিন্যাসে, উচ্চারণভঙ্গী, গায়কী, ছন্দোভঙ্গিমা-প্রভৃতি একদিকে, আর অন্যদিকে একান্তভাবেই বিশিষ্ট কোনও আর্থ-সামাজিক-পরিবেশিক (এককথায় আঞ্চলিক) নিজস্বতার সমন্বয়ে ।

কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। যে-অঞ্চলের গান, সেখানকার ভৌগোলিক-পরিবেশ, সামাজিক-পটভূমিকা, ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্ট কিছু শ্রমপ্রক্রিয়া এবং ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার-ইত্যাদি বিষয় মিলে-মিশে তার 'নিজস্বতা' গড়ে ওঠে সুরে, কথায়, এমন কী লয়েও। ...সুর-তালের কথাটাই আগে বলি; কথার আলোচনা পরে।

সাধারণত (অবশ্যই ব্যতিক্রমও আছে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ; সেই কথায় পরে আসব) দেখা যায় যে আদিমতম সঙ্গীত ছিল একস্বরিক, অর্থাৎ, 'মনোটোনিক' : আদিবাসী জীবনে সুরের চলাফেরা সচারচর ঘটে মাত্র দুই বা তিনটি স্বরের মধ্যে, অর্থাৎ 'বাইটোনিক' কিংবা 'ট্রাইটোনিক' (ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে এই তিন ধরনের সুরের নাম যথাক্রমে, 'আর্চিক' 'গাথিক' এবং 'সামিক')। লোকায়ত স্তরের সুর তিন-চার স্বরের মাধ্যমে তৈরি হয়। তার পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে সুরবিন্যাস সূক্ষ্ম এবং জটিল হয়, অর্ধস্বর (কোমল এবং কাড়) বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে ; বৈয়াকরাণকভাবে বাধবদ্ধ সঙ্গীতেব শাস্ত্রীয়রূপটি গড়ে-তোলা হয়। এটাই হল মার্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের প্রত্নপ্রতিমার উপরে যা প্রতিষ্ঠিত ।

ভাবতীয় মার্গ সঙ্গীতেব রাগ-রাগিনীর নামকবণে এই ব্যাপাবটি স্বচ্ছ হয়ে আছে . ভূপালি; মালব-কৌশিক; জৌনপুরী; বৃন্দাবনী সারং; গৌড়মল্লার; পাহাড়ী- ঝিঁঝিট;

দেশ; দেশী; গৌড়সারং — এরা সবাই আদিতে ছিল আঞ্চলিক লৌকিক সুরই।

ঐ যে তিন- বা-চারটি স্বরের সুরকে ('ট্রাইটোনিক', 'টেট্রাটোনিক') সম্বল করে লোকসঙ্গীতের এক-একটি বিশেষ ধারা বিকশিত হয় নিজস্ব সব 'বাহিরানা'-র আওতায়, তাদের মাধ্যমেই আঞ্চলিকতার প্রয়োগকেন্দ্রিত পরিচয় ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেটাই এক-এক প্রকরণের গানের নিজস্ব গায়কী। ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালীর মতো একান্ত ভাবেই অঞ্চলবন্দী গানের প্রসঙ্গ যদি উদাহরণ হিশেবে ধরা হয়, তাহলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । ভাওয়াইয়ার যেটা একান্তভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, একস্বর থেকে অন্য স্বরে সরে যাবার সময়ে ধ্বনিবিক্ষেপের সঙ্গে যে একটা বিচিত্র ধবনের মোচড় শোনা যায় — যাকে হঠাৎ গলা-ভেঙে -যাওয়া বলে মনে হলেও আসলে সুরের রেশটা কিন্তু অক্ষুণ্ণই থাকে — তার কারণ হল ঐ গানের প্রচলনভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং যাঁরা গানটা করেন, তাঁদের অর্থনৈতিক, শ্রেণী-অবস্থানের ব্যাপারগুলি।

ভাওযাইয়ার যা প্রধান এলাকা, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা আর বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর (আসামের গোয়ালপাড়াতেও এই গানের চল্ আছে) — এই দুই অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশেব মধ্যে কিছুটা ফারাক আছে। বাংলাদেশের জেলাদুটি মোটমুটি ভাবে সমতল অঞ্চলে অবস্থিত, পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলার অনেকটাই তবাইয়ের আরণ্যক - পর্বতাঞ্চলের সীমানাভুক্ত এবং গোয়ালপাড়াও বহুলাংশে পাহাড়িয়া এলাকা। এই অঞ্চলের অরণ্যে-প্রান্তরে-পর্বতসানুতে খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলির প্রতিবেশে মুক্ত কণ্ঠে ভাওয়াইয়া গান গাইবার সময়ে শিল্পীরা ঐতিহ্যাগত ভাবে, প্রতিধ্বনি ফিরে-আসার সময়ে স্বরের যে-অনিবার্য ঝাঁকিটা সৃষ্টি হয়, সেটার সঙ্গে মানানসই করেই সুর সৃষ্টি করেন এবং ঐ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুষঙ্গে ধীরে-ধীরে সেটাই ভাওয়াইয়ার অনন্য-বৈশিষ্ট্য ঐ 'গলা-ভাঙা'-তে পরিণতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের দুই জেলায় শিল্পীরা মূলত সমতল ভূমিতে ধীরগতি নদীর পাড়ে গান করেন বলে, সাধারণভাবে তাঁদের ভাওয়াইয়ায় ঐ 'গলা-ভাঙা' থাকার কথা নয়; কিন্তু এখানেও যে সেটা সমানভাবে প্রচলিত, তার কারণ হিশেবে বুঝতে হবে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উপলক্ষ এবং শ্রমপ্রক্রিয়াব সঙ্গে এই গানের সম্পর্কের ব্যাপারটিকে। কোচবিহার-জলপাইগুড়িতে স্বাভাবিক তৃণসমৃদ্ধির জন্য মহিষচবানোটা একটি মুখ্য উপজীবিকা বলে গণ্য হয় গ্রামের জীবনে। পক্ষান্তরে রংপুর-দিনাজপুরে ঐ একই আর্থ-সমাজিক বর্গের মানুষেরা মহিষের গাড়ি চালিয়ে জীবিকাসংস্থান করেন অনেকেই। গাড়ি-চলার ঝাঁকুনির সঙ্গে-সঙ্গে স্বরের কম্পনটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে এবং উপলক্ষটা পৃথক হলেও, এই গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-টুকু (ঐ'গলা-ভাঙা'-র ব্যাপারটি) এখানেও অটুট থাকে। গোযালপাড়াতে, হাতী-খেদা করতে এবং বুনো হাতীকে পোষ মানাতে, মাহুতের জীবিকা গ্রহণ করেন অনেকেই। মৈষাল-গাড়িয়ালের মতো মাহুতও এই গানেব অন্যতম মুখ্য কুশীলব।

গায়ন-রীতির সঙ্গে আর্থ-পারিবেশিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত এবং

শ্রমপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক যে কী-পরিমাণে ঘনিষ্ঠ সেটি এই ভাওয়াইয়ার প্রসঙ্গে রীতিমতো স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি। শুধু সুরক্ষেপণ বা গায়কীর বেলা নয়; গানের বয়ান রচনার ক্ষেত্রেও এই জিনিষটাই দেখা যায়। ভাওয়াইয়ার সুরের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হল কারুণ্য। একটা বেদনার ভাব এতে সব সময়েই ফুটে ওঠে। এইটা, তিন অঞ্চলের ভাওয়াইয়াতেই মেলে। কিন্তু এই কারুণ্যের বা বেদনার আড়ালে একটা গভীর দুঃখবোধ থাকে, যার উৎসে আছে সামাজিক শোষণ। দিনেব পর দিন, স্ত্রী বা প্রেমিকাকে ছেড়ে ধনী-ভূস্বামীর মহিষ-বাথানে কিংবা চারণভূমিতে কাটান যাঁরা নেহাৎই রুজির তাগিদে, তাঁদের সেই বিচ্ছেদের হতাশাই ভাওয়াইয়ার সুরে এবং কথায় ব্যক্ত হয়। ''মৈষাল বোন্ধু''-র মতোই ''গাড়িয়াল বোন্ধু''-রাও ঠিক একইভাবে মালিকের মুনাফার, জন্য মহিষের গাড়ি চালিয়ে দূর-দুরান্তরে যান দয়িতাকে ছেড়ে। সেই রকমভাবেই গোয়ালপাড়ার 'মাহুত বন্ধু'-রাও জীবিকার দায়ে গৃহ ও প্রণায়িণীকে ছেড়ে দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে বাধ্য হন। আর তাই, একই বিরহের কষ্ট কথায় এবং সুরে, রংপুর-দিনাজপুর-গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়াতে অনিবার্য ভাবেই মেলে। এখন দুই দেশ হয়ে গেছে ; কিন্তু কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-রংপুর-দিনাজপুর যখন অখণ্ড বাংলার অংশ হিশেবে গণ্য হতো, তখন এক মরশুমের মৈষালি-করা ''বোহন্ধু''-রা (ভাওয়াইয়ার নিজস্ব উচ্চারণরীতিতে বললে এই রকমই শোনায়) অন্য মরশুমে গাড়িয়ালি করতেন। ফলে পার্বত্য-অঞ্চল কিংবা সমতলীয়-অঞ্চলে যে -প্রাকৃতিক ফারাকটাই থাকুক না-কেন, আর্থ-সামাজিক বৃত্তটা ছিল একই। আর এইভাবেই ভাওয়াইয়ার বিকাশ ঘটেছে সুদীর্ঘ সময়ের আবর্তন । মাহুত, গাড়িয়াল এবং মৈষাল আর তাঁদের দয়িতারা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পটভূমিকা, সামাজিক প্রেক্ষিত এবং শ্রমপ্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে ভাবে, সুরে ও কথায় একটি অনন্যরহিত লোকসঙ্গীতের ধারাকে সংগঠিত করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত কিছু আবেগের অভিব্যক্তি হিশেবে। এইটা ঠিক কীভাবে সম্ভব হয়ে-ওঠে, তা তো ওর্পিংগালিকের যে-জবানী কিছু আগে উদ্ধৃত করেছি , তার আলোকে সমস্ত ব্যাপারটুকু বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি-প্রেরণার ঐ অন্তর্কাঠামোটা অবশ্যই বিশ্বজনীন, যদিচ সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়ের গীতধারারই অনন্য পার্থক্য থাকে ; এমন-কী, একই বলয়ের অন্তর্গত উপবলয়গুলিতেও এর ব্যতিক্রম দেখিনা।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য লোকসঙ্গীত-প্রকরণ যেমন ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গে তেমনই ভাটিয়ালী এবং পশ্চিমবাংলায় ঝুমুর। অবশ্য ঝুমুরের প্রকরণ অনেক বেশি বিচিত্র এবং আদিবাসী ও লৌকিক দুই সাংস্কৃতিক স্তরেই ঝুমুরের প্রচলন দেখা যায় — আর কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদের মধ্যে ঝুমুরের চলন নেই — কিছু-কিছু রূপান্তর সহ, আদিবাসী-ঝুমুর আরও পশ্চিমে বিস্তৃত; ছোটনাগপুর, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা অবধি তো বটেই, এমন কী ছত্তিসগড় পর্যন্তও ঝুমুরের একটা-না-একটা প্রকরণ শোনা যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং কর্মপ্রক্রিয়ার যুগ্ম-অনুষঙ্গে গড়ে উঠেছে ভাটিয়ালী গানও। সমগ্র পূর্ববঙ্গে না-হলেও, ঢাকা-মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা-প্রভৃতি জেলার এক-একটি বৃহৎ-বৃহৎ অংশ ভাটিয়ালীর এলাকা। নদীপ্রধান অঞ্চলের এই গান মূলত নৌকার মাঝি-

মাল্লারাই গেয়ে থাকেন। ভাটির টানে নাও যেমন ভেসে চলে তেমনই নদীর ধীর স্রোতের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে মানিয়েই গড়ে উঠেছে ভাটিয়ালীর সুরের কাঠামো : এক স্বর থেকে আরেক স্বরে গড়িয়ে যাবার সময়ে ঐ বহতা- স্রোতোধারারই মতো সুরের মধ্যেও অবাধ একটি গতিপ্রবাহ থাকাই ভাটিয়ালীর বৈশিষ্ট্য। মাঝে-মাঝে যে ভাটিয়ালীতে এক-একটা মৃদু ঝোঁক্ বা 'স্ট্রেস্' পড়ে, সেটা নৌকা অবিরাম ভাসার মধ্যেও কখনও-কখনও দাঁড়ের টান-পড়ার অনুসূত্রেই তৈরি।

শ্রমপ্রক্রিয়ার ধীরতা কিংবা দ্রুততা কীভাবে আনুষঙ্গিক গানের চলনটাকে নির্দিষ্ট করে দেয়, ভাটিয়ালীর পাশাপাশি প্রচলিত ঐ-একই অঞ্চলের সারি গানের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা বেশ বোঝা যায়। সুরের অন্তর্কাঠামোয় বিশেষ ফারাক নেই, কিন্তু সারির সঙ্গে ভাটিয়ালীর মূল পার্থক্য হল লয়ে, চলনে। অত্যন্ত দ্রুত দাঁড় ফেলে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ভাটিয়ালীর মতো ধীর লয়ে গান গাওয়া অসম্ভব যেহেতু, তাই দাঁড়-ফেলার ঝোঁকে-ঝোঁকে গান গাইতে গেলে লয়টা অনেক দ্রুত করতেই হয়। এবং তখনই ভাটিয়ালীর পরিবর্তে 'সারি' গান এসে যায় [illegible] কণ্ঠে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপারটি ভাটিয়ালীকে কীভাবে প্রভাবিত করে যে, তার স্বরূপটি আবার ব্যক্ত হয় এই গানের সুরের বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করলে। মধ্য সপ্তকে সুরের মুখবন্ধ হয়ে, তারপরে এটি ক্রমশ তারসপ্তকে অগ্রসর হয় এবং একটি কোনও বিশেষ স্বরের ওপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ সুরেলা টান দেবার পরে, আবার নেমে আসে মন্দ্র সপ্তকে; অধিকাংশ সময়েই ধীরে-ধীরে, কখনও বা হঠাৎ। নদীর প্রবাহের সঙ্গে ভাটিয়ালীর চলনের যে-তুলনা করা হয়েছে, এইটিই তার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

ভাটিয়ালীও মূলত বিরহের গান। তবে এখানে ভাওয়াইয়ার মতো জীবিকান্বেষণের ফেরে পড়ে নিরুপায় হয়ে 'মৈষাল-কি-গাড়িয়াল-কিংবা-মাহুত বন্ধুদের' এবং তাঁদের দয়িতাদের পারস্পরিক আকুলতা নয় — সাধারণভাবেই ঘর-বাড়ি-পরিজন-পরিবার ছেড়ে থাকার একটি বেদনাই এর মধ্যে প্রবলতর।

ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালী, দুইয়ের ক্ষেত্রেই একটা কথা কিন্তু বুঝতে হবে। শুধু মৈষাল-গাড়িয়া-মাহুতরা এবং তাঁদের দয়িতারাই ভাওয়াইয়া গান না, যেমন ভাটিয়ালীও শুধু মাঝিরাই গান না। "কি জাদু বাংলা গানে / গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে/ গেয়ে গান নাচে বাউল / গান গেয়ে ধান কাটে চাষা" — এই কথাগুলির মধ্যে এই ধরনের লোকসঙ্গীতগুলির মূল ভাবটা যথাযথভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, যে-বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এই লোকসঙ্গীত-প্রকরণগুলির উৎসরণ এবং বিকাশ ঘটে থাকুকই না-কেন, কালক্রমে এরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত ধরনের মানুষেরই সাঙ্গীতিক আত্মবিকাশের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে। ফলত, এই কারণেই ভাওয়াইয়া সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের এবং ভাটিয়ালী সামগ্রিক পূর্ববঙ্গেরই লোকজীবনে প্রতিনিধিকল্প গীতধারা হিশেবে প্রতীত হয়েছে।

ঠিক এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের সুবৃহৎ এলাকায় ঝুমুরের প্রচলন থাকার ফলে তাকেই আবার এই অঞ্চলের মুখ্য লোকসঙ্গীত-ধারা বলে ধরতে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি,

ঝুমুর তার বিভিন্ন বৈচিত্রের সূত্রে আদিবাসী এবং লৌকিক স্তরে প্রচলিত আছে এবং আদিবাসীদের ঝুমুরগুলি শুধু এই রাজ্যেই নয়, অন্যত্রও প্রচলিত। বস্তুতপক্ষে, আদিবাসী-সঙ্গীত থেকে লোকসঙ্গীতে বিবর্তন কীভাবে হয়েছে, সেটি অনুধাবন করার পক্ষে 'ঝুমুর' নিঃসন্দেহেই একটা অত্যন্ত আর্কষণীয় উপকরণ।

ঝুমুরের এলাকা (এই রাজ্যে) পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল। এই এলাকায় আদিবাসী বিভিন্ন জাতি — বিশেষত সাঁওতালরা থাকেন। এঁদেরই পাশাপাশি গ্রামীণ বাঙালীরাও থাকেন এবং একটা বৃহৎ ও ব্যাপক সাংস্কৃতিক - বলয়ের মধ্যে এঁরা পরস্পরের প্রতিবেশী হিশেবে রয়েছেন। ফলে করম ঝুমুর, পাতা ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, দাঁড়শালিয়া ঝুমুরের পাশাপাশি নাচ্‌নী ঝুমুর, খেমটি ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, রাস ঝুমুর, বাট ঝুমুর- প্রভৃতিও পারস্পরিক ভাবে যোগাযোগ রেখে একটা অখণ্ড ঝুমুর-বলয় তৈরি করেছে যা আদিবাসী এবং লৌকিক, দু-ধরনেরই ঝুমুরের সমন্বয়ে সংগঠিত।

এইসব বিভিন্নমাত্রিক অভিপ্রকাশের উৎস বিচিত্র এবং বিভিন্ন হলেও তারা মিলেছে একটিই মোহনায়। যেমন করম ঝুমুর সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, পাতা ঝুমুরের সম্পর্ক তাঁদের লোকাচারের সঙ্গে। দাঁড়শালিয়া ঝুমুর একান্তভাবে সামাজিক উৎসব-কেন্দ্রিত কিছু প্রথার উৎসজাত। নাচ্‌নী ঝুমুর এবং খেম্‌টি ঝুমুর আবার পুরুলিয়ারই বিশেষত্ব — যা নাচ্‌নীর জীবিকাগ্রাহিকা মহিলারই গেয়ে থাকেন। প্রতিটির প্রকরণের ঝুমুরের মধ্যে অখণ্ড একটি সুরের কাঠামো আছে, সেটা বললে ভুল হবে ; কিন্তু সুরের অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও, মূলত তাদের মধ্যে একটা ভাবের সৌষম্য তো আছেই। তা ছাড়াও ঝুমুব গানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমবেত কণ্ঠের ভূমিকাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সেখানে নাচেরও (প্রায়শঃ গোষ্ঠীনৃত্য) একটা বিধিমতো চল্ আছে।

এই গোষ্ঠীনৃত্যের ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে এই সঙ্গীতধারার সৃজনে আদিবাসী-সংস্কৃতির অভিঘাতকে সূচিত করে। কোনও-কোনও গবেষক আদিবাসীদের গানকে, বাংলা ঝুমুরের সঙ্গে পৃথক করতে চাইলেও, এই একটি কারণেই তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায়না। ঝুমুর গানের উৎসে আদিবাসী-সংস্কৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতামুখী-শ্যভিনিজম ওরফে উন্নাসিকতা বললে হয়ত অন্যায় হবেনা।

ঝুমুরের সঙ্গে ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালীর মৌলিক পার্থক্য এইখানেই। ঐ ধারাদুটি এককসঙ্গীত হিশেবে প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে। পক্ষান্তরে, ঝুমুরের মধ্যে গোষ্ঠীচরিত্রটা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে, মূলত টাঁড় ঝুমুরের একক গায়নের ব্যাপারটা প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও। এই যূথবদ্ধতা এবং অনেক সময়েই ধর্ম-বা-আচার-ইত্যাদির সম্পর্ক থাকার ফলে (যথাক্রমেঃ ইঁদপূজা, টুসু এবং ভাদু, সয়লা-উৎসব-ইত্যাদিতে) এর লৌকিক চরিত্রের মধ্যে পুরানো ঐতিহ্যের রংটা বেশি গাঢ়। পক্ষান্তরে ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালীর মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত —এগুলোই মুখ্যতর। (এখানে একটা কথা বলা ভাল : রাঢ় বাংলার প্রায় সব ধরনের গানেই গায়নভঙ্গী ঝুমুর-ধর্মী ; তাই ভাদু

টুসু-ইত্যাদির কথা এখানে উল্লেখ করা হল।)

ঝুমুর গানের সঙ্গে ভবপ্রীতানন্দের যোগাযোগটার কথা তুলে অনেকে এর মধ্যে একজাতীয় পরিশীলন থাকার কথা বলেন। কিন্তু ঐ পরিশীলন অনেক পরের জিনিষ; সেই সফিস্টিকেশ্যনের সূত্রেই একসময়ে ঝুমুরের সঙ্গে কীর্তনেরও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সেটি এই আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রাথমিকভাবে ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচের একটা সম্পর্ক থাকার ফলে, ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালীর চেয়ে তার লয় জলদ। একক এবং গোষ্ঠীগত — দু-ভাবেই এই গান গাওয়া হয়, একক কণ্ঠের ঐ দুটি সঙ্গীতধারার সঙ্গে এর এটিও মৌলিক প্রভেদ। ধর্মীয় কিংবা প্রথাগত আচারভিত্তিক কোনও উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হয় যখন, তখনও ঝুমুরের মূল উপজীব্য প্রেমই। অন্যান্যক্ষেত্রে তো এটা প্রায় একমাত্র বিষয়।

বাংলার সংস্কৃতিতে এই তিনটিই প্রধান সঙ্গীত-প্রকরণ। সাধারণভাবে গড়ে-ওঠার অন্তরালে যে-সব উপলক্ষ ক্রিয়াশীল থাকে, এদের তিনটির মধ্যে তাদের বৃহদংশই বজায় আছে । এদের বাইরে উল্লেখনীয় আর যে-সমস্ত লোকসঙ্গীতের ধারা প্রচলিত আছে আমাদেব সংস্কৃতি-বলয়ে, তাদের মধ্যে বাউল ও গম্ভীরার মূল উপজীব্য ধর্মীয় প্রতীতি। গম্ভীরা, আলকাপ-ইত্যাদি একইসঙ্গে লোকসঙ্গীত এবং লোকনাট্য হিশেবে গণ্য হয়। গম্ভীরায় ধর্মীয়-অনুষঙ্গ তার উৎসে থাকলেও পরবর্তীকালে তাব মধ্যে সামাজিক-বিষয়ই প্রধান — যেমন টুসু বা ভাদুগানে মুখ্য হল টুসু-ভাদুকে নিয়ে উৎসব করার উপলক্ষেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক নানান্ বিষয়। এই দুটি উৎসবের সঙ্গে উর্বরতান্ত্রিক ধর্ম-ধারার যোগাযোগ থাকলেও, সঙ্গীতের অভিব্যক্তিতে তার হদিশ কিন্তু মেলেনা। ... এই সমস্ত ব্যাপারটুকু একটি সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে : লোকসঙ্গীতের উৎসারণ যেভাবেই হয়ে থাকুক না - কেন, তার মূল আত্মবিকাশটা ঘটে মানবিক শোক-সুখের আশা -নিরাশারই মধ্যে। লোকজীবনের প্রত্যক্ষ প্রতীতিতেই তার অস্তিত্ব। বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি সুরগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা এই উপলক্ষে বলে নেওয়া হয়ত প্রাসঙ্গিক। বছর পঁয়ত্রিশ আগে প্রখ্যাত আমেরিকান লোকসঙ্গীত গায়ক পীট্ সীগার কলকাতায় একটি আলোচনা সভায় সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সীগার যা বলেছিলেন, তার মূল কথা হল এই : সাধারণভাবে লোকসঙ্গীতে তিন-বা-চারটি পর্দার মধ্যেই সুরের ওঠা-নামার ব্যাপারটা চলমান থাকে। এবং প্রায় সর্বত্রই সেই পর্দাগুলি হল পূর্ণস্বর (ভারতীয় সঙ্গীতে যাদেরকে বলা হয় 'শুদ্ধস্বর' : স - র - গ - ম - প - ধ - ন)। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীতে পাঁচ, ছয়, এমন কী সাতটি স্বর পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এবং, অর্ধস্বর (ভারতীয় গানের পরিভাষায় 'কড়ি' এবং 'কোমল' ঃ ঋ - জ্ঞ - হ্ম)-ব্যবহারের প্রচলনও সেখানে যথেষ্ট। এর সমাজতাত্ত্বিক বা অন্য কোনও কারণ তিনি অবশ্য দেখাননি। কিন্তু এমনটা হবার পিছনে অবশ্যই কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ হেতু আছে। সেটি কী হতে পারে, এখানে তার অন্বেষণ সম্ভবত প্রাসঙ্গিক।

পাশ্চাত্ত্যে যেমন কোর্ট-মিউজিক এবং ফোক মিউজিক, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক আর্থ-

সামাজিক শ্রেণীর শিল্পধারা হয়ে থেকেছে মধ্যযুগ থেকেই, এখানে কিন্তু সেটা হয়নি। মার্গসঙ্গীতের চর্চা করতে গিয়ে এখানে শিল্পীরা লোকায়ত গানের জগৎ থেকে যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি, তার সবচেয়ে বড় কারণ — আমাদের মার্গসঙ্গীতের মূল ভিত্তিটা লৌকিক সুরপর্যায়ের উপরই জটিল-ও-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাসে গড়ে উঠেছে— যে-কথা কিছু আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ফলে এখানে লোকগীতি এবং শাস্ত্রীয়গীতি 'জল-বাতাস-নিরুদ্ধ -পৃথক কামরায়' বন্দী থাকেনি — একটা পারস্পরিক দান-প্রতিদান এখানে বরাবরই চালু থেকেছে। এর ফলে বাংলার নিজস্ব যে ধ্রুবপদী সঙ্গীতের ঘরানা — বিষ্ণুপুরী 'স্কুল', তার গায়ন-রীতির মধ্যে লোকসঙ্গীতের মতো সরল হৃদয়স্পর্শী ছাপ খুঁজে-পাওয়া যায় বৈয়াকরণিক-বিশুদ্ধতার মধ্যেই (যে-জন্য বিষ্ণুপুরী ঘরানা সম্পর্কে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতগুণীরা এক ধরনের উন্নাসিক-অনীহা পোষণ করতেন), ঠিক একইভাবে বাংলা লোকসঙ্গীতগুলিও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করেছে: সে-কারণেই 'পেন্টাটোনিক'- 'হেক্সাটোনিক' - 'হেপ্টাটোনিক' — 'ওড়ব'- 'খাড়ব' - 'সম্পূর্ণ' জাতির লোকসঙ্গীতও এখানে অপ্রাপ্য নয়, যেমন অপ্রাপ্য নয় 'হাফ-নোট্' — 'কোমল' বা 'কড়ি' স্বরের ব্যবহার।

প্রাচীন সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ 'বৃহদ্দেশী'-তে উল্লেখ্য করা হয়েছে ঃ "চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতির্নমার্গঃ — শবর - পুলিন্দ - কাম্বোজ - বঙ্গ - কিরাত - বাহ্লীক - অন্ধ্র - দ্রবিড় - বনাদিষু প্রযুজ্যতে" — বিভিন্ন প্রাদেশিক এবং আদিবাসী সঙ্গীত চারস্বরে গঠিত বলে, তারা মার্গসঙ্গীত নয়। 'বঙ্গ'-এর সঙ্গীতও ঐ তালিকায় রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার লোকসঙ্গীতে, মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে রূপগত দিকে বেশ কিছুটা সদৃশতা যে আছেই সেটা অনস্বীকার্য। বাংলার সংস্কৃতির এ একটি অনন্য বিশেষত্ব। সংস্কৃতির মাধ্যম হিশেবে লোকসঙ্গীতের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে, তার মধ্যে 'কথা'-র ভূমিকা নিয়েও কিছু না-বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুধু সুর নয়, বাণীর মধ্যেও আঞ্চলিকতার ব্যাপারটি লোকসঙ্গীতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ কিংবা তার উচ্চারণ পাল্টে দিলে, অন্ততপক্ষে লোকসঙ্গীত তার স্বকীয়-পরিচয় থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ভাষার ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতে নাগরিক - পরিমার্জনা প্রকৃতপক্ষে একটা অমার্জনীয় ত্রুটি।

এর কারণ, প্রতিটি প্রকরণের লোকসঙ্গীতেরই বাণীর মধ্যে তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি অভিব্যক্ত হয়। বাণীর বদল ঘটলে, সেই পরিপ্রেক্ষাটি আচ্ছন্ন, অন্তত বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া, শুধু সুর- ও - লয়কারীর বৈচিত্র্য ধ্রুবপদী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুখ্য হতে পারে — কারণ সেখানে কথার গুরুত্ব স্বভাবতই কম, গৌণ যদি না-ও হয়। পক্ষান্তরে লোকসঙ্গীতে সুরের, তালের অভিনবত্ব কম বলেই, সেই অভাবের পরিপূরণ ঘটায় কথা। তা ছাড়াও, লোকসঙ্গীত যেহেতু জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত - আবেগের ব্যঞ্জনাকে অভিব্যক্ত করে, তাই গোষ্ঠী এবং তার অন্তর্গত ব্যক্তির সুখ - শোক -আনন্দ - যন্ত্রণা - ক্রোধ - প্রশান্তির আবেগগুলি মূর্তিমন্ত হতে পারে কথার মধ্যেই।

উদাহরণরূপে ধরা যেতে পারে আমাদের বিভিন্ন রকমের লোকসঙ্গীতে প্রচলিত বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দের প্রসঙ্গই। "জীলুয়া বাতাস", "নিধুয়া পাথার", "মাহুত বন্ধু"

"চিকন কালা", "বন্ধুয়া", "নিরলে", "ভাবের দেওরা" — এবং এরকমের আরও অজস্র শব্দের মাধ্যমেই বাংলার লোকসঙ্গীতের নিজস্ব জলমাটিতে -গড়া রূপটি প্রমূর্ত হয়। এদের 'ভব্যকরণ' করতে গেলে অনিবার্যভাবেই লোকসঙ্গীত তার পরিচয়ের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়।

এ হল একটি দিক। অন্যপক্ষে, লোকসঙ্গীতের কথার মধ্যে যে-আবেগ সঞ্চিত থাকে — সেটার মূল্যও অপরিসীম। ভাওয়াইয়া গানে 'ধনীর চাকরি' করতে গিয়ে মাসের - পর - মাস 'বাথানে - থাকা' মৈষালের দয়িতা যখন বলেন "না হইলং মুই ছাওয়ার মাও" কিংবা ভাটিয়ালীতে যখন নৌকার মাঝি ভিন্ন নৌকায় বৃদ্ধ পিতৃব্যকে দেখে গেয়ে ওঠেন, "কইও গিয়া চাচীর কাছে, আল্লা মোরে দিন দিয়াছে, বড় নৌকার মাঝি হইছি," — তখন সেই বাণীর অন্তর্লীন সুগভীর আবেগ শুধু সুরে ব্যক্ত হবার নয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ; বাংলা ও আসাম' (কলকাতা, ১৯৭৮) গ্রন্থে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, এখানে সে কথা খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করতে হয়।

আবার, যখন মিঠে - কথায় ভুলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি আসার পরে কোনও মেয়ে দেখে যে তার স্বামীর প্রাক্-বৈবাহিক সব কথাই ভুয়ো, তখন " মোক ভুলালু সত্তের্ খাড়ু দিয়া" কথাটির তাৎপর্য হয়ে ওঠে অপরিমিত । আবার দালালদের প্ররোচনায় চা-বাগানের কাজে লাগার পর চারিদিকের দুঃসহ পরিবেশ দেখে যখন ঝুমুরশিল্পী গেয়ে ওঠেন "হায় সাহেব কেনারাম — ফাঁকি দিয়া পাঠ্যালি আসাম" — তখনকার আর্তি ঐ গানকে তো বিশেষ একটা মাত্রাতেই অন্বিত করে।

আদিম কালের শিকার ও সংগ্রহ, পরবর্তীকালের কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনচর্যার উপলক্ষে যতকিছু শ্রমপ্রক্রিয়া — সমস্ত মিলেই লোকায়ত জীবনের গানের কাঠামো গড়েছে সুরে, তালে। আর সেকাল থেকে এই আমল অবধি, গানের কথায় সেই জীবনচর্যার স্বচ্ছ পরিচয়টিই উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে অবিরাম গতিপ্রবাহে।

গ. লোকনৃত্য

আজ অবধি সবচেয়ে পুরোনো নাচের ছবি যা পাওয়া গেছে, তার বয়স কমবেশি ২০,০০০ বছর। দক্ষিণ ফ্রান্সের আরীজ্ অঞ্চলের পাহাড়ে বেশ কিছু প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুহা খুঁজে - পাওয়া গেছে, যাদের একটি হল 'ত্রোয়া ফ্রেরে' (বা, তিনভাই ; তিনটি ভাই মিলে খেলা করতে - করতে ঐ গুহাটি খুঁজে পেয়েছিল বলে এই নামকরণ !) — যার প্রবেশ পথের মুখে নানারকমের প্রাণীর ছাল - চামড়া - শিং - ইত্যাদিতে সেজেগুজে একজন নৃত্যরত মানুষের ছবি আঁকা আছে। এইটিই প্রাপ্ত প্রাচীনতম ছবি, যাতে নাচের ভঙ্গীতে অবস্থায় কোনও মানুষকে দেখা যাচ্ছে। ঐ চিত্রমানবটির মাথায় বল্‌গা - হরিণের শিং আঁকা আছে বলেই, এর সঠিক সময়টা চিহ্নিত করা যাচ্ছে ; কেননা শেষ তুষার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে হাজার বিশেক বছর আগে এবং তারপর মধ্য ইউরোপে আর বল্‌গা হরিণদের পাওয়া যায়নি বলেই জীববিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

এই ছবিকে অ্যাবে ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরীজ অব কেভ আর্ট' (১৯৫২) বইতে আদিম মানুষের জাদুনৃত্যের নমুনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

নৃত্যপর মানুষটির যে-বিচিত্র বেশভূষা এবং ভঙ্গিমা ঐ ছবিতে দেখা যায় (লোকশিল্প-সম্পর্কিত আলোচনার 'মুখোশ' অংশটি এই সূত্রে দ্রষ্টব্য) — তাতে গুহাচিত্রকলার এই সর্বজনমান্য বিদ্বানের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মেনে নিতে কোনও ধরনের দ্বিধাই থাকে না।

অর্থাৎ, আদিম পর্বের নৃত্যকলার মধ্যে জাদুসংস্কারের একটি অভিক্ষেপ অবশ্যই ছিল। সেই জাদুপ্রতীতির উপলক্ষ প্রত্যক্ষত যে কী, তার বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী অধ্যায়েই করা হয়েছে। শিকার পাওয়া, রোগ-নিরাময়, ভূতপ্রেত - ইত্যাদির (কল্পিত) এবং হিংস্র জীবজন্তু ও শত্রু গোষ্ঠীর (বাস্তব ও সম্ভাব্য) আক্রমণ প্রতিহত করা, জীবনের নানা - পর্যায়ে উন্নীত হওয়া (যেমন, বয়ঃসন্ধিতে পৌছনো, প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হওয়া, বিবাহ হওয়া, শিশুর জন্ম হওয়া, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে অপেক্ষা করা - ইত্যাদি — যেগুলি 'রাইটস দা প্যাসাজ' বলে নৃতত্ত্বে উল্লেখিত হয়) — প্রভৃতি উপলক্ষেও নাচের একটি অত্যন্ত ভূমিকা ছিল আদিম সমাজে। পরবর্তীকালে কৃষির পত্তনী হলে, চাষবাস এবং সেই সংক্রান্ত বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেও নাচের ব্যাপারটা জড়িয়ে গেছে অনিবার্যভাবেই, কেননা এই ক্ষেত্রেও জাদুর প্রত্যয়টার প্রভাব অত্যন্তই ক্রিয়াশীল। ফলে সময়ের বিবর্তনে নাচের উপলক্ষটা বরং বেড়েই গেছে । এমন কী ধীরে - ধীরে আদিম নৃত্যকলা যখন আদিবাসীদের নাচে পরিণতি পেয়েছে, তখন তার মধ্যে একটি সামাজিকতার দিকও (যা জাদু, ধর্ম কিংবা সংস্কার - নিরপেক্ষ) বিকশিত হয়েছে, যেটা লোকনৃত্যে এসেও অনুপস্থিত নয়। আর তখন এর মধ্যে নান্দনিক ভাবনারও আবির্ভাব ঘটে কিছু পরিমাণে।

।। ২।।

ক. "ডেকে লব আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব —
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে —
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;
ফলন্ত ধানের গন্ধে — রঙে তার — স্বাদে তার ভরে যাবে
আমাদের সকলের দেহ ......"
(অবসরের গান /ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ)

খ. "ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হত
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি - বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে — বিবাহের কিছু পরে —
সন্তানের জন্মাবার আগে।" (১৯৪৬-৪৭/ শ্রেষ্ঠ কবিতা : ঐ)

জীবনানন্দ দাশ নৃতত্ত্ববিদ্ অথবা লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন না বটে, কিন্তু এই দুটি কবিতাংশে আদিবাসী - এবং লোকনৃত্যের যে - ছবি চিত্রিত করেছেন তিনি, তার মধ্যে নাচের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলির অনেক কটিই প্রাপ্য। ফসলের উৎসব, নরনারীর মিলনোৎসব, শস্য - ও - সন্তানকেন্দ্রিত উর্বরতাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান — ইত্যাদি অনেক কিছুই এই নাচের বর্ণনার মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

নরনারীর যৌথনৃত্য অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে সব - সময়ে কিংবা লোকনৃত্যের সর্ব-স্তরে প্রচলিত নয়। সাঁওতালী নাচের প্রচলিত যে - ধারাটি আমাদের খুব পরিচিত, তারই সুবাদে এরকমই একটা ধারণা অবশ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই, এই ধরনের নাচগুলির মধ্যে নরনারীর একত্রে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে বিধি - নিষেধ আছে। যেমন ছৌ - নৃত্য একান্তভাবেই পুরুষালি ব্যাপার ; পক্ষান্তরে বৌ - নাচের ধারে - কাছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের আসাই নিষেধ।

নাচের উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে মূলত যে - যে উপলক্ষগুলি রয়েছে, সেগুলি হল এই :

ক. ভাব - বিনিময়ের জন্য অঙ্গভঙ্গীর ক্রমবিবর্তন;

খ. ধর্ম - ও জাদুসংস্কারের অভিব্যক্তি;

গ. বিভিন্ন ধরনের উৎসব ও অনুষ্ঠান।

এখানে বলার কথা এই যে, 'ক' -'খ' -'গ' কিন্তু কখনওই পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। ভাববিনিময়ের ব্যাপারটা পারস্পরিক যেমন, তেমনই আবার জাদু এবং ধর্মাচরণের

সূত্রে কল্পিত অলক্ষ্য শক্তিগুলির (মান্যা ; দেবতা) সঙ্গেও সেটা সম্পৃক্ত। নাচের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে জাদু - শক্তিকে ক্রিয়াশীল করা বা দেবতাদের উদ্দেশে কিছু নিবেদন করার ব্যাপারটিও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। জাদুশক্তি এবং দৈবশক্তিসমূহকে সক্রিয় করার হেতুগুলিও ছিল মূলত 'গ'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিকার পাওয়া, শস্য ফলানো, সন্তান লাভ, কারুর মৃত্যুর পূর্বে অলৌকিক শক্তিদের খুশি করা, যুদ্ধযাত্রায় সাফল্য লাভ ইত্যাদি ব্যবহারিক প্রয়োজনের ব্যাপারগুলি নৃত্যের মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হতো ; বহুক্ষেত্রে এখনও হয়। জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে - সব ভাবাবেগ গোষ্ঠীজীবনকে আলোড়িত করতে পারে, আদিবাসী এবং লৌকিক সমাজে তারই যূথবদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিশেবেই তাই নাচকে গণ্য করেন নৃবিজ্ঞানীরা।

নাচের উদ্ভব হয়েছিল জাদুর সূত্রেই যেহেতু, তাই মুখোশ, ছদ্মবেশ, জাদুভঙ্গিমা ইত্যাদি ছিল তার প্রাথমিক উপকরণ। আবার যেহেতু পশুশিকারই ছিল সেই সময়ের মুখ্য জীবিকান্বেষণ, তাই শুধু পশুর ছদ্মবেশ ধরাই নয়, তাদের হাবভাব, চলাফেরা লাফঝাঁপ, অঙ্গভঙ্গী - প্রভৃতিও তখন ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে হতো মানুষকে। তাই নাচের মধ্যে পশুসুলভ চলন্ এখনও অনুসৃত হয়। পুরুলিয়ার ছৌ - এর একটি বিশিষ্ট চলন্ভঙ্গিমার নামই 'পশুচাল'। ঠিক একই সঙ্গে সেখানে 'দেবচাল' এবং 'দানবচাল' নামেও আর দুটি চলনভঙ্গী বজায় আছে । বুঝতে অসুবিধে হয়না — এ-দুটি ভঙ্গিমাও আদিমনৃত্যকলায় অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসের হদিশই দেয়।

আদিম নৃত্যকলা আদিবাসী সংস্কৃতির নাচের মধ্যে বিবর্তিত হয় কীভাবে, এবং তারপরে লোকনৃত্যে তার উদ্বর্তন কেমন করে ঘটে সেই গবেষণার সহজগম্য অথচ একান্ত -গুরুত্বপূর্ণ একটি নৃত্যরীতি হিশেবে 'ছৌ'- কেই বোধ হয় গণ্য করা সঙ্গত। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে পুরুলিয়া শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে, কাঁটাড়ি গ্রামে 'আকাদেমী অব ফোকলোর' - এর উদ্যোগে আয়োজিত 'ছৌ নৃত্য উৎসব' উপলক্ষে আয়োজিত একটি সভায় বিশিষ্ট ছৌ-শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া এবং নেপাল মাহাতো (পরবর্তীকালে দু'জনেই 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করেছেন তাঁদের শিল্পপাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ) এই নাচের আদি রূপ হিশেবে 'কাপ-ঝাঁপ' নামে একটি প্রকরণের কথা বলেছিলেন; কিন্তু তখন উপস্থিত কোনও বিশেষজ্ঞ - শিল্পীই সেটা কী রকম যে ছিল, তার ব্যাখ্যান দেননি। ওঁরা একবাক্যে বলেন, শুধু ঐ-নামটুকুই ওঁদের শোনা।

সেই 'কাপ ঝাঁপ' - এর মোটামুটি রূপটার হদিশ পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক বছর পরে, '৭৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। পুরুলিয়ার ছৌ-এর এখন যাঁরা গুরু, তাঁদের মধ্যেও আবার বহুজনেরই গুরু বলে স্বীকৃত হতেন মধু রায়। মধুবাবু প্রয়াত হলে, তাঁর সুযোগ্য পুত্র হীরালাল রায় বাবার কাছ থেকে শেখা অনেক বিস্মৃতিবিলীন নৃত্যপদ্ধতিকে নিয়ে নিরীক্ষা করতে আগ্রহী হন। 'কাপ-ঝাঁপ'-এর স্বরূপ সন্ধান করতে - গিয়ে এই খবরটি সংগৃহীত হলে আকাদেমীর ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকরা হীরালালবাবুর শরণ নিয়েছিলেন। তাঁদের সবার একান্ত অনুরোধে, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে এ-বিষয়ে যা-যা জেনেছিলেন, সেগুলিকে অবলম্বন করেই একটি 'কাপ-ঝাঁপ' নাচের অনুষ্ঠান করান

তাঁর ছাত্রও - সহশিল্পীদের দিয়ে। সেই অভিজ্ঞতারই ফসল হল নিচের বিবরণীটি ঃ

'মাঠের মাঝখানে টুসু-চৌদোলের আদলে একটি কাঠামোকে ফুলপাতা দিয়ে সাজিয়ে তার সামনে ফুল-ফল-মিষ্টি -ইত্যাদি রাখলেন একজন 'পুরোহিত'। জানা গেল, তিনি ব্রাহ্মণ নন, মাহাতো। এঁর পিঠের দিকে একটা শারীরিক অসঙ্গতি দেখা গেল, এবং হীরালালবাবুর জনৈক সহযোগী জানালেন যে শারীরিক-ভাবে কিছু-না-কিছু অসঙ্গতি/বিকৃতি-সম্পন্ন মানুষেরাই না-কি আগের আমলে কাপ-ঝাঁপের উপলক্ষে পূজার পুরোহিত হতে দায়িত্ব পেতেন, এই রকমই তাঁরা জানেন। কারণ অবশ্য তিনি বলতে পারলেন না। (তবে 'ফিজিক্যাল-ডিফর্মিটি '-থাকা মানুষেরা না-কি কিছুটা অ-সাধারণ/অ-লৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন, এমন একটা আদিম বিশ্বাস পৃথিবীর বহু সংস্কৃতিতেই প্রাপ্য; "কানা-খোঁড়া, একগুণ বাড়া"-ইত্যাদি প্রবাদে ঐ বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে।) এরপরে, একদল 'শিল্পী' (অথবা, 'পূজারী') ছৌ-এর পালায় ব্যবহার্য-পশুর-নকল ল্যাজে সজ্জিত হয়ে পরপর উবু হয়ে বসে পড়লেন পুরোহিতের পিছনে, খানিকটা দূরত্ব রেখে। এরপর প্রথমজন বাদে অন্যরা সামনের শিল্পীর কোমর দুহাতে ধরে হামা-দেওয়ার ভঙ্গীতে বসলে — প্রথমজন ছৌ-এর 'ছপ্‌কা-দেওয়া'-র (দুই হাঁটু দু-দিকে বেঁকিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঘুরে যাওয়া ; এই চালকে 'উল্‌ফা'/'উফ্‌লা'-ও বলা হয় অনেক সময়ে) ভঙ্গীতে লাফিয়ে পুরোহিত-এবং-চৌদোলকে টপ্‌কে ওপারে গিয়ে কিছুটা দৌড়ানোর পরে, ফের চৌদোলের দিকেই মুখ করে বসলেন। ঠিক একই কাজ প্রতিটি শিল্পীই করলেন আগের মতো ভঙ্গীতেই। এরপরে আবারও লাফানোর পালা। এইভাবে দশ-বারো বার নাচা-এবং-বসে-পড়ার পরে সমস্ত অংশগ্রহণকারী শিল্পী-ও-দর্শককে ফল-মিষ্টির টুকরো প্রসাদ হিশেবে দিলেন সেই পুরোহিত এবং তারপরে প্রচলিত ছৌ-নাচের মহলা দেবার মতো করে প্রায় একঘণ্টা নাচলেন শিল্পীরা। সব শেষে ফের একবার পরের পর সবাই চৌদোল টপ্‌কে গেলেন 'ছপ্‌কা' দিয়ে। তখন আর পুরোহিত সেখানে বসে থাকেন নি।'

হীরালালবাবুর অভিমতে ; এই নৃত্য দেবতাদের মনস্তুষ্টির জন্য করা হতো, পরবর্তী সময়ে দেবতাদের (গণেশ, শিব, দুর্গা-প্রমুখ) সাজে সজ্জিত হয়ে পালা-নাচ করার রীতি প্রচলিত হলে ধীরে-ধীরে চৌদোল সাজিয়ে পূজা এবং আনুষঙ্গিক 'কাপ-ঝাঁপ' অপ্রচলিত হয়ে যায়। ফলত হিন্দু-পুরাণের কাহিনী নিয়ে পালা গড়ার পরিপ্রেক্ষায় ধীরে-ধীরে 'পুরানো-ধর্মের' আচারকৃত্যগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্মের ব্যাপার এতে কতটা, কীভাবে আছে, সেটা বলা কঠিন। তবে উপরের বর্ণনা (যা, সংশ্লিষ্ট-ক্ষেত্রসমীক্ষণের প্রতিবেদনের অংশ) থেকে এটুকু বলা যায় যে, যে-ধর্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিত সমস্ত-অনুষ্ঠানটির মধ্যে দেখা গেল, তার চরিত্র অত্যন্ত আদিম। ধর্মের চেয়ে অলক্ষ্য-কিছু জাদুর ভাবনা অন্তর্লীন হয়ে আছে বরং। নাচ-চলাকালীন আঙিনায় কোনও প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ঢোকার ব্যাপারে নিষেধ-থাকাটা, সেটিরই সূচক।

একটা আকর্ষণীয় বিষয় হল এই যে, যেভাবে পিছনে নকল-লেজ লাগিয়ে পরস্পরের কোমর ধরে লাফিয়ে-লাফিয়ে কাপ-ঝাঁপের অনুষ্ঠান হতো বলে

হীরালালবাবু জানান এবং তাঁর সহযোগীরা তার একটি নমুনা দেখান — ঠিক সেইভাবে কোমরে ল্যাজ বেঁধে, একে-অন্যের কোমর ধরে হামাগুড়িরত-অবস্থায় নাচের একটি ছবি সি. এম. বাওরার 'প্রিমিটিভ সং' (১৯৬৩) বইতে (২১ নং চিত্র) দেখা যায়। ঐ নাচটি মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার ইলহাল-রুনট্জা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। ১৮শ শতকের একজন ভ্রমণকারীর আঁকা এই ছবিটিকে বাওরা প্রামাণ্য বলেই গণ্য করেছেন।

।। ৩।।

ধর্ম-ও-জাদু-সংক্রান্ত সংস্কার অন্যান্য আরও সব লোকনৃত্যের মধ্যে দেখা যায়। হুদুমদেও-পূজার (উত্তরবঙ্গের কোনও-কোনও অঞ্চলে এই দেবতাকে বৃষ্টিদাতা বলে মনে করেন গ্রামের লোকেরা) উপলক্ষে মধ্যরাত্রে নিরংশুকা হয়ে দলবদ্ধ ভাবে মেয়েরা গান গাইতে-গাইতে যে-নৃত্যানুষ্ঠান করেন, তার ত্রিসীমানায় কোনও পুরুষের থাক নিষেধ। এ শুধু ট্যাবু নয়; এমনও মনে করা হয় যে, তেমনটা ঘটলে খরা, অজম্মা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি অনিবার্যভাবে ঘটবে। ঠিক একইভাবে মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল-প্রভৃতি অঞ্চলে নববধূ-বরণের পর 'বৌনাচ' হবার যে-প্রচলন এখনও ঐ-সব এলাকার গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়, তার অনুষ্ঠান-কালেও কোনও পুরুষের, এমন কী স্বয়ং বরেরও প্রবেশ নিষেধ। এর কারণ হিশেবে বলা হয় ঐ নাচের সময়ে পুরুষেরা ধারে-কাছে থাকলে বধূর সন্তান হবার সময়ে না-কি বিপদ হতে পারে।

নারসিংহী নাচের মুখোশ যদি 'অশুদ্ধ' অবস্থায় কোনও শিল্পী মুখে বাঁধেন, তাহলে যে-প্রাণীর মুখোশ সেটি, নাচের সময়ে সেটি আবির্ভূত হয়ে ঐ শিল্পীকেই আক্রমণ করবে এমনও একটা জাদুর সংস্কার রয়েছে। সারা পৃথিবীর লোকনৃত্যেই এরকম অজস্র নমুনা খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল আলোচনার পরিপূর্ণতার জন্য :

ক. সেমা এবং অঙ্গামী নাগাদের ঝুম্ (বা, জুম্)-চাষের নাচের সময়ে নর্তকরা যতটা পারেন উঁচুতে পা তুলে নাচেন। ওঁদের বিশ্বাস এর ফলে, ধানের গাছ ততটাই লম্বা হবে, যতটা উচ্চতায় ওঁরা পা তুলতে পারবেন ।

খ. মালয়েশিয়ার সেমাং যুবকরা যখন 'বসন্তনৃত্য' করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে তরুণীরা নাচতে নামেন না, তালে-তালে হাততালি দেন অথবা ছোট-ছোট ঢাক বাজান। ওঁদের বিশ্বাস, এর ফলে প্রকৃতির পুষ্পলাবী রূপটি বিহিত করেন ('চেনয়' নামে যে অলক্ষ্য শক্তি (তিনি কিন্তু ঠিক দেবতা নন; তবে মান্যারই একটি বিবর্তিত ধারণা), তিনি তুষ্ট হবেন। পুরুষের নৃত্য এবং নারীর লয় রক্ষা — এই 'কর্ম' -বিভাজনেই ফল-ফুল উপ্‌ছে পড়ার (জাদু) সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ... কিছুটা সামাজিক বিধি-বিধানের হদিশও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে এই নিয়মের আড়াল থেকে যেন।

গ. সিংহলের হেন্নেবেড্ডে-অরণ্যবাসী ভেড্ডারা কেউ মারা গেলে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে নাচেন। ওঁদের বিশ্বাস এর সুবাদে, মৃত ব্যক্তির পরলোকের পথের সব বাধা-বিঘ্ন কেটে যাবে । ওঁরা একটা তীরও মাটিতে ফলা-গিঁথে রাখেন ঐ সময়ে, যার ফলে না-কি 'পথ'-

এর অশরীরী শক্তিরা আহত হয়ে পালাবে।

ঘ. আফ্রিকার অনেক অঞ্চলেই চাষের ক্ষেতে নরনারীর প্রতীকী মিলনসূচক নাচের রেওয়াজ আছে। বিশ্বাস, এর ফলে জমি উর্বরা হবে। নাইজেরিয়ার ইবো, ওরুবা গ্যাবনের পিগমী, ঘানার ফান্টি -প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই রীতি আছ।

ঙ. প্রাক্তন চেকোশ্লোভাকিয়াতে বোহেমিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলে বিয়ের সময়ে কনের সহচরীরা নাচের সময়ে সাবধান থাকেন, যাতে তাঁদের হাঁটুর ওপরের অংশ কারুর নজরে না-পড়ে। এর ব্যত্যয় ঘটলে না-কি তাঁদের নিজেদের আর বিয়ে হবে না!

চ. অস্ট্রেলিয়ার আর্নহেমল্যান্ড অঞ্চলের বাসিন্দারা শিশুর 'সুন্নৎ' করার পরে, বালির ওপর নক্‌শা কেটে একটা নকল সাপ গড়ে সেখানে ছেড়ে দেন। ওঁদের ধারণা, এর ফলে বয়োপ্রাপ্ত হলে এই শিশুর যৌনক্ষমতা বরাবর অটুট থাকবে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানটিই ঘটে যৌথভাবে একদল গ্রামবাসী পুরুষ যখন নাচেন। না-নাচলে না-কি ঐ উৎসবের 'শক্তি' (জাদু!) নষ্ট হয়। এখানেও মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

ছ. উত্তর আমেরিকার চিপ্পেওয়া, সিয়্যো, চেরোকী এবং আরও অনেকগুলি জনজাতির মধ্যে যে-যুদ্ধনৃত্য প্রচলিত, তাতে সব সময়েই ঢালের ওপরে বিকট-সব প্রেতের মুখ এবং বিদ্‌কুটে বিচিত্র-নকশা আঁকা থাকে। ওঁরা মনে করেন, এর ফলে ঐ সমস্ত অলৌকিক অশুভ শক্তিরা না-কি যথাকালে তাঁদের সহায়ক হিশেবে হাজির হবে।

জ. পাঞ্জাবী মহিলারা 'গিদ্ধা' নাচ কখনও ঋতুমুক্তির পর অন্তত দুদিন না-কাটলে নাচেন না। সংস্কার এই যে, এর ব্যতিক্রম ঘটলে দাম্পত্যজীবনে হানি ঘটবে।

...এই রকম আরও অজস্র উদাহরণ পৃথিবীর যে-কোনও সাংস্কৃতিক-বলয় থেকেই খুঁজে-পাওয়া যায় সামান্য একটু চেষ্টা করলেই। জাদু-প্রত্যয় এবং নৃত্যরীতির এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজও অব্যাহত রয়েছে, অন্তত আদিবাসী-এবং লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে।

।।৪।।

জাদু-কিংবা-ধর্মকে উপলক্ষ করে যে লোকনৃত্যগুলি, আদিমকাল থেকে বিবর্তিত হতে-হতে এ-অবধি এসেছে, তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য কিছু-না-কিছু আছে। জীবিকা-সংস্থান, যৌনতৃপ্তি, সন্তানসুখ, ভয়-বিমোচন, বিপদ-বিদূরণ-প্রভৃতি যাতে ঘটে, তার জন্য নাচের মাধ্যমে জাদুশক্তি-সঞ্জনন-করার অবচেতন আকাঙক্ষাই এখানে সুপ্রবল। নান্দনিক দিক এদের মধ্যে গরহাজির নয়, তবে লোকনৃত্যের যূথবদ্ধ চরিত্রটি কখনও তাকে সেই সূক্ষ্ম-সেন্টিমেন্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না, যা একক-কণ্ঠের ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়া কিংবা টাঁড় ঝুমুর বা বাউল গানের ক্ষেত্রে সম্ভবপর। আসল কথা, লোকনৃত্যে কোনও সময়েই লোকসঙ্গীতের মতো দুটি পৃথক মাত্রাকে খুঁজে-পাওয়া যায়না। লোকসঙ্গীত — অন্তত বাংলার লোকসঙ্গীত, ব্যবহারিক উৎস থেকে সঞ্জাত হলেও, তার মধ্যে জাদু-ধর্ম-অলৌকিকতা-প্রভৃতির অভিঘাত অনেক কম। বরং, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সেখানে অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে প্রভাব সঞ্চার করে। এমন কী প্রেম-ভালবাসার গানও — সামাজিক-অনুশাসনের বিরুদ্ধে নিরুদ্ধ অভিযোগ এবং

অসম্মতি হিশেবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকে।

স্পষ্টতই, লোকসঙ্গীতের চেয়ে লোকনৃত্যের মধ্যে অতীতের অভিঘাত অনেকখানিই বেশি। জাদুর ব্যাপারটা বেশি লোকনৃত্যে ; নান্দনিক-স্পন্দন লোকসঙ্গীতে বেশি। জীবনের ছাঁটাকাটা বস্তুময় প্রয়োজনই লেকনৃত্যের মাধ্যমে প্রমূর্ত হয় অনেক ব্যাপক হয়ে; পক্ষান্তরে লোকসঙ্গীতে অভিব্যক্তি ঘটে অনেক সূক্ষ্ম-অভিব্যক্তির — যা ব্যক্তিগত-সেন্টিমেন্টকে বহু-সময়েই প্রকাশমান করে। তবে, ঐ ব্যক্তিগত-আবেগও সর্বদাই একটা-না-একটা গোষ্ঠিক-আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে অন্যের কাছে পৌঁছয়। অন্যপক্ষে লোকনৃত্যের অভিভবের মধ্যে ব্যক্তিক-বোধের কোনও অস্তিত্বই নেই। সেখানে শুরু থেকে শেষ—সবটকুই গোষ্ঠিভিত্তিক অভিব্যক্তি।

আসলে, নৃত্য এবং সঙ্গীত — এরা যমজ হলেও, তুলনামূলকভাবে নৃত্যই স্বভাবে বেশি প্রাচীন। গানের মধ্যে অবোধ্য কিছু-ধ্বনি খুব সম্ভবত উচ্চারিত হতো একদা — যেগুলো কালক্রমে পাল্টে গিয়ে অর্থবোধক-কিছু বাক্য বা বাক্যাংশে পরিণতি পেয়েছে। এবং ক্রমশ সুর-এবং-কথা — এই দুই প্রকাশমাধ্যমের যুগলবন্দীতে নাচের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তার বিকাশটা হয়েছে কিছুটা পরিশীলিত। এটা একমাত্রিক কলা নৃত্যের ক্ষেত্রে হয়নি। এছাড়া, গান — নাচ ছাড়াও হয় ; কিন্তু নাচের ক্ষেত্রে গান, অন্ততপক্ষে তার সুরটা অপরিহার্য বিষয়। ফলে ধীরে-ধীরে লোকসঙ্গীত এবং আদিবাসী সঙ্গীত ও পরিশীলিত সঙ্গীতের মাঝখানে লোকসঙ্গীত যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও স্বকীয়তায়-প্রতিষ্ঠিত স্তর হিশেবে গণ্য হয়, আদিবাসী নাচ এবং শাস্ত্রীয় নাচের মধ্যে লোকনৃত্য সেভাবে স্ব-প্রকাশ কোনও বিশেষ একটা পর্যায়ের শিল্প-ঋক্‌থ হয়ে ওঠেনি।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই লোকনৃত্যের মুখ্য চালিকাশক্তি যে, সেকথা ঠিক। কিন্তু আদিবাসী সমাজে তো বটেই, এমন-কী তার চেয়ে-এগিয়ে-আসা, লোকসমাজেও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপলক্ষের সঙ্গে একটা অপরিহার্য সম্বন্ধ বন্ধন থাকার ফলে এটা প্রাক্-নাগরিক স্তরের মানুষের অস্তিত্বের একটা দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। এখনও শিল্প ('ইন্ডাস্ট্রি-অর্থে')-সভ্যতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটেনা—এমন সব অঞ্চলের মানুষ সাধারণভাবে, নাচ এবং গানকে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে রেখেছেন। আদিবাসীরা অবশ্য নাগরিক শিল্পবাণিজ্যময় জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও, এটাকে ছাড়েননি, ছাড়াতে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়। .... কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু হবার পর, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-প্রভৃতি এলাকা থেকে সাঁওতাল শ্রমিকেরা সপরিবারে এসে অনেকদিন কাজ করেছিলেন ঐ প্রকল্পে । একদা যেখানে মনোহরদাস তড়াগ ছিল, (এখন মেট্রো রেলের মালখানা) সেখানে, কাটা-মাটির এক বিশাল পাহাড়-প্রমাণ স্তূপের নিচে তাঁদের অস্থায়ী বসতি করে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। জনকল্লোল-মুখর চৌরঙ্গী রোড — পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড সামান্য দূরেই থাকা সত্ত্বেও, সেই মহানগারিক পরিবেশের যন্ত্রজর্জর পটভূমিকার মধ্যেও প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে, তাঁদেরকে মাদল-বাঁশি বাজিয়ে গাইতে-নাচতে দেখেছেন-শুনেছেন অনেকেই।

ঠিক এখানেই আদিবাসী-সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটা বড় মাপের ফারাক। যে-সহজাত জোরের সুবাদে, এসপ্ল্যানেড-চৌরঙ্গীর নাগরিক রলরোলের মধ্যেও সাঁওতালী গান-এবং-নাচ নিজের অস্তিত্বকে জানান্ দিয়ে গেছে নিয়মিতভাবে, সে-জোর তার মধ্যে থেকেছে, আদিবাসী জীবনের সঙ্গে নৃত্যগীতের সম্পর্কটা যেহেতু লৌকিক বাগরীতি-অনুযায়ী বললে — 'চোলি-দামন্'-এর মতো!

কিন্তু সেই প্রাণশক্তি, নাগরিক জীবনের সংশ্রবে এলে বরং, বলা উচিত — নাগরিক ব্যবসাবুদ্ধির আক্রমণের সামনে পড়লে, বিপন্ন হয়ে পড়ে ! লোকনৃত্য তো মোটামুটিভাবে নিরস্তিত্বই হয়ে-যায়; আর লোকসঙ্গীতও কৃষ্টিবণিকদের ব্যবসার উপকরণ হয়ে গিয়ে তার নিজস্ব চরিত্রলক্ষণগুলি খোয়াতে থাকে।

লোকসাহিত্য বা লোকশিল্পকে বিকৃত করে ব্যাবসায়িক লাভ করার সুযোগ অনেক সীমাবদ্ধ হওয়ায়, তাদের ওপরে আক্রমণটা সেভাবে আসেনা। কিন্তু লোকসঙ্গীত, এই নগরায়ণের-তথা-নগরাগ্রাসনের ধাক্কাটা সামলাতে পারেনা, কারণ তাকে উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার জন্য চলচ্চিত্র রেডিও এবং টেলিভিশ্যান সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরী যাকে বিদ্রূপ করে 'ফোকো-মডার্ন' বলতেন, বা রিচার্ড ডরসন যার নাম দিয়েছিলেন 'ফেকলোর' — এ হল সেই জিনিষ। লোকসঙ্গীত আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্যই নেবে; কিন্তু তার মূল রূপটা — অবশ্যই অবিকৃত থাকা দরকার। 'কালচারাল-কনটিন্যুয়াম' পারস্পরিক আদান-প্রদানটাকে সূচিত করে ঠিকই; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই অজুহাতে সংস্কৃতির একটা স্তরের শিল্প-প্রকরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকটি স্তরের নিজস্ব সত্তাটা যাতে বজায় থাকে, সেটাই দেখা দরকার একান্ত ভাবে।

।। ৫ ।।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের লোকনৃত্যধারায় যে-প্রকরণটি সবচেয়ে পরিচিত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সে-পরিচয় ব্যাপ্ত — সেই ছৌ-নাচের প্রসঙ্গেও কিছু বিচার্য বিষয় আছে। অবশ্যই কাপ-ঝাঁপের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকলে, ছৌ এভাবে বিশ্ব-পরিচিতি অর্জন করার ব্যাপারে যোগ্য হতে পারত না। সুতরাং, আদিম-জাদু/ধর্মকেন্দ্রিত সরহদ্দকে ধীরে-ধীরে অতিক্রম করে এসে, ছৌ এখন পৌরাণিক-পালার প্রকাশমাধ্যমে পরিণতি পেয়েছে। জাদুর ব্যাপারটা আছে পরোক্ষে।

পুরুলিয়া-সেরাইকেলা-ময়ূরভঞ্জ — ছৌ-এর এই তিনটি আঞ্চলিক রীতির মধ্যে ময়ূরভঞ্জের ধারাটি ব্যাপকভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে বলে, তার মধ্যে পরিশীলিত-শিল্পের চারিত্রিক-লক্ষণ আনুপাতিক ভাবে অনেক বেশি পুরুলিয়ার ছৌ-এর তুলনায়। পুরুলিয়ার ছৌ-এব মূল ধারক হলেন যেহেতু শ্রমজীবী সাধারণ মানুষরাই, তাই তার মধ্যে লৌকিক শিল্পের চরিত্রটা অনেক বেশি পরিমাণে সুরক্ষিত রয়েছে। সেরাইকেলার ছৌ-ও রাজকীয় দাক্ষিণ্য পেয়েছে বটে, তবে তার অবস্থানটা (শিল্পলক্ষণগতভাবে) অন্য দুটি ধারার মাঝামাঝি।

উৎস-পর্বে (কাপ-ঝাঁপ) এই নাচ ছিল আদিম জাদুবিশ্বাস সঞ্জাত-কোনও এক ধরনের আচার-নৃত্য: এর সঙ্গে ধর্মীয়-অনুষঙ্গ ধীরে-ধীরে এসে মিশেছিল। পশুর-লেজ লাগিয়ে নাচের সূত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পশুবেশ-ধারণ করে শিকার করাই ছিল এর প্রারম্ভিক প্রেরণা (সম্ভবত সেই জন্যেই নারী-সংস্রব-বিহীনতাও এর অবশ্যমান্য বিধি)। উত্তরকালে শিকারের অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঘটতে থাকে যখন, তখন সেই সূত্রে এর বিবর্তন হয় যুদ্ধনৃত্যে। বলা বাঞ্ছনীয় যে তিনটি প্রধান নৃত্যঘরানারই (না-কি, ঐ 'বাহিরানা' কথাটাই এখানেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত?) মূলত যুদ্ধশৈলীনির্ভর। শৈলীর এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আমার ছাত্রী অধ্যাপিকা ড. ইন্দ্রাণী দত্ত-সৎপথী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পুরুলিয়া ⟶ সেরাইকেলা ⟶ ময়ূরভঞ্জ— এই ভাবে ছৌ-এর ক্রমান্বিত, অগ্রসরণের ব্যাপারটি ঘটেছে। পুরুলিয়ার ছৌ-তে যখন হিন্দু পুরাণবৃত্তের বিভিন্ন কাহিনী (যথা : মহিষাসুর-বধ, অভিমুন্য-বধ, কিরাতার্জুন, রাবণবধ ইত্যাদি) এসে যুক্ত হয়ে একে এক-ধরনের নৃত্যনাটকে রূপান্তরিত করল, তখনও এর মধ্যে বীররস-নির্ভরতা প্রবলভাবে থেকে গেছে। বস্তুত পৌরাণিক সেই কাহিনীগুলিই পুরুলিয়ার ছৌ-তে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়, যেগুলি একান্তই যুদ্ধকেন্দ্রিক। (এমন-কী, ইদানীং কালে অ-পৌরাণিক যে-দু-একটি পালা নিয়ে নিরীক্ষা করছেন কোনও-কোনও ছৌ-নৃত্যের দল, সেখানেও সংগ্রামটাই একমাত্র উপজীব্য; যেমন — ' সিদো-কানুর বিদ্রোহ'।)

পুরুলিয়ার ছৌ-নাচে যেমন 'কিরাতার্জুন'-প্রভৃতি পালায় আদিম শিকারের অনুষঙ্গটি এখনও বজায় আছে, ঠিক তেমনই আবার সেরাইকেলার ছৌ-তে 'সর্পনৃত্য', 'ময়ূরনৃত্য', 'বাণবিদ্ধ'- প্রভৃতিও সেই ব্যাপারটিকেই সূচিত করে। ময়ূরভঞ্জে 'শবরটোকা', 'কালচক্র'- ইত্যাদি পালাও শিকারভিত্তিক। সেরাইকেলা-ময়ূরভঞ্জে শিকার এবং যুদ্ধের নৃত্যাভিনয় থাকলেও, প্রণয়ভিত্তিক-মধুররসাশ্রিত পালাও সেখানে সুপ্রচুর। বীররস, ছৌ-এর সহজাত অবলম্বন; ময়ূরভঞ্জ -সেরাইকেলার মতো রাজপ্রসাদলব্ধ না-হওয়ায় পুরুলিয়া ছৌ-তে সেটাই মুখ্য ; আনুষঙ্গিকভাবে করুণরসও এসেছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় (যেমন : 'অভিমন্যু বধ', 'তরণীসেনবধ' প্রভৃতি পালায়)। কিন্তু দরবারী-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অন্য দুই ধারায় প্রেমের লীলাবৈচিত্র্যও এর সঙ্গে এসে মিশেছে। ফলত, বীররস এবং মধুর রস সেখানে পরস্পর-সম্পৃক্ত। এজন্য পুরুলিয়ার মতো ময়ূরভঞ্জের নাচে মেয়েদের আসরে-নামা বারণ নয়। 'কালচক্র' পালায় তো 'অষ্টশবর' এবং 'অষ্টশবরী' শিকারান্তে প্রেমমূলক অঙ্গভঙ্গিমার সাহায্যে পালাকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

অঙ্গভঙ্গিমার সূত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তিনটির মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়াতেই দেব-দানব-মানব-পশু, সমস্ত চরিত্রই মুখোশধারী। আদিম জাদুসংস্কার এইভাবে তার মধ্যে সমাবৃত। সেরাইকেলাতেও মুখোশ আছে, সে-মুখোশ লীলায়িত ভাবাত্মক, পুরুলিয়ার বীরত্বব্যঞ্জক মুখোশের সঙ্গে তা মেলেনা। আবার তাতে শরীরের লীলায়িত মুদ্রাবিভঙ্গও কিছু পরিমাণে দেখা যায়। আর ময়ূরভঞ্জের ছৌ মুখোশহীন — ফলে দেহভঙ্গিমা, হস্তমুদ্রা এবং মুখভাব — তিনে মিলে তার আবেদন অনেক বেশি পরিশীলিত। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার অভিঘাতে ময়ূরভঞ্জের ছৌ-তে যথেষ্ট পরিমাণে এসে

পড়েছে ; তুলনায় অনেক লঘু হলেও, সেরাইকেলাতেও পারিশীলন ও শাস্ত্রীয়তার ছাপ সুপ্রাপ্যই। ড. কপিলা বাৎস্যায়ন সেরাইকেলা এবং ময়ূরভঞ্জের ছৌ-তে শাস্ত্রীয় ভঙ্গিবিক্ষেপের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর 'ট্র্যাডিশ্যনাল ইন্ডিয়ান থিয়েটার' (১৯৮৩) বইতে। 'রসিকনাগর', 'চন্দ্রকলঙ্ক', 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা'-প্রভৃতি পালানাচ ময়ূরভঞ্জে এবং 'ফুল ও বসন্ত' 'প্রজাপতি দেবদাসী', 'বৃষ্টি ঝমাঝম'-ইত্যাদি পালা সেরাইকেলায় অনুষ্ঠিত কেন যে হতে পারে, আর পুরুলিয়ায় যে কেন নয়, তার ব্যাখ্যা এই সূত্রেই মেলে।

পুরুলিয়ার ছৌ-এর মূল অনুষ্ঠানকাল হল চৈত্রসংক্রান্তি বা গাজনের সময়টি। সেরাইকেলা-ময়ূরভঞ্জেও তাই । এর অর্থ তাহলে এই যে, একসময়ে ছৌ, উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় নিশ্চিতভাবে। পুরুলিয়াতে তো বলেই, অন্য দুই অঞ্চলেও এজন্য ছৌনাচের সঙ্গে চৈত্রপরবকে এক করে দেখা হয়। রাজপরিবারের সংশ্রব সত্ত্বেও তাই ওখানে ছৌ-তে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও মানসিক-প্রবণতা ব্যাপক।

তবে পুরুলিয়াতে এখন সারা বছরই ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন ছৌ-কে শুধু একটি নৃত্যধারা নয়, 'প্রতিষ্ঠান' রূপেই প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে, এ সত্য মানতেই হবে। ছৌ এখন শুধুমাত্র নৃত্য নয়, সাধারণ মানুষের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুভবসৃষ্টিকারী একটা মাধ্যমে পরিণত। সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ-অনুষ্ঠান অন্তত বাহিরঙ্গিক আচারের দিক থেকে অনেক ব্যাপকভাবে ধর্মানুষ্ঠান-সম্পৃক্ত, বিভিন্ন 'রিচ্যুয়াল' তাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

কিন্তু পুরুলিয়ার ছৌ-তে একমাত্র গণেশবন্দনার নাচ ব্যতীত সে-রকম কোনও রিচ্যুয়াল কিছু নেই। পক্ষান্তরে, প্রতিটি পালারই মূল প্রতীতি, প্রবল যুদ্ধের শেষে অধর্মের পরাভব এবং ন্যায়-ও-সত্যের বিজয়। অর্থাৎ, পুরুলিয়ার হতদরিদ্র-মানুষ এই নাচের মধ্যে দিয়ে তাঁদের শ্রেণীচৈতন্যের আত্মপ্রতিষ্ঠ বোধটিকে খুঁজে পেতে চান। এখানেই এই নাচের 'রূপকথাসুলভ 'একটা পরিতৃপ্তির বোধ সৃষ্টি হয়। এবং এটিই যথার্থ লোকসাংস্কৃতিক-অভিজ্ঞান। আর তাই, সেরাইকেলার 'ফারিখণ্ড খেলা' (অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মহড়ামূলক নাচ) কিংবা ময়ূরভঞ্জের 'কামনাঘট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষাপূরণের মতো কোনও কিছু প্রয়াস নয় পুরুলিয়ার ছৌ। সে হল ঐ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের স্বাধিকারচেতনা এবং আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীকী সংগ্রাম — যা নাচের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত। . .হয়ত ঠিক ঐ একই কথা, রায়বেঁশে, পাইক নাচ, ঢালী নাচ -প্রভৃতি আরও যে-কটি বীরত্বদৃপ্ত নাচ বাঙালীর সংস্কৃতিতে প্রচলিত — তাদের সম্পর্কেও সমানভাবেই প্রযোজ্য।

ছৌ-নাচের আলোচনাসূত্রে কয়েকবারই নাটক অভিনয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে. ছৌ-তো এক ধরনের লোকনাট্যই : সংলাপ এবং সঙ্গীত সেখানে নেই. এই মাত্র। লোকনাটকের যে-ভূমিকা রয়েছে লোকসংস্কৃতির জগতে, তার মূল পরিকাঠামোটা (অন্তর্নিহিত ভাবের ক্ষেত্রে) ছৌ-এর যে-ভাবগত প্রতিবাদী মনস্কতার কথা এখনই বলা হল, তার সঙ্গে একান্ত সুসমঞ্জস।

এই লোকনাট্যগুলির মধ্যে যা মুখ্য-তাই নিয়েই আবার গণদেবতার শ্রেণীচৈতন্য কতখানি ক্রিয়াশীল সেই বিচার এবারে করা জরুরি হয়ে উঠল অতঃপর।

ঘ. লোকনাট্য

যদিও 'নাটক' কিংবা 'নাট্যকলা' বলতে যা-বোঝায়, প্রয়োগকলাভিত্তিক সংস্কৃতির আদিপর্বে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক-প্রপিতামহদের তার কোনও ধারণা না-থাকলেও, তাঁদের নৃত্য-গীতের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এক ধরনের নাটকই অভিনীত হতো। উদাহরণ হিশেবে যে-হরিণশিকারের কথা আগে বলেছি, প্রসঙ্গক্রমে যদি সেই কথা এখানে আবার তুলি — তাহলেই কিন্তু এই বক্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে। ...একজন মানুষ যখন হরিণকে প্রলুব্ধ করে শিকারের পাল্লায় নিয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষায় — ঝোপের আড়াল থেকে তার ডাক নকল করছে, তার শিং-ছাল মাথায়-গায়ে চড়িয়ে হরিণ সাজছে এবং হরিণের মতো ভঙ্গীতে চলা-ফেরা, নড়া-চড়া করছে, তখন তো সে প্রকৃতপক্ষে একটা হরিণের ভূমিকায় অভিনয়ই করছে বললে কোনও ভুল হবে না !

নাচ-গান-চিত্রকলা-প্রভৃতির আড়ালে শুরুতে যেমন জাদুর সংস্কার এবং তারপর ধর্মীয় প্রতীতির অস্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে দেখা গেছে, ঠিক তেমনভাবেই নাটকের উদ্ভবের প্রেক্ষিতেও ঐ ব্যাপারদুটিই লুকিয়ে ছিল ক্রমান্বয়ে। যেহেতু আদি-পর্যায়ের নাচ-গান, প্রকারান্তরে নাটকেরই নামান্তর, সুতরাং তাদের অন্তর্নিহিত জাদু-ও-ধর্মের প্রত্যয় সেটির মধ্যেও থাকতে বাধ্য অবশ্যই। মুখোশ যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তো এই বক্তব্য আরও বেশি দৃঢভিত্তিক। সঙ্গীতসহ শিকার-নৃত্যই হোক আর রণহুংকারসহ যুদ্ধ-নৃত্যই হোক, কিংবা দেবতার কাছে প্রার্থনা করে অথবা মিলন-আকাঙ্ক্ষাসূচক গান গেয়ে চাষের মুখবন্ধই হোক, সর্বত্রই এক ধরেনের নাটকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়। এক-একটি পূজা-পার্বণ উপলক্ষে পালিত আচার-অনুষ্ঠান যে কতখানি নাটকীয়-চরিত্রের হতে পারে, তার হদিশ তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' (কলকাতা ১৯৪৮) বইতে 'মাঘমণ্ডল'-ব্রতের বর্ণনা করতে গিয়ে খুব সুন্দর ভাবেই দিয়েছেন।

এইখানেই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অঙ্গভঙ্গিমার ভূমিকাটিও চিহ্নিত হয় (অঙ্গভঙ্গীর তাৎপর্য পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। মুখোশ থাকলে মৌখিক-অভিব্যক্তিটুকু অবশ্য ধরা যায়না; কিন্তু অন্যান্য শরীরাংশকে তো ভঙ্গীর মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতেই হয়। সুতরাং আদিম-আদিবাসী-লৌকিক — যে-কোনও পর্যায়েই হোক না কেন, নৃত্যভঙ্গিমার মাধ্যমে প্রকারান্তরে অভিনয় করাটাই মুখ্য। অস্ট্রেলিয়ার অরুন্টারা যে-'ক্যাঙারুশিকার' নাচ নাচেন, কিংবা মেক্সিকোর মানুষ 'আলু-তোলা' নাচ করেন, অথবা উত্তরবঙ্গের রাভা মেয়েরা যে-'মাছ-ধরা' নাচ নেচে থাকেন — বস্তুতপক্ষে, সে-সবই হচ্ছে এক ধরনের প্রাথমিক লোকনাট্য।

এই ভঙ্গী-নৃত্য-সঙ্গীত-সমন্বিত হয়ে কীভাবে লোকনাট্য এবং পরিশীলিত (মন্দির) নাট্যে পরিণত হয়েছিল, সেটি এর আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মন্দির-নাট্যে/নৃত্যে লৌকিক প্রভাব কতটা তারও ইঙ্গিত মিলেছে। এখানে লোকনাট্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কী-কী, সেটিই আপাতত আলোচ্য —তার পরে বিচার্য, তার মূল চরিত্রলক্ষণগুলিই বা কী?

সাধারণভাবে লোকনাট্য, মুক্ত অঙ্গনে — খোলা মাঠে কিংবা চাষের জমিতে অথবা গ্রামদেবতার থানের সামনে অভিনীত হয়। মোটামুটি একটা কাহিনী বাঁধা-থাকলেও,

সংলাপের অনেকাংশই তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় বহুসময়ে। গান, নাচ এবং সংলাপ — এখানে হামেশাই একে অন্যের বিকল্প-বা-পরিপূরক হিশেবে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় কাহিনী, পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অসঙ্গতিই মোটামুটিভাবে এই জাতীয় নাটকের উপজীব্য। আর প্রায়শই, এগুলি প্রকারান্তরে লোকশিক্ষা-তথা-গণজ্ঞাপনমাধ্যম রূপে গণ্য হয়। অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং পরিণামে জয়লাভ — এই নাটকগুলির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। রসিকতা এবং বিদ্রূপ-বা-শ্লেষ এগুলির স্বাদুতা বৃদ্ধি করে। মেয়ে-পুরুষে একত্রে অভিনয় এখন ব্যাপকভাবে এদেশেও চালু হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এক সময়ে সেটা নিষিদ্ধপ্রায় ছিল।

লৌকিক সঙ্গীত-এবং-নৃত্য যেমন অসংখ্য, অজস্র প্রকরণে বিভক্ত, ঠিক সেই কথা লোকনাট্যের সম্পর্কেও বলতে হয়। তবে 'ফর্ম'-বা প্রকরণের দিক থেকে যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, বিষয় এবং তার প্রকাশের ক্ষেত্রে — উপরে যা-যা উল্লেখিত হয়েছে, তাদের বাইরে প্রায় কোনও সময়েই যায় না লোকনাটক। কোনও সংস্কৃতিবলয়েই না। এটা প্রায় বিশ্বজনীন একটি বিধিতেই পরিণত হয়েছে।

।।২।।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোকনাট্য ধারাগুলির মধ্যে রামলীলা (সমগ্র হিন্দীভাষী বলয়), নৌটংকী (ঐ), ছৌ (পুরুলিয়া-সেরাইকেলা-ময়ুরভঞ্জ), যক্ষগান, তামাসা (মহারাষ্ট্র), ভবাই (গুজরাট), কুটিয়াট্যম (কেরল), যাত্রা (বাংলা, বিহার, ওড়িশা), অঙ্কিয়া-নাট (আসাম), ভাওনা (ঐ), তেরুকুট্টু (তামিলনাড়ু) বীথিনাটকম (অন্ধ্র) - ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকনাট্যগুলির মধ্যে গম্ভীরা (মালদহ), আলকাপ (মুর্শিদাবাদ), বনবিবিপালা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), চোর চুরণী (জলপাইগুড়ি, কুশানে (কোচবিহার), পালাটিয়া (জলপাইগুড়ি), ডোমনী (মালদহ) ইত্যাদি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর যাত্রা এবং ছৌ তো তালিকায় আছেই ; মোখাখেল (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) এবং ব-খেলা (উত্তর দিনাজপুর)-এর নামও সেখানে সংযুক্ত হতেই পারে।

শুধু নাচ কিংবা গানের তুলনায় নাট্যাভিনয়ের আবেদন যেহেতু বেশি, তাই এর সামাজিক-অভিঘাত সৃষ্টি করার ক্ষমতাও স্বাভাবিকভাবেই অনেক ব্যাপক। এটা ঠিকই যে মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকজীবনে প্রচলিত নাটকের উপজীব্যগুলি কী, তা সেখানকার মানুষ জানেন। যেমন 'বনবিবির পালা' অথবা 'কুশানে'। যখন এই রকম একটা প্রতিষ্ঠিত বা ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীর বদলে কোনও সামাজিক বিষয় নিয়ে পালা রচিত হয়, তখন গল্পটা নতুন হলেও তার ছকটা থাকে পরিচিত ; এর ফলে ঐতিহ্য-বিচ্যুতির বোধটা সেখানে পীড়িত করেনা।

লোকশিক্ষা এবং গণমাধ্যম হিশেবে লোকনাট্যের যে গুরুত্ব থাকার কথা উল্লেখ করেছি একটু আগে, এখানে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। কথকতা, পাঁচালিপাঠ, তরজা এবং কবিগান যেটা একটি মাত্রায় করে, লোকনাট্যের ক্ষেত্রে সেটার মাত্রা একাধিক। কারণ একই সঙ্গে 'অডিও-ভিসুয়াল এফেক্ট' সেখানে ক্রিয়াশীল। লোকনাট্যে

মূকাভিনয় বা প্যান্টোমাইমের স্থান নেই এমন নয়; তবে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর নির্দিষ্ট তাৎপর্যটা সকলে চিরাচরিত অভ্যাসের ফলে বোঝে বলে, সবটাই ভিসুয়াল - এফেক্ট হওয়া সত্ত্বেও নাটকের পরিপূর্ণ স্বাদটুকু উপলব্ধি করতে কারুরই অসুবিধে হয়না।

পৌরাণিক পালার মাধ্যমে নীতিবোধ, ন্যায়বিচার, ধর্মবুদ্ধি-ইত্যাদি শেখানোর একটা ব্যাপার থাকে যদিও, তবু তার মধ্যেও সামাজিক অবিচার-ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সূক্ষ্মভাবে প্রতিবাদ সূচিত হয়। আর যখন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে পালা রচিত হয়, তখন প্রতিবাদটা অনেক স্পষ্ট এবং সরাসরিভাবেই ব্যক্ত হয়।

এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে উদাহরণ হিশেবে কুশানে, ছৌ (ছৌ-কে যদি সংলাপহীন নৃত্যনাটক হিশেবে গণ্য করি), বনবিবির পালা একদিকে — অন্যদিকে আলকাপ, গম্ভীরা, চোর-চুরনীর পালাকে বিচার করা যেতে পারে। রামায়ণের কাহিনী-অনুসারে সীতাবর্জনের পর, লব-কুশ রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। এই হল কুশানের কাহিনী — শুধু গান হিশেবেও এর প্রচলন আছে যদিও, তবু নাটক রূপেই এর পরিচিতিটা বেশি। লব-কুশের এই বিজয়কে অবচেতনভাবে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত মেয়েরা এক ধরনের 'প্রতীকী প্রতিশোধ' বলে অনুভব করেন। এ-ও এক বর্গের 'ফেরারী-টেল'-সুলভ পরিতৃপ্তি পাওয়া।

ছৌ-এর পালায় যখন সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করে, তখন পুরুলিয়ার দরিদ্র চাষী-এবং-খেতমজুরেরা অন্তরের অন্তঃস্থলে ঐ অভিমন্যুর সঙ্গে নিজেদেরকেই সমীকৃত কবে ফেলেন চিরকাল। আর সামাজিক শোষণের প্রতিমূর্তি হিশেবে ওঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন সপ্তরথী। ... সামগ্রিকভাবে ছৌ-এর পালার মধ্যে যে-যুদ্ধমনস্ক অভিজ্ঞান আছে, সেটাই তাঁদেরকে অলক্ষ্যে দিয়ে যায় প্রতিরোধের প্রেরণা, অবস্থার মোকাবিলা করতে সাহস জোগায়। ঠিক এই জন্যেই পুরুলিয়ার মেহনৎকরা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে ছৌ-এর সংস্কৃতি ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে। মহিষাসুর বধ, রাবণ বধ, বকাসুর বধ, তাড়কা বধ থেকে শুরু করে ইদানীন্তনী সিদো-কানুর পালা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ছৌ-পালার অন্তরালেই সেই মানস-প্রবণতাটি সুনিবিড়। আদিম জাদু-সংস্কার তখন সামাজিক অভিভবের মধ্যে ডুবে যায়।

'বনবিবির পালা'-য় যখন বিত্তবান্ ধনা-মনারা গরীব বিধবার একমাত্র সন্তান দুখেকে গহন বনে বাঘরূপী দক্ষিণরায়ের মুখে ফেলে চলে যায়, তার সেই অসহায়তার উপলক্ষে ১৮ ভাটির দরিদ্র মানুষেরা নাটকের প্রতিবিম্বে নিজেদেরই মুখ দেখেন। আবার বনবিবি-ওরফে-বিবিমা এসে যখন দুখেকে কোলে তুলে নেন, এবং তাঁর ভাই শাজঙ্গলীর থাপ্পড়ে ব্যাঘ্রদেবতার ঘাড় বেঁকে যায়, তখন তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় স্বস্তি-ও-প্রতিহিংসার দ্বিমাত্রিক আনন্দ।

॥ ৩ ॥

গম্ভীরার ব্যাপারটা আরও তীক্ষ্ণ এবং প্রত্যক্ষ। একজন 'বুড়ো শিব' সেজে এসে দাঁড়ান বটে, কিন্তু তাঁকে উপলক্ষ করে যে পালা অনুষ্ঠিত হয়, তার সম্পূর্ণটাই সামাজিক,

অর্থনৈতিক, এমন কী ইদানীং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেও গড়া হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও দু-চারটি জায়গায় পুরোদমে এই গম্ভীরার পালা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে 'শিব' হয়ে যান্ 'নানা'! ঐ''শিবো হে'' কিংবা ''নানা হে'' ধূয়ো ধরে গান এবং সংলাপের সূত্রে জোতদার, মহাজন, দারোগা, পুলিশ, এম এল এ, সরকার, পঞ্চায়েৎ — কারুকেই রেয়াৎ করা হয়না গম্ভীরার পালায়। ধর্মীয় উপলক্ষে এই পালার অনুষ্ঠান হলেও, আর্থ-সামাজিক সমস্যা তার মধ্যে যেভাবে প্রবলমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাতে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের হয়ে যায়।

ঠিক এই একই কথা বলতে পারা যায় আলকাপ সম্পর্কেও। গম্ভীরায় তবু যা হোক একটা ধর্মীয় উপলক্ষ থাকে প্রাথমিকভাবে থাকে, আলকাপের ক্ষেত্রে সেটাও অনুপস্থিত। রঙ্গরসিকতা, বিদ্রূপ-টিপ্পনীর মাধ্যমে সমাজের এবং দেশের বহুবিধ অপহ্নবকে প্রকৃতপক্ষে জনতার আদালতে দাঁড় করিয়ে দেয় এইসব পালা।

একসময়ে অবশ্য গম্ভীরাতে ধর্মীয় কাহিনীর কিছুটা হদিশ মিলত। আলকাপের মধ্যেও খেলোমি, মৃদু-অশালীনতার অভাব ছিলনা। কিন্তু নিছক বিনোদনের উপকরণরূপে এদেরকে কোনও সময়েই কখনওই মনে করা হতো না। আসলে, সামাজিক অভিব্যক্তি হিশেবেই এদের ব্যাপ্তি ও বিকাশ ঘটেছে — যে-কথা, অল্পবিস্তর সমস্ত লোকনাট্য প্রসঙ্গেই সত্য। গ্রামের চাষী এবং খেটে-খাওয়া মানুষেরা এদের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদী অস্তিত্বকে জানান্ দিতেন, এবং এখনও দেন — এমনটা ভাবলে ভুল হবে না।

চোর-চুর্নীর পালাও একান্তভাবেই সামাজিক। কেন একজন গরীব মানুষ চোর হয়; তার চেয়ে অনেক বড়-চোরেরা সমাজে বুক ফুলিয়ে কী করে চলা-ফেরা করে; চোর জেলে গেলে তার বউ (চুর্নী) -এর কী হাল করে-তোলে ঐ সব বড়-চোরেরা — এই সমস্ত উত্তপ্ত আর্থ-সামাজিক প্রশ্নকে সরাসরি তুলে ধরে এই পালা।

প্রকৃতপক্ষে (অন্তত পশ্চিমবঙ্গে) এই জাতীয় লোকনাট্যগুলি এখনকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক - সামাজিক পটভূমিকার গভীর এবং নিবিড়ভাবে চিত্রায়ণ করে । গণজ্ঞাপনমাধ্যমরূপে তার বিরাট একটি ভূমিকা এখনও সুপ্রতিষ্ঠ। এটা ঠিক যে, রেডিও-সিনেমা-টি ভি -ভিডিও (বিশেষত, এই শেষ উপকরণটি) গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে গ্রস্ত করলেও, লোকনাট্যের বহুবার দেখা পালাগুলির অনুষ্ঠানে দর্শকের অভাব এখনও হয়না। এটা কিন্তু এদের সামাজিক-মূল্যেরই সুনিশ্চিত সূচক।

।।৪।।

লোকনাট্যগুলিতে সমাজ-সচেতনতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার প্রমাণ মেলে এখনকার কিছু পালার উপজীব্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই। পরিবার-পরিকল্পনা, সাক্ষরতার প্রসার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সময়বিশেষে প্রতিকারের হদিশও (তাঁদের মতো করেই অবশ্য) এই সব পালার পরিচালক এবং কুশীলবেরা দেখান।

এটাকে 'পোলিটিকালাইজেশ্যন' বলে কোনও-কোনও মহল থেকে আপত্তি তোলা হয় বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে লোকনাট্য হল লোকসংস্কৃতির অন্যতম অগ্রসর মাধ্যম, তাই পরিবর্তনশীল সমাজ-এবং -অর্থনীতির অভিক্ষেপ তার ওপর অত্যন্ত দ্রুতভাবে এসে পড়ে। এটা সংস্কৃতিবিজ্ঞানের অনিবার্য একটি শর্ত। এতে আপত্তি করলে, তা পরিণামে টেঁকে না।

আদিম নৃত্য-গীত-জাদু-ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির স্তর থেকে লোকনাট্য এখন বহুদূর এগিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের লৌকিক-সংস্কৃতির প্রায়-সব প্রকরণের থেকেই লোকনাট্য অনেক বেশি আধুনিক হয়ে উঠেছে। থিয়েটার, এমন কী সিনেমাসুলভ কিছু -কিছু ব্যাপারও, এদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে, তা ঠিক; কিন্তু লোকনাট্যের শিকড়টা বৃহত্তর জনজীবনে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বলে, এই কালচারাল-কনটিন্যুয়াম সত্ত্বেও তার মৌলিক রূপান্তর ঘটেনি। আর সেটাই হল এদের অনাহত জনপ্রিয়তার মূলে। রূপ-বদল যা ঘটেছে, তা বহিরঙ্গে; অন্তর্কাঠামোয় এদের চিরায়ত ঐতিহ্যটা অটুটই থেকে গেছে।

ভারতের অন্যান্য অংশের লোকনাট্য সম্পর্কে ঠিক এই কথাটা বলা চলেনা অবশ্য। এখনও সে-সব জায়গার গ্রামীণ-ভূস্বামীরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ টিকিয়ে রাখতে পারায়, এই ধরনের রূপান্তরণ লোকনাটকের পালায় ঘটেনি। বাংলার লোকনাট্যে যে-সব 'আধুনিক' বিষয় এসে তাকে ঋদ্ধিমান্ করেছে, সেগুলি এখনও অন্যত্র তেমনভাবে উপস্থিত হতে পারেনি। চিরায়ত ঐতিহ্যেব ভিত্তির ওপরেই গড়ে-উঠেছে অথচ ভাবনার অভিব্যক্তিতে একান্ত সাম্প্রতিক — বাংলার লোকনাট্যের এই দ্বিমাত্রিক চরিত্র, তাবে এইজন্যেই অনন্যসাধারণ এক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে।

ঙ. লোকভঙ্গিমা

গিলবার্ট কীথ চেস্টরটনের 'দি ক্লাব অব কুঅ্যর ট্রেড্স' বইতে একজন আধাক্ষেপা, প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপকের বিবরণী আছে, যিনি-না-কী আদিম কৌমগোষ্ঠীর ভাষাবিবর্তন নিয়ে গবেষণা করতে-করতে শেষ অবধি কথা বলাই বন্ধ করে দিয়ে নানা বিচিত্র ধরনের নৃত্যভঙ্গিমার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁর এই গবেষণায় সহযোগী হয়েছিলেন আর এক রৌপ্যকেশ বয়স্ক — এক অবসরগ্রাহী বিচারপতি ! দুই বৃদ্ধের গম্ভীর মুখে অবিশ্রাম নেচে চলার বিবরণ চেস্টরটন যদিও গম্ভীরতর ভঙ্গীতেই লিপিবদ্ধ করেছেন, তবুও বর্ণনার অন্তর্লীন পরিহাসটুকু পাঠকের মুখে হাসির রেখা টেনে দেয় অনিবার্যভাবেই।

অথচ দুই পরিণতবুদ্ধি প্রবীণের এই ক্ষেপামির বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুগভীর নৃতাত্ত্বিক সত্য নিহিত কিন্তু আছেই। জুলু জাতির আদি ভাষা নৃত্যকেন্দ্রিক ছিল কি-না, এ নিয়ে ঐ অধ্যাপক এবং বিচারপতির মতো 'নেচে-নেচে' তর্ক না-করেও, একটা বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত হতে পারি যে, আদিম মানুষের প্রাথমিক ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমই ছিল নানা ধরণের সাংকেতিক ভঙ্গী। এখনও মূক-বধিরদেরকে নানান্ রকমের অঙ্গসংকেতের সাহায্যেই বক্তব্যের প্রতিবেদন করতে শেখানো হয় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে; সেগুলি অনুধাবন করলে অন্যরাও সে-সবের মর্মোদ্ধার করতে পারেন।

বিভিন্ন পেশা এবং ধর্মগত গোষ্ঠীর সদস্যদের নানা রকমের সংকেতভঙ্গী থাকে, যা এক ধরণের কোড্ বা প্রচ্ছন্ন ভাষার সমতুল্য। উদাহরণ হিশেবে চলন্ত-বাসে-ওঠা পকেটমারের দলের লোকদের বহু বিচিত্র সংকেত-ভঙ্গিমার কথা বলতে পারি। খেলোয়াড়দের এবং স্কুলে-পড়ুয়া ছেলেমেয়েদেরকেও নিজেদের মধ্যে এ ধরণের কোড্-জাতীয় অঙ্গ-ভঙ্গিমা ব্যবহার করতে হর্‌হামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু এ ধরনের ভঙ্গীব্যবহার সীমায়ত গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকার ফলে এদেরকে কোনও লোকভঙ্গিমা বা 'ফোক্ জেশ্চার' হিশেবে গণ্য করা যায় না। একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত সমস্ত মানুষের সমন্বয়ে যে বিশেষ আর্থনীতিক-সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সর্বজনীনভাবে যে-সব ভঙ্গিমা অর্থ-বহন করতে সক্ষম হয়, 'লোকভঙ্গিমা' অভিধা অর্জনের যোগ্য তারাই; যেমন, (আমাদের পরিমণ্ডলে সর্বজনীনভাবে অর্থবাহী দু-একটি ভঙ্গীরই উল্লেখ করি) 'বক দেখানো' বা 'কলা দেখানো' ইত্যাদি !

এ ধরণের সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি-প্রাপ্ত ভঙ্গিমাগুলি কিন্তু একেবারেই এক-একটি বিশেষ সংস্কৃতির নিজস্ব জিনিষ। অন্য সংস্কৃতির মানুষদের কাছে তাদের আবেদন হয় কিছুই প্রায় নেই, আর নয়ত নেহাৎই সামান্য এবং বহু ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন কী বিপরীতও।

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এই বিশেষ দিকটিতে সংকলন, গবেষণা

এবং বিশ্লেষণ যা হয়েছে, আনুপাতিকভাবে তার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। লোকসঙ্গীত কিংবা লোককাহিনী বা গীতিকা কি জাদুবিশ্বাস, কুসংস্কার, আচারবিধি-ইত্যাদি নিয়ে যে পরিমাণ কাজ সুদীর্ঘকাল ধরে হয়েছে , তার তুলনায় একেবারেই এই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ আক্ষরিক অর্থেই মুষ্টিপ্রমেয়। সংস্কার এবং আচারবিধির ক্ষেত্রে পালনীয় কিছু-কিছু অঙ্গভঙ্গিমার কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখিত হয় বটে, কিন্তু সেগুলিকে অবলম্বন করে নতুন ভাবনার প্রয়াস গবেষক-মহলে প্রায়শই দেখা যায় না।

এর পিছনে অবশ্য একটি কারণ আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মাচার-কেন্দ্রিক এবং জাদু-ও-ডাইনী-বিদ্যা-সম্পৃক্ত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে ধর্ম-ও-সংস্কার-নিরপেক্ষ অঙ্গভঙ্গীকে একজাতীয় বলে গণ্য করে ফেলার পরিণতিতে গবেষকরা এক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে দ্বিতীয় বর্গের ভঙ্গিমাগুলিকে সম্ভবত নিজেদের অজান্তেই উপেক্ষা করেন। এই ভ্রান্তির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সবার আগে প্রয়োজন অঙ্গভঙ্গিমার বিভিন্ন উপলক্ষের একটি মোটামুটি সুষ্ঠু বর্গীকরণ বা ক্লাসিফিকেশ্যন।

মোটামুটি ভাবে তিনটি প্রধান বর্গে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গভঙ্গিমাকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক. ধর্মাচরণ-কেন্দ্রিক;

খ. জাদু-বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং ডাইনীবিদ্যা-সম্পৃক্ত বিশ্বাস-কেন্দ্রিক;

গ. ধর্ম-এবং-সংস্কার-সম্পর্কবিহীন।

'গ' বর্গের মধ্যে আবার কিছু-কিছু ভঙ্গী আছে যার আবেদন বিশ্বজনীন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, আনন্দ, শোক, যৌনাকাঙ্ক্ষা-ইত্যাদি কতকগুলি বৃত্তি, যা দেশ-কাল-সমাজের কোনও গণ্ডীকে মানে না— মোটামুটি ভাবে তাদেরকে কেন্দ্র করেই এগুলি গড়ে উঠেছে বিশ্বের সর্বত্র। ঐ বিশেষ প্রবণতাগুলিকে অবলম্বন করেই আবার কিছু-কিছু ভঙ্গিমা প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব পরিমণ্ডলেও গড়ে উঠেছে, যার ব্যঞ্জনা অন্য সংস্কৃতির মানুষের কাছে বলতে গেলে কিছুই নেই — বরং বিপরীত একটা কোনও মনোভাবেরই সৃষ্টি করে সেখানে। এখনই সে কথা বলেছি।

এই সব সেক্যুলার-জেশ্চার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ ভঙ্গিমারও আবার নানান্ উপবর্গে বিভাজন করা সম্ভবপর :

১. সৌজন্য ও অনুগত্যসূচক;
২. প্রেম-প্রীতিসূচক;
৩. আনন্দ বা দুঃখসূচক;
৪. তৃপ্তিসূচক ;
৫. প্রেরণাসূচক ;
৬. লজ্জাব্যঞ্জক ;
৭. ক্রোধপ্রকাশক ;
৮. অপমানসূচক ;
৯. বিবাদসূচক ;
১০. নিষেধাত্মক;
১১. সম্মতি-অসম্মতি-ব্যঞ্জক ;
১২. দ্বিধাকেন্দ্রিক ;
১৩. ভয়কেন্দ্রিক ;
১৪. ঘৃণাকেন্দ্রিক;
১৫. যৌনইঙ্গিতসূচক ;
১৬. লোভসূচক ;
১৭. নৃত্য ও মূকাভিনয়সম্পৃক্ত ;
১৮. সচেতক ;

১৯. পরিহাসব্যঞ্জক ; ২১ 'কোড'-সূচক ;
২০. শপথব্যঞ্জক ; ২২ মুদ্রাদোষব্যঞ্জক ;

এ ধরণের উপবর্গ আরও কিছু অবশ্যই হওয়া সম্ভব যে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

কোনও-কোনও সময়ে একই ভঙ্গিমা একের বেশি তাৎপর্য বহন করে; ঠিক তেমন ভাবেই একাধিক ভঙ্গিমাও একটিই মাত্র তাৎপর্য নির্দেশ করে, এ-ও দেখা যায় হামেশাই। এ-সব সম্পর্কেও পরে আলোচনা করছি।

ধর্মকেন্দ্রিক অঙ্গভঙ্গিমাসমূহ আদিতে কোনও-কোনও জাদুবিশ্বাসের উৎস থেকে সঞ্জাত হয়েছে — যার পিছনে আবার গোষ্ঠীবিশেষের নিজস্ব ব্যঞ্জনাচিন্তা ছিল সক্রিয়। ক্রুশচিহ্ন কপালে বা বুকে আঁকা, আঙুল দিয়ে স্বস্তিকাচিহ্ন তৈরি করা, আশীর্বাদ বা বরাভয় মুদ্রা দেখানো থেকে শুরু করে নমাজের অথবা 'হত্যে' দেয়ার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, এরা সবই আদিতে বিশেষ ভঙ্গিমার মাধ্যমে বিশেষ দৈবশক্তির আনুকূল্য লাভের প্রেরণাজাত। সুতরাং ধর্মায়ত ভঙ্গিমা এবং জাদুভঙ্গিমা-ও দুই-ই মূলত এক। জাদু (তথা ডাইনীবিদ্যা)-ব্যঞ্জক নানা বিচিত্র ভঙ্গী এখনও আমাদের জীবনে বহুল প্রচলিত, বাইরে বার করার সময়ে শিশুর বাঁ-হাতের আঙুল কামড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নতুন পোশাক পরার জন্য চিমটি ('নিউ পিঞ্চ') কাটার বিলেতী কেতার ভঙ্গিমা উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও অপ্রাপ্য নয়। ভঙ্গীগত দিক থেকে না-হলেও, ভাবগত দিক থেকে এগুলি এখনও অবশ্যই প্রায় সর্বজনীন।

ভঙ্গীগত ভাবে যেগুলি বিশ্বজনীন অর্থ-ব্যঞ্জিত করে, তাদের মধ্যে ক্ষুধাসূচক এবং তৃষ্ণাসূচক প্রকরণ দুটির পরিধি সবচেয়ে বিস্তৃত। ডান হাতের পাঁচটি আঙুল একত্র করে হাঁ-করা মুখের কাছে এনে দোলানোর অর্থ, বিশ্বের এমন কোনও জাতি নেই, তা তারা যে-সাংস্কৃতিক স্তরেই থাকুক না কেন, যে—বুঝবে না! তেমনই হাতছানি দিয়ে ডাকা বা হাত নেড়ে নিষেধ করা ইত্যাদিও বিশ্বজনীন ভঙ্গিমা।

কিন্তু যথার্থ লোকভঙ্গিমা হল সেইগুলিই, যার সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে, সুনির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক গণ্ডীর অন্তর্গত মানুষের কাছেই। কথাটা ওপরেও একবার বলেছি; এখানে বুঝিয়ে বলছি বিস্তৃতভাবে।

একটি বিশেষ ভঙ্গী, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকলেই সেটি লোকভঙ্গিমা হবে না। প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সোনি রামাধীন নাকি গুগ্‌লি বল দেবার আগে হাত ও বল নিয়ে এমন একটি ভঙ্গী করতেন, যাতে করে তাঁর দলের উইকেট কীপার এবং অন্যান্য ফিল্ডাররা আগেই প্রস্তুত হয়ে যেতেন, ঠকে যেতেন বিপক্ষের ব্যাটসম্যান। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ একটি বিশেষ ভঙ্গী এটা নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু লোকভঙ্গিমার দাবী এটি রাখতে পারেনা, কারণ সর্বজনীনভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষের কাছে রামাধীনের ঐ ভঙ্গিমার কোনও বিশেষ তাৎপর্য ছিল না। এটা এক ধরণের 'কোড্' বা গুপ্তসংকেত, খুব সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই তার অর্থব্যঞ্জনা সংরক্ষিত। ছদ্মবেশী পুলিশের গোয়েন্দা এবং চোর, ডাকাত—বিশেষত

ছিনতাইবাজ ও পকেটমারেরা এই ধরণের সংকেত খুব বেশি ব্যবহার করে থাকে। কারখানা-শ্রমিকদের মধ্যে, অপারেশনের সময়ে ডাক্তার এবং সেবিকাদের মধ্যে, স্কাউটদের মধ্যেও এই ধরণের গোষ্ঠীকেন্দ্রিত সংকেত ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সৌজন্য ও আনুগত্যসূচক ভঙ্গী, বিভিন্ন ধরণের লোকভঙ্গিমার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। নমস্কার, কুর্ণিশ, হ্যান্ডশেক, স্যালুট, প্রণাম-ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ সংস্কৃতিকেন্দ্রিত হলেও, এগুলি বহুজনীন পরিচিতি অর্জন করেছে। এর ফলে এগুলি ভিন্নতর সংস্কৃতির মানুষের কাছেও হাস্যকর বা অবমাননাকর রূপে গণ্য হয় না। কিন্তু এই কারণেই, এগুলি লোকায়ত ঐতিহ্যের নিজস্ব বিশিষ্ট পরিচয়টুকু ক্ষুণ্ণ করেছে। পক্ষান্তরে এমন অনেক কিছু সৌজন্যসূচক ভঙ্গী আছে যারা নিজেদের ঐ নিজস্ব আবেদনকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে আজও। নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতির প্রবীণরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে নাকে-নাকে ঘষে যে-ভঙ্গিমা করেন, সেটা অন্য সমাজে হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার বলে গণ্য হলেও, প্রকৃত অর্থেই লোকায়ত ভঙ্গী। এরই ইউরোপীয় বিকল্প হল এক হাঁটু গেড়ে বসে সম্মানভাজন (প্রায় ক্ষেত্রেই মহিলা) ব্যক্তির বা হাতের মধ্যমাঙ্গুলি চুম্বন; রুশ ও ফরাসীদের মধ্যে সৌজন্য জ্ঞাপনের জন্য এক জন বয়স্ক পুরুষ কর্তৃক আর এক প্রবীণের গালে চুমো খাওয়া-ইত্যাদিও নিজস্বতার জন্য লোকভঙ্গিমা রূপেই গণ্য।

সৌজন্যভঙ্গীরই প্রায় সমান গুরুত্ব আছে পরিহাস এবং অপমানের ভঙ্গিমাগুলির। প্রতিটি জাতিরই কতকগুলি নিজস্ব মান-অপমানের মানদণ্ড আছে। আমাদের ট্রাডিশ্যনে বক-দেখানো, কলা-দেখানো, অর্ধচন্দ্র-দেখানো ইত্যাদি যতখানি অপমানদ্যোতক, কোনও ইংরেজ বা জার্মান, হটেনটট্ কিংবা এস্কিমোর কাছে এগুলি কণামাত্রও সূচিত করে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজরা যাকে বলেন 'সাংহাই জেশ্চার' অথাৎ নিজের নাকে ছড়ানো-হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকানো — আমাদের কাছে তা সম্পূর্ণ তাৎপর্যশূন্য। যে-বুড়ো আঙুল তুলে দেখানো আমাদের কাছে অগ্রাহ্য করা বোঝায়, আমেরিকান পরিব্রাজকের কাছে সেটাই মাঝপথে অচেনা গাড়ি থামিয়ে লিফ্ট চাওয়া ওরফে হিচ্-হাইকিং-এর সবচেয়ে শোভন ইঙ্গিত। কিন্তু ঐটাই যদি আবার সার্দিনিয়া অঞ্চলে গিয়ে যদি আমেরিকান ট্যুরিস্ট অভ্যাসবশত করে ফেলেন, তাহলে তাঁর বরাতে উত্তমমধ্যম অনিবার্য, কেননা ওই অঞ্চলে ঐ সংকেতের ব্যঞ্জনা অত্যন্ত অশ্লীল এবং অপমানাত্মক! হাতের পাঁচ আঙুল একসঙ্গে জুড়ে এবং নাড়িয়ে বিদায় দেবার রীতি এখন আমাদের দেশেও চালু হয়েছে দুশো বছরের ইংরেজ-সংশ্রবে, কিন্তু ইউরোপের সর্বত্র এর অর্থ এক নয়। গ্রীসের বহু অঞ্চলেই এর মানে, অবজ্ঞা প্রকাশ করা! ইউরোপে কোনও ব্যক্তির উদ্দেশে নিজের দুই কানের কাছে দু-হাত তুলে নিয়ে গিয়ে হাতছানির ভঙ্গী করা বিশেষ অপমানদ্যোতক; এর অর্থ, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর উপপতি আছে। অন্যত্র এটা নেহাৎই অর্থহীন।

কানধরা ব্যাপারটা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; ইস্কুলে মাস্টারমশাই যদি কান ধরেন বা ধরান তাহলে ব্যাপারটা শ্রীমান্ পানুর পক্ষে যতখানি অপমানসূচক, পানু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে

প্রাণগোপালে পরিণত হন, তখন তাঁর বাসরঘরে শ্যালিকা-শালজদের হাতের কানমলারও তাৎপর্য পালটায়। জিভ ভেঙানোও এই রকম একই সঙ্গে অপমান এবং পরিহাসের তাৎপর্য বহন করে; পাত্র এবং পরিবেশের ওপর সেটা নির্ভর করে। গালে জিভ দিয়ে, চোখ মট্‌কে চাপড় দেখিয়ে কিংবা আলতো করে মেরে যে-সব ভঙ্গী সেগুলি অবশ্য নির্ভেজাল পরিহাসও বিদ্রূপসূচক।

জিভ অবশ্য অনেক ধরণের ইঙ্গিত করতে পারে। লজ্জায় জিভ কাটা নেহাৎই বাঙালি কালচারের অঙ্গ, কালীপ্রতিমার জিহ্বা বাদানের পিছনেও বাঙালীর গল্প-বলিয়ে স্বভাবটি স্বামীর বুকে পা-ফেলার লজ্জার উপলক্ষ খুঁজে বের করেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে লোভ ব্যক্ত করা মোটামুটি ক্ষমার যোগ্য হলেও, ঠোটের ফাঁক দিয়ে সাপের মতো বারংবার জিভ বের করা নিতান্তই অশ্লীল এবং আপত্তিকর বলে গণ্য হয়, বিশেষত তা যদি অল্পবয়সী মেয়েদের সামনে ঘটে। অনুরূপ যৌন-ইঙ্গিতমূলক ভঙ্গী হাতের বিশেষ মুদ্রার মাধ্যমে কিংবা চোখের ইঙ্গিতেও বদ লোকেরা করে থাকে, যা দেখে ভাল মেয়েরা লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢাকে অথবা ঘৃণায় নাক সিঁটকোয়, কিংবা ভয়ে দুহাত গলার নিচে জড়ো করে, নয়ত রাগে কট্‌মটিয়ে তাকায়। রাগের অবশ্য আরও ভঙ্গী আছে; মুঠো পাকানো এবং খোলা, আঙুল মট্‌কানো, জোরে পা-ঠোকা, দাঁত কিড়মিড় করা-ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশ্য আঙুল মট্‌কে অভিশাপও দেওয়া হয় আমাদের দেশে।

পথেঘাটে এক মেয়ে আরেক মেয়েকে সচেতন করে দেয় কনুয়ের গুঁতো মেরে — এও তো হর-হামেশাই দেখি আমরা। হাততালি শুধু আনন্দের কারণেই নয়, সচেতন করার জন্যও দেওয়া হয়, বিশেষত অনেক দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে। ভয় পেলে মাথার ওপর দুহাত তোলা বা আত্মসমর্পণ করতে হলেও তাই করা — এগুলিও এখনই উল্লেখিত ভঙ্গিমাগুলির মতেই সর্বজনীন। ফলত, এরাও ঐ কারণেই লৌকিক সত্তা হারিয়ে ফেলেছে।

হাতের পাঁচ আঙুল নাড়ানো নিয়ে ওপরে একবার বলেছি। বিদায় দেওয়া ছাড়া অন্য সময়ে তার অর্থ (গ্রীস এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশের সিন্ধু অঞ্চল ছাড়া) সর্বত্রই নিষেধাত্মক। ইউরোপের বহু অঞ্চলে ঐ নিষেধ আবার দু-হাতের তর্জনী গুণচিহ্নের মতো করে জ্ঞাপন করা হয় — যা আবার মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনমিলনের সঙ্কেতবাহী। ঠিক ঐ ভাবেই একদা যে চুমো-ছোঁড়া প্যালেস্তাইন থেকে গ্রীস অবধি বিস্তীর্ণ এলাকায় দেববন্দনাসূচক ছিল, বর্তমানে মার্কিন সৈনিকদের বদান্যতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা গোটা প্রাচ্য ভূখণ্ডেই যৌনবাসনাজ্ঞাপক ভঙ্গী রূপে পরিচিত হয়েছে সেটি। ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নেড়েও নিষেধ করা হয় উত্তরাপথের সর্বত্র। অসম্মতিও জ্ঞাপন করা হয় ঐ ভঙ্গীর মাধ্যমেই। সম্মতিসূচক ভঙ্গিমা হল, যে কোনও একদিকে ঘাড় হেলানো। কিন্তু দ্রাবিড়ভাষী সাংস্কৃতিক-বলয়ে সর্বত্রই সম্মতি-অসম্মতির ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত ভঙ্গীর মাধ্যমে জানানো হয়ে থাকে। জলন্ধরের কমলজিৎকে কি শ্রীরামপুরের সুতপাকে দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভাতিন্দার গুরুবক্স কিংবা মাথা চুলকে কলকাতার অমলেন্দু 'প্রোপোজ' করলে তারা হ্যাঁ-না যাই বলুক না কেন, একইভাবে বলবে,

পক্ষান্তরে পণ্ডিচেরীর বিশ্বনাথন ম্যাঙ্গালোরের লক্ষ্মীকান্তাম্মাকে সেই একই কথা শুধোলে তাদের হ্যাঁ-না ব্যক্ত হবে ঠিক বিপরীত ভঙ্গীতে। কিন্তু যদি 'হ্যাঁ' বা 'না'-র মাঝামাঝি থাকে মনের ভাবটা? অর্থাৎ দো-টানা। তখন চারটি মেয়েই যা করবে, তা কিন্তু বিশ্বজনীন — অর্থাৎ রোমের সিলভানিয়া থেকে শ্যামপুকুরের শ্যামলী অবধি সবায়েরই একই ভঙ্গী। ঠোঁট কামড়াবে, নখ খুঁটবে, বিনুনি (থাকলে) খুলবে আর বাঁধবে, আঙুল কামড়াবে, এইসব—বাঙালী মেয়ে হলে হয়ত আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াবে।

অর্থাৎ দ্বিধার ভঙ্গীগুলো মোটামুটিভাবেই বিশ্বজনীন। পূর্বোক্ত কমলজিৎ, সুতপা, লক্ষ্মীকান্তাম্মা, সিলভানিয়া এবং শ্যামলীর এই ব্যাপারটা যদি যোগেযাগে নির্ঝঞ্ঝাটে স্থির হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে স্নেহ করেন এমন বর্ষিয়সী মহিলারা আবার যে ভঙ্গীতে নিজেদের খুশি এবং অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, তাও কিন্তু প্রায় বিশ্বজনীন। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে মেয়েটির সলজ্জ থুতনিটুকু ছুঁয়ে চুমকুড়ি কেটে অন্নদা মাসীমা সুতপাকে বলবেন, "ওমা তাই নাকি। আহা জন্ম এয়োস্তিরি হও মা।" আর রোমের সোফিয়া আন্টি সিলভানিয়ার থুতনি ধরে বা না-ধরে তার গালে চুমু খেয়ে বিশুদ্ধ ইতালিনী উচ্চারণে যা বলবেন, তার মধ্যেও মৌলিক কোনও তফাৎ নেই।

আলোচনায় বারবারই একটি বিশেষ ভঙ্গিমার কথা এসে যাচ্ছে : চুম্বন। কখনও ভক্তি, কখনো শ্রদ্ধা, কখনও স্নেহ, আবার কখনও সৌজন্য এবং কখনও যৌনবাসনা — সবই এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয় যে, তা আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি। মোটামুটি একটা মতকে প্রাসঙ্গিক আলোচকরা সবাই মেনে নিয়েছেন যে, চুম্বনকারীর সামাজিক অধিষ্ঠান যত নিচের দিকে হবে, চুম্বনপাত্রের দেহের তত নিচের অংশে সে চুমো দেবে। একেবারে ভৃত্যস্থানীয়রা সেইজন্য মধ্যযুগের ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভুর শুধুমাত্র চরণ-চুম্বনের অধিকারী ছিল। আবার যাজক ছিলেন কপালে বা মাথায় চুম্বনের অধিকারী। ওষ্ঠে চুম্বনভঙ্গী কেবলমাত্র প্রেম-সম্পর্কেই বিহিত ছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যে চুম্বন অবশ্য প্রেম-সম্পর্কেই প্রধান; শিরশ্চুম্বন ইত্যাদি পরবর্তীকালে এসেছে। প্রাচীন চিত্র-ভাস্কর্য সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য নজির আছে বলে তা মনে পড়ছে না।

গা ছুঁয়ে বা মাটি ছুঁয়ে শপথ আর একটি ভঙ্গী, যা আপাতভাবে সেকুলার হলেও জাদু-সংস্কারজাত। গা ছুঁয়ে (নিজের বা প্রিয়জনের) শপথ করার তাৎপর্য, মিথ্যা বললে (নিজের বা ঐ প্রিয়জনের হানি হবে); মাটি ছুঁয়ে শপথ আদিম উর্বরতা-কেন্দ্রিক কাল্ট্-এর ঐতিহ্যবাহী। এরই প্রতীচ্য সংস্করণ হল 'টাচ্ উড'। আমাদের নিজের ঠোঁটে টোকা দিয়ে 'থুড়ি' বা ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সময় দেওয়া 'আব্বু' কোনও ধরণের শপথ না হলেও, ভঙ্গিমার দিক থেকে অনেকটাই অনুরূপ। ঠোঁটে আড়াআড়ি তর্জনী ঠেকানো অবশ্যই সারা বিশ্বেই নীরব থাকার সঙ্কেত।

দ্বিধাসূচক ভঙ্গিমাগুলি অনেক সময়েই মুদ্রাদোষরূপেও প্রকাশিত হয়। কিছু - কিছু ভঙ্গীর কথা ওপরে বলেছি। এই ধরণের আরও দু-একটি ভঙ্গী হল নিজের কপালে বা গালে, কিংবা ঠোঁটে অথবা মাটির ওপরে আঙুল টাইপ-রাইটার চালানোর ভঙ্গীতে নাচিয়ে যাওয়া। এটি অন্যমনস্কতার ভঙ্গীও বটে।

তৃপ্তি, আনন্দ এবং দুঃখের প্রকাশের ক্ষেত্রেও হাতের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। বুকে হাত বুলোনো (স্বস্তি অথবা সান্ত্বনা), মাথায় হাত দেওয়া (দুর্ভাবনা), গালে হাত দেওয়া (বিস্ময় অথবা চিন্তা), হাততালি (উল্লাস), পেটে হাত বুলোনো (ক্ষুধানিবৃত্তি) তুড়ি দেওয়া (সচরাচর ফুর্তি, হাই-ওঠার সময়ে জাদুসংস্কার), পিঠে হাত বুলোনো (সান্ত্বনা), পিঠ চাপড়ানো (অভিনন্দন), দ্রুত হাত ঝাঁকানো (প্রেরণা দেওয়া) ইত্যাদি অনেক কিছুর ব্যঞ্জনাভঙ্গীই হাতের মাধ্যমে ছাড়া করা সম্ভব না।

ভঙ্গীতত্ত্বের স্বল্পসংখ্যক গবেষকদের মধ্যেও এই জন্যই একটি গোষ্ঠী ভাবগত বিশ্লেষণের বদলে বিভিন্ন ভঙ্গীর অঙ্গগত বিশ্লেষণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেন। তবে তাতে বর্গবিন্যাসটা জটিল হয়ে যায়।

একালে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ ভঙ্গী (যা এখন সারা বিশ্বেই প্রচলিত হয়েছে) হল ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাধ্যমে 'ভি' অক্ষরের মতো করা। 'ভি ফর ভিক্টরি' এই শ্লোগান ঐ চিহ্নের মাধ্যমে রূপায়িত করতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। কিন্তু এর ইতিহাস আরও আগের : বিশেষত যাদের উদ্দেশে ঐ ভঙ্গী করা হয়, তাদের দিকে যদি হাতের তালুর বিপরীত দিকটা (নখের দিক) ফেরানো থাকে, তাহলে ভিক্টোরিয়ান ইংলন্ডে তার অর্থ অশালীন ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করা হতো। এই উল্টো 'ভি' এখনো অনুরূপ অর্থই বহন করে ইংলন্ডে — যদিও ভুলক্রমে অনেকেই সেটা করে ফেলেন কখনও-কখনও — যাঁদের প্রাক্তন তালিকায় আছেন প্রাক্তন দুই-বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং উইনস্টন চার্চিল।

নৃত্য এবং মূকাভিনয়ের ভঙ্গীগুলি অবশ্য প্রকৃতপক্ষে লোকভঙ্গীরূপে গ্রাহ্য নয়, যদিও আদিতে এর অনেক কিছুই লোকজীবনের ব্যবহার্য সংকেতসমূহকে অবলম্বন করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন এইসব মুদ্রাগুলি ব্যাকরণাশ্রয়ী হয়ে পড়ার ধ্রুবপদী বলেই গণ্য হয়। ফলে লোকায়ত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরে চলে গেছে এগুলি — এদের অর্থ এখন বিশেষজ্ঞ রসিক দর্শক ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রেই সুবোধ্য নয়। ভঙ্গীর সাহায্যে গল্প তৈরিও লোকসংস্কৃতির একটি সুপ্রচলিত শাখা। লোককাহিনীর যে-আড়াই হাজার বর্গবিন্যাস করেছেন অ্যান্টি আর্নে এবং স্টিথ টমসন, তাতে এর নির্দিষ্ট সূচক সংখ্যা অবধি দেওয়া আছে : ৯২৪

লোকভঙ্গিমার সীমানা, লৌকিক প্রয়োগকলার অন্যান্য শাখার থেকে অনেক বেশিদূর অবধি ব্যাপ্ত, পরিশেষে এই কথাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র নৃত্য, অভিনয়, ক্রীড়া অথবা অনুরূপ কিছুর মধ্যে এটি সীমায়ত নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহুবিচিত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিস্তীর্ণ এলাকায় এর বিচরণ। প্রণাম থেকে আশীর্বাদ, স্বাগত-সম্বোধন থেকে বিদায় জ্ঞাপন, আনন্দ থেকে বিষাদ, ক্রোধ থেকে লজ্জা — প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকভঙ্গিমার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনা মানুষের প্রাত্যহিক চর্যাকেই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে সাহায্য করে। এই 'সম্মান' এককভাবে অন্য কোনও প্রয়োগকলার পাওয়া কিন্তু নিতান্তই অসম্ভব।

চ. লোকক্রীড়া

প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিজ্ঞানী আর্চার টেলর বহুদিন আগে একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন : ছেলেখেলা বলে যাকে আমরা স্নেহ এবং উপেক্ষার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত, বস্তুতপক্ষে তার মধ্যে 'ছেলেমি' এবং 'খেলার' ভাগটুকু নেহাৎই আপেক্ষিক; প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সামাজিক বিবর্তনের অজস্র স্মৃতিই তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ... হঠাৎ এমন কথা শুনলে মনে হতেই পারে যে, এ হল নিতান্তই বাড়িয়ে বলা : বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন! কিন্তু সত্যিই যদি কোনও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত বিভিন্ন ধরণের লৌকিক ক্রীড়ার রীতি, নিয়ম ইত্যাদি অভিনিবেশের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হন, তাহলে টেলরের ঐ কথার নিহিত তাৎপর্যটুকু খুঁজে পাবেন অবশ্যই। স্মরণাতীত কাল থেকে এ-অবধি মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে ক্রমোত্তরণ ঘটেছে, তার স্মৃতিরেণু এই সবের পরতে-পরতে জমে রয়েছে। কালের বিবর্তনে তাদের প্রাথমিক তাৎপর্যটুকু শুধু ঢাকা পড়ে গেছে।

মানুষের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজনের কাঠামোর ওপরই যে গড়ে উঠেছে তার সংস্কৃতির বিচিত্রমূর্তি বহিঃসৌধ, এ তত্ত্ব আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত অস্বীকার করেন না — ব্যতিক্রম শুধু কিছুসংখ্যক পশ্চিমী (বিশেষত আমেরিকান) পণ্ডিত, যাঁরা সমাজবিকাশধারাকে দ্বান্দ্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে অনিচ্ছুক। ভরসার কথা টেলর প্রমুখ পণ্ডিতেরা অবশ্য তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত নন। মার্ক্সবাদী না হলেও, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তাঁরা আগ্রহী; সুতরাং ভাবনা চিন্তার সময়ে তাঁদের অভিমতকেও মার্ক্সবাদীরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রাহ্য করেন। মার্ক্সীয় সমাজবীক্ষণের ক্ষেত্রেও এর ফলে চিন্তার নূতন উপকরণ মেলে।

ঠিক এই প্রেক্ষিতেই এখানে বাংলার সাংস্কৃতিক বলয়ে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত কয়েকটি লৌকিক খেলার স্বরূপ অন্বেষণ করা যাচ্ছে। নিছক 'ছেলেখেলা' নয় যে এই খেলাগুলি, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিই প্রতীয়মান হবে। এই সমস্ত লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে আমাদের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষ নানা আবরণে আত্মগোপন করে আছে : বাহিরঙ্গিক তাৎপর্য এখন যা-ই হোক না-কেন মূলে তাদের অর্থ ছিল অন্যতর।

।। ২ ।।

কানামাছি, কুমির-কুমির, বউ-বসন্তি এবং চোর-পুলিশ এই চারটি সুপরিচিত খেলার আড়ালে প্রাগিতিহাসের কাল থেকে এ-অবধি যে-সাংস্কৃতিক সামাজিক ইতিহাসের ধারা বহমান আছে আমাদের জীবনচর্যায়, তারই বেশ কিছু বিস্মৃতিবিলগ্ন উপলখণ্ড এইসব খেলার খুঁটিনাটি ব্যাপারের ভিতরে ছড়িয়ে আছে। এই বহুল-প্রচলিত খেলাগুলির নিয়ম-কানুন, রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে প্রায় সকলেই যেহেতু ভালভাবে পরিচিত, তাই সেগুলি এখানে স্মরণ করতে কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়। হা-ডু-ডু, ডাং-গুলি, এক্কা-দোক্কা, বাঘবন্দী প্রভৃতি আরও কিছু খেলার কথাও এই সূত্রে যথাকালে আলোচ্য।

'কানামাছি' খেলার মধ্যে যে মানুষের আদিম কতকগুলি সংস্কার বিচিত্রভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্পর্কে মানুষের অবচেতন মনে এক ধরনের ভয় এবং অস্বস্তি থাকেই, এমন কথা মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। আদিম মানুষের চেতনায় অন্ধ, খঞ্জ-প্রভৃতি পঙ্গু লোকেরা তাঁদের দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারেন, এই ব্যাপারটা এক রকমের 'অলৌকিক' ক্ষমতা বলেই প্রতীত হতো (যার অনুষঙ্গে উত্তরকালে গড়ে উঠেছে ''কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া''—জাতীয় প্রবাদবচন)। অন্ধ যদি কারুকে স্পর্শ করে ফেলে, তাহলে সেও দৃষ্টিশক্তি হারাবে এমনই একটি স্পর্শমূলক জাদুসংস্কার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মনে দানা বেঁধেছিল। সেই ভীতির বশেই, অন্ধকে না-ছোঁবার যে-একটি প্রয়াস তাঁদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল, তারই অনুকরণে তাঁদের শিশুরাও কখন এই খেলার আদিতম রূপটিকে তৈরি করেছিল। অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও এর পিছনে মিলে-মিশে আছে নিঃসন্দেহে। সংস্কার এবং জীবিকান্বেষণ, এই দুই উপলক্ষ একত্রে এই খেলার মূল পরিকাঠামোটিকে গড়ে তুলেছে।

''কানামাছি ভোঁ-ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'' এই খেলার একটা পশ্চিমী-সংস্করণও আছে, সেকথা প্রাসঙ্গিকভাবে একটু বলা বাঞ্ছনীয়। সেই খেলার আনুষঙ্গিক ছড়াটাও আশ্চর্যজনকভাবে বাংলা ছড়াটার সঙ্গে ছন্দের ঝোঁকে-ঝোঁকে মেলে ঃ ''ঈনি মীনি মীনা মো, ক্যাচ দ্য নিগার বাই দ্য টো।'' বাংলার 'কানামাছি'-র বদলে 'নিগার' হবারও একটা সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সূত্র আছে। অন্ধ সম্পর্কে আদিম-ভীতিটা আমাদের সংস্কৃতি-বলয়ে ক্ষিপ্ত-মৌমাছির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। আর মার্কিনী সমাজে সেটাই অন্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে — নিগ্রোর প্রতি ঘৃণা এবং অবজ্ঞার মনোভাবটা তাই খেলার মধ্যে প্রতিবিম্বিত : নিগ্রো সেখানে শুধু ভয় এবং ঘৃণারই পাত্র নয়, অবমাননারও। তাই তাকে যদি ছুঁতে বা ধরতে হয়ই তা— হলে সেটা করতে হবে পা-দিয়ে —''বাই দ্য টো''। সমাজ-মানসের নিখুঁত চিত্রায়ণ, সন্দেহ নেই। আদিম আরণ্যক জীবনের প্রতিভাস ওদেশের খেলাটার মধ্যেও খুব সম্ভবত ছিল; কিন্তু পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক জীবনচর্যায় বাহিরঙ্গিকভাবে তার রূপান্তরণ ঘটল, যদিও পরিকাঠামোটুকু বদলায়নি।

॥ ৩ ॥

কানামাছির মতোই আদিম আরণ্যক-জীবনের স্মৃতিকণা জড়ো হয়ে আছে 'কুমির-কুমির' খেলার মধ্যেও! ''কুমির, তোমার জলকে নেমেছি—'' এ তো নক্র-শ্বাপদসঙ্কুল নদী-অরণ্যের প্রতিবেশী মানুষের জীবনযাপনেরই প্রতিভাসবাহী। জলকে নেমে নদী পেরোনোর সময়ে বাস্তবক্ষেত্রে কুমির ধরে ফেললে অবশ্য কোনও রেহাই থাকত না। কিন্তু খেলার সময়ে 'কুমির' ধরতে এলে একটা বাঁচবার পথ আছে . 'বুড়ি' ছুঁয়ে ফেলতে পারলে কুমির আর 'মোর' (মরা) বানাতে পারবে না!...এই 'বুড়ি' ব্যাপারটাও এক ধরনের আদিম-কালাগত সংস্কারের অনুক্রমণ। 'বুড়ি' যে সাজে সে তো ঐ প্রবল

ছুটোছুটির মধ্যেও একমাত্র খেলুড়ে যাকে 'থুবড়ি খেয়ে' বসে থাকতে হয় (সাধারণত দলের মধ্যে সবচেয়ে বাচ্চা যে, তাকেই 'বুড়ি' বানায় বড় দাদা-দিদিরা।)

'বুড়ি' হল নিরাপদ আশ্রয় : হোলি প্লেস বা হোলি পার্সন। তাকে স্পর্শ করে থাকতে পারলে কোনও আপদ-বিপদ ছুঁতে সক্ষম হবে না, এমন সংস্কারই খেলার মধ্যে 'বুড়ি'কে উপস্থিত করেছে। এই খেলার মধ্যে স্মরণপূর্ব কালে, হয়ত একদা কুমিব যাঁদের টোটেম ওরফে কুলপ্রতীক ছিল, তাঁরা যখন আদিম গোষ্ঠীযুদ্ধে অন্যদের মোকাবিলা কবতে যেতেন— তখন নিশ্চয়ই আক্রান্তরা ঐ 'বুড়ি' মতোই বাস্তব একটা স্যাংচুয়ারিতে আশ্রয় খুঁজতেন। আশ্রয় জোগাড় হলে, তখন তাঁরা নিরাপদ; আর সেখানে কুমির-বাঘ-হাতী-গণ্ডার— কোনও টোটেমের লোকেরাই হামলা করতে পারত না, করলে ট্যাবু (ধর্মসম্পৃক্ত পবিত্রতা) ক্ষুণ্ণ হতো। এই ট্যাবু-সংস্কারও আদিমকালের প্রত্যয়; আর খেলার মধ্যে সেটি বিম্বিত হয়েছে ঐ বুড়ি-ছুঁয়ে-যাওয়ার সূত্রে।

'চোর-চোর' হল 'কুমির-কুমির' ধরনের খেলারই একটি আধুনিক রূপান্তর। 'কুমির' ছুঁয়ে ফেললেই যেমন 'মোর'— ঠিক তেমনই 'চোর' কারুকে একবার স্পর্শ করলেই সে বনে যায় 'চোর', আর আগের 'চোর'-এর তখন রেহাই। স্পর্শজাদুর সংস্কারটুকু এখানে অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে, 'আব্বু' বলে সাময়িক রেহাই পাবার ব্যাপারটাও সেই ট্যাবু-সংস্কারেরই খেলা-খেলা রূপ বলে স্বচ্ছন্দে মনে করা যায়। 'আব্বু'-র এমনি কোনও অর্থ নেই। কোনও ধরনের প্রতিরোধক-বলে প্রতীত-হওয়া জাদু-শব্দের অনুকল্প হতে পারে। কোড্-ওয়ার্ড অর্থাৎ সংকেতমূলক শব্দ বলেও গণ্য করা যায় হয়ত একে। 'চোর'-এর স্পর্শ পেলে আরও একজন 'চোর' বনে যেতে বাধ্য, এই নিয়মটা পরবর্তী কালের সামাজিক-এথিক্‌সের অভিঘাতে সৃষ্ট হয়েছে। আর খেলার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে সেইটিই।

চোর-পুলিশ খেলার কথা ওপরে উল্লেখ করেছি। 'চোর' এবং 'পুলিশ' এই নামদুটি মূল খেলাটির ওপরে একটা আধুনিকতার পালিশ বুলিয়েছে। এই খেলারই প্রাচীনতর রূপ হচ্ছে 'কুকুর-শকুনিদের লড়াই'। 'কুকুর' হয় একটা দলের ছেলেরা— আর 'শকুনি' হয় অন্যরা। ঠিক 'চোর-পুলিশ' খেলার মতো একজন 'কুকুর' প্রথমে ঝিম্ মেরে বসে থাকে, আর তার চারদিকে 'শকুনি'-রা ডানা মেলার ভঙ্গীতে দুটো হাত নাচিয়ে-নাচিয়ে ওড়ার মতো ভাব দেখায়। কুকুর যদি কোনও শকুনিকে ধরে ফেলতে পারে, তখন সেও হয়ে যায় কুকুর। এইভাবে শেষ অবধি যারা দলে ভারী হয়ে যায় তারাই জেতে।

স্পষ্টতই, আদিমকালের দুই কৌমগোষ্ঠীর সংঘাতই এই খেলার অন্তর্কাঠামোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কুকুর এবং শকুন— এই দলনাম দুটি সেই টোটেম-বিশ্বাসেরই স্মারক বলে গণ্য করা চলে। এই খেলাটি 'বাঘ-ছাগল' নামেও কোনও-কোনও অঞ্চলে পবিচিত। আদিম আরণ্যক জীবন থেকে অগ্রসর হয়ে মানুষ যখন পশুপালনের স্তর অবধি এসেছে, এই নামটি সম্ভবত তখনকারই দ্যোতনাবহ। টোটেম-গোষ্ঠীদের মধ্যে যুদ্ধ, শ্বাপদের হাতে গৃহপালিত প্রাণীর বিপন্নতা এবং অবশেষে সামাজিক এথিক্‌স-মাফিক চোব ও পুলিশের মধ্যে লুকোচুরির টানাপোড়েন— একই খেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা অনুসারেই তাদের নামগুলি গড়ে উঠেছে। বাঘ-ছাগল নিয়ে একটি

ঘরোয়া খেলাও আছে, যার নাম 'বাঘবন্দী'। সেটির প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে।

আদিম জীবনের রীতিনীতি, বিধিবিধানের হদিশ খুজে পাই আরও দুটি জনপ্রিয় খেলার মধ্যে : 'বউ-বসন্তি' এবং 'জোড়বাঁধাবাঁধি'— এই খেলা দুটির মধ্যে, বিবাহ প্রথা এবং নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তার বেশ খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'বউ-বসন্তি' খেলায়, দুটি দলের মধ্যে একদল একটি মেয়েকে 'আটকে রাখে' এবং অন্যদল তাকে 'উদ্ধার করা'-র উদ্দেশ্য নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে। স্পষ্টতই, এটা হল কন্যাহরণ করে বিবাহ করা এবং তাতে বাধা দেবার বাস্তব ঘটনাধারারই ছেলেমানুষি অনুবর্তন। 'বউ' যদি পাহারাদারদের এড়িয়ে উদ্ধারকারী কোনও একজনের সঙ্গে অন্য দলের এলাকায় ছুটে পালাতে পাবে, তাহলে পাহারাদাররা হেরে যায়; আর 'উদ্ধারকারী-কে যদি পাহারার দলের কেউ ছুঁয়ে দিতে পারে, তাহলে সে হয়ে যাবে 'মোর' (অর্থাৎ, মৃত)। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে নারী-লুণ্ঠনের আদিম দ্বন্দ্ব তার সামগ্রিক কাঠামোটি নিয়েই এর মধ্যে বজায় থেকেছে সম্প্রসারিতভাবে।

'জোড়বাঁধাবাঁধি' খেলার মধ্যেও বিয়ে-করা এবং বিয়ে-ভাঙার সামাজিক প্রথাগুলিরই কিছু-কিছু অবশেষ দৃশ্যমান হয়। উবু-দশ-কুড়ি-ইত্যাদি বাংলার লৌকিক খেলাধূলাব প্রচলিত গণনাপদ্ধতি অনুসারে একজন 'চোর' বলে সাব্যস্ত হয়। সে ছাড়া, অন্য ছেলেমেয়েরা দুজন-দুজন করে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়ায় (সচরাচব একটি ছেলে-একটি মেয়ে, জোড়গুলো এইভাবেই বাঁধা হয়)। এর পরে খেলা শুরু হলে, দৌড়ো-দৌড়ির সময়ে জুড়িরা পরস্পরের হাত ছেড়ে দেয আর বলে ওঠে "জোড় ছেড়েছি! জোড় ছেড়েছি!" 'চোর' – যদি সে মেয়ে হয়, তাহলে একটি জোড়-খোলা ছেলেকে ছুঁয়ে দিয়ে, তার 'জুড়ি' হয়ে যায় এবং যার কাছ থেকে সে এই 'জুড়ি' ছিনিয়ে নিল সে তখন হয় 'চোর'। আবার 'চোর' যদি ছেলে হয়, তাহলে সে ঐভাবে কোনও মেয়েকে ধবে জোড বাঁধতে পারলে, মেয়েটির অনতিপূর্বের জুড়িটি হয় 'চোর'।

আদিমকালের গোষ্ঠীসমাজে এক নারী-এক পুরুষের যৌন-সম্পর্ক থাকাটাব কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না যে, সে-ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা, বিশেষ দ্বিমত পোষণ করেন না। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সঙ্গেই সব প্রাপ্তবয়সী পুরুষের তেমন সম্পর্ক-থাকা তখন গোষ্ঠীসমাজের বিধানে বৈধ বলেই গণ্য হতো। সেই নির্বাধ যৌন-স্বাধীনতার প্রথাই এই খেলার প্রত্নপ্রতিমা হিশেবে বিদ্যমান রয়েছে। এখনও লোকসমাজের একেবারে নিচের সিঁড়িতে কিংবা আদিবাসী কৌমসমাজে 'সাঙা', 'চুড়িবিহা'-প্রভৃতি বিয়ের পদ্ধতিগুলির মধ্যে ঐ-রকম 'জোড় ছাড়া' এবং 'জোড় বাঁধা'-র স্মৃতিকণা সঞ্চিত হয়ে আছে। বাংলার এই ছেলেমানুষি খেলাটি তারই অনুরূপায়ণ করে। হয়ত, এই কারণেই 'বউ-বসন্তি' এবং 'জোড়বাঁধাবাঁধি' খেলাদুটি অভিভাবক সমাজে একান্তভাবেই অপছন্দেব বিষয়ে পরিণত হয়ে উঠেছে কালক্রমে।

নারী এবং জমি— এ দুটিই হল চিরকালীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মুখ্য দুই উপলক্ষ। নারী-লুণ্ঠন এবং বিবাহ-ইত্যাদির স্মৃতি-অবশেষ যেমন 'বউ-বসন্তি'-জাতীয় খেলার মধ্যে থেকে গেছে, ঠিক তেমনই আবার জমির অধিকার-ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্বের অনুসূত্র দেখা

যায় 'হাডু-ডু', 'কবাডি', 'গাদি'— এমন-কী 'এক্কা-দোক্কা'-প্রভৃতি খেলার মধ্যে। জমির প্রয়োজন ছিল শিকার-সংগ্রহের জন্য, ফল-পাকুড় লতা-গুল্ম জোগাড়ের কারণে, পশুচারণ এবং চাষবাসের উপলক্ষে। সুতরাং জমির অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, ট্রাইবে-ট্রাইবে, ক্ল্যানে-ক্ল্যানে লড়াই। সেই লড়াইয়ের এক জাতীয় অভিব্যক্তি ঐ 'কুকুর-শকুন', 'বাঘ-ছাগল' ধরনের খেলায় দেখা যায়; আর অন্য ধরনের প্রকাশ পরিদৃশ্যমান হয় এই সব খেলাগুলিতে। নিজেদের এলাকা থেকে একদমে (এটা এবং আনুষঙ্গিক বিচিত্র কণ্ঠধ্বনিগুলি জাদুসংস্কার বলে মনে করা যায় অবশ্যই) বিপক্ষের এলাকায় গিয়ে হানা দিয়েই তৎক্ষণাৎ ফিরে-আসার ব্যাপারটাই পশুশিকার, ফসল-বা-ফলমূল ছিনিয়ে-আনা-ইত্যাদি ব্যাপার ঐ সবেরই সূচকস্বরূপ।

আমার ছাত্র ড. অসীম দাস এইসব খেলাগুলি নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন 'হা-ডু-ডু' খেলার দুই পক্ষের মাঝের সীমারেখাটিকে 'চরাই' বলে উল্লেখ করা হয় এই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। 'চরাই' নামটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ : পশুচারণার এলাকাকে 'চরাই' বলা হয় গ্রামীণ-ভাষায়। সুতরাং 'হা-ডু-ডু'-ইত্যাদি খেলার মধ্যে প্রাচীনকালীন যে-প্রতিভাসের কথা বলা হয়েছে এখনই, এখানে তার সমর্থনে জোরালো যুক্তি মিলছে।

জমি-দখল, কৃষিকর্মের-বিলিব্যবস্থা এবং শিকার করা—ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার লুকিয়ে আছে 'ডাংগুলি' খেলার মধ্যে। কিছুটা ক্রিকেট খেলার সঙ্গে দূরাগত সাদৃশ্য থাকার ফলে 'রান-ওঠা' কিংবা 'আউট-হওয়া'-ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এখন 'ডাংগুলি' খেলায় এসেছে বটে, কিন্তু এগুলো নিতান্তই অর্বাচীন কালের সংযোজন। বছর চল্লিশ আগেও এই খেলায় ছিলনা এসব।

গর্ত খুঁড়ে ডাং দিয়ে খুঁচিয়ে গুলিটাকে বহু দূরে পাঠানোর তাৎপর্য একাধিক। গর্তে ডাং দিয়ে খোঁচানোটা জুম্-চাষের অনুকৃতি অবশ্যই। গুলিটা যত দূরে ছিট্‌কে যায়, ততটা জমিই একপক্ষের অধিকারে যে আসে, সেটা অস্ত্রনিক্ষেপের সাহায্যে শত্রুকে ঘায়েল করে হটানোর স্মৃতির অনুষঙ্গবাহী। গুলিকে শস্যপ্রতীক হিশেবেও গণ্য যতদূর অবধি গুলিটা গেল, ততদূর পর্যন্ত শস্য ফলবে— এটাই সংস্কার ছিল গোড়ায়। ডাং দিয়ে গর্তের মধ্যে গুলি খোঁচানোকে এক অর্থে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার প্রতীক বলে ভাবতে পারি। চাষের জমিতে নরনারীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের 'রিচুয়াল' বিশ্বের বহু সংস্কৃতি-বলয়েই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। গর্তে ডাং-খোঁচানো সেই সংরাগ-ক্রিয়ারই অনুকৃতি বলেও ধার্য করেছেন কোনও-কোনও গবেষক।

লোকক্রীড়ার মধ্যে সুদূর অতীতের স্মৃতিকণাগুলি কীভাবে রূপান্তরিত-প্রকরণে পুঞ্জিত হয়ে থাকে, তার একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন শ্রীমান্ অসীম। 'পিট্টু' ওরফে 'সাতচাড়া' খেলার উৎস এবং স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে যে-ক্ষেত্রসমীক্ষণ করেছেন, তার সূত্রে তিনি আকর্ষণীয় একটি তথ্যকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রত্ন-ঐতিহাসিক যুগের সিন্ধু সভ্যতার পতনের একটি পরোক্ষ বিবরণী ঋগ্বেদে আছে বলে সার জন মার্শাল, মর্টিমার হুইলার,...স্টুয়ার্ট-পিগট, রাজমোহন নাথ, কুঞ্জগোবিন্দ নাথ, মালতী শেংড়ে- প্রমুখ এই বিশেষ-বিদ্যাশৃঙ্খলার অনেক পণ্ডিতই যে সিদ্ধান্ত করেছেন, বাংলার এই জনপ্রিয় লোকক্রীড়াটির মধ্যেও তার সমর্থনে কিছু তথ্য মেলে।

ঋগ্বেদে বর্ণনা আছে—পুরন্দরের নেতৃত্বে দেববাহিনী এসে দাস-তথা-দস্যুদের 'অশ্মময়ী সপ্তপুরী'-কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পুরন্দরের অর্থ হল নগর বা দুর্গ ধ্বংসকারী; অশ্মময়ী পুরীর অর্থ সঠিকভাবেই মার্শাল করেছেন— পাকা ইটের বাড়িতে তৈরি শহর; দাস এবং দস্যু মূলে ছিল জাতির নাম। অসীম তাঁর সন্ধিৎসু গবেষণার মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্যগুলি কীভাবে লুকিয়ে রয়েছে এই খেলায়, সেটা দেখিয়েছেন। ২৪-পরগণা (উত্তর)-এর অনেকগুলি গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষণ করে তিনি পেয়েছেন যে সব তথ্য, তা হল এই : যারা সাতটি খোলামকুচিতে সাজানো 'গড়' আক্রমণ করে তাদেরকে বলা হয় 'পুরন্দর' এবং 'গড়' যারা রক্ষা করে তাদেব নাম এই খেলাতে, 'দস্যু'। অসীমের মতে সাতটি খোলামকুচি হচ্ছে 'অশ্মময়ী সপ্তপুরী'-র প্রতীক। আপাতভাবে এই সিদ্ধান্তকে দূরান্বয়ী বলে দু-চার জন গবেষক ১৯৮৫ সালে অল ইণ্ডিয়া ফোকলোর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তাঁর সন্দর্ভপত্রটি শোনবার পবে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর গবেষণায় ('বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস'; ১৯৯১; পৃ. ৮০-৯৭) এই ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা করে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসীম।

অতীত ইতিহাসের অজস্র স্মৃতি যে এইভাবে বিভিন্ন লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, সুষ্ঠুভাবেই ব্যাখ্যা করে তা দেখানো যায়। বস্তুতপক্ষে, খেলা যে শুধু ছেলেখেলাই নয়, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্তব যে তাদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের পক্ষে সেটি স্বীকার কবতেই হয়। কেবল পুরানো সেই দিনের কথাই নয়, সমকালের প্রতিভাসও তার মধ্যে মেলে। এই রকম একটি খেলা আমাদের বাল্যকালে চালু ছিল : রুশ-জার্মান যুদ্ধ! প্রচলিত 'চু-কিৎ-কিৎ' খেলারই একটা রকমফের ছিল আর-কী!

কিছু-কিছু লৌকিক খেলাও আছে অবশ্য যাদেব মধ্যে চিরকালীন অভিজ্ঞতারও প্রচ্ছন্ন হদিশ মেলে। 'বাঘবন্দী' খেলার কথা তো ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে . এই খেলায় পশুপালক গৃহস্থ সমাজের ছবি লুকিয়ে আছে যে, সে কথা ঠিকই। বনের বাঘ এসে গৃহপালিত পশুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, একভাবে এ খেলায় তারই স্মৃতি সঞ্চিত। কিন্তু ঠিকমতো খেলতে পারলে— সংঘবদ্ধভাবে 'ছাগল'-দের সাজাতে পারলে, 'বাঘ'-ও 'বন্দী' হতে পারে, তাকে পরাস্ত করা যায়— সেই সত্যটিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে এ-খেলার মূল কথা সেইটাই—বাঘকে বন্দী করা! 'বাঘ' এবং 'ছাগল'— দুটিই এখানে প্রতীক হিশেবে ধরা যায় . প্রতিপত্তিশালী অভিজাত এবং দীনদরিদ্র সাধারণ মানুষ। সংঘবদ্ধ হলে যে সাধারণ মানুষ ওপরতলার মানুষদের হারিয়ে দিতে পারে, সেই সামাজিক দ্বন্দ্বের আকাঙ্ক্ষিত মানসিকতাই এর মধ্যে বিম্বিত হয়েছে, এমন কথাও ভাবা যায় স্বচ্ছন্দে।

লোকক্রীড়া যেহেতু জীবনচর্যারই অনুবৃত্তি, তাই এর ইতিবৃত্ত সন্ধান করতে পারলে প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকেই চেনা যায়। ইতিহাসের অনেক অনিরসিত সংশয়কে নির্মোচিত করা সম্ভব বিভিন্ন রকমের লৌকিক খেলাধুলার পূর্বাপর বিশ্লেষণের সূত্রেই। তাই ছেলেদের (এবং মেয়েদেরও!) খেলা, আসলে কিন্তু 'ছেলে-খেলা' আদৌ নয়!

অষ্টম অধ্যায়

লোকশিল্পকলা

ক. লোকশিল্পকলার মুখবন্ধ

একথা আমরা জানি যে, সমস্ত প্রকরণের প্রযোগকলারই মূল-উৎস একটিই : জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনের তাগিদ। সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয়-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-প্রভৃতি সংস্কৃতির মানস-সম্পদের সব ধরনের অভিব্যক্তিই সেই চাহিদা থেকে উৎসারিত। মিথ বা আদিম-লোকপুরাণও ঐ একই উৎস-সঞ্জাত যে, সেটাও এখানে স্মরণযোগ্য। শিকার, সংগ্রহ, কৃষি এবং অন্যবিধ উপলক্ষগুলির সূত্রে বিভিন্ন শ্রম-প্রক্রিয়া একদিকে, আর অন্যদিকে অনির্দেশ্য অলৌকিকে প্রত্যয় এবং জাদুসংস্কার— একসঙ্গে মিলে গিয়ে সৃষ্টি করেছিল এইসব প্রয়োগকলার। সময়ের বিবর্তনে অনেক সময়ে এসবের মূল তাৎপর্যটুকু হয়ত বিস্মৃতিবিলীন হয়েছে, কখনও বা নূতনতর কোনও ব্যঞ্জনা আরোপিত হয়েছে : আদিম-শিল্পকলা বিবর্তিত হয়ে পরিণতি পেয়েছে লোকশিল্পে।

আদিম শিল্পকলার সঙ্গে জাদুপ্রতীতির যেমন যোগ ছিল, তেমনই ফের ধর্মবিশ্বাসেরও একটা ভূমিকা এইখানে সুপ্রতিষ্ঠ। 'শিল্পের জন্য শিল্প'-ইত্যাদি মর্মের তত্ত্ব আর যেখানেই মর্যাদা পাক, লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে তার ঠাঁই জোটেনা। উত্তরকালে নান্দনিকতার অভিভাবনা লোকশিল্পের মধ্যে সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সেটাও এর ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধতাকে অতিক্রম করে গিয়ে নয়। আলপনা, ঘট, সরা, কাঁথা, পুতুল, মুখোশ, পট— কোনওটাই সেই প্রয়োজনীয়তাকে বর্জন করতে পারে না। ধর্মবিশ্বাসই হোক, আর জাদুসংস্কারই হোক—অন্তরালে তারা ক্রিয়াশীল থাকলেও, প্রায় সময়েই লোকশিল্পের প্রত্যক্ষ অভিপ্রকাশটা ঘটে ব্যবহারিক কোনও কারণের উপলক্ষে। নান্দনিকতার চিন্তা হল তার পরবর্তী স্তরের বিষয়।

লোকশিল্পের সম্পূর্ণ মূর্তিটিকে তাহলে এইভাবে দেখানো যায় :

লোকশিল্প	স্তর	ক্রম
লো	নান্দনিকতা	৩ ↑
ক শি	ব্যবহারিক প্রয়োজন	২ ↑
ল্প	জাদু-ও-ধর্মবিশ্বাস	১

বহুবিচিত্র প্রকরণে সমৃদ্ধ বাংলার লোকশিল্পকলার মধ্যে প্রধান কয়েকটি ধারাকে বিশ্লেষণ করে তাদের উৎস এবং বিকাশের ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। এদের ওপর ভিত্তি করেই লোকশিল্পের একটি বিশ্বজনীন সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর, বাংলার লৌকিক শিল্পধারার নিজস্বতাটুকু বিস্মৃত না-হয়েও।

॥ ২ ॥

'শিল্প' ব্যাপারটি যে কী এ-নিয়েই আজ পর্যন্ত এত বির্তক হয়েছে যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে লোকশিল্প কী সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করার মুখপাতেই আরও বেশি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলে রাখা দরকার যে, 'শিল্পের সৃষ্টিটুকুর মধ্যেই তার চূড়ান্ত সার্থকতা' কিংবা 'শিল্পসৃষ্টিকে লুকিয়ে রাখতে পারার মধ্যেই আছে তার পরম চরিতার্থতা'-ইত্যাদি মর্মের ভাববাদী এবং অস্বচ্ছ তত্ত্বগুলির বস্তুতপক্ষে আজ আর কোনও তাৎপর্য নেই। শিল্প, তার সৃষ্টি-এবং-প্রকাশকে সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি আর সুসংহত প্রয়োজনের বাঁধনে জড়িয়ে যদি রাখতে পারে; তবেই তার সার্থকতা—এই হল যথার্থ মার্ক্সবাদী প্রত্যয়। লোকশিল্পও যে এই সর্বজনীন সূত্রের অংশীদার সে-কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রেণীবিন্যাস-বিভক্ত প্রত্যেক সমাজেই আর সব কিছুর মতো সংস্কৃতির প্রকরণগুলিরও মূলত দুটি স্তর : লৌকিক এবং অভিজাত। প্রথমটি কর্মবিবর্তনে পরিশীলিত হতে-হতে দ্বিতীয়টিব বিকাশ ঘটে। সাধাবণত দুটি পৃথক অর্থনৈতিক স্তরে এদের চর্যা এবং চর্চা গণ্ডীবদ্ধ; তবে ঐ স্তর দুটি যেহেতু শ্রেণীগত বিরোধ সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সমান্তরাল দুটি সাংস্কৃতিক ধারাও একে-অন্যের ওপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুতরাং, এখনও অভিজাত সংস্কৃতি তার প্রাণরস সন্ধান করে লোকায়ত কৃষ্টির কুঁড়েঘরেই অন্যপক্ষে পরিশীলিত শিল্পাঙ্গিক ত বটেই, এমন-কী তার উপজীব্য বস্তুও লোকজীবনের কালচারকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে (এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) ঠিক এই কারণেই দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা বিভাগের প্রধানও 'ধানের শিসের উপরের শিশিরবিন্দু' দেখতে উৎসুক হয়ে 'ঠাকুমার ঝুলি' ঝেড়ে খুঁজে বের করেন ছবিই উপজীব্য; আধুনিক শিল্পরীতিতে সুদক্ষ প্রবীণ শিল্পীও তাঁর চিত্রাঙ্গিকরূপে পটের তুলির টানকেই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় প্রকাশমাধ্যম বলে গণ্য করেন। অন্যপক্ষে, দেবীপ্রতিমার ঐতিহ্যবাহী মূর্তিতেও এসে দেখা দেয় জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-নন্দিনীর আদল এবং নক্শী কাঁথার মধ্যে ঢুকে পড়ে কাশ্মীরী শালের ফোঁড, কারণ সেটা আভিজাত্যের সূচক আর চলচ্চিত্র-নন্দিনীরা হলেন কাঞ্চনকৌলীন্যে সমাজের ওপরতলার মানুষ।

সুতরাং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতেই লোকশিল্পের প্রেরণা, প্রয়োজন উৎস, বিকাশ, পরিণতি এবং স্বরূপ-ইত্যাদি বিচার করতে হবে। এই সবকিছুরই পিছনে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন অংশের নানা ধরনের ব্যবহারিক অভিব্যক্তি সে কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

সমাজের বস্তুগতভাবে উৎপাদনশীল স্তর যেটি, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক-কারুশিল্পীরা যার অন্তর্গত, সেখান ঐতিহ্যগতভাবে যে সমস্ত চারু-ও-কারুকলার ধারা বহমান আছে, সাধারণভাবে লোকশিল্প বলতে তাদেরকেই বোঝায়। এদের মধ্যে অনেকগুলিরই প্রাচীনতম উৎস খুঁজতে গেলে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহদের জীবনচর্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, যদিও হামেশাই দেখা যায় যে, সেই আদিম উৎসকেন্দ্রিত তাৎপর্যগুলি এখন বিস্মৃতিবিলগ্ন। মানুষের নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই, তার শিল্পসৃষ্টির অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাগুলিও উত্তরোত্তর বদ্‌লে-বদ্‌লে গেছে। গুহাবাসী শিকারী-ও-সংগ্রাহক মানুষের শিল্পকলা—চিত্র, ভাস্কর্য-ইত্যাদি স্বাভাবিক গতিতেই ধীরে-ধীরে প্রেরণা ও অভিব্যক্তিতে বদ্‌লে গেল, যখন সে পশুপালন-পশুচারণ-কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হল। প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠল নতুন -নতুন শিল্পমাধ্যম যেমন, তেমনই আবার পুরানো মাধ্যমগুলিরও প্রকাশগত তাৎপর্যও পরিবর্তিত হতে লাগল। কৃষিভিত্তিক জনপদ-জীবন যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখনকার শিল্পকলায় এল নূতনতর প্রকরণ, পুরানো মাধ্যমগুলির প্রকাশ আরও নূতন তাৎপর্যে হল মণ্ডিত।

কথাগুলো অবশ্যই উদাহরণের অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ গুহার গায়ে শিকারের ছবি এঁকেছিল কেন? কেনই বা তারা নানান্ ধরনের চিহ্ন খোদাই করেছিল পাথরের গায়ে? হাতিয়ারের গায়েই বা ছবি-ও-চিহ্ন-লাঞ্ছনের তাৎপর্য কী কোন্ ভাবনার বশে তৈরি করেছিল আনগ্না যুবতী নারীর (প্রায়শই গর্ভবতী) লক্ষণযুক্ত পাথুরে প্রতিরূপ?

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা বলেন, আদিম মানুষের জীবনচর্যার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকত অজস্র দুর্বোধ্য রহস্যেভরা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বেঁচে থাকবার নিরন্তর এক সংগ্রাম। সেই জীবনযুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত হতো অলৌকিকতায় আস্থাশীল, জাদুবিশ্বাসী একটি মানসিক প্রবণতার দ্বারা, যা ছিল তাঁদের সৃষ্টিরও প্রেরণা। সুতরাং পশুশিকারের ছবি এঁকে শিকারের এক কল্পিত দেবতায় উদ্দেশে কিছু জাদু-নির্ভর ধর্মাচরণ করলে, তিনি খুশি হয়ে শিকার জুটিয়ে দেবেন, মিলবে বেঁচে থাকবার রুজি। তাঁদের ভাবনায় কিছু-কিছু চিহ্ন হয় শুভদ্যোতক আর নয়ত অশুভরোধক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল যে ভাবেই হোক। অতএব সেই সব চিহ্নের জাদুপ্রভাবে শুভকারী অলৌকিক শক্তি মঙ্গল করবে এবং অশুভকারক অনুরূপ শক্তি অমঙ্গল করতে পারবে না, অতএব ঐ সব চিহ্ন চিত্রিত বা খোদিত হতে লাগল। আদিম সমাজের সন্তানজন্মের রহস্যাবৃত পটভূমির মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার ছিল এইটুকুই : নারী কিছুকাল গর্ভবতী থাকার পর সন্তান প্রসব করে। প্রবীণেরা মরছেই; অন্যদেরও মৃত্যু হচ্ছে রোগে বা অপঘাতে, সন্তান নিয়মিতভাবে না এলে তাই সম্পূর্ণভাবে গোষ্ঠীরই বিনাশ হবে। সুতরাং গর্ভবতী নারীমূর্তি তৈরি করলে তার জাদুপ্রভাবে 'গর্ভের নিয়ামক দেবতা' সন্তান দেবেন। অর্থাৎ রুজি-অর্জন, মঙ্গল-অমঙ্গল-বিধান এবং গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা—এই তিনটি ঐকান্তিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই শিল্পকলার সূত্রপাত হয়েছিল।

সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির বিবর্তন ঘটার সঙ্গে সমান-অনুপাতেই সংস্কৃতির ভাবনা এবং প্রকরণগুলিরও রূপান্তরণ ঘটল। কৃষি এবং পশুপালনের মাধ্যমে যখন থেকে জীবিকার সংস্থান করতে লাগল মানুষ, তখন থেকে তার দেবতা-কল্পনা এবং ধর্মাচরণেরও চরিত্র বদল হল। তাই শিকার জুটিয়ে দেওয়ার বদলে, তখন দেবতার কাজ হল পশুচারণার উপযুক্ত জমি জোটানো কিংবা ভাল ফসল ফলিয়ে দেওয়া। গুহা ছেড়ে বাসা বেঁধে জনপদ প্রতিষ্ঠা করে থাকতে শিখেছে তখন মানুষ। কৃষির কল্যাণে স্থায়ী একটা খাদ্যসম্ভাবও তার আয়ত্তগত হয়েছে : খানিকটা অবসরও মিলেছে অতএব। কিছুটা কার্যবিভাজনও ঘটছে এর ফলে। এই ঐতিহাসিক স্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে (যাকে বলা যাবে কৌম বা ট্রাইব্যাল), যে-জীবন-চর্যার উদ্ভব হয়, আদিবাসী সমাজে বেশি-কম সেটা এখনও দেখা যায়। এই স্তরের পরবর্তী ধাপে শ্রেণী-বিভাজিত সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। লোকশিল্পের সৃষ্টি এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শিল্পকলা থেকে মধ্য-প্রস্তর এবং নব্য-প্রস্তর যুগ দুটির শিল্পকলার মধ্যে পার্থক্য কতখানি?..গুহাবাসের কালে মানুষের জীবন ছিল ছোট্ট-ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে নিরুদ্ধ, এক ধরনের স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগতের মধ্যেই মানুষ তখন বাস করত। যতই সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে, ততই মানুষের সমাজের পরিধিও উত্তরোত্তর বেড়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবগত আদান-প্রদানও বেড়েছে এর পরিণতিতে। মোটামুটিভাবে আদিম মানুষ দ্বীপকল্প ক্ষুদ্রগোষ্ঠীজীবনে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও মূলত একই ধরনেব জীবন-সংগ্রাম তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যেই একই ধরনের ভাবনারও সৃষ্টি করেছিল, আর তা ছিল মোটামুটি অনুরূপ বা সমতুল্য চরিত্রের ভাব ও অভিব্যক্তি, উভয় ক্ষেত্রেই।

পরবর্তী স্তরগুলিতে শিল্পকলার এই সর্বজনীনত্ব অনেকাংশে খর্বিত হল, বিভিন্ন সমাজের অসমান অর্থনৈতিক বিকাশের পরিণতিতে। ফলত, আদিম পর্যায়ে শিল্পের মধ্যে যে সমতুলনীয়তা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে তার পরিবর্তে এক-এক অঞ্চলে, এক-এক গোষ্ঠীতে তার ব্যত্যয় ঘটল। সুতরাং মৌলিক উপকরণে ঐক্য থাকলেও আদিম শিল্প যখন কৌম শিল্পে রূপান্তর লাভ করেছে, তখন তার প্রকাশও বহুবিচিত্র হয়েছে, কৌম শিল্প শ্রেণী-সমাজের স্তরে বিবর্তিত হবার পর হয়েছে বিচিত্রতর।

।। ৩ ।।

আগের অধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি উদাহরণ দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দরকার আছে। একটু আপাত-অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই সেটি করা হল এখানে।

মানুষ আঁকতে শিখেছিল কেমন করে? মনোবিজ্ঞানী মহলে শিশুর মানসিক উদ্বর্তন সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন— আদিম মানুষের মানসিক বিকাশের সঙ্গে তার অনুরূপতা রয়েছে, এমন কথা তাঁদের প্রায় সকলেই বলে থাকেন। শিশু যেমন নিজের মনের বিচিত্র সব অনুভূতিগুলিকে বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ছবি আঁকার মধ্যে সেসবেরই প্রতিফলন ঘটাতে চায়, আদিম মানুষও ছবির মধ্যে সেই

অভিজ্ঞতাগুলিরই প্রতিফলন ঘটাতে চাইত। বুদ্ধি এবং উপলব্ধি যত পরিশীলিত হয়েছে, সংকেত এবং প্রতীকও ততই ঠাঁই করে নিয়েছে আস্তে-আস্তে।

একটা উদাহরণ কল্পনা করা যেতে পারে : ধরা যাক একটা হরিণ তার শিং-টিং-সবসমেত দাঁড়িয়ে আছে বালির ওপরে, রৌদ্রে তার ছায়া বালির গায়ে পড়েছে। আদিম গুহাবাসী মানুষ হয়ত খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই ঐ ছায়ার শিলুয়েটের সীমানারেখাটার ওপরে আঙুল বা গাছের ভাঙা ডাল বুলিয়ে গেল। কিছুটা সময় পরে যখন হরিণটা চলে গেল দূরে কোথাও, তখন সবিস্ময়ে প্রথম শিল্পী এবং তার স্বজনবৃন্দ দেখল জ্যান্ত হরিণটার হুবহু একটি প্রতিরূপ বালির ওপরে তৈরি হয়ে গেছে।

এই দক্ষতা যাদের সহজাত ছিল, তারা স্বভাবতই দলের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হতো। এরা বিশেষ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতাবান বলে গণ্য হতো এবং গোষ্ঠীর ধর্মসংস্কারের নিয়ন্ত্রণেও তাদের সেই ক্ষমতা কার্যকরী হতো। তারপরে ধীরে-ধীরে গুহার গায়ে বড়-বড় ছবি কম্পোজ করতেও শিখল তারা। সেই সূত্রে হাড়ের ওপরে কিংবা পাথরের গায়ে ধারালো পাথুরে ছুরি দয়ে খোদাই করে ছবি ফোটাতেও শুরু করল।

এর পরে একটু একটু করে ব্যঞ্জনার বোধ তাদের মনে জাগরূক হতে লাগল যখন থেকে, তখন থেকে প্রতীক এবং সংকেতও ছবি এবং ভাস্কর্যের মধ্যে আসতে শুরু করল। এই ব্যাপারটাই লোকশিল্পের মধ্যে ধীরে-ধীরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

আদিম চিত্রকলার ঐ রেখাঙ্কিত চরিত্রটি লোকচিত্রকলার মধ্যে এসেছে। পটের ছবি, সরার ছবি, ঘটের ছবি, আলপনার নক্‌শা—সব কিছুর মধ্যে ঐ ধারাটিই অস্তিত্বময়। গুহার গায়ে যেমন ধরনের মানুষের ছবি আঁকা ছিল, ঠিক সেই মানুষের অনুরূপ চিত্রই দেখি আল্‌পনার ষষ্ঠীর 'কোলে-পো-কাঁখে-পো' ছবির মধ্যে; ঘটের গায়ের পুতুলি মূর্তিও তো ঠিক একই ধরনের।

হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ আদিম সংস্কারগত বাস্তব 'ফর্ম'-টাকে বজায় রেখে গুহার গায়ে আঁকা হতো · তার আদলে আল্‌পনায় ঐ জিনিসই এসেছে। সরীসৃপের চলে যাবার চিহ্নই—আল্‌পনার সর্পিল ভঙ্গীর নকশার মধ্যে এসেছে। এ ধরনের উদাহরণ অনেকই দেওয়া যায় অবশ্য।

লোকশিল্পের এলাকাভুক্ত বিষয় কী-কী? সাধারণভাবে এই চারটি প্রকরণ বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিতেই লোকায়ত শিল্পকলার অন্তর্গত বলে ধার্য করা হয় : চিত্র, অলংকরণ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য। এগুলি হল ব্যাপক সাধারণীকরণ; পারিবেশিক, জাতিতাত্ত্বিক আর্থনীতিক ইত্যাদি নানা কারণে এদের মধ্যে বহু বিচিত্র ভাগ-উপভাগ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য মূলত বাংলার লৌকিক শিল্পকলাকে ভিত্তি করেই লোকশিল্পের সীমানা এবং স্বরূপ কী সেটি আলোচনা করা যাচ্ছে এর পরে।

বাংলার লোকচিত্রকলার মধ্যে আলপনা, কাঁথা, পট-ইত্যাদি প্রকরণ খুবই সমৃদ্ধ সরা, ঘট, তাস প্রভৃতির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য নমুনা মেলে। আলপনা এবং কাঁথার মধ্যে বিভিন্ন অলংকরণের আভিপ্রায়িক প্রকাশটা বেশি হলেও, অনেক সময়েই সেখানে চিত্র-বিন্যাসও দেখি।

অলংকরণের মধ্যে বাংলা লোকশিল্পের প্রকাশটা ব্যাপকভাবে ঘটেছে। কাঁথা এবং আল্‌পনা তো বটেই, বিভিন্ন ধরনের শাড়ীর পাড়ে এবং আঁচলায়, ঘট, কুলো ও পিঁড়িতে, পুথির মলাট হিশেবে ব্যবহৃত কাঠের পাটায় লৌকিক বিভিন্ন 'মোটিফ-এর অলংকরণ প্রচলিত। প্রতিমার চালচিত্র এবং 'ডাকের সাজ'-এও ঐ ধরনের মোটিফগুলিই ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ভাস্কর্য কথাটি একটু ব্যাপক এবং স্থিতিস্থাপকভাবে ব্যবহাব করা হয়েছে এ আলোচনায়। মৃৎভাস্কর্য এবং দারুভাস্কর্য দুই-ই এর অন্তর্গত। এর মধ্যে মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাঠ, মাটি এবং শোলা কাগজেরও তৈরি খেলনা এবং বিশেষত, মুখোশ, কাঠের খিলান এবং দরজা জানালার ফার-ফোরের কাটাই-খোদাই কাজ, পোড়ামাটির ইটের দেওয়াল-ভাস্কর্য, নকশী পাটি ও পাখা, ডোকরা কামারের তৈরি ধাতুর খেলনা এবং তৈজসপত্র, পূর্বে উল্লেখিত শোলার তৈরি ডাকের সাজ, শাঁখ-ঝিনুক-কড়ি ইত্যাদির গয়না, তৈজস এবং খেলনা, এই সমস্ত কিছু এবং আরও অনেক কিছু এর মধ্যে পড়ে। তবে এদের সবগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

যে-সমস্ত শিল্প-প্রকরণের নাম এখানে উল্লেখ করা হল তাদের মধ্যে মুখোশ এবং পুতুলের একটা বিশ্বজনীন ইতিহাস আছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই দুটি শিল্পবস্তু সম্পর্কে মূলত সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করব; আর একান্তভাবে 'বাঙালী' শিল্পকলা হিশেবে আলোচিত হবে আলপনা এবং কাঁথা। যদিও অন্যান্য সংস্কৃতি-বলয়েও এদের সমতুল্য শিল্পরীতির প্রচলন আছে; তবে তা বাংলার এই শিল্পপ্রকরণগুলির মতো এত সমৃদ্ধ নয়।

খ. মুখোশ ও মানবসংস্কৃতি

মুখোশ মানুষের তৈরি প্রাচীনতম শিল্পবস্তুগুলির অন্যতম। প্রাচীন প্রস্তরযুগ, অর্থাৎ অন্তত দশ কিংবা বারো হাজার (কিংবা তারও বেশি) বছর আগের যে-সব গুহাচিত্র পৃথিবীর অনেক দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে মুখোশ-পরা মানুষের ছবি বিরল নয়। এই রকমই একটি ছবি পাওয়া যায় ফ্রান্সের আরীজ্ অঞ্চলের 'তিনভাই' (ত্রোয়া ফ্রেরে) গুহার অভ্যন্তরে : একটি মানুষ; মাথায় বল্গা হরিণের শিং, মুখে পেঁচার মুখোশ---তার তলা দিয়ে উপ্‌চে-পড়া আবক্ষ-শ্মশ্রু, কান হরিণের মতন, নেকড়ে কিংবা ভাল জাতের বুনো ঘোড়ার মতো ল্যাজ পিছনে ঝুলছে, পুরুষাঙ্গটি সিংহজাতীয় কোনও পশুর এবং হাতদুটিতে ভালুকের থাবার মতন দেখতে দস্তানা-জাতের কিছু একটা জিনিষ পরা, কিন্তু দুটি-পা অন্যসব মানুষের মতোই। মূর্তিটি নৃত্যরত।

অর্থাৎ, বহু প্রাণীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিজের দেহে সাজিয়ে একটি মানুষ কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাচছে—এই হল ছবিটির উপজীব্য। আদিম গুহাচিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের একজন বলে স্বীকৃত অ্যাবে ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরীজ অফ কেভ আর্ট' (১৯৫২) বইতে এই মুখোশ-পরা এবং বিচিত্র সাজসজ্জা-করা নৃত্যরত মানুষটিকে উল্লেখ করেছেন 'জাদুকব' (সোরসারার) বলে। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যেই মুখোশের উদ্ভবের মূল সূত্রটি নিহিত আছে। সেই কথা বিশ্লেষণ করার আগে এই ছবিটির আনুমানিক বয়স সম্পর্কে একটু ভেবে নেবার প্রয়োজন আছে।

পীরেনিজ পর্বতমালার যে-অঞ্চলে ঐ গুহাটি আছে, সেখানে বল্গা হরিণ এখন পাওয়া যায় না। ভূ-বিজ্ঞান এবং প্রাণী বিজ্ঞানের বিদ্বানেরা যে-কথা বলেন, সে-অনুসারে তাহলে ঐ ছবির বয়স '±২৫,০০০' বছর ধরতে হয়; কারণ ঐ সময়ে, অর্থাৎ শেষ তুষার যুগে ওখানে বল্গা হরিণেরা নিশ্চয়ই ছিল—তা-নইলে তার শিং মাথায়-পরার কথা তদানীন্তকালের শিল্পী ভাববেনই বা কেন? এই ছবির সময়কাল তার পরের হওয়া সম্ভব নয়,কেননা হাজার পঁচিশ বছর আগে হিমযুগ কেটে যাবার পর থেকে ও-অঞ্চলে ঐ-বিশেষ প্রাণীটিকে দেখা যায়নি।

মুখোশের বয়স তাহলে অন্তত হাজার পঁচিশেক বছর তো বটেই! দশ-বারো হাজার বছরের পুরোনো মুখোশ-পরা-মানুষের গুহাচিত্রের কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু মানব-সংস্কৃতির সেই প্রদোষলগ্ন থেকেই মুখোশ কী কারণে মানুষের হাতে তৈরি হল? জীবন-সংগ্রামের কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে?

ব্রুইলের কথায় . এটি হল জাদুকরের ছবি; তো, আদিম প্রস্তরযুগের সমাজে জাদুকরদের ভূমিকা কী ছিল সেটিও তবে দেখা দরকার। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যে-কোনও অনগ্রসর এবং নিজেদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ-সমাজে জাদুবিশ্বাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাদুকর সেখানে ধর্মগুরু; এবং অনির্দেশ্য সব প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্লীন কল্পিত 'সত্তা'-র (অর্থাৎ মান্যা) সঙ্গে গোষ্ঠীসদস্যদের সংযোগ-মাধ্যম। সুতরাং সেই হল

সমস্ত দলের চিকিৎসক, শুভাশুভ-বিচারক, রীতিবিধানের নিয়ন্তা এবং উচিত-অনুচিত হিশেবে করণীয় সব-কিছুর সম্বন্ধে তার কথাই শেষ কথা। অর্থাৎ অন্নসন্ধান, রোগনিরাময়, ভয়মুক্তি, কামতৃপ্তি থেকে শুরু করে কল্পিত-পরলোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান অবধি, সর্ববিধ প্রয়োজনের পরিত্রাতা হল জাদুকরই। আর সেই জাদুকরের কর্মবিধির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হল—মুখোশ। তার উদ্ভবের পিছনেও তাহলে ঐ সব প্রয়োজনগুলিই উপস্থিত ছিল নিশ্চয়ই।

এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি আদিম মানুষ মেটাতে জাদু-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক ধর্মাচার পালন করে। মুখোশ-নৃত্য ছিল ধর্মাচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা বহু শতাব্দীর পথ পেরিয়ে এসেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্তের নানা আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও অল্পবিস্তর প্রচলিত। এমন-কী সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় যে-সব সমাজ উন্নততর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে কোনও-না-কোনও সময়ে, তাদের মধ্যেও মুখোশ ব্যবহারের রীতির বহুল-প্রচলন স্মরণযোগ্য; প্রাচীন মিশর এবং গ্রীসের কথা এখানে মনে করা যেতে পারে। ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও-কোনও দেশ, যেমন থাইল্যাণ্ড বা ইন্দোনেশিয়া, আজও মুখোশ-নৃত্যের ধারাকে ধরে রেখেছে ধ্রুবপদী এবং লৌকিক, উভয় পর্যায়েই। জাপান এবং ভারতের বিভিন্ন মুখোশ-নৃত্যের কথা তো বহু-পরিজ্ঞাত।

মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন অবশ্য খুব ব্যাপকভাবে আছে আফ্রিকার বিভিন্ন অধিজাতিগুলির মধ্যে; তারপরই মুখোশের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারকারী হলেন আমেরিকা মহাদেশের রেড্ইণ্ডিয়ানদের অসংখ্য প্রজাতির মানুষেরা, যাঁরা পুরোদস্তুর 'মার্কিনী' হননি এখনও। আমাদের বাঙালী-সংস্কৃতির লোকায়ত-স্তরেও বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীনৃত্যে মুখোশের যথেষ্টই প্রচলন রয়েছে।

॥ ২ ॥

মুখোশ-শিল্পের প্রত্ন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে মুখোশ তথা ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ ছিল বিভিন্ন প্রাণীর মাথা, ছাল, শিং ইত্যাদি। বিশেষ কোনও প্রাণীর ছদ্মবেশ ধরে (এবং তার কণ্ঠস্বর নকল করে) সে-রকম প্রাণীদের আকর্ষণ করে কাছে নিয়ে-আসার অবকাশে তাকে শিকার করার যে সুবিধা আছে, এটা উপলব্ধি করতে আদিম-বুদ্ধির পক্ষেও অসুবিধে হয়নি। প্রত্নশিল্পের পণ্ডিতরা অবশ্য অনেকেই মনে করেন যে, মুখোশ-তৈরি করতে শেখার আগেই সম্ভবত মানুষ বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করতে শিখেছিল নিজের দেহকে। ওঁরা যে-প্রমাণ হাজির করেন একথার সপক্ষে, তা অবশ্য উড়িয়ে দেবার মতো নয় : বুশম্যানরা, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা, টিয়েরা-ডেল্-ফুয়েগোর আদিবাসীরা, আন্দামানের আদিবাসীরা—বিশেষত ওঙ্গেরা—অর্থাৎ যাঁরা আধুনিক কালে পৌঁছেও মোটামুটি প্রাচীন-প্রস্তরযুগের মধ্যপর্যায়ের জীবনযাত্রায় বন্দী আছেন, তাঁদের মধ্যে মুখোশের ব্যবহার নেই—ও-ধরণের কোনও কারুশিল্প গড়ে তোলার স্তরে তাঁরা এখনও পৌঁছননি। পক্ষান্তরে, গাত্রচিত্রণ তাঁদের মধ্যে কিন্তু বহুল-প্রচলিত। মুখোশের স্তরে এসেছেন সেই আদিবাসীরা, যাঁরা এঁদের চেয়ে

উন্নততর অর্থনীতি ও সমাজকে আয়ত্তে পেয়েছেন। (এই অধ্যায়ের শেষে উল্কি, দেহচিত্রণ ইত্যাদির প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে এই কথার নিষ্পত্তি করব।)

এই-যে মুখোশ হিশেবে কিছু-একটা বস্তুকে গণ্য করা (প্রাণীদেহের অংশের ক্ষেত্রে) অথবা কিছু-একটা গড়ে-তোলা—এর সঙ্গে আদিম সমাজ-মানসের বহির্কাঠামোতেউদ্ভূত ধর্মের অনুভূতিও সংমিশ্রিত হতো খাদ্যসংগ্রহ-ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজনগুলি থেকে সঞ্জাত বোধের অন্তর্কাঠামোর সহযোগে। রেন্যে হুইঘ্যি একটি নিবন্ধে এই ব্যাপারটিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন : "উত্তর আমেরিকার কোনও-কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীর কোনও যুবক আগে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে তার অভিভাবক-কল্প এক অলৌকিক সত্তার সান্নিধ্যবে উপলব্ধি করারই চেষ্টা করবে প্রথমে; তারপর তার দ্বারা আবিষ্ট বোধ করে তবেই মুখোশ তৈরি করতে শুরু করবে সে; ঐ মুখোশটাই (তার প্রত্যয়ে) সেই অভিভাবক-শক্তির আবেশ বা ভরের প্রমাণ।" ("আর্ট ফর্মস্ অ্যাণ্ড সোসাইটি" /' লারূজ্ এনসাইক্লোপীডিয়া অব প্রি-হিস্টোরিক অ্যাণ্ড এনসেন্ট আর্ট"; ১৯৭০ সং : পৃ. ৭৬)

আদিমস্তরের সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত মন, ২৫,০০০ বছর আগেই হোক আর ২৫ বছর আগেই হোক, কতকগুলো ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবনাতেই নিবিষ্ট থাকে। সুতরাং, এই যে অলৌকিক দৈবীশক্তির ভর-ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে মুখোশ তৈরির প্রসঙ্গে, তার সঙ্গে ক্রইলের দেওয়া 'জাদুকর' অভিধার মৌলিক ঐক্য আছেই। এমনকি মুখোশ গড়তে-না-শেখা আদিবাসীদের গাত্ররঞ্জন ইত্যাদিরও অবলীন চিন্তাটাও ঐ একই রকম।

পশুর মাথা-শিং-ছাল ইত্যাদির মাধ্যমে আদিম মানব যে-ছদ্মাবরণ ধারণ করত, তার সাহায্যে সে কল্পনা করত ঐ বিশেষ পশুর বিদেহী সত্তা অথবা তার পরিচালক দৈবী শক্তির সঙ্গে যেন সে নিজেই হয়ে একাত্ম হয়ে গেছে। আবার পশুকে পূর্ব-পুরুষরূপেও কল্পনা করত সে এবং সেই সূত্র ধরে মুখোশের মাধ্যমে প্রয়াত পূর্বপুরুষের সত্তার সঙ্গেও সে নিজেকে সমীভূত বলে বোধ করত। কালক্রমে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মুখোশগুলো এক-একটা প্রতীকরূপেও গৃহীত হতে লাগল পরিবর্তমান বিভিন্ন সমাজে। পশুর বদলে (এবং সঙ্গে) মানুষের মুখ, এবং তারই বিবর্তনের পথে পশু-মানুষের সহাবস্থিত মুখ—এইভাবে মুখোশের মূল চরিত্রের রূপান্তরণ ঘটেছে ক্রমান্বয়ে। তারপর মানুষের মুখ নানাভাবে ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস করে দেখিয়ে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো, মায় দেবতা অবধি—মুখোশের প্রতীকে সমাবিষ্ট হয়েছে। এরই পাশাপাশি উদ্ভট কিছু-একটা কল্পনা করে তাকেও মুখোশের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে দেখা যায় বিভিন্ন আদিম সমাজের শিল্পীদেরকে।

॥ ৩ ॥

মুখোশ তাহলে একটা জাদুবস্তু এবং তার মাধ্যমে বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতের একটা সংযোগসাধন ঘটানো যায়, মানুষের চেতনার সজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরে এমন একটা বোধ ও সঞ্চিত হয়ে থেকেছে হাজার-হাজার বছর ধরে, এটাই সিদ্ধান্ত করতে হয়। অতএব পূর্বপুরুষের প্রয়াত আত্মাকে ফিরিয়ে আনা, রোগ এনেছে যে-অলৌকিক শক্তি—

তাকে তাড়িয়ে দেওয়া, শত্রুকে যুদ্ধে হারানোর জন্যে ভয়ঙ্কর কোনও শক্তিকে আমদানি করা, শস্য নিরাপদে রাখা, যৌবনপর্বে দীক্ষিত হওয়া-ইত্যাদি জীবনচর্যার সবক্ষেত্রে মুখোশ হয়ে উঠল বিবর্তনশীল সমাজের ধর্ম ও আচার-ভাবনার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এক শিল্পমাধ্যম। ঐ আচারবিধির সহযোগী হিশেবেই মুখোশের সঙ্গে নাচের ব্যাপারটাও যুক্ত হয়ে এসেছে : আর তা এসেছে সেই 'সোরসারার'-এর সময়কাল থেকেই।

প্রাথমিকভাবে মুখোশের বাস্তব-প্রয়োজন-ভিত্তিকতা এবং অলৌকিকতার সঙ্গে-সংযোজন-কেন্দ্রিকতা—এই দুটি উৎস ছিল। আদিতে এ-দুইকে সংযুক্ত করেছিল নৃত্য এবং অঙ্গভঙ্গীর বিশিষ্ট কিছু অভিব্যক্তি। বাস্তব প্রয়োজন—যেমন শিকার পাওয়া-এবং সেই জন্যে উদ্দিষ্ট পশুকে বিভ্রান্ত করে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টায় তার ছদ্মবেশ ধারণ-করা (বা, তার ডাক নকল করা, তার মতো চাল-চলন হাব-ভাব করা) ইত্যাদির সূত্রপাত হয়েছিল। আবার আদিম মনে অনুকৃতিমূলক এবং সংস্পর্শমূলক জাদুতে আস্থার যে-ব্যাপারটি উপস্থিত ছিল, তারই সূত্রে, আসল হরিণের শিং এবং ছাল ইত্যাদির সংস্পর্শ এবং সে-সবের মাধ্যমে হরিণের অনুকৃতিকে অবলম্বন করে ঐ অলৌকিকতার সঙ্গে সংযোজন ঘটার কল্পনাও সে করেছে : তার বিশ্বাস ছিল এই ছদ্মবেশের অবলীনে যে-জাদুশক্তি ক্রিয়াশীল, সেটা আসল হরিণকে অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে এনে দেবেই।

এই জাদুর শক্তিকে মুখোশ-সংস্কৃতির মূল চালিকা হিশেবে গণ্য করে তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এই ক-টি প্রকরণ নির্দেশ করতে পারা যায় :

ক. পশুর মুখ;

খ. দেবদেবীর কল্পিত মুখ;

গ. প্রেতসত্তা-ইত্যাদির কল্পিত মুখ;

ঘ. মানুষের মুখ;

ঙ. কোনও পশু বা মানুষের বিকৃত মুখ ;

একান্তভাবে নিজের পরিচয় গোপন রেখে কোনও-কোনও ধর্মানুষ্ঠান যখন করতে হয়, তখন মুখোশের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক বলেও ধার্য করা হয়। এই গোপনতার কারণ নানাবিধ। আদিম সংস্কারাবদ্ধ সমাজে কেউ কোনও প্রাণীর মুখোশ পরলে, যার মুখোশ—তার সমরূপ গুণ বা ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে—এমন বিশ্বাস বহু সময়েই দেখা যায়। এর ফলে, (ধরা যাক) সিংহের মুখোশ যে পরছে সেও সিংহতুল্য বলেই নিজের এবং অন্যের কাছে গণ্য হয়। দেবতার মুখোশ যে পরল, সেও হয়ে গেল দেবতুল্য। বিকৃত মুখের ঢঙে তৈরি মুখোশ পরে অশুভ প্রেতসত্তা-ইত্যাদির চোখে ধুলো দেওয়া যায়। প্রেত, ডাকিনী, রাক্ষস-ইত্যাদির মুখোশ পরার প্রচ্ছন্ন মানসিকতাও ঠিক তাই-ই। অন্য মানুষের মুখের মতো মুখোশ পরে নিজেকে অন্য লোক বলে প্রতীত করার প্রয়োজনও ঘটে নানান্ আদিম গোষ্ঠীর ব্যবহারিক সংস্কারে।

নরনারীর যৌবন-আগমনের স্বীকৃতিমূলক উৎসবে, শিশুর জন্মকালে, রোগীর

চিকিৎসা অথবা মৃত্যুকালে, বিবাহকালে, পূজা-অর্চনার সময়ে এবং আরও কোনও-কোনও সময়ে মুখোশের প্রচলন খুব ব্যাপক। ধরা যাক, একটি-কোনও আদিবাসী কোম-ওরফে-ট্রাইবের কথা : একটি ছেলেকে পরিপূর্ণভাবে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে যুবক হিশেবে। এখন সেই ছেলে যদি সিংহবর্গীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়, তাহলে তাকে দীক্ষা দেবে যে, সে সিংহের মুখোশ পরতে পারেও হয়ত বা। ঐ মুখোশের সূত্রেই তার গোত্রগুণ হিশেবে সিংহের মতো বিক্রম যেন উত্তরাধিকার রূপে অর্জন করতে পারবে ছেলেটি।

বহু আদিবাসী সমাজেই নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ-উপলক্ষে তাকে শারীরিক ভাবে সুগম্যা করে তোলা হয় ধর্মীয় আচাররূপে। প্রায়শই এই বিশেষ কাজটি করতে হয় গোষ্ঠীর পুরোহিতকে। যে কল্পিত-দেবতার ওপর এই বিশেষ 'ধর্মীয়' আচারটি পালন করার দায়িত্ব আছে বলে মনে হয়, পুরোহিত ওরফে জাদুকর সেই দেবতার মুখোশ পরে তার সঙ্গে সমীভূত হয়ে যায় বলে গোষ্ঠীর সবাই মনে করে। উত্তর আমেরিকার অ্যাপাচে আদিবাসী সমাজে প্রথম ঋতুদর্শনের পর একটি কিশোরীকে নিয়ে গোষ্ঠীর যুবতী মেয়েরা আনুষ্ঠানিক মুখোশ নৃত্যের আয়োজন করে। শেষদিনে অপদেবতার মুখোশ-পরা পুরুষেরা মেয়েটিকে আক্রমণ করার ভাণ করলে, মুখোশধারিণী বয়োজ্যেষ্ঠারা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার করে। সমস্ত ব্যাপারটাই যে পরোক্ষ যৌনাচার, সেকথা বলাই বাহুল্য।

অর্থাৎ এক-একটি যৌন-আচারবিধি ধর্মীয় আচারের রূপ ধারণ করে মুখোশের কল্যাণে। ঠিক একই রকমভাবে শিকারে যাবার আগে এবং শিকারের সময়ে কিংবা চাষের সময়ে মুখোশ পরে নাচা এবং চলাফেরার তাৎপর্যও ঠিক অনুরূপ। সমস্ত জাদু-বস্তুর মতো মুখোশের প্রয়োজনীয়তাও মূলত দু-ধরণের—প্রবর্তক এবং নিবর্তক। বিশেষ কোনও পশুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শস্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা-প্রমুখ তাঁদের প্রাসঙ্গিক মুখোশের মাধ্যমে শিকারী বা চাষীদের সঙ্গে মিশে যাবেন, অতএব চাষবাস-শিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা থাকবে না—জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য প্রবর্তিত হবে, বিশ্বাসটা এইরকমই। হরিণের মুখোশ এবং শিং পরে মধ্য-আফ্রিকার ব্যাম্বারা চাষের আয়োজন করেন; তারও পিছনে একটি জাদুসংস্কারই আছে : ওঁদের ধারণা, হরিণ হল ভাল ফসলের অগ্রদূত। অন্যপক্ষে, অশুভ যে-সব শক্তি শিকারগুলোকে নাগালের বাইরে তাড়িয়ে দেয়, বীজ নষ্ট করে দেয়, ফসলে পোকা ধরিয়ে দেয় বলে তাঁদের বিশ্বাস, সেই ভূত-প্রেত-অপদেবতারাও না-কি ঐ সব 'দৈব'-মুখোশধারীদের দেখে ভয় পাবে : অর্থাৎ এভাবেই জীবিকার ক্ষতি নিবর্তিত হবে।

॥ ৪ ॥

মৃতের সৎকার এবং শিশুর জন্মকালেও মুখোশ পরার বিধান বহু গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। উদ্দেশ্য, ওপরে যা-যা বলা হয়েছে, মোটামুটি সেইগুলিই : শুভের প্রতিষ্ঠা, অশুভের বিদূরণ। তিব্বতের বহু অঞ্চলেই ভয়ঙ্করদর্শন

কাঠের মুখোশ পরিয়ে মৃতদেহের সৎকার করার রীতি দেখা যায়। প্রেতের ভীতি বিদূরণের জন্যই নাকি এই ধরনের মুখোশ ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত। রোগীর চিকিৎসার জন্য মুখোশ-নৃত্যের প্রচলন আছে সিংহলের গ্রাম্য অঞ্চলে। মুখোশ দেখে ভয় পেয়ে রোগ-বালাই পালাবে—ভাবনাটা হল এই রকম। প্রতি ধরণের মুখোশের পিছনেই যে-ভাবনার মানসিকতা নিহিত রয়েছে, সেগুলি বহু সময়েই এক-একটি লোকপুরাণবৃত্তকে অবলম্বন করেই তৈরি হয়েছে। এ-ধরণের বিভিন্ন মুখোশের সমন্বয়ে যে-অনুষ্ঠান হয়, অনেক সময়েই তার মধ্যে এই জন্যে কাহিনীগত একটা ভাবানুষঙ্গ থাকে। আমাদের ছৌ-নাচের পালাগুলি এর সুন্দর উদাহরণ। এইসব দর্শকদের কাছে যেমন, নর্তকদের কাছেও তেমনই, ওগুলি বিশেষ ধরণের শক্তিসম্পন্ন বলে মনে হয়। এই মনে হওয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই মিলবে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় পশু-পাখি এবং দেবদেবীর মুখোশ পরে একধরণের নাচের রেওয়াজ আছে। এই নাচের শিল্পীদের বিশ্বাস, নাচের সময়ে কোনও নর্তক যদি কিছু কু-চিন্তা করেন তাহলে মুখোশটি আর মুখোশ না থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং নর্তকের পাপের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করে তাঁকে ! বাঘ বা সিংহ হলে খেয়েই ফেলবে, হাতি হলে থেঁতলে মারবে, দেবদেবী হলে অস্ত্রের সাহায্যে বা অভিশাপ দিয়ে নিকেশ করবে।

মুখোশের প্রচলন এমনই বহুধাব্যাপ্ত যে, এই-সমস্ত-সংস্কারই প্রায় বিশ্বজনীন। কিছু-কিছু অতি-অনগ্রসর জাতিকোম ছাড়া সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়েই এই সমস্ত সংস্কার বহমান। যেখানে মুখোশ নেই সেখানে আছে গাত্রচিত্রণ এবং উল্কি ধারণ; মুখোশ যেখানে আছে, সেখানেও যে এরা বিরল তা নয়; তবে এদের তাৎপর্য সীমিত। সামাজিক বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে যাঁরা এসে পৌঁছেছেন, গাত্রচিত্রণ তাঁদের ক্ষেত্রে প্রায়শই একধরণের নান্দনিক তাৎপর্যও অর্জন করেছে। টিপ পরা, কাজল পরা, মেহেন্দি পরা, চন্দন পরা- ইত্যাদি এখানে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।

মুখোশ যেখানে পুরোপুরিই একজনের আবয়বিক পরিচয়কে আবৃত করে দেয়, সেখানে এই ধরণের গাত্রচিত্রণ কিছু পরিমাণে সংকেত-ব্যঞ্জনাই বহন করে, যে, সেকথা স্মরণযোগ্য। এখানে একটা আপাত-স্ববিরোধী বক্তব্য এসে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। অতি অনুন্নত অর্থনৈতিক স্তরে যে-সমস্ত জাতি-কোমগুলি আবদ্ধ, তাঁদের মধ্যে মুখোশ অপ্রচলিত, প্রচলিত দেহচিত্রণ—এইকথা ওপরে বলা হয়েছে। আবার এও বলছি যে, উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছেন যাঁরা, তাঁরা দেহচিত্রণকে নান্দনিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই দুটি কথা কী তাহলে পরস্পর-বিরোধী নয়?

না, তা নয়। অনুন্নত কোমগুলির কাছে মুখোশ যে হাজির হয়নি, সে শুধুমাত্র তাঁদের প্রাযুক্তিক দক্ষতা এবং সুযোগের খামতিতে। কাজেই মুখোশের যে বিচিত্র তাৎপর্য এবং (তাঁদের-ভাবনায় প্রয়োজন)— তা সিদ্ধ হয় ঐ দেহচিত্রণের মাধ্যমেই। পক্ষান্তরে, তুলনামূলকভাবে উন্নত গোষ্ঠীগুলি সেই প্রয়োজন তাঁদের উন্নত প্রাযুক্তিক জ্ঞানের দ্বারা নির্মিত মুখোশের মাধ্যমে মেটান। ফলত উল্কি, দেহচিত্রণ ইত্যাদি উত্তরোত্তর প্রতীকী হতে-হতে কালক্রমে মূল ব্যঞ্জনাকে ঢেকে ফেলে নান্দনিক তাৎপর্য অর্জন করেছে।

একটা উদাহরণ দিই। বাঙালীর ঘরে শিশুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাইরে বার করার সময়ে যে সিঁথির পাশে কাজলের টিপ পরানো হয় — এখন সেটা নিতান্তই একটা প্রথা বলে গণ্য। কিন্তু এর সূত্রানুসন্ধান করলে দেখা যায় নে, ঐভাবে কালি মাখিয়ে 'কুচ্ছিত' করে দিলে, অপদেবতা, ডাইনি, ভূত-প্রেত-শাঁখচুন্নিরা আর ঐ শিশুর দিকে তাকাবে না। ('লোকসংস্কৃতির সীমানা' অধ্যায়টি পুনর্দ্রষ্টব্য।) তাহলে বিকৃতদর্শন-মুখের মুখোশ পরে বেরোনোর সঙ্গে এই চিন্তার মৌলিক প্রভেদ কোথায়? বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরের শিশু এখন মুখোশ পরে খেলার বস্তু হিশেবে। এর অতিলৌকিক তাৎপর্য তার পরিবারে এখন বিলুপ্ত। কিন্তু দেহচিত্রণের ব্যাপারটার মধ্যেও তেমন তাৎপর্যই অন্তর্লীন হয়ে আছে — বহিরঙ্গে প্রকাশ না থাকলেও।

উন্নততর অর্থনৈতিক পরিবেশে যে-সমস্ত প্রজাতি উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে মুখোশের এইসব আদিম অভিভব স্তিমিত হয়ে গেলেও, নূতনতর তাৎপর্যও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা গেছে গ্রীসে; নাচের ক্ষেত্রে জাপানে, বাংলায়, এবং কেরলে। গ্রীক নাট্যাভিনয়ে মুখোশধারী চরিত্রগুলি প্রায়শই কাহিনীর অলক্ষ্য সূত্রগুলিতে গ্রন্থি বেঁধে দিত। তাদের নির্দিষ্ট কোনও পরিচয় সব সময়ে থাকত না; মুখোশ ধারণ করে এক ধরনের প্রতীকী তাৎপর্য বহন করত এই চরিত্রগুলি। জাপানের 'ন্যো' এবং 'কাবুকি'-তে, বাংলার (কিছুটা সেরাইকেলারও) 'ছৌ'-এ এবং কেরলের 'কথাকলি'-র মধ্যে মুখোশ-পরার সূত্রেই অবশ্য এক-একটি চরিত্রের পরিচয় ব্যক্ত হয়। মুখোশের মতো এমন দ্বিমাত্রিক তাৎপর্য, সম্ভবত আর কোনও লোকশিল্পে মেলেনা, যা একই ভাবে একটি চরিত্রের পরিচয়কে মূর্ত অথবা লুপ্ত করে দিতে সক্ষম।

গ. আলপনা : সংস্কৃতির চিত্র-ইতিহাস

মহারাষ্ট্রের সর্বত্রই এর প্রচলিত নাম হল রঙ্গোলি। ঠিক ঐ একই নামে আবার একে উত্তরপ্রদেশেরও বহু অঞ্চলে ডাকা হয়। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে কিন্তু একে বলে সোন্‌হা রখ্‌না; বিহারে বলে অরিপন, ওড়িশায় ঝঙ্গতী, মধ্যভারতে মন্ডন; হিমাচল এবং হরিয়ানায় লিখনুয়া, গুজরাটে সাথিয়া, অন্ধ্রে মুগ্গলি এবং তামিলনাড়ু ও কেরলে কোলম হল এর অভিধা।

বহু-নামে নন্দিত এই জিনিষটি হল আমাদের অতি-পরিচিত আলপনা : ব্রত, পার্বণ, পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অন্যতম বিশিষ্ট মাঙ্গলিক উপচার; যা বহু-বহুকাল ধরে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশরূপে পরিগণ্য হয়ে আসছে। আলপনার একটি নান্দনিক দিক আছে; আবার তার মঙ্গলবিধায়ক চরিত্রটিও আমাদের বিশ্বাসে লীন হয়ে আছে এবং নিছক শিল্পকলারূপেও তার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু আলপনার মধ্যে যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফেলে-আসা কালের সুপ্রচুর স্মৃতি-অবশেষ লুকিয়ে আছে, এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমরা স্মরণে আনিনা বহু সময়েই।

আলপনার মধ্যে মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাক্রমটি নানান্‌ভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে লুকিয়ে আছে। বিচিত্র ধরনের চিহ্ন এবং প্রতীকী চিত্র মানুষ আঁকতে শিখেছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। অবশ্যই এই কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে আমাদের আদিম প্রপিতামহদের শিল্পকলা, যার সূত্রপাত অন্তত ৪০,০০০ বছর আগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুহাচিত্রে এবং অন্যান্য নানা ধরনের শিল্পবস্তুতে বাস্তবানুগ ও সঙ্কেতধর্মী যে-সমস্ত চিত্র-চিহ্ন দেখা যায়, ঠিক তাদেরই সমতুল্য ভাবনা এবং প্রেরণার হদিশ মেলে আলপনাতেও। আদিম চিত্রকলা কালের বিবর্তনে যেমন প্রাচীন যুগে পৌঁছে একদিকে লিপিতে পরিণতি পেল (যার নমুনা মেলে মিশরের হায়ারোগ্লিফিকে, মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্মে, অবিশ্লেষিত সিন্ধুলিপিতে, ইস্টার দ্বীপের বর্ণচিত্রাবলীতে এবং ক্রীটদ্বীপের লিনিয়ার 'এ' এবং 'বি' লিপিমালায়) অন্যদিকে লোকায়ত ও কৌম স্তরে তার বিবর্তন ঘটল আলপনা-জাতীয় শিল্পে।

ইতিহাস-পূর্বকালের চিত্রকলার অন্তরালে যে-বিশেষ মানসিকতাটি ক্রিয়াশীল ছিল, আলপনার মধ্যেও সেটি অস্তিত্বময়, সে হল জাদুশক্তিতে বিশ্বাস। আদিম মানুষের চিত্রকলার অবলীন তাৎপর্যটি ছিল জীবন-ও-জীবিকার জন্য কিছু অর্জন করা; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই-'কিছু' অবধারিতভাবে ছিল শিকারযোগ্য কোনও প্রাণী। পরবর্তীকালে আলপনার যে ব্যবহারিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে, তার উৎস অবশ্য শিকার-এবং-সংগ্রহভিত্তিক আদিম অর্থনীতি নয়, বরঞ্চ কৃষি-নির্ভর সমাজের পরিমণ্ডল। অবশ্যই এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বদলটা, আদিম চিত্রকলার অনেক পরবর্তীকালে আলপনা-জাতীয় শিল্পের বহিরঙ্গে (অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর চিত্রণে) প্রচুর পার্থক্য ঘটালেও, দুই কালের শিল্পধারার মধ্যে অবলীন-থাকা ভাবনাকে মৌলিক ঐক্যে বেঁধে রেখেছে। ঐ ঐক্যসূত্রটিই হল, জাদুবিশ্বাস।

আদিম প্রপিতামহরা তাঁদের শিল্পকলা-চর্চার কারণে জাদুশক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা ঘটাবে, এমনই মনে করতেন। শিকারের ছবি আঁকলে বাস্তবেও অনুরূপ শিকারের ব্যাপার সংঘটিত হবে; কিংবা, কতকগুলির বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন / প্রতীক আঁকলে বিশেষ-বিশেষ ধরনের কামনা / প্রত্যাশার পরিপূরণ হবে—ইত্যাদি-মর্মে তাঁদের যে-সব ধ্যান-ধারণা ছিল, তা-ই বিবর্তিত হয়েছে আলপনার ক্ষেত্রেও : ধানের ছড়া আঁকলে-ফসলক্ষেত্রে ধান উপ্‌ছিয়ে পড়বে, মাছভর্তি পুকুর আঁকলে সত্যিকারের পুকুর মাছের ছানাপোনায় ভরে যাবে; বাড়ি, মরাই, ফলন্ত গাছ, ফুলন্ত নদী, উড়ন্ত পাখি-ইত্যাদির ছবি আলপনায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবেশ তৈরি হবে-এই সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনাই লুকিয়ে রয়েছে আলপনা রচনার প্রেরণার আড়ালে। স্পষ্টতই এ হল সাদৃশ্য বা অনুকৃতিমূলক জাদু সম্পর্কে বিশ্বাসের লব্ধফল। সেঁজুতি ব্রতের একটি মন্ত্রকে অনুধাবন করলেই এ কথার যাথার্থ্য যাচাই হতে পারে :

'আমি আঁকি পিটুলির গোলা
আমার হোক ধানের গোলা।
আমি আঁকি পিটুলির বালা
আমরা হোক সোনার বালা।' .... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আলপনায় প্রচলিত বহু চিহ্নের মধ্যেই তাদের মূল তাৎপর্য বা সঙ্কেত আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে; বিস্মৃতিকে ছাপিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নূতন-পরিবেশানুগ নূতনতর-তাৎপর্য, নানাভাবে, নানাধরনে। মাছ, মরাই, কুটির, কলাগাছ ধানের শিস্-ইত্যাদির তাৎপর্য অবশ্য সহজবোধ্যই। কিন্তু বহু চিহ্নই রয়েছে, যাদের আদিম ব্যঞ্জনা এখন হাবিয়ে গেছে বলে নূতনতর কিছু ব্যঞ্জনা আরোপিত হয়েছে তাদের ওপর। ধরা যাক বাংলার আলপনা শিল্পের মধ্যে বহু-ব্যবহৃত নানা ধরনের বিসর্পিল চিহ্নের কথাই, যাদেরকে বিচিত্রভাবে অলঙ্কৃত করে শঙ্খলতা, খুন্তিলতা- ইত্যাদি সব নামে ভূষিত করা হয়েছে। কিংবা, সারিবদ্ধ অসংখ্য টিপছাপের কথাটা। প্রাথমিক তাৎপর্যগুলি এই দুই ধরনের চিহ্নের ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হয়ে গেছে।

শিকারভিত্তিক অর্থনীতির ওপরে নির্ভরশীল জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পশু-পাখি-সরীসৃপদের চলা-ফেরা-বসার চিহ্নগুলি অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় সংকেত বলে গণ্য হতো। ঐ সমস্ত প্রাণীই ছিল শিকারী মানুষের খাদ্য এবং চামড়া, পালক-ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহের আরও কিছু-কিছু উপকরণও তারাই জোগাত। সুতরাং তাদের সন্ধান দেয় যে-সব চিহ্ন, সেগুলি-অবশ্যই তার কাছে শুভদ্যোতক। কাজে-কাজেই, সরীসৃপের বিসর্পিল সঞ্চরণ-চিহ্ন বা নদীর তীরের নরম মাটিতে-বসা পাখির ঝাঁকের টিপছাপ ধরনের পদচিহ্ন-ইত্যাদি খাবারের হদিশ দেয় বলে ঐ ধরনের চিহ্নমাত্রেই শুভদ্যোতক জাদুর অন্তর্গত বলে ধার্য হল।

কালক্রমে শিকারের বদলে কৃষি / পশুপালন যখন থেকে অর্থনৈতিক সংস্থানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল, তখন চিহ্নগুলির ব্যঞ্জনাও গেল বদলে : ধানের গুছি কিংবা মরাইয়ের আলপনা-চিত্রের পাশে ঐ সর্পিল রেখার কিংবা টিপছাপ সারির অলঙ্করণের মাধ্যমে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ-মানসিকতার প্রতিফলনও ঘটল : গোলা উপ্‌ছিয়ে ধান

পড়লে পাখিরা এসে সেগুলো খুঁটে খায় যেহেতু, তাই গোলাব ছবিব পাশে পাখির পায়ের ছাপ আঁকলে বাস্তবেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটবে (অর্থাৎ, সমৃদ্ধি এতই হবে যে গোলা উপ্‌ছিয়ে ধান পড়বে এবং পাখিরা তা খাবে)। আবার কৃষিসমাজের সঙ্গে উর্বরতাভিত্তিক ধর্মধারার সম্পর্কজনিত বিশ্বাস বিশ্বজনীন এবং সাপ ও উর্বরতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সর্বত্রই কল্পিত। অতএব ধানের গুছি / মরাইয়ের ছবির পাশে সাপের চলার চিহ্নের মতো ছবিও আঁকা হল। তাছাড়াও শস্যের শত্রু হল ইঁদুর এবং তার শত্রু (অতএব ধানের মালিকের মিত্র) যে, সেই সাপের-চলার মতো চিহ্নও শুভদ্যোতনায় মণ্ডিত। ঐ একই কারণে আলপনার মধ্যে পেঁচাও এসেছে এবং কালক্রমে সমৃদ্ধির দেবীর বাহনরূপেও কল্পিত হয়েছে।

হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, ফুল, সূর্য, পান, কড়ি, কলাগাছ, মাছ-ইত্যাদির ছবি যে আলপনায় আঁকা হয়, তাদেরও নানা ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। আগের কোনও শিকারীর পায়ের ছাপ ধরে-ধরে এগোলে শিকারযোগ্য প্রাণীর সন্ধান মিলতে পারে; অতএব পায়ের ছাপ ছিল শুভচিহ্ন। পশুচারণ-কেন্দ্রিত জীবনযাপন যখন ছিল প্রচলিত, তখনও তা শুভসূচক, কেন না পূর্বতন কোনও পশুচারকের পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলে সামনে কোথাও হয়ত-বা নতুন কোনও তৃণভূমি কিংবা নদী বা হ্রদ মেলা সম্ভব। মানুষের পায়ের ছাপ সম্বন্ধে যেকথা, পশুর পদচিহ্ন সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। মোটের ওপর মানুষের বা পশুর, যারই হোক না কেন, পদচিহ্ন সদাই সুলক্ষণরূপে ধার্য!

কৃষির উদ্ভবের পরও পদচিহ্নের সুলক্ষণা চরিত্র অটুট রইল মানুষের ভাবনার জগতে। ঘরের দুয়ারে ভিতরমুখী পায়ের ছাপ আঁকলে তার ওপর পা ফেলে-ফেলে শুভঙ্করী কোনও দৈব / অলৌকিক শক্তির পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব এবং ত্বরান্বিত হবে এই জাদুবিশ্বাসই ঐ চিহ্নকে মানুষের কৃষ্টিতে টিকিয়ে রাখল। অতএব এল লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। পায়ের ছাপ আঁকা / খোদাই-করা শীলমোহর হরাপ্পা-সংস্কৃতির কয়েকটি কেন্দ্রে এবং প্রাচীন ক্রীটদ্বীপের প্রত্নাবশেষের মধ্যেও মিলেছে!

পায়ের ছাপ যেমন শুভাগমন / শুভগমনের অভিব্যঞ্জক, হাতের ছাপের তাৎপর্য ঠিক তার বিপরীতটি : অশুভরোধ করার ভাবনা তার ভিতর ব্যাপ্তিত। ২০,০০০ বছর আগে চিত্রাঙ্কিত গুহার দেওয়ালে যেমন হাতের পাঞ্জার ছাপ ফেলে শিকারী মানুষ ভাবত, অকল্যাণকারী অলৌকিক শক্তিকে যে প্রতিরুদ্ধ করল, ঠিক তেমনভাবেই পরবর্তীকালের কৃষিজীবী-মানুষ ঐ ছাপ লাঞ্ছিত করে আলপনা-আঁকা মেঝে-অথবা-দেওয়ালের পাশে কিংবা ঘরের দরজার পাল্লায়। সেটাও গণ্য হয় অলঙ্করণের একটা অনিবার্য অঙ্গরূপে! মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার আদিবাসী-প্রধান গ্রামগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই একথা জানেন।

আদিম চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে, উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা বা ফার্টিলিটি কাল্টের প্রাথমিক পর্যায়ের এক অনুভাবনায় নারীমূর্তির মাতৃত্ববাচক বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। গর্ভবতী নগ্না নারীমূর্তি—যাদের চোখ-মুখ-নাক-ইত্যাদি স্পষ্টভাবে তক্ষণ করা হতো না, অথচ নারীবৈশিষ্ট্যসূচক শরীরাংশগুলি বিশেষ স্পষ্টতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো। এমন মূর্তি প্রত্নপ্রস্তর যুগে নানা দেশ এবং গোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পরে এদের প্রচলন কমে গেল। মাতৃকামূর্তির প্রতীকী

রূপান্তবণ ঘটল নানা ভাবে; যার একটা হল আমাদের আলপনা শিল্পের 'কোলে-পো-কাঁখে-পো' ধরনের চিত্রমূর্তি। পক্ষান্তরে, স্ত্রী-ত্ববাচক প্রত্যঙ্গের প্রতীক-ব্যঞ্জনা নিয়ে চিত্রায়িত হতে লাগল পুষ্পল-অলঙ্করণ, বিশেষত পদ্মফুল। তান্ত্রিক 'যন্ত্র' এবং 'অষ্টদল', 'চৌষট্টি দল' 'শতদল', 'সহস্রদল'-প্রভৃতি পর্যায়ের পদ্মপ্রতীক এবং 'মণি-পদ্ম'-প্রভৃতির ব্যঞ্জনা যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে আলপনাব পুষ্পচিহ্ন সম্বন্ধে এই বক্তব্য দূরান্বয়ী বলে মনে হবে না আদপেই।

উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধমধারার এই ভাবদ্যোতকতা আলপনা শিল্পের আরও কিছু-কিছু চিহ্নের মধ্যে হাজির হয়ে আছে। মাছ, কড়ি, শাঁখ, কলাগাছ,পান-ইত্যাদি চিহ্ন বাঙালীর আলপনা-কলায় এসেছে সুপ্রাচীন অস্ট্রিক অধিজাতিব উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার ঐতিহ্যাগত উত্তরাধিকার হিশেবেই তাতে সন্দেহ নেই। এদের সবগুলিই যে যৌনচিহ্নের বিকল্প / অনুকল্প রূপে মানুষের মগ্নচৈতন্যে প্রতিভাসিত, সে-তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানে মেলে। আলপনার সূর্যচিহ্নও উর্বরতামূলক কাল্টের সূত্রবাহী; বিশ্বজনীনভাবেই সূর্যকে উর্বরতাভাবনার পুরুষ-প্রতীক বলে গণ্য হয়ে থাকে। স্বস্তিকা চিহ্ন রূপেও আলপনায় থেকে গেল সূর্য। স্বস্তিকার মতো বসুধারা চিহ্নও উর্বরতার কাল্টের স্মারক : এ হল বর্ষণের সঙ্কেতবাহী। এতএব কৃষি-সমাজের পক্ষে শুভদায়ক অবশ্যই।

আলপনার মধ্যে মানুষের ছবির যে পুত্‌লিগুলি আঁকা হয়, তাদেরও পর্বসূত্র মেলে পৃথিবীর নানা মুল্লুকের গুহাচিত্রে অঙ্কিত মানবমূর্তিগুলির মধ্যে। গুহাচিত্রের পশুমূর্তি অনেক সময়েই বাস্তবধর্মী; আবার অনেক সময়ে তা রৈখিক প্রতীকীভঙ্গীতেও অঙ্কিত। কিন্তু মানুষের মূর্তির অভিপ্রকাশ সেখানে প্রায় সর্বদাই ঐ দ্বিতীয় ধরনের টেকনিক বা প্রকরণে। গুহাশিল্পে মানুষের প্রতীকী ছবিতে যে মানসিকতার প্রতিফলন, তারই অনুবর্তন আলপনার পুত্‌লি অঙ্কনেও : মানুষ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করছে, গুহাচিত্রের উপজীব্য এইটি; আর মানুষ শস্যে-সন্তানে-বিত্তে সমৃদ্ধ হচ্ছে, আলিম্পনের অন্তর্নিহিত ভাবনা হল এইটি। মূল ভাবনার পরিকাঠামো এক; প্রকাশ মাধ্যমও এক। পার্থক্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপজীব্যে : পশুর পরিবর্তে, শস্য। শিকারের বদলে চাষবাস। শ্রম-পদ্ধতি পৃথক, ফলশ্রুতি অভিন্ন। অভিপ্রায়ও সেই চিরকালীন কথার মধ্যেই নিহিত : "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" যদিও আলপনাকে আমরা একান্তভাবেই বাঙালীর সাংস্কৃতিক নিজস্বতার লক্ষণ বলে মনে করি, তবু সেই ভাবনাটা কিন্তু সঠিক নয়। ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপ-বলয়েও যে অনুরূপ শিল্পধারা ব্যাপকভাবে বহমান তা এই অধ্যায়ের শুরুতেই দেখেছি। শুধু ভারতবর্ষই বা কেন? উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা কিংবা আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা জাতিকৌমভুক্ত আদিবাসীরা, কি অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন বাসিন্দারা— আলপনা জাতীয় চিত্রকলার নিয়মিত প্রয়োগ সর্বত্রই দেখা যায় কোনও না কোনওভাবে। ভারতের অসংখ্য আদিবাসীরাও এর ব্যতিক্রম নন। আদিম সমাজ থেকে আদিবাসী সমাজ এবং যেখানে থেকে জনপদবাসী লোকসমাজ অবধি এই শিল্পধারা চলে আসছে। মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তন-ধারাটিকে চিনতে হলে তাই তার স্বরূপ বিশ্লেষণ একটি অনিবার্য শর্তরূপেই গণ্য অতএব।

ঘ. নক্‌সী কাঁথা : হৃদয়ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক রূপ

"নক্‌সী কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরই বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।

মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরই বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায়ে এরে মিলে দিও তাই
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।"

('নক্‌সী কাঁথার মাঠ' : জসীমউদ্দীন)

জসীমউদ্দীনের নায়িকা সাজু তার বিবাহিত জীবনের সুখের সময়ে যে-নক্‌সী কাঁথাটি 'শিলাইতে' শুরু করেছিল, সেই কাঁথাটিই সে তার দুঃখের ভরা মরশুমে বসে-বসে সাজিয়ে তুলত নানান্ ছবিতে। তার স্বামী রূপাই তখন পুলিশের হাত এড়াতে ফেরার হয়ে রয়েছে। বিরহিনী সাজুর মৃত্যুর পর তার দুঃখিনী বিধবা মা সেই কাঁথাটি মেয়ের কবরের ওপর বিছিয়ে দেন তারই শেষ ইচ্ছার অনুযায়ী। রূপাই অবশেষে একদিন ফিরে আসে বটে, কিন্তু গ্রামের লোক পরদিন ভোরে তার নিষ্প্রাণ দেহটিকে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে সাজুর কবরের পাশে। দুঃখিনী সাজুর হাতে 'শিলানো' তাদের জীবনের বসন্ত-বর্ষার নানা ছবিতে-ভরা সেই কাঁথাটি তার গায়ে জড়ানো। 'সেই হতে এই মাঠের নামটি হয়েছে নক্‌সী-কাঁথা, / ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ গাথা।'

যে-গল্পটি বলা হল, তার মধ্যেই বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু কাঁথা-শিল্পটির মূল কথাটুকু ধরা রয়েছে। প্রতিদিনের সুখ বা দুঃখের নানান্ ছবিই পরোক্ষে-প্রত্যেক্ষে প্রতিফলিত হয় এর মধ্যে; বাঙালীর ঘরের মেয়ে-বউরা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা সবটুকু উজাড় করেই এই শিল্পকে সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর পাঁচটা লৌকিক শিল্পকলার মতো নক্‌সী কাঁথারও আজকে বিলীয়মান প্রায় অবস্থা।

এই 'সুদীর্ঘকাল' মানে খ্রিস্টপূর্ব আমল থেকে আজ অবধি। পাণিনি 'কন্থা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। জাতকে এবং পালি সাহিত্যের অন্যত্রও 'কথা'-র উল্লেখ বিরল নয়। আলাওলের 'পদ্মাবতী' বইতে 'কান্থা' শব্দের ব্যবহার আছে। নাথপন্থীরাও 'জীর্ণকন্থা' ব্যবহারে আদিষ্ট ছিলেন। মোট কথা, কাঁথার ঐতিহ্য বহু শতাব্দীর।

উল্লেখযোগ্য এই কাঁথাও আলপনার মতো একান্তভাবে মেয়েলি শিল্পকলা। ছেঁড়া কাপড় পরের-পর বিন্যস্ত করে ঘন সূচের ফোঁড়ে সবগুলিকে একসঙ্গে শেলাই করে এর প্রাথমিক চেহারাটি খাড়া করা হয়। পরের-পর অজস্র সমান্তরাল রেখা; সরল, বঙ্কিম, কৌণিক, এই জমিনের ওপরে তার পরে নক্‌সী কাঁথার নক্‌সা। 'কন্থা' পাণিনির সময়কাল থেকে সারা উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল ঠিকই, কিন্তু নক্‌সী কাঁথা একেবারেই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ফলন।

আলপনার নক্‌সাগুলির মধ্যে ব্রতকেন্দ্রিক ধর্মধারা (কাল্ট) আছে বলে তাদের মধ্যে

খানিকটা জাদুবিশ্বাসও আছে; নক্‌সাগুলির মধ্যে সেই বিশ্বাসই প্রতীকমূর্তি ধরেছে। কাঁথার নক্‌সাগুলি বহুলাংশেই আলপনার নক্‌সার সঙ্গে হুবহু মিলে গেলেও, তার মধ্যে ঐ ধর্মীয় তাৎপর্য বা জাদু-কেন্দ্রিক কোনও বিশ্বাসের অভিক্ষেপ ঘটেনি। না-ঘটার একটা খুব বড় কারণ হল এই যে, আলপনার এলাকা সীমাবদ্ধ মূলত বাঙালী হিন্দুর ঘরের দাওয়া অবধিই; পক্ষান্তরে, কাঁথার শিল্পীরা হিন্দু-মুসলিম দুই-ই। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্পে আলপনার 'মোটিফ' (চিত্রাভিপ্রায়) ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র প্রতিভাসিত হয়েছে। আলপনা দেওয়ার চেয়ে কাঁথা তৈরি করতেও যেমন বেশি সময় লাগে, তার স্থায়িত্বও তেমনিই দীর্ঘতর। স্বভাবতই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-ব্যঞ্জনা—যা কি-না আলপনার গোড়ার কথা—কাঁথার মধ্যে অনেক বাস্তবায়িত মূর্তি ধরেছে। দিনের পর দিন ধরে (মাতামহী-মাতা-কন্যা—তিন প্রজন্ম ধরে বানানো কাঁথারও সন্ধান মেলে; ঠাকুর-পুকুরের গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে এ-রকম আছে একটি) তৈরি-করা এই কাঁথাটি প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মধ্যে যে-আনন্দ এবং মমতা ফুটে ওঠে, ব্রতের আলপনার মধ্যে তারই আকাঙ্ক্ষার রূপটি প্রতীকায়িত হয়। আলপনা যদি আকাঙ্ক্ষা হয়, নক্‌সী কাঁথা তার পূর্ণতা।

কী নক্‌সা সাধারণত কাঁথার ফোঁড়ে দেখা যায়? ফুল—বিশেষত পদ্ম, একটি বহু প্রচলিত চিত্রোপকরণ। পানের পাতা, খেজুর পাতা, অশ্বত্থ পাতা, পাখি, কদম গাছ, মাটির বাড়ি, হাতী, ঘোড়া, বেড়াল, হাঁড়ি, নৌকো, পালকি, লক্ষ্মীর পা, কুন্‌কে, কাছিম, মাছ, কলসি, পিদিম, ধানের শিস্, মায় কাঁকড়া অবধি কি-না আছে কাঁথার নক্সায়! কল্‌কা, পদ্মলতা, কাজললতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা ইত্যাদি এবং বর্‌ফি, চাকতি, চৌকোণা-ইত্যাদি ডিজাইনও কাঁথার নক্‌সায় বহুল-প্রচলিত। সূর্য, চাঁদ, তারা প্রভৃতিও কাঁথার খুব জনপ্রিয় মোটিফ বলে গণ্য।

ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্কে কোনও-না-কোনও ভাবে গ্রামবাংলার মানুষের জীবনে যা রেখাপাত করেছে, তা-ই এসেছে কাঁথার নক্‌সায়। গ্রামের বা এলাকার কোনও ঘটনা—যা স্বভাবত নিশ্চিন্ত, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে হয়ত বা সাময়িক দোলা তুলেছিল, তারও ছবি কাঁথার ফোঁড়ে দেখা গেছে অনেক সময়েই। এক লক্ষ টাকায়-বীমা-করা একটি কাঁথা আছে গুরুসদয় মিউজিয়ামে; জঙ্গলবাধাল নিবাসী জনৈকা মানদাসুন্দরী দাসীর তৈরি ঐ কাঁথাটিতে সিপাহী যুদ্ধের একটা মোটামুটি পটভূমি অঙ্কিত আছে বলে মনে করা যেতে পারে, এমন অভিমতও পোষণ করেন অনেকেই। কৃষ্ণ-রাধা লীলার ছবিও কাঁথার আর একটি বহু ব্যবহৃত চিত্রোপকরণ।

॥ ২ ॥

সাধারণত কাঁথার মাঝখানে পদ্মফুল কিংবা কল্‌কা বা সূর্য ইত্যাদির একটি বড় মাপের ডিজাইন সাজিয়ে তার চারপাশে বিভিন্ন ধরণের ছবি বা মোটিফ বিন্যস্ত করা হয়। ওপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে জমিন তৈরি করে নিয়ে লাল, নীল, হলুদ, কালো এবং সবুজ সুতোয়—অবশ্যই ছেঁড়া কাপড়ের রঙিন্ পাড় থেকে বের-করে-নেওয়া 'রান্'-শেলাই অথবা দোরোখা শেলাই দিয়ে কাঁথার ছবিগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়।

কাঁথার পাড় হিসেবে সচরাচর শঙ্খলতা-ঝুমকোলতা ইত্যাদি তরঙ্গায়িত কোনও একটি মোটিফ ব্যবহৃত হয় পূর্ববঙ্গে; পশ্চিমবঙ্গে কোনও-কোনও অঞ্চলে মূল বা কেন্দ্রীয় নক্সার সঙ্গে রঙে এবং ডিজাইনে মানানসই শাড়ির পাড়ও মজবুত করে শেলাই করে দেওয়া হয় বাহারী বর্ডার হিসাবে। অনেক সময়ে, কাঁথার কাপড়গুলি একত্র করে আগে চারদিকের পাড়ের নক্সাটি সাজিয়ে নিয়ে তারপর ভেতরে নানান ডিজাইন-বিন্যাস করা হয়ে থাকে। সে রকম পুরো কাঁথার জমিন তৈরি না-করে শুধুমাত্র নক্সা-না-থাকা শাদা অংশগুলিতেই সেটি করা হয়।

'রান্'-শেলাই প্রচলিত থাকলেও, কাঁথাব বাহার খোলে অবশ্য দোরোখা সূচের কাজে। কাশ্মীরী শালের সঙ্গে এদিক থেকে এর মিল আছে। কাঁথার শৈল্পীনৈপুণ্যের বৃহদংশই ঐ ফোঁড়ের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। দোরোখা-ফোঁড় ছাড়া আরো কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গীর ফোঁড় এক সময়ে জনপ্রিয় ছিল, যেমন : বাঁশপাতা ফোঁড়, কার্ফা ফোঁড়, বাঁক ফোঁড়, ভাঙা ফোঁড়, গোটা ফোঁড় ইত্যাদি। এক সঙ্গে কয়েকটি একই রঙের সুতো লহর বা লরি পাকিয়ে নানা মাপের সূচের সাহায্যে এই ফোঁড়গুলি দেওয়া হয়ে থাকে। একই সূচে কখনও একাধিক রঙের সুতো পরিয়ে ফোঁড় দেওয়া কিংবা শেডের কাজ করা কাঁথায় প্রচলিত নয়। তবে নক্সা ভরাট করার সময়ে হাতের দক্ষতায় শেডের কাজের আভাস ফুটে উঠতে পারে।

কাঁথার ছবিতে 'শেড্' নেই বলে তা সর্বদাই দ্বি-মাত্রিক। ভারতীয় চিত্রকলার এই ঐতিহ্য কাঁথা, আলপনা, সরা, পট সর্বত্রই দেখি। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় চিত্রশিল্পের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকরণগতভাবে কাঁথার ঐতিহ্যবাহী চরিত্রকে সূচিত করছে, যেমন পদ্মের মোটিফের প্রাধান্য সূচিত করেছে তার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের ভাবগত ঐতিহ্যবাহিতা।

এই ঐতিহ্যবহনকারী কাঁথারও আবার নানান্ প্রকারভেদ। মোটামুটিভাবে নক্সী কাঁথার সাতটি বিভিন্ন ধরণ আছে, প্রত্যেকটির চেহারা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ আলাদা : ক. রুমাল, খ. আর্শিলতা, গ. ওয়াড়, ঘ. দুর্জনী, ঙ. সুজনী, চ. বইতন এবং ছ. লেপ। এই বিভাজন গুরুসদয় দত্তের করা। দীনেশচন্দ্র সেন আবার তিনটি মাত্র ধরণে কাঁথার গোষ্ঠী বিভাগ করেছেন : গেলাপ, বটুয়া এবং কাঁথা। জসীমউদ্দীন এক জায়গায় আরও কটি ধরণের কাঁথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন : খিচা, থলিয়া ঝুলি, বেতন, আবরণী, ঝোলা এবং কাঁথা। ঢাকার বাংলা একাডেমির সংগ্রহে থাকা দশ রকমের কাঁথার উল্লেখ করেছেন ওয়াকিল আহমেদ : নক্সী কাঁথা, সুজনী কাঁথা, লেপকাঁথা, নক্সী আসন, জায়নামাজ, দস্তরখানা, গাঁটরি, বোঁচকা বা বুগইল, বালিশচাপা এবং বস্তানী।

নানা ধরণের আঞ্চলিক নাম ব্যবহৃত হবার ফলে কাঁথার তালিকা এত দীর্ঘ হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে মূলত ছ-সাতটি প্রয়োজনেই কাঁথার ব্যবহার হয় বলে গুরুসদয় দত্ত যে মূল বিভাগটি নির্দেশ করেছেন, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সেটি মনে রাখলেই চলে।

রুমাল কাঁথা সচরাচর এক বর্গফুট মাপের সমচতুষ্কোণ আকারের হয়; মাঝে পদ্মের মোটিফই প্রচলিত, তার চারদিকে লতাপাতা, কল্কা, পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদিও বিন্যস্ত হয় ছবিতে। রুমালের প্রয়োজন ঠিক না মেটালেও, ফ্যাশন হিশেবে এই কাঁথা হাতে রাখা

না-কি একসময় চালু ছিল। আর্শিলতার আকার আয়তক্ষেত্রিক : আধ ফুট চওড়া, এক ফুট লম্বা। এর চারদিকে পাড়ের মতো নক্সা থাকে। মাঝের জমিটুকুতে একসার পদ্ম কিংবা শঙ্খলতা অথবা কল্‌কা দিয়ে সাজানো হয়। আর্শি, চিরুণী ইত্যাদি রাখার জন্য এই কাঁথাগুলিতে কৃষ্ণ-লীলা, কদম গাছ, চাঁদ-তারা ইত্যাদি মোটিফই বেশ প্রচলিত।

রুমাল এবং আর্শিলতা নামের তাৎপর্য সরল হলেও দুর্জনী নামের মানে সত্যিই চিন্তা করার বিষয়। মাপে এবং (প্রাথমিকভাবে) আকারে আর্শিলতার মতোই; তবে, তিনটি একত্র করে মুড়ে বটুয়ার চেহারা দেওয়া হয় পরে। তখন বটুয়া হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন দুর্জনে ছিনিয়ে নিতেও পারে হয়ত বা, এই কারণে এর নাম 'দুর্জনী' কি-না জানা নেই। বিভিন্ন ধরণের রেখাঙ্কনেই দুর্জনীর বৈচিত্র্য।

সুজনী সম্ভবত সুজনের ব্যবহারের জন্য। বিছানা ঢাকবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে এর দৈর্ঘ্য চারহাত মতো, বহরেও দুহাতের বেশি। আকারে এত বড় বলেই এগুলিতে চিত্রসম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিন্যস্ত করা যায়। পাড়ের বাহার এগুলিতে খুব বেশি; মাঝের ডিজাইনও নানা ধরণের; ভরাট চেহারার পদ্মফুল প্রায়ই ঠিক মাঝখানে চিত্রিত হয়। কল্‌কা এবং বিভিন্ন ধরণের লতারও কারিকুরি এতে প্রচুর। প্রাণীজীবন এবং সমাজজীবনও এর মধ্যে হামেশাই আঁকা হয়; সে তালিকা ওপরে দিয়েছি।

লেপ এবং সুজনী চেহারায় একই, তবে লেপের আয়তন সামান্য বড়, বহরে এবং আড়ে। তাছাড়া লেপ গায়ে জড়ানো হয় বলে এর ঘনত্বও কিছু বেশি। নক্সার দিক থেকেও সুজনীর সঙ্গে এর হেরফের বেশি নেই, তবে শালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বঙ্গবালারা এটি তৈরি করতেন একদা, তাই এর অলঙ্করণ অবশ্যই বেশি, সুজনীর চেয়ে। ওপরে যে লাখ টাকার 'ছেঁড়া' কাঁথাটির কথা বলেছি সেটি এবং তিন প্রজন্মে তৈরি কাঁথাটি—লেপ-কাঁথার অতি বিশিষ্ট উদাহরণ।

বইতন, নামেই বোঝা যাচ্ছে বইয়ের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক আছে। বইখাতা ইত্যাদি জড়িয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এর ব্যবহার হয়। চার বর্গহাত মাপের সমচতুষ্কোণ এই কাঁথাগুলিতে কল্‌কা ইত্যাদি ঐতিহ্যাগত অলংকরণের বিভিন্ন মোটিফ ব্যবহৃত হয়—মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালা এবং অবশ্যই ফুলকে অবলম্বন করে। রথ, কুলো ইত্যাদিও যথেষ্ট দেখা যায়। ঝিরিঝিরি ফোঁড়ের সেলাই দুর্জনীর মতো এরও বৈশিষ্ট্য।

ওয়াড়-কাঁথারও নামেই প্রতীত হয় যে, বালিশ ইত্যাদি ঢাকার জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা। পৌনে দু-হাত লম্বায়, আর চওড়ায় একহাত হল এর সাধারণ মাপ। সমান্তরাল সরল রেখার ডিজাইন এবং গাছপালার চিত্রাভাস ইত্যাদির চারপাশে পাড় হিশেবে থাকে এতে। সব ধরণের কাঁথার মধ্যে এতেই কেবল সামান্য রৈখিক বিমূর্ততা (লাইনার-অ্যাব্‌সট্র্যাক্‌শ্যন) দেখা যায়, যা লোকশিল্পের স্বধর্ম বিরুদ্ধ। এর কারণ জানা নেই।

জায়নামাজ, দস্তরখানা ইত্যাদি মূলত বসার আসন। প্রথমটি প্রার্থনার এবং দ্বিতীয়টি খাওয়ার সময়ে ব্যবহৃত হত একদা। গেলাপ এক ধরণের বড় বাক্সের ঢাকনী গোছের কাঁথা, অর্থাৎ ওয়াড় কাঁথারই একটা বৃহৎ রূপ। ওয়াড়কে কেউ-কেউ বেতনও বলেছেন, তাতে বইতনের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে অবশ্যই। আবরণীও অনেকটা গেলাপ জাতেরই জিনিষ, বাদ্যযন্ত্র রাখার কাজে ব্যবহৃত হত।

॥ ৩ ॥

কাঁথার বিশিষ্ট মোটিফগুলি সম্বন্ধে কিছু কথা না-বললে চলে না এখানে। বাংলা লোকশিল্পের প্রায় সমস্ত মোটিফই কাঁথায় পাওয়া যায়; সে কথা ওপরে বলেছি। এই মোটিফগুলির মধ্যে পদ্ম, কল্‌কা, বিভিন্ন প্রকরণের লতা, বরফি, বুটি, রেখবৃত্ত ইত্যাদি কাঁথায় প্রায় সব সময়েই ব্যবহৃত হয়। পদ্মের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রভাস্কর্যের গভীর সম্পর্কের কথা শিল্প-ইতিহাসের ছাত্রদের অবশ্যই জানা আছে। হিন্দু ধর্মে পদ্মের যে বিশেষ গুরুত্ব, কাঁথার পদ্মের গুরুত্ব তার থেকে পৃথক। কাঁথার শিল্পভাবনার মধ্যে যে নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি আছে, তা নিতান্তই ধর্মনিরপেক্ষ যেহেতু, তাই এর তাৎপর্যটি বিশেষ ভাবে বিচার্য।

আসলে পদ্মের এদেশের লোকায়ত নন্দনচিন্তার একটা সুগভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। পদ্ম আদিম কাল থেকেই নারীত্বের এবং উর্বরতার ব্যঞ্জনাবহ একটি প্রতীক। মাতৃকাতন্ত্র এবং উর্বরতাতন্ত্রকে ধারাবাহিকভাবে অবলম্বন করে যে সমাজ-পরম্পরা প্রাগিতিহাসের কাল থেকে এই দেশে বিবর্তিত হয়েছে, তার সূত্র ঐ প্রতীকে বিধৃত রয়েছে। ধ্রুবপদী হিন্দুধর্মে, তন্ত্রে, এমন কী মহাযানী বৌদ্ধধর্মেও পদ্ম তাই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতীক চিহ্নরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পক্ষান্তরে লোকায়ত নন্দনচিন্তাতেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পদ্ম-প্রতীক শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে বহমান হয়ে থেকেছে। সেই লোকায়ত ব্যবহারিক ভাবনাই কাঁথার মধ্যে এসেছে; আলপনার মধ্যে ধর্মসাপেক্ষ জাদুবিশ্বাস আছে বলে সেখানে পদ্মের একটি অন্যতর ব্যঞ্জনা রয়েছে, কাঁথার পদ্মের ব্যঞ্জনার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কাঁথার পদ্ম, জাদু এবং ধর্মকে অতিক্রম করে সমাজ-নান্দনিক একটি স্তরে উন্নীত হয়েছে বলেই, মুসলিম মহিলারাও কাঁথায় পদ্মপ্রতীক সাদরে চিত্রিত করেন।

কল্‌কা প্রতীক এসেছে সম্ভবত মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ করেই। কাশ্মীরী শালের প্রভাবটা সমাজের ওপর মহলে যতই বেড়েছে, ততই বৃহত্তর জনসমাজের সমান্তরাল শিল্পধারা নক্‌সী কাঁথার মধ্যেও তার মোটিফ-বৈশিষ্ট্য কাঁথাকেও প্রভাবিত করেছে। শঙ্খলতা, খুন্তিলতা-প্রভৃতি মোটিফ আলপনার ধারার সঙ্গে সমান্তরাল; তবে কাঁথার মধ্যে আল্‌পনার মতো ব্রতকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস নেই। অবশ্য দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রে এবং দেবীর মুকুটেও কল্‌কা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, একথা স্মরণযোগ্য।

বাংলার বিভিন্ন মসজিদগাত্রের অনেক মোটিফের সঙ্গে আলপনার মোটিফের সাদৃশ্যের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য। এই সূত্রেই কাঁথার মধ্যেও একই ধরণের মোটিফের কথা বিচার্য। পূর্বোক্ত 'লতানে'-মোটিফগুলি সম্পর্কে এই ভাবনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলেই নিঃসন্দেহে মনে হয়। অর্থাৎ, নক্‌সী কাঁথার মধ্যে হিন্দু-ও-মুসলিম— দুই ঐতিহ্যেরই একটা সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বিত ঐতিহ্য সেই জন্যে ধর্মীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করে, বৃহত্তর মানবধর্মকেই ব্যক্ত করেছে। শ্রেণীশোষিত সমাজের ওপরতলায় যে-বিভেদ থাকে, নিচের তলায় তার কোনও শিকড়ই নেই, সেটিই এর থেকে প্রমাণিত হয়।

ঙ. পুতুলের পটভূমি ঃ আদিম জাদু থেকে বিশ্বযুদ্ধ

আগেই বলেছি যে, বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়েই শিল্পকলার ক্ষেত্রে মোট চারটি পৃথক ধারার অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে করা হয় : চিত্র, অলঙ্করণ, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য। লৌকিক শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয় অবশ্যই; এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যেই আবার রয়েছে নানা ধরনের উপবিভাগ। পুতুল ও প্রতিমা হল লৌকিক ভাস্কর্যের অর্ন্তগত এই রকম দুটি উপশাখা।

লৌকিক ভাস্কর্য কথাটি অবশ্য এখানে কিছুটা স্থিতিস্থাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মৃৎভাস্কর্য এবং দারুভাস্কর্য দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল তো বটেই, এই সব ক-টি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা দেবদেবীর প্রতিমা, নানাধরনের মুখোশ এবং খেলনাও লৌকিক ভাস্কর্যের বিষয়ীভুক্ত। এসব ছাড়া এই শিল্পবর্গের গোষ্ঠীভুক্ত হল ডোক্‌রা কামারের তৈরি পুতুল, খেলনা এবং তৈজসপত্র; গালা, শোলা এবং শাঁখা-ঝিনুক-কড়ি ইত্যাদির গয়না, সাজ, তৈজস আর খেলনা ইত্যাদিও। কাঠের খিলান এবং দরজা-জানালার ফার-ফোরের কাটাই-খোদাই কাজ, পোড়ামাটির ইটের ওপর কাজ-এসবও এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু এইসব কিছুর মধ্যে পুতুলই হল বহুলতমভাবে প্রচলিত শিল্পবস্তু—বাংলার লোকশিল্পীরা যা তৈরি করে থাকেন সাধারণত তিনটি উপলক্ষে : ধর্মীয় আচার-পালন, গৃহসজ্জা এবং শিশুর ক্রীড়া। অত্যন্ত অপরিশীলিতভাবে তৈরি এক ধরনের হাতি, ঘোড়া, পাখি—মায় মানুষেরও প্রতিকৃতি গ্রাম বাংলার প্রায় সর্বত্রই লৌকিক কোনও গ্রামীণ দেবতার 'থানে' মানৎ-রক্ষা কিংবা পূজার উপলক্ষে সাজিয়ে দিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। এদেরকে বলা হল 'ছলন'। আদিম মানুষ দেবতার উদ্দেশে শিকার-করা পশুকে নিবেদন করত তাঁদেরকে খুশি রাখবার আশায়; এটাই পরে পরিণতি পেয়েছে 'বলি'-তে। আরও পরবর্তীকালে আসল প্রাণীর বদলে তাদের ঐসব প্রতিকৃতি উৎসর্গ করে দেবতার মনস্তুষ্টি (ছলনার মাধ্যমে !) করার প্রয়াস প্রচলিত হয়েছে। এই 'ছলন'-গুলির চেহারার মধ্যেই একটা প্রাগৈতিহাসিক আদিমতা প্রকট হয়ে আছে যেন। প্রায় সর্বদাই মাটির তৈরি পোড়া অথবা কাঁচা অবস্থায় রঙহীন রূপেই এদেরকে দেখা যায়।

নির্ভেজালভাবে যাদেরকে লৌকিক পুতুল বলে গণ্য করা হয়, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে তাদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক গঠনশৈলী কমবেশি দেখা যাবেই। আদিম প্রপিতামহরা যে পুতুল প্রতিমা গড়তেন (পাথরে বা পোড়ামাটিতে), তাদের মধ্যে হাত-পা ধড়-মুখ ইত্যাদির খানিকটা আদল থাকাই প্রধান কথা ছিল, কোনো সূক্ষ্ম 'ডিটেইল্‌স' সেখানে ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম পুতুলগুলি ছিল নারীমূর্তি; নারীত্বসূচক অঙ্গ-বৈশিষ্ট্যগুলিই সেখানে প্রকট করে দেখানো হতো। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্ভবত এগুলি প্রজনন-কেন্দ্রিক ধর্মাচার-বা-মাতৃকাতান্ত্রিক সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এমনিতে বাস্তবানুগ 'ডিটেল্‌স' অন্যক্ষেত্রে না থাকলেও—ঐ বিশেষ-বিশেষ প্রত্যক্ষ-নির্দেশনা কিন্তু ধর্ম-সংস্কার ছাড়াও, 'রিয়ালিস্টিক' শিল্পেরও প্রাথমিক পরিচয়

বহন করছে, এ কথা মানতে হবে।

প্রত্নতত্ত্বের পরিভাষায় এই নগ্নিকা পুতুলগুলির নাম 'ভেনাস ফিগারাইনস'। এই আদিম পৌত্তলিকতার অনুষঙ্গেই প্রাচীন সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সর্বত্রই অনুরূপ ধরনের পুতুল তৈরি হয়ে এসেছে। মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু উপত্যকায় মধ্য-আমেরিকায় এবং অন্যত্রও, সেই রূপকল্পের যে-সব পুতুল-বা-মূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কিছুটা পরিশীলন এসেছে। ফ্রান্সের ব্রোয়া ফ্রেরে কিংবা অস্ট্রিয়ার ডুসেলডর্ফে বা ল্যাসেলে অন্তত ২০,০০০ বছর আগের যেসব 'ভেনাস' পুতুল মিলেছে তাদের তুলনায় নীল-তাইগ্রিস/ইউফ্রেতিস-সিন্ধুর অববাহিকায় পাওয়া ৮,০০০—৫,০০০ বছর আগের এই পুতুলগুলিতে চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, থুতনি জামাকাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদি বেশ 'ডিটেইল্ড' ভঙ্গীতেই স্পষ্ট করা হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পা-চন্হুদড়ো প্রভৃতি নগরীগুলির প্রত্নাবশেষ থেকে পাওয়া পুতুলগুলি আমাদের পরিচিত। কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে এদের কয়েকটি নিদর্শন সাজানো আছে; ইতিহাসের বইতেও এরা ছবির মাধ্যমে হাজির।

॥ ২ ॥

ঠিক ঐ একই ঢঙে তৈরি পুতুলই গ্রাম-বাংলার শিল্পীরা স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে আসছেন। তবে নারীমূর্তির স্ত্রী-ত্বসূচক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানে নির্মণ্ডিত। মাটি দিয়ে গড়া এই প্রতিমাগুলিতে আঙুলের টিপে নাক-কান তৈরি করা হয়; চোখ এবং ঠোঁট, নখ বা নরুন দিয়ে আঁচড় কেটে চিহ্নিত করা হয় কিংবা আলাদা করে মাটির ডেলা বসিয়ে দেওয়া হয় মানানসই করে। মঙ্গলঘটের গায়ে-আঁকা পুতুলি কিংবা আল্পনার 'কোলে-পো কাঁখে-পো' মূর্তির সঙ্গে এই ধরনের পুতুলগুলির ভাব এবং রূপে দারুন মিল দেখা যায়। প্রাচীন গুহাচিত্রে—তা সে স্পেনের আলতামিরাই হোক, আর ফ্রান্সের দর্দোঁ-ই হোক, কিংবা সাহারার তাসিলীই হোক, কিংবা আমাদের ভূপালের কাছে হোসেঙ্গাবাদের ভীমবেট্কাই হোক—প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে টিকে-থাকা ঐ প্রত্ননিদর্শনগুলিতে ঠিক এই একই 'মোটিফ'-এর মানুষের চেহারা দেখা যায়। নব্যপ্রস্তরযুগে সিন্ধুলিপিতে কি ক্রীট দ্বীপে পরবর্তী কালের পাওয়া 'মিনোয়ান-বি' লিপিতে কিংবা ইস্টার দ্বীপের লিপিতেও ঠিক ঐ ধরনেরই মানুষের মূর্তিচিহ্ন মেলে। এই পুতুলগুলি রূপকল্পের দিক থেকে তাই বিশ্বজনীন এবং বলতে গেলে চিরকালীন। প্রত্নবিজ্ঞানীরা সঙ্গতভাবেই তাই এদের নাম দিয়েছেন 'এঞ্জেলস ডল্স'। প্রাগিতিহাসের কাল থেকে আজ অবধি এরা মোটামুটি একই রূপকাঠামোয় তৈরি হয়ে আসছে।

এ-ধরনের পুতুলগুলি অনেক সময়েই আবার পুড়িয়ে ইট-রঙা করে দেওয়া হয়। রঙ দিলে, আমাদের দেশে প্রচলিত লোকশিল্পের উপজীব্য মুখ্য রঙগুলিই ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ লাল, হলদে, নীল, শাদা, সবুজ এবং কালো। মিশ্র রঙের ব্যবহার নেই বললেই চলে। আদিতে নানান্ দেশি ভেষজ ইত্যাদি রঙ করার জন্য ব্যবহৃত হলেও, এখন কেমিক্যাল রঙই প্রযুক্ত হয়। শাদামাটা চেহারার এই পুতুলগুলি সাধারণত বেনেতি-

পুতুল কিংবা মা-পুতুল বলেই কথিত হয়ে থাকে। মাটির পাখি, ঘোড়া, হাতি, বেড়াল, মাছ ইত্যাদির পুতুলমূর্তিও এই বর্গেরই প্রচলিত খেলনা। খুব পরিশীলিত না হলেও এগুলির মধ্যে মোটামুটি বাস্তবানুগ একটা ভঙ্গী এবং চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়, যা হয় না ঐ মা-পুতুলের ক্ষেত্রে।

আমাদের লৌকিক পুত্তলীশিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি হল কাঠপুত্‌লি; সংস্কৃতি-বিজ্ঞানে যাদের পরিচয় 'ম্যমি ডল্' হিসেবে। প্রাচীন মিশরে যেমন 'ম্যমি' করে-রাখা মৃতদেহের আধার হিশেবে মানুষের চেহারার অনুরূপ কাঠের তৈরি যে অলঙ্কৃত বাক্সগুলি তৈরি হতো, এগুলি সেই রকমই দেখতে ক্ষুদ্রাকৃতি মানবীমূর্তি। লম্বা এবং পুরু একটা কাঠের টুকরোর দুধার ঢালুভাবে চেঁছে ফেলে একটা দীর্ঘ ত্রিকোণাভাস ফুটিয়ে তোলা হয়; মাথার দিকটা দুপাশে ছেঁটেকেটে ঘোমটা দেবার আদল তৈরি করে আবার বুকের ওপর থেকে থুতনির নিচে অবধি গভীর করে খাঁজ কেটে নারীমূর্তির অনুকরণ করা হয় এগুলিতে। এরপর রঙ্ তুলিতে বধূমূর্তি আঁকা হয়—নাক, চোখ, মুখ, শাড়ি-ইত্যাদি সমেত। এই 'ম্যমি ডলে'র আদলে কাঠের পেঁচাও তৈরী হয়। অনেক সময় এগুলি গৃহসজ্জার উপকরণ হিশেবে ব্যবহৃত হলেও লক্ষ্মীপূজার আনুষঙ্গিক রূপেও এদের ব্যবহারের প্রচলন আছে। এগুলি নানাভাবে রেখায় এবং রঙে সজ্জিত করেন শিল্পীরা, যা আবার খানিকটা 'স্টাইলাইজ্‌ড'ও বটে।

এই পেঁচাগুলির মুখ যতটা-না পুতুলের মতো, তার চেয়ে বেশি মুখোশের অনুরূপ। 'ম্যমি ডল'-এর ছাঁদেই অনেক সময় দু-হাত তোলা গৌর-নিতাই কিংবা ঐ কোলে-পো কাঁখে-পো মায়ের পুতুলও বেশ পরিচিত।

ঐ পুতুলগুলির প্রাগৈতিহাসিক পূর্বসূত্র না থাকলেও, এদের মধ্যে ইতিহাসের একটি পর্বক্রম খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে করা হয় অনেক সময়ে ঐতিহাসিকদের একটি বড় অংশ মনে করেন যে প্রাচীন মিশর এবং বাংলার মধ্যে একটি নিয়মিত আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল কোনও সময়। সেই সূত্র ধরেই এমন কথাও হয়ত মনে করা যায় যে, এই 'ম্যমি ডল্'-গুলি সেই পুরোণো সম্পর্কেই স্মৃতির অনুষঙ্গবাহী।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন মিশরে পুতুল তৈরির যে-হদিশ পাওয়া যায়, তারও বয়স অন্তত ৮০০০ বছর। শুধু মিশরই নয়, সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাতেই পুতুলের একটা উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী হিশেবে তো বটেই, তা ছাড়াও নানাবিধ দৈনন্দিন প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাপারও ছিল প্রায় সমস্ত সংস্কৃতি-বলয়েই। মিশরীয় পিরামিডগুলির ভিতরে সোনা এবং অন্যান্য ধাতু অথবা পাথরে তৈরি নানা রকমের পুতুল দেখা গেছে, যেগুলোর সঙ্গে পরলোক এবং মৃতের প্রত্যাবর্তন-চিন্তা জড়িয়ে আছে বলে মনে করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং নিকট-ও-মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে-সমস্ত প্রাচীনকালের সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে, তাদের অনেকগুলিতেই পাথর ও পোড়ামাটির পুতুলেরও সন্ধান মিলেছে। ফারাওদের সমাধিস্থল পিরামিডগুলিতে যে-কারণে পুতুল

রাখা হতো, এইসব সমাধিগুলিতে মৃতদেহের পাশে পুতুল শুইয়ে রাখার হেতুও তার থেকে পৃথক কিছু নয়। মৃত মানুষটি যদি প্রাণ ফিরে পায় কখনও, তখন তার 'মৃত্যু'-র ব্যাপারটা গিয়ে বর্তাবে ঐ পুতুলের ওপরে—এই জাদুবিশ্বাসের বশেই এমনটা করা হতো।

পুতুল-সংক্রান্ত এই জাদুপ্রত্যয়ের আরও নানাবিধ রূপ আছে। উর্বরতাকেন্দ্রিক সংস্কারের দো-রোখা অভিব্যক্তির (শস্যকামনা এবং সন্তান-আকাঙ্ক্ষা) সঙ্গেই পুতুলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সন্তানহীনা নারী যদি পুতুল নিয়ে সর্বদা ঘোরে, তাহলে সে এক সময়ে সন্তান লাভ করবে, এমন বিশ্বাস ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছে। এই বিশ্বাস চৈনিক সংস্কৃতিতেও রয়েছে। মার্কিন দেশে বিয়ের উৎসবে মানুষের-মতো-দেখতে—এমন সব কেকের-পুতুল তৈরি করে টেবিলে সাজানো হয় এবং বিয়ের ভোজ শুরু হলে কনেকেই সর্বপ্রথম সে-রকম একটি কেক যে খেতে হয়, তর পিছনেও ঐ বিশেষ সংস্কারটিই ক্রিয়াশীল।

রোগ-বালাই হলে অসুস্থ শিশুর কাছে একটি পুতুল শুইয়ে রাখার যে-সংস্কার পশ্চিমী দেশগুলির প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, তার অর্থ আর কিছুই নয়, শিশুর ব্যাধি যেন পুতুলটাকে গ্রাস করবে—আর তার ফলে শিশুটিও রোগমুক্ত হবে, এমনই একটি অশুভ-বিতাড়ক জাদুশক্তির কল্পনা সেখানে রয়েছে। মধ্যযুগে ডাইনীকে 'ঠকাতে', বাড়ির বাইরে একটি দোলনায় একটা পুতুলকে সাজিয়ে-গুছিয়ে শুইয়ে রাখতেন জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, হাঙ্গারী-প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলির মানুষেরা। পুতুলকেন্দ্রিক এই অশুভরোধক জাদুশক্তির কল্পনা যে কতদূর অবধি যেতে পারে, তার একটা সুন্দর নমুনা মেলে মারিয়া লীচ-সম্পাদিত 'স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশ্যনারী অব ফোকলোর, মিথোলজি অ্যাণ্ড লিজেণ্ড' (১ম খণ্ড, ১৯৪৯)-এর মধ্যে : "প্যারি শহরে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক জাদুবস্তু হিশেবে, এবং তারও আগে সেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই, ইনফ্লুয়েঞ্জা ঠেকানোর মাধ্যম রূপে গণ্য করে বহুলোকেই পুতুল-মেয়ে এবং পুতুল-ছেলে নিয়ে ঘুরতেন।" (পৃ. ৩২০)।

ভাল ফসলের আকাঙ্ক্ষায় অথবা ভাল ফসল হবার কৃতজ্ঞতায় শস্য দিয়ে নারীমূর্তি তৈরি করে চাষের ক্ষেতে উৎসব করার পিছনে উর্বরতা-কেন্দ্রিক সংস্কারের অন্যতর অভিব্যক্তিটি দৃশ্যমান। এই শস্যমূর্তি 'বিয়ের কনে' হিশেবে উল্লেখিত হয় মধ্য-ইউরোপে; কোথাও আবার এর নাম 'শস্যজননী'। আমাদের দেশে আবার ফসলের ক্ষেতে পাখির উৎপাত এড়ানোর জন্য হাঁড়ির ওপর কালো রং করে, তার গায়ে চুন দিয়ে চোখ-মুখ এঁকে সাজিয়ে রাখা হয়। এই 'কাকতাড়ুয়া'-ও এককালে শস্যরক্ষক এবং জাদুক্ষমতার অধিকারী বলে ধার্য হতো। এখন এই বিশেষ তাৎপর্যটা অবশ্য বিলুপ্ত প্রায়।

॥ ৪ ॥

পুতুলের সূত্রেই 'পুতুল-নাচ' সম্পর্কেও দু-চারটি কথা উল্লেখ করতে হয়। পুতুলের মতোই পুতুলনাচও একটি বিশ্বজনীন শিল্পধারা। জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের সঞ্চার হবার একটি আদিম সংস্কার এই শিল্পকলার পিছনে থাকতে পারে অবশ্যই। তবে মূলত এই

শিল্পকে লোকনাট্য এবং লোকক্রীড়ার মধ্যবর্তী একটি প্রকরণ বলে গণ্য করাই শ্রেয়।

সুতোয়-টানা পুতুল, দস্তানা-পুতুল, ডাঙে-চড়ানো পুতুল— এই তিনটিই হল বিশ্বজনীন ধারা। ইন্দোনেশিয়ায় ছায়া-পুতুলের খেলারও প্রচলন আছে অনেক অঞ্চলে। কিন্তু অন্য তিনটিই হচ্ছে পুতুল নাচের প্রধান ধারা।

পুতুল-নাচের বয়স খুবই প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্লবক, কুহক-প্রভৃতি ভ্রাম্যমান আনন্দ-বিনোদনকারী-সম্প্রদায় পুতুল নাচিয়ে জীবিকার্জন করত বলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। তার শ-দুয়েক বছর পরে পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও পুতুল-নাচের উল্লেখ আছে। ইউরোপেও পুতুল-নাচ খ্রিস্টপূর্ব আমলের রেওয়াজ।

সম্ভবত সুতো ধরে পুতুল যাঁরা নাচাতেন, তাঁরাই অভিহিত হতেন 'সূত্রধর' বলে। 'পঞ্চালিকা' শব্দেরও একটি অর্থ, 'পঞ্চালী'-সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহার্য 'পুত্তলিকা'।

প্রাচীন পুতুল-নাচ অবশ্য ইউরোপ-এবং-আমেরিকায় এখন প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে অত্যন্ত পরিশীলিত একটি বিনোদনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়-বা-ইন্দোনেশীয় পুতুল-নাচ এখনও পুরানো পদ্ধতিতেই নির্ভরশীল। জাদুর (এবং / অথবা, মান্যার)-সংস্কার এখন পুতুল-নাচে কোথাওই ক্রিয়াশীল নয়। পক্ষান্তরে তবে পশ্চিমবাংলায় এই শিল্পকলা লোকনাট্যের সাধারণ স্রোতেই ভেসে চলেছে। লোকনাট্যে যেমন পুরাণ-কথা থেকে সামাজিক-বিষয় অবধি, বহুবিচিত্র উপজীব্য অবলম্বন করা হয়, পুতুল নাচও তার থেকে পৃথক কিছু নয়।

তবে শিল্পধারা হিশেবে পুতুলনাচ এদেশে এখন মুমূর্ষুপ্রায়। লোকসংস্কৃতির কোনও-কোনও ধারা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনা বলে ধীরে-ধীরে গতোন্মুখ হয়। আর পুতুল-নাচেও, লোকশিল্পের ক্ষেত্রেও এইরকম হওয়াটাই বোধহয় অনিবার্য পরিণাম।

নবম অধ্যায়

শেষ কথা : লোকসংস্কৃতির দর্শন—প্রমা ও প্রতীতি

চল্‌তি রেওয়াজ-অনুযায়ী ধ্রুবপদী ভারতীয় দর্শনের যে-ছ'টি শাখা (মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক এবং বেদান্ত) আস্তিক বা বেদ-অনুগামী বলে গণ্য, তাদের সব ক-টিকেই আমরা ভাববাদী চিন্তাধারার জাতক হিশেবে গণ্য করে থাকি। পক্ষান্তরে নাস্তিক অর্থাৎ বেদ-বিরোধী বলে যে তিনটি শাখার (বৌদ্ধ, জৈন এবং লোকায়তিক তথা চার্বাকীয়) মূল্যায়ন করা হয়, তাদের মধ্যেও প্রথম দুটি পরিণামে ভাববাদী তত্ত্বেরই পরিপোষণ করে থাকে। ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যানুসারী পণ্ডিতেরা একমাত্র বেদ-বিরোধী অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ড-বিরোধী বস্তুবাদী নাস্তিক্য-তত্ত্বনির্ভর লোকায়ত মতকে সেজন্যে মূলধারার অঙ্গীভূত বলে গণ্য করতে নারাজ।

সাধারণভাবে 'নাস্তিক' বলতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীকে বোঝালেও, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় এ-শব্দের ব্যঞ্জনা ভিন্নতর। সে-কথা এখনি বলেছি। বৌদ্ধ দর্শন এবং জৈন দর্শন—দুয়েরই ঈশ্বর সম্বন্ধে অনীহা, পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ এবং নিরীশ্বরতাকে সমার্থক করে তুলেছিল। কিন্তু লোকায়তিক চিন্তাধারার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক-তত্ত্বের নাম উচ্চারিত হলেও, তার সঙ্গে ও-দুয়ের মৌলিক একটা পার্থক্য রয়েছে। ষড়্‌দর্শন-বহির্ভূত তিনটি নাস্তিক্য-দর্শনের মধ্যে একমাত্র লোকায়তিক ধারাটিই বস্তুবাদী চিন্তা থেকে জন্মেছে বলে, পরিণামে ভাববাদ-প্রচারক বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও জৈন-আজীবিকদের সঙ্গে তার অনুগামীদের বিরোধ একটা ছিলই।

গুপ্তযুগ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটেছিল, তার রাজনৈতিক পরিণতি হিশেবে বৌদ্ধধর্ম নিজের জন্মভূমিকে ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল বৃহত্তর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। আর আজীবিক ওরফে জৈনরা নির্বিরোধ একটি ছোট্ট সম্প্রদায় হিশেবে এই বিরাট দেশের দু-একটি প্রত্যন্তে টিঁকে রইলেন নিজেদের সীমায়ত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে। বৌদ্ধধর্ম দেশের এক বৃহৎ জনশক্তিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে, রাজ-শক্তির ধর্ম অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্যবাদ (সাধারণভাবে যা হিন্দুধর্ম বলে স্বীকৃত) তাকে নিজের শত্রু বলে গণ্য করেছিল, যা করেনি জৈনধর্মকে, তার অনুগামীদের সংখ্যাল্পতার কারণে। তবু বৌদ্ধসংস্কৃতির কিছু অবশেষ এদেশে রয়ে গেল; রয়ে গেল বৌদ্ধ দর্শনের গ্রন্থগুলিও। 'যজ্ঞ-অনল-আলোতে' সমস্ত 'বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি' অজাতশত্রুর দল যে সমর্পণ করেনি কিংবা করতে পারেনি, তার অন্তর্নিহিত একটি বড় কারণ হল এই যে, বৌদ্ধধর্মও রাজধর্ম হিশেবে গৃহীত হয়ে একটা সময়ে সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে বৈদিক

যাগযজ্ঞ-বলি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে-বিরোধিতা দেখি, তার কারণেই এগুলি শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হতো; তাঁরা বলির নামে গবাদি পশুহত্যার বিরোধী ছিলেন, যেহেতু সেগুলিও ছিল তাঁদের পণ্যবস্তু। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের যে-বিবাদ হিন্দু সম্রাটদের আমলে সুবিস্তৃত হয়েছিল, সেটাকে এইসব কারণে মূলত একই শ্রেণীস্বার্থের অর্ন্তদ্বন্দ্ব গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়। ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার 'হিন্দুস্থানে' সীমিত হয়ে গেলেও বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রকে সেখানে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়নি বা যায়নি!

কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারটি লোকায়তিক দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটেনি। বৃহত্তর জনজীবনের প্রতিদিনের উপলব্ধি এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে যে-দর্শনের অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটেছিল, স্বভাবতই শ্রেণীসমাজের মাথায় যাঁরা আসীন ছিলেন, তাঁরা তার অস্তিত্বকে নিজেদের স্বার্থবিরোধী বলে উপলব্ধি করে সবরকমে তার উৎসাদন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন, এতে আর আশ্চর্য কী।

বেদান্তদর্শনই কালক্রমে এদেশে অধ্যাত্মচিন্তার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সেও ঐ একই কারণে। লোকায়ত দর্শনের বস্তুমুখী ও জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিরুদ্ধ করতেই যে আচার্য শঙ্করের নেতৃত্বে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বৈদান্তিক তত্ত্বকে সমস্ত দর্শনভাবনার সারাৎসার রূপে প্রচারিত করা শুরু হয়েছিল শাসকগোষ্ঠী এবং তার সহযোগী সম্প্রদায়গুলির শ্রেণীস্বার্থেই, একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। 'মূঢ়' জনগণ যদি জগৎসংসারের ভালমন্দের ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে মাথা ঘামায়, তাহলে তো কায়েমী স্বার্থপোষিত রাজ-শক্তি, পুরোহিত-শক্তি এবং শ্রেষ্ঠী-শক্তির পক্ষে সেটা হবে নেহাতই বিপদের কথা। সুতরাং শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে বেদান্ত দর্শনের প্রচার শুরু হল দুর্মর গতিতে : জনগণকে ভুলিয়ে দিতে চাওয়া হল ঐহিক বা পার্থিব সুখ-শোক, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মূল্যবোধ এবং তারই প্রয়োজনে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র ঘটল আবির্ভাব, যার মূল কথা হল : ১. তুমি শুধু কাজ কর, তাতেই তোমার অধিকার। বিনিময়ে ফলের আশা কোর না, কারণ তাতে তোমার অধিকার নেই; অর্থাৎ, শ্রম দাও, পারিশ্রমিক চেয়ো না; সেবা কর, প্রতিদানে কিছু আশা কোর না; আর, ২. সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাতেই শরণ নাও; অর্থাৎ তুমি বুদ্ধপন্থা, আজীবিক মত, লোকায়তিক চিন্তাধারা—এই সমস্ত 'পাপ' ও ঐহিকতাময় 'ধর্ম' তথা 'দর্শন'-কে পরিত্যাগ করে আশ্রয় নাও পবিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যাদিত-বদনগহ্বরে, এই 'মায়া প্রপঞ্চময়' ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবার পর সেটাই হবে তোমার মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়! অতএব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার শ্রেণীগত বিচারে যারা তোমাদের ওপরে অধিষ্ঠান করছে, তাদের সেবা কর, সেই 'পুণ্য' তোমাকে মোক্ষের পথে এগিয়ে দেবে। আর তা যদি না কর, তাহলে ঘটবে 'পাপ'—ইহলোকে-পরলোকে কোথাও তোমার পরিত্রাণ নেই!

স্বাভাবিক কারণেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারিত হবার ফলে বেদান্ত দর্শনই সমস্ত ধ্রুবপদী দর্শনভাবনার মধ্যে সর্বশক্তিমান্ হয়ে উঠল কালক্রমে। ভাববাদী দর্শনের অন্যান্য শাখাগুলিও এর ফলে স্তিমিতশক্তি হয়ে পড়ল। আর ধর্মসংঘ ও রাজশক্তি একযোগে গলা টিপে ধরল বৃহত্তর জনগণের দর্শন-চিন্তার, অর্থাৎ বস্তুবাদী লোকায়ত

মতের।

কী ছিল এই লোকায়ত মতের স্বরূপ? বারবার এই মতকে 'বস্তুবাদী' বলে আখ্যাত করা হচ্ছে কেন? কেন এই ভাবনাধারা কায়েমী স্বার্থের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল?... এইসব প্রশ্নের উত্তর অনেক সহজে দেওয়া সম্ভব হতো যদি লোকায়ত দর্শনের গ্রন্থগুলির অনাহত অস্তিত্ব বজায় থাকত; যদি সেগুলিকে নির্মূল না করে দেওয়া হতো। কিন্তু কায়েমী শ্রেণীস্বার্থ সেই বিশেষ দর্শনশাস্ত্র-কেন্দ্রিত একখানি পুঁথিকেও অস্তিত্ব রক্ষা করতে দেয়নি . ভয় এবং প্রতিহিংসার আগুনে তাদেরকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছিল একেবারে।

॥ ২ ॥

লোকায়ত দর্শন (নামান্তরে চার্বাকপন্থা) বলে যে একটি মত 'প্রাকৃতজনাঃ'-কে প্রভাবিত করেছিল, তার উল্লেখ স্বয়ং শঙ্করাচার্যই তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র'-এর একাধিক জায়গায় করেছেন। কিন্তু কী ছিল তাঁদের সেই দর্শনে, সে-বিষয়ে শঙ্কর আলোকপাত করেননি। পরবর্তী সময়ে মাধবাচার্যের 'সবদর্শনসংগ্রহ'-তে এর যৎসামান্য উল্লেখ আছে। বলাই বাহুল্য কটু-কাটব্যের জন্য! চন্দ্রকীর্তির 'প্রজ্ঞাশাস্ত্র'-এ লোকায়ত শাস্ত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি সংকলিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রিজ ডেভিড্‌স, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, গার্বে, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এ-ব্যাপারে সবাই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, লোকায়ত মতের তাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। লোকায়ত মতের বিরোধী যাঁরা, তাঁদের বইপুঁথি থেকে ঐ দর্শনের যথার্থ স্বরূপটিকে খুঁজে বার করাও দুষ্কর কাজ, কেননা, প্রায় ক্ষেত্রেই সেগুলি বিকৃতিদুষ্ট স্বাভাবিক কারণেই।

অতএব?... অতএব, লোকায়ত মতের অনুসন্ধান করতে হবে ভারতবর্ষের মানুষের বহু শতাব্দীর জীবনচর্যায়, প্রাত্যহিক ধর্মবোধের ভিতরে, লৌকিক ও সামাজিক সংস্কারের ঐতিহ্যের মধ্যে। শুধুমাত্র এটুকুই নির্দেশক-সূত্র হিশেবে লোকায়ত-বিরোধী শাস্ত্রপুঁথিগুলির উল্লেখন থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে যে, লোকজীবনের সঙ্গেই ঐ মত-ধ্যান-ধারণা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ('লোকেষু আয়ত ইতি লোকায়ত'); তাই লোকজীবনের প্রাত্যহিক চর্যার অন্তর্লীন রূপটিই ছিল সেই দর্শনের উৎস-মুখ।

কিন্তু সেই বিশ্লেষণের আগে দেখা দরকার যে. আধুনিক বিদ্বানবর্গ প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থগুলির মাধ্যমে লোকায়ত দর্শনের স্বরূপ হিশেবে কী এবং কতখানি সাব্যস্ত করেছেন। লোকায়ত মত সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে যে, এই মতবাদ হল বেদ-বিরোধী এবং বেদান্ত দর্শন হল এই মতবাদের বিরোধী। এই দুটি নেতিমূলক সূত্র অবলম্বন করে যে-ইতিবাচক চিন্তায় এসে পৌঁছনো যায় তা হল এই ·

লোকায়ত-মতে বিশ্বচরাচর পাঁচটি 'ভূত' বা উপাদানের মাধ্যমে গঠিত—ক্ষিতি

(মৃত্তিকা), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বাতাস) ও ব্যোম (শূন্যতা)। এই প্রতিটি উপাদানই অসংখ্য কণার সমাহারে সৃষ্টি, যে-কণানিচয় সৃষ্টির আদিকাল থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই কণার সমন্বয়েই চেতনা এবং ইন্দ্রিয়বোধের সৃষ্টি, জীবনেরও সৃষ্টি। মৃত্যুর পর ঐ কণানিচয় আবার মৌলিক পঞ্চ-উপাদানে মিশে যায়।

অন্যপক্ষে, লোকায়ত মতে বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান অস্বীকৃত, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে এই তত্ত্বের অপ্রত্যয়; এবং শুধু তাই নয়, জীবাত্মা, পরমাত্মা, কর্মফল-ইত্যাদি বহু-প্রচারিত বিবিধ ভাববাদী তত্ত্বকেও এই দর্শনে অস্বীকার করা হয়েছে।

সমস্ত দর্শনতত্ত্বেরই একটা ব্যবহারিক দিকও থাকে। লোকায়ত মতও তার ব্যতিক্রম নয়। অজিত কেশকম্বলী-প্রমুখ লোকায়তিকরা যে-দার্শনিক তত্ত্বের এবং কণাদ (এঁর তত্ত্বের কথা পরে বৈশেষিক দর্শনপ্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলছি)-প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন, তারও অবশ্যই একটা প্রয়োগগত ও ব্যবহারিক দিক ছিল। প্রাচীন ভারতের 'গণ'-রাষ্ট্রগুলিকে শাসন ও তাদের সমাজকে পরিচালনা যাঁরা করতেন, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁদেরকে লোকায়ত চিন্তার অনুসারী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ঐ 'গণ'-রাষ্ট্রগুলির কাঠামো ছিল বহুলাংশেই গণতান্ত্রিক (আধুনিক কালের পরিভাষায়), আর তাই তাদের অন্তর্নিহিত সুস্থিত অবস্থাটিকে ধ্বংস করার জন্য রাজতন্ত্র-পন্থী কৌটিল্য-প্রমুখ সনাতনী শাস্ত্রবিদ্‌রা নানাবিধ পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের রচনা-ইত্যাদির মধ্যে।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী-সমাজগুলিতে যে-আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মাধ্যমে তাদের অন্তর্লীন শ্রেণী-বৈষম্য টিকিয়ে রাখা হতো, তারই পরিপন্থী-তত্ত্ব ঐ 'গণ'-রাষ্ট্রগুলিতে প্রচারিত ছিল বলেই, সেগুলিকে ধ্বংস করতে চাওয়া হতো, এমন সিদ্ধান্ত করা খুব অযৌক্তিক হবে না।

কৌটিল্য থেকে লোকায়ত-মতের যে-বিরোধিতা ও হানিসাধন শুরু হয়, তারই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শঙ্করাচার্যের হাতে। শুধু লোকায়ত-মতানুসারী রাষ্ট্রশক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করেই নয়, লোকায়ত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকেও নির্মূল করে এবং লোকায়ত-মতের বিরুদ্ধে বিচিত্র কুৎসা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী রটনা করে ব্রাহ্মণ্যসমাজ-সংস্কৃতির নায়করা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থকে নিরাপদ করতে চেয়েছেন। ধ্রুবপদী দর্শনপ্রবাহে তাই লোকায়তিক ধারাকে নিরস্তিত্ব-রূপে প্রতিভাত করে, তারই একটি খণ্ডিত ও অপূর্ণরূপকে 'চার্বাকীয়-মত' বলে নিন্দিত করার বৃহৎ কর্মকাণ্ড একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রবণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরই লব্ধফল।

॥ ৩ ॥

লোকায়ত দর্শনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী শাখাগুলির সঙ্গে—তা আস্তিক্যবাদী বা নাস্তিক্যবাদী যাই হোক না-কেন—তার মৌলিক বিরোধ। এই বস্তুবাদিতার স্বরূপ কী, তা আমরা একটু আগেই দেখেছি— এখানে তার

উৎসটি কী দেখা যেতে পারে। 'লোকায়ত' অর্থে যা-যা লোক-জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, এমন সমস্ত-কিছুই। লোক-জীবনের বিচিত্র-বিশ্বাস, বিভিন্ন আচার-সংস্কার, বিবিধ ব্যবহারিক ঐতিহ্য-অনুসরণ—এই সবকিছুর তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ সমন্বিত হয়েছে যার ভিতরে, তাই হল লোকায়ত দর্শন। সুপ্রাচীন কাল থেকে জনজীবনে যে-সমস্ত লৌকিক আচার প্রচলিত হয়ে এসেছে, আসছে— তাদের অন্তরস্থিত তত্ত্বান্বেষণ করেই লোকায়ত দর্শনের উৎসমুখটি খুঁজে পেতে পারি আমরা। বস্তুতপক্ষে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের আক্রমণে লোকায়ত দর্শনের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও, তার ব্যবহারিক বিলুপ্তি ঘটেনি ভারতের বৃহত্তর জনজীবনে, লৌকিক অজস্র ঐতিহ্যের অন্তরালে সেই ধারা প্রবহমান রয়েছে আজও।

লোকায়ত মতের জটিল দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরাজির অন্তর্নিহিত সারসত্যটি কী? এককথায় তাকে বলতে পারি—ইহমুখিনতা; ঐহিকতা; পার্থিব আকাঙ্ক্ষাসমূহের চরিতার্থতা। টি. ডব্লু. আর. রিজ্‌-ডেভিড্‌স তাঁর 'ডায়ালোগস অব দি বুদ্ধ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১৮৯৯) 'ফোকলোর' বা 'নেচারলোর' (লোকসংস্কৃতি; প্রকৃতিতত্ত্ব)-অর্থে 'লোকায়ত' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। যদিও রিজ্‌-ডেভিড্‌সের অভিমত পুরোপুরিভাবে দর্শন-ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ একালীন বিশেষজ্ঞরা, তবুও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেকটাই প্রাসঙ্গিক বস্তুধর্মিতা দেখতে পাই। লোকায়ত তথা ফোকলোর /নেচারলোর অর্থে রিজ্‌-ডেভিড্‌স যা বলেছেন, তা হল এই :

"ঐতিহ্যের পরম্পরাগত জ্ঞানগর্ভ প্রবচনমালা যেমন এর মধ্যে রয়েছে, ঠিক তেমনই আবার সঞ্চিত আছে এই মহাজগৎ-সম্পর্কে বিচিত্র সব প্রজ্ঞার বিপুল ভাণ্ডার· গ্রহ-নক্ষত্র, জল-বাতাস-আবহাওয়া, সামান্য কিছুটা জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাথমিক ধরনের পদার্থবিদ্যা—এমন-কী শারীরতত্ত্বের বিষয়ও। এছাড়াও, মহার্ঘ মণিরত্ন, গাছপালা-পশু-পাখি-ইত্যাদি অজস্র-কিছুর অমেয় অভিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে।" (পৃ ৭১)

রক্ষণশীল দর্শনবিদ্‌রা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিত্তি করে কোনও দর্শনতত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে যে সম্ভবত সেইকথা স্বীকার করবেন না। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অভিনিবিষ্ট ছাত্রমাত্রেই এই কথা উপলব্ধি করবেন যে, সেভাবে যদি ঐরকম বস্তুমুখিন এবং নিত্যকার লোকজীবনের চর্যাকে অবলম্বন করে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব যদি না-ই গড়ে উঠে থাকে, তাহলে সেই তত্ত্বের নিন্দাবাদ করা এবং তার উৎসাদন করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কায়েমী শ্রেণীস্বার্থের বাহক ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ এভাবে জেহাদ চালিয়ে যেতেন না।

সুতরাং লোকজীবনচর্চাকে কেন্দ্র করেই যে লোকায়তের উদ্ভব অতঃপর একথা মেনে নেওয়া চলে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নও ওঠে যে, লোকজীবনে প্রচলিত বহুবিধ আচার-সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদির পিছনে তো নানা ধরনের দৈব-বিশ্বাস, জাদু-নির্ভরতা-ইত্যাদি অসম্ভাব্য ব্যাপার অবলীন থাকে। তাহলে এ-সবের সারনির্যাস রূপে লোকায়তের মতো বস্তুবাদী চিন্তাধারা গড়ে ওঠে কেমন করে? এ-আপত্তি খুবই সঙ্গত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর নিরসন করতে হলে গণমনস্তত্ত্বের স্বরূপটি সম্পর্কে একটু

কথা বলে নেওয়া দরকার।

সাধারণ মানুষের জীবনের মৌল আকাঙ্ক্ষাটি কি? এই গ্রন্থের একাধিক জায়গায় উল্লেখিত ভারতচন্দ্র রায়ের সেই বহু-পরিচিত কবিতার পংক্তিটি পুনরুদ্ধৃত করে এককথায় তার জবাব দেওয়া যায় : "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" প্রকৃতপক্ষে ঐ পার্থিব সুখের আকাঙ্ক্ষাই হল সর্ববিধ পূজা, প্রার্থনা, সাধনা-ইত্যাদির মর্মসার ('মোক্ষবাদীরা' হয়ত একথা মানবেন না!) তাই ধনের আকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা, রূপের আকাঙ্ক্ষা, জয়ের আকাঙ্ক্ষা, অন্নের আকাঙ্ক্ষা, যৌনবাসনাচরিতার্থ হবার অভীপ্সা—এই সর্ববিধ আকাঙ্ক্ষাই নির্গলিত হয় স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা-ইত্যাদির মধ্যে। নিজের জন্য প্রার্থনা, প্রিয়জনের জন্য প্রার্থনা, সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনা—সবই প্রকৃতপক্ষে ঐ একই উৎস থেকে উৎসারিত। এই প্রার্থেয় বস্তুগুলি থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে মুষ্টিপ্রমেয় শ্রেণী-স্বার্থ-সংরক্ষক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের প্রাপ্যের পরিমিতি বাড়ানোর জন্যেই পার্থিব সুখের তাবৎ ব্যাপারকে মায়া, মিথ্যা, মোহ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ ঐ বৈদান্তিক মায়াবাদ উদ্ভাবিত হয়েছিল গণমানুষের পার্থিব প্রত্যাশাকে পরিপুষ্টি দেয় এমন কোনও মতবাদের প্রতিরোধ করতেই। সেই মতবাদ অবশ্যই বস্তুধর্মী, তার ব্যবহারিক প্রকাশে দৈব-ইন্দ্রজাল-অলৌকিকতা প্রভৃতি অসম্ভাব্য চিন্তা যতই সন্নিবিষ্ট হোক না-কেন! সেই মতই হল লোকায়ত। সর্ববিধ পার্থিব আদিম আকাঙ্ক্ষাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দুটি মৌল ধারায় সন্নিবদ্ধ করেছেন : ক্ষুধা এবং কামনা। ফসল চাই, সন্তান চাই এবং তার জন্যে জমি চাই, নারী /পুরুষ চাই। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এই রূঢ় গদ্যময় আকাঙ্ক্ষাগুলি পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত হল; আকাঙ্ক্ষার অনাবৃত রূপটা তাতে ঢাকাও পড়ল। কিন্তু জীবনের বাস্তব প্রয়োজনগুলি তো তাতে অবসিত হয়ে গেল না। কাজে-কাজেই সেই পার্থিব প্রত্যাশাগুলি পরিণতি লাভ করল নানান্ লোক-সংস্কারে। এই রকমই একটি সংস্কার হল মাতৃকাতন্ত্র; অর একটি হল উর্বরতাতন্ত্র! এই দুই ধর্মধারায় বহু বিচিত্র সব অভিক্ষেপ লোকায়ত মতের ব্যবহারিক দিকগুলিকে সুবিন্যস্ত করেছে।

আদিমতম সমাজ মূলত মাতৃপ্রধানই ছিল, যেহেতু সন্তানের পিতৃপরিচয় ছিল অনিশ্চিত। বস্তুতপক্ষে সন্তানের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে পিতার যে কোনও ভূমিকা রয়েছে সেটাই মানুষ উপলব্ধি করেছে ঢের পরে। ফলে মাতৃকাতন্ত্র (মাদার কাল্ট) স্মরণাতীত কাল থেকেই—সভ্যতার তথা-কথিত উদ্ভবকালের ঢের আগে থেকেই—প্রচলিত। কৃষির উদ্ভাবনের সঙ্গে যখন জানপদ জীবনের প্রতিষ্ঠা হল তখন থেকে মাতৃকাতন্ত্র বিবর্তিত হল উর্বরতাতন্ত্রে (ফার্টিলিটি-কাল্ট)—ফসল ও সন্তান, নারী ও ধরিত্রী সমার্থসূচক হয়ে উঠল। এর আধ্যাত্মিক দিকে মাতৃদেবতাদের আবির্ভাব হল, আবার পূর্বতন পুরুষপ্রধান শিকারজীবী সমাজের কাঠামোয় যে-পিতৃদেবকুলের কল্পনা করা হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে ঐ মাতৃদেবতাদের পার্থিব নারী-পুরুষের তুল্য সম্পর্কও অনুকল্পিত হল কালক্রমে। ইতিমধ্যে কৃষির আবির্ভাবের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি—রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়কের

আবির্ভাব ঘটল ক্রমান্বয়ে—যার অভিক্ষেপ আমাদের প্রাচীন (মানুষ তখন আদিম স্তরে পেরিয়ে সভ্যতার দিক্‌প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে) পিতামহদের দেবকল্পনা ও ধর্মাচরণেও পড়ল। যে দেবলোকের কল্পনা করলেন তাঁরা, সেখানে এক পরম-পিতা এবং আরেক পরমাজননী— পরমপুরুষ এবং পরমা-প্রকৃতির অস্তিত্বও কল্পিত হল।

এইখান থেকেই আমাদের দেশের অধ্যাত্মভাবনা ও দর্শনচিন্তার দ্বি-ধারার উৎপত্তি। নারী-পুরুষের বাস্তব ও স্বাভাবিক সম্পর্ককেই জীবনচর্যার লব্ধফল হিশেবে যাঁরা মানতে চাইলেন—কালক্রমে তাঁরাই হয়ে উঠলেন বস্তুবাদী, তথা লোকায়তিক; প্রচলিত মতে, চার্বাক-পন্থী। আর পরমপুরুষ-পরমাপ্রকৃতি-তত্ত্বের অধ্যাত্মকেন্দ্রিত বিশ্লেষণ যাঁদের বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল, সময়ের উদ্বর্তনে তাঁরা পরিণত হলেন সাংখ্যদর্শনের অনুগামী রূপে। ভাববাদী ছ-টি আস্তিক্য দর্শনের মধ্যে সাংখ্যই হল প্রাচীনতম। অনেক পণ্ডিতই সাংখ্যকে প্রাগার্য-অস্ট্রো-দ্রাবিড়-সংস্কৃতির জাতক বলে গণ্য করেন।

অর্থাৎ সাংখ্য এবং লোকায়ত একই উৎস থেকে সঞ্জাত, একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। একটি চলে গেল ভাববাদের পথে; অন্যটি গেল বস্তুতত্ত্বের সন্ধানে। বস্তুবাদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব-থাকা প্রত্যাশিত হওয়া সত্ত্বেও ধ্রুবপদী আস্তিক্য দর্শনের আবও এক শাখা—যোগ বা পাতঞ্জলও ভাববাদের ইহবিমুখতায় নিমীলিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুর চক্রাবর্তন থেকে মুক্তির পন্থা হিশেবে যোগসাধনার প্রথম স্তর যে পার্থিব সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে যেতে পারা এবং সেই বীতস্পৃহাই পরিণামে ঈশ্বরাস্বাদন করাবে—যোগ-দর্শনের মূল কথা হল এই। কিন্তু এরও ভিত্তি প্রোথিত দেহকেন্দ্রিত সাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণের বস্তুধর্মিতায়। দেহ ও মনের নিয়ন্ত্রিত পরিশুদ্ধির মধ্যে যে-বাস্তবমুখিনতা আছে, তাতে যোগদর্শনের আদি উৎসও যে লোকায়তিক চিন্তার নিকটবর্তী একথা বললে ভুল হবে কী?

লোকায়ত দর্শনের বিজ্ঞানসম্মতি প্রসঙ্গে এই অধ্যায়েই কিছু আগে যে-সব কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আবার ন্যায়দর্শনের অনেকাংশেই সাধর্ম্য রয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, অনু বা কণানিচয়ের মতো আত্মানিচয়েরও সংখ্যাতীত অস্তিত্বও এতে অনুজল্পিত হয়েছে এবং অনু ও আত্মার আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে—এমন কথাই বলে ন্যায়দর্শন। এর ফলে বস্তুবাদের সঙ্গে নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায়দর্শন পরিণামে ভাববাদী হয়ে গেছে। কার্য-কারণ-পরম্পরা বিচারে সূত্রে যে-যুক্তিবাদপ্রবণতা ন্যায়দর্শনের ব্যবহারিক সত্তাস্বরূপ, সেটিও সেটিও এক অর্থে বস্তুবাদী।

বৈশেষিক দর্শনের বস্তুধর্মিতা পদার্থ-বিশ্লেষণের পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিভাসিত। লোকায়ত-দর্শনের বিজ্ঞানভিত্তিতে সম্ভূনিচয়ের অন্তর্লীন পঞ্চভূতের যে-তত্ত্ব রয়েছে, এখানেও দেখি তারই অনুরূপ সপ্ত পদার্থ : দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। 'দ্রব্য' পদার্থ আবার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম (লোকায়তিক মতানুসারে) এই পাঁচটি এবং কাল, দিক, আত্মা ও মন এই আরো চারটিসহ মোট ন-টি ভাগে বিভক্ত। লোকায়ত বিজ্ঞানের অনু-তত্ত্ব প্রসঙ্গে কণাদের নাম তো ইতিপূর্বেই করেছি; মনে করা হয় কণাদই ছিলেন নাকি বৈশেষিক দর্শনের আদি প্রবক্তা।

এই সমস্ত কারণে বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত দর্শনের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যদিও এই দর্শনও খানিকটা আধি-পরমাত্মা-তত্ত্বের প্রবাচন করে বলে এরও ভাববাদ-দুষ্টি রয়েছে।

আস্তিক-দর্শনের মধ্যে বেদান্ত বাদে আর যে-শাখাটি বাকি রইল, সেই মীমাংসা ওরফে পূর্ব-মীমাংসা (বেদান্ত হল উত্তর-মীমাংসা) সামগ্রিকভাবেই বেদের কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করে সংরচিত হয়েছিল। বেদান্তদর্শনের কথা তো আগেই আলোচিত হয়েছে। তাহলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক এই চার সিদ্ধান্ত উৎসগতভাবে লোকায়ত মতের আত্মীয় হলেও, উত্তরকালে ভাববাদী সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই বলে কিন্তু তাদের বস্তুবাদী তথা লোকায়তধর্মী ভিত্তিটি অস্বীকার্য হতে পারে না, এ কথা স্পষ্ট করে বোঝার দরকার আছে। পক্ষান্তরে মীমাংসা ও বেদান্ত মূলত বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিকশিত হওয়ায় এদের সঙ্গে ও-দুয়ের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের শ্রেণীসংরক্ষক ঐতিহ্যের রক্তচক্ষুর সামনে, পরিণামে ঐ চার দর্শনের প্রবক্তারা নতি স্বীকার করেছিলেন নিশ্চয়ই, তা নইলে, তাদের অন্তর্গত বস্তুধর্মপ্রবণতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও কীভাবে ভাববাদী চিন্তাধারা সেখানে ব্যাপ্তিলাভ করতে পারে? পক্ষান্তরে, সেই নতি স্বীকার করাটা লোকায়তিকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি বলেই, সমাজ-নেতৃত্বের রুদ্ররোষে তার আপাত-বিলুপ্তি ঘটেছে।

আপাত-বিলুপ্তি? ঠিক তাই-ই; কারণ সমাজতত্ত্বের স্বাভাবিক সূত্রানুসারেই একটি সত্যভাবনাকেন্দ্রিত মতবাদ কোনও শাসকশক্তির রক্তচক্ষুর আগুনে দগ্ধভস্ম হয়ে যেতে পারে না। কী বলব একে? চিন্তাদর্শের গেরিলা যুদ্ধ? পরিহাস-জল্পিত হলেও, হয়ত কথাটা ভুল নয়। কারণ লোকায়ত মত প্রচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে তার জ্ঞাতিদের—বিশেষত সাংখ্য ও বৈশেষিকের মধ্যে। লোকায়ত নর-নারী-সম্পর্কবাদ সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের মাধ্যমে উত্তরপর্বের ধ্রুবপদী হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুর যুগল-আরাধনার মনস্কতা (শিব-শক্তি, নারায়ণ-লক্ষ্মী, রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা) সম্পূর্ণরূপেই সাংখ্যের ঐ যুগল-তত্ত্ব থেকে উৎসারিত। লোকায়ত-তত্ত্ব যে মাতৃকা-উপাসনা থেকে বিবর্তিত তারই পরবর্তী অনুক্রমণ দেখি তন্ত্রসাধনার ধারায়। লোকায়ত উর্বরতা-কাল্ট প্রবাহিত লৌকিক ব্রতাচারে; তার গণধর্মিতা অনুবর্তিত হয়েছে বিবিধ প্রকরণের সহজিয়া ভাবনায়।

সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে এবারে পৌঁছনো চলে যে, ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও আচার-বিধির যে-বহুবিচিত্র স্ফূরণ কয়েক হাজার বছর ধরে ঘটে চলেছে, তার বৃহদংশ আবর্তিত হয়েছে লোকায়ত মতকে কেন্দ্র করেই; হোক-না তা প্রচ্ছন্নভাবে। প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যার মূল দুটি শ্রেণী-পরিচয় : বেদানুসারী এবং বেদবিরোধী। ক্ষাত্র-অস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য-বুদ্ধি এবং বৈশ্যীয়-অর্থ একত্রে মেলবন্ধ হয়ে করেছে প্রথমটির পরিপোষণ এবং দ্বিতীয়টির উৎসাদন—আর বৃহত্তর জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সা মূর্তিমন্ত হয়েছে দ্বিতীয়টিকে অবলম্বন করে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে দ্বিতীয়ের পরাভব ঘটেছে যে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পরোক্ষ-সংগ্রামে তার অনমনীয় এবং অপরাজেয় সত্তা যে বহু শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করেও সুদৃঢ় হয়ে আছে, তাতে আর সন্দেহ কী?

লোকায়ত ভাবনাদর্শ আজও তাই প্রচ্ছন্নে থেকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত রেখে চলেছে অবিরামভাবে।

প্রাচীন গ্রীসের এপিকিউরিয়াসপন্থীদের দর্শনের সঙ্গে হয়ত ভাবনার দিকে কিছুটাও এই লোকায়ত-তথা-চার্বাকীয় দর্শনের তুলনীয় সমধর্মিতা আছে। কিন্তু এপিকিউরীয় ঐ তত্ত্ব নেহাৎই ভোগবাদের ইশ্‌তেহার-স্বরূপ ছিল; তাই শ্রমজীবী মানুষের ঘাম-মেহনৎ রক্ত-অশ্রু দিয়ে তার সামাজিক লিপিকরণ সম্ভবপর আদৌ হয়নি। পক্ষান্তরে, ঐ ভোগবাদিতার যে-সমস্ত অভিযোগই লোকায়তপন্থীদের বিরুদ্ধে নিয়তই তোলা হয়ে থাকুক না-কেন, লোকসমাজের মধ্যে—প্রতিদিনের জীবনচর্যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে-থাকা শ্রমপ্রক্রিয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেণী-অবস্থানের প্রতীতি এক হয়ে মিশে তার সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে বিশ্বজনীন-শিকড় তাকে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠ করে রেখেছে, তার ওপর ভর দিয়েই অলক্ষ্যে অস্তিত্বময় হয়ে আছে 'লোকায়ত' : লোকসংস্কৃতির অনাহত জীবন দর্শন॥